পন্থা

ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্ম-বিদ্যা সম্বন্ধীয়

মাসিক পত্র।

ত্রয়োদশ বর্ষ, ১৩১৬ সাল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্,

ও

শ্রীমন্মথমোহন বসু বি, এ,

সম্পাদিত।

কলিকাতা থিওসফিক্যাল সোসাইটী, ৮৭ নং

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ হইতে

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৬

প্রিণ্টার :—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌,—কলিকাতা

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৩শ ভাগ | বৈশাখ, ১৩১৬ সাল। | ১ম সংখ্যা।

আমাদের ত্রয়োদশ বৎসর।

গত বৎসরের পন্থার পাঠকগণের ও পন্থার প্রতিপাদ্য পরাবিদ্যা সমিতির সুখ দুঃখ পাপ পুণ্যাদির সমস্ত ফল শ্রীভগবৎ চরণে সমর্পিত হউক। ওঁ। মানব বুদ্ধি বা অবুদ্ধিপূর্ব্বক যে সমস্ত কর্ম্ম করে তাহা বুঝিতে গেলে ভগবানেরই কর্ম্ম। কিন্তু 'এই মহা সূত্রটী হৃদয়ে ধারণ করা চাই এবং কর্ত্তা, কর্ম্মাদি কারকাদি জ্ঞানে একরস ভগবানের সত্তার উপলব্ধি হওয়া চাই'। গতবারে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম। এবারে ব্রহ্মবিদ্যা কি তাহার আলোচনা আবশ্যক। কারণ পন্থা ও পরাবিদ্যা সমিতি যথাসময়ে শ্রীগুরু-চরণে উপনীত হইয়া এখন যোগ শিক্ষার জন্য চেষ্টিত রহিয়াছে। সাধনার প্রারম্ভে স্বরূপ প্রতীতি না হইলে সাধনায় ফল হয় না।

বিদ্যা কি? নীলকণ্ঠ শ্রীমদ্দেবী ভাগবতের বৃত্তিতে একস্থানে বলিয়া "অন্তর্মুখা শক্তিরেব বিদ্যা"। অন্তর্মুখা শক্তির নাম বিদ্যা। শক্তি ক

বলে ? এ বিষয়টী বুঝিতে গেলে পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরী বাক্ সকল অথবা কলা বা ত্রিমাত্রা শক্তি, বিন্দু ও নাদের তত্ত্ব বুঝা চাই। সর্ব্বময় একরস আনন্দময় চৈতন্যকে ভগবান্ বলে। ভগবানের স্বরূপাভিব্যক্তিকে সৃষ্টি বলে। ঐ স্বরূপাভিব্যক্তি প্রকৃত চারিটী মহাভাবে দৃষ্ট হয়. তাহাদিগকে বাক্ বলে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৭শ শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী বলেন যে মনুষ্যগণ কেবল বৈখরী বাক্ প্রয়োগ করেন এবং অন্তর্নিহিত আর তিনটী বাক্ জানেন না।

চৈতন্যের অভিব্যক্তি অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে সকল অবস্থাতেই তাহার মধ্যে একটী আমি বা আত্মজ্ঞান ও জগৎ বা অনাত্মজ্ঞান, দুইটী অবিচ্ছিন্নভাবে অন্তর্নিহিত আছে। আমাদের চৈতন্যের যেরূপই অভিব্যক্তি হউক না কেন তাহাতে এই দুই প্রকার ব্যঞ্জনাশক্তির ক্রিয়া দেখা যায়। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ধর্ম্মজীবনে ব্যাপৃত লোকের মধ্যে কিছু দিন পরে কোথা হইতে একটী আমি জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হইয়া পড়ে। তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব নিরূপণে ব্যাপৃত স্থূলাভিমানবর্জ্জিত যোগীর চিত্তেও কোথা হইতে Plane লোক বা জগৎ জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। যোগী স্থূল জগতে সমস্ত চিত্তবৃত্তি আপনাতে পর্য্যবসিত করিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন। স্থূল আমি-জ্ঞান অন্তর্হিত হইল, স্থূলশরীর পড়িয়া গেল কিন্তু দেখ কোথা হইতে তাঁহার চিত্তে আমি ভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী সূক্ষ্ম জগৎ বা লোক প্রতীত হইল। এইরূপে যে অবস্থায়ই যাই না কেন বিশিষ্ট আমি-ভাব থাকিতে গেলে তাহার ব্যঞ্জক জগৎভাব থাকা চাই। এই মহা সত্য অবধারণ করিয়া যোগমার্গে স্থূলোত্তর জগৎ বা বস্তভাব ত্যাগ করার উপদেশ আছে। বস্তুকে সূক্ষ্মভাবে দেখিতে শিখ তুমি যে সূক্ষ্ম তাহা দেখিতে পাইবে। বস্তুকে কারণভাবে দেখিতে শিখ তোমার কারণাত্মা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তেমনই অপর পক্ষে মহাপুরুষ বা ভগবান্ ভাবে তোমার বিশিষ্ট আমি-জ্ঞানকে ন্যস্ত করিলে তৎসঙ্গে উচ্চতর লোকেরও প্রতীতি হয়। বিশিষ্ট আমি ও জগৎ পরস্পর অভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট। এই ধ্রুব সত্যটী সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করা চাই।

এখন বাক্ চতুষ্টয়ের মর্ম্ম কি তাহা আলোচনা করা যাউক। বিশ্লিষ্ট ভাবে বিশিষ্ট আমি-জ্ঞানের বা উপাস্য বস্তু-জ্ঞানে চিত্ত স্থাপিত

করিলে স্থূলাদি লোকসকল প্রতীত হয় বটে কিন্তু তাহার মধ্যে ভেদাত্মক বিশিষ্ট জ্ঞানের খেলার অবসান হয় না। এই ভেদাত্মক ভাবের অভিব্যক্তির নাম বৈখরী বাক্ বা নাদ। যদিও জগৎ ও আমি সংশ্লিষ্টভাবে থাকে তত্রাচ চৈতন্যের এই প্রকার অভিব্যক্তিতে আমি যে জগৎ হইতে বিশিষ্ট এই ভাবটী সকল অবস্থায়ই রহিয়া যায়। কেবল প্রয়োজন, অর্থ, কাম প্রভৃতি ভাবে, আমি ও জগৎ একত্র থাকে। যেমন ট্রাম গাড়ীতে চড়িয়া অন্যত্র যাইবার সুবিধা হয় বলিয়া আমি ট্রাম গাড়ীতে চড়ি ও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সত্ত্বা স্বীকার করি এবং যেমন তাই বলিয়া আমি ও ট্রাম গাড়ীর মধ্যে যে ভেদটুকু থাকে সেটুকু দূর হয় না, তদ্রূপ বৈখরী বা নাদ ভাবে অবস্থিতি চৈতন্যে জীব ও জগৎ সংশ্লিষ্ট হইলে তাহাদের মধ্যে প্রভেদ রহিয়া যায়। এই দুইটী বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বস্তু কেবল কাম বা প্রয়োজন জ্ঞানে পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। সেই জন্যই সাধকের এ অবস্থায় কামের বা কামনার প্রয়োজন আছে। যে সাধক যত উচ্চ কামনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সাধনা করেন লৌকিক ভাষায় আমরা তাঁহাকে তত উচ্চ বলিয়া গণনা করি। এইরূপ সাধনা করিতে করিতে একদিন সাধকের মনে একটী ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইবে, তাহার সন্দেহ হইবে এই যে, যে বিশিষ্ট আদরের "আমি" কে লইয়া এতদিন সাধনা হইতেছিল তাহা বোধ হয় প্রকৃত "আমি" নহে। তিনি বুঝিতে পারিবেন যে বিশিষ্ট আমি জ্ঞানে বা বিশিষ্ট জগৎজ্ঞানে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব নাই, তিনি দেখিবেন যে ঐ কাম বা তৃষ্ণার মধ্যে বিশ্বাত্মিকা এক মহাশক্তির খেলা হইতেছে ও এই মহান চৈতন্যের ভাবের সহিত তুলনা করিলে বিশিষ্ট আমি বা বিশিষ্ট জগৎভাব অনিত্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয়, তখন আর তিনি বিশিষ্ট অহং জ্ঞান স্থাপনে বেষ্টিত থাকিবেন না পরন্তু যাহাতে এই বিশিষ্ট আমি-জ্ঞানের মধ্য দিয়া সেই বিশ্বাত্মিক সর্ব্ব সংযমনকারিণী চৈতন্যময়ীর অভিব্যক্তি হয় তাহারই চেষ্টা করেন।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে নাদ বিন্দু আদি ভাব পরিত্যাগ করিয়া সাধক যখন শক্তিভাবে অবস্থিত হন, তখন তাঁহার চৈতন্যে একটী মহাভাবান্তর উপস্থিত হয়। সে ভাবান্তরের স্বরূপটা কি? তখন তিনি আর বিশিষ্ট আমি জ্ঞান স্থাপনা করিতে ব্যস্ত হইবেন না। তখন চৈতন্যে যে খেলা হউক না কেন

তাহাতে বিশিষ্ট আমি ও তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশিষ্ট জগৎ বা বস্তু ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে না। তখন আর আমি এই ছিলাম এই হইয়াছি এরূপ ভাব দেখা যাইবে না। বৈখরী অবস্থায় যেমন যে প্রকার চৈতন্যের ক্রিয়া হউক না কেন তাহাতে কেবল কোন এক বিশিষ্ট আমির বা বিশিষ্ট বস্তুর অভিব্যক্তি, ব্যঞ্জনা বা প্রতিষ্ঠা করা হয়, এখন আর তদ্রূপ হইবে না। চৈতন্য আর বিশিষ্ট আমিকে দেখাইবে না, পরন্তু সকল ক্রিয়ার মধ্যেই সর্ব্বব্যাপিনী জীব ও জগদাত্মিকা ঐশী শক্তিকে দেখাইবে। মনে করুন আমি যোগমার্গে কোন বিশিষ্ট ক্রিয়ায় ব্যাপৃত আছি। ক্রিয়ার ফল হইল, তাহাতে আমি কি দেখিলাম। আমি দেখিলাম যে বিশিষ্ট ক্রিয়ার ফলেই বিশিষ্ট গুরুরূপ ব্যক্তির অহং নামধেয় বিশিষ্ট জীবের উপর বিশিষ্ট কৃপার ফলে এই ব্যাপার সংঘটিত হইল। অন্য জীবে ইহা হইতে পারে না। অন্য জীব ইহার ফল পাইতে গেলে তাহাকে ঐ বিশিষ্ট সাধনা করিতে হইবে। ফলতঃ এক কথায় বলিতে গেলে এই ক্রিয়া দ্বারা চৈতন্যের এই প্রকার অভিব্যক্তি দ্বারা আমার বিশিষ্টরূপ সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। কেহ কেহ এই ব্যাপারে উচ্চতর নিয়ম বা higher law দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সেই উচ্চতর নিয়মের কেন্দ্রও আমি। কেহবা ভগবানের কৃপা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সে ভগবানও বিশিষ্ট ক্রিয়া বা ভাবের পক্ষপাতী বলিয়া তাহার ফলস্বরূপ এই বিশিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা সাধককে জগৎ হইতে বিশেষিত করিয়া দিতেছেন, সুতরাং যে রকম ভাবে চলি না কেন বিশিষ্টতার হাত এড়াইতে পারিব না। কিন্তু শক্তিভাব প্রকটিত হইলে আর কার্য্য কারণ অনুসন্ধানরূপা কোন বিশিষ্ট শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ ভেদভাবাপন্ন আমিকে দেখিতে পাইব না। তখন বুঝিব যে বিশিষ্ট ক্রিয়ার মধ্য দিয়া একই ঐশী শক্তি প্রকটিত হইতেছেন। তখন বুঝিব যে আমার ভেদভাবাপন্ন আমি যতই কিছু করুক না কেন এই শক্তির অভিব্যক্তি না হইলে কোন ক্রিয়ার কোন ফল হয় না। তখন বুঝিব যে শক্তির গতি আমার বিশিষ্ট আমি স্থাপনা করিবার দিকে নহে, তাহার গতি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্য। তখন আর আমিকে দেখিয়াই তৃপ্ত হইব না। পরন্তু শক্তির অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া পরমেশ্বরের করুণাময়ী সত্তার অভিব্যঞ্জনা দেখিতে শিখিব।

সাধনার এই রহস্যটী বড়ই দুর্গম। একটী দৃষ্টান্ত লইলে বোধ হয় ভাবটী পরিস্ফুট হইতে পারে। আমরা বিশিষ্ট ভেদ ভাবাপন্ন বলিয়াই মূর্ত্তি আদি বিশিষ্ট ভাবের কল্পনা না করিলে সাধনা করিতে পারি না, কিন্তু যখন স্বকল্পিত মূর্ত্তির ভিতর দিয়া ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি হয়, তখনই সৌভাগ্যবান্ জীব বুঝিতে পারে যে জগতের সামান্য ব্যাপারের মধ্যেও কেবলমাত্র সেই ঐশী শক্তিরই ক্রিয়া হইতেছে। ঐ শক্তি সর্ব্বব্যাপিনী, পাপী ও পুণ্যাত্মা সকল প্রকার জীবকেই ধারণ করিয়া বহিয়াছে। চোব যে হস্ত দিয়া পরস্বাপহরণ করে তাহার মধ্যেও ঐ শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়। কিন্তু তাহা দেখিতে গেলে ক্রিয়া বা ব্যক্তির বিশিষ্ট ভাব বা বিশিষ্টতা বাচক মান ভুলিয়া যাওয়া চাই। বিশিষ্টতা জ্ঞানে আবদ্ধ জীব সাধুর কার্য্যে এক ভাব দেখেন ও পাপীর কার্য্যে আর এক ভাব দেখেন। কিন্তু প্রকৃত সাধক একই ভাব দেখেন, তিনি আর পার্থক্য দেখেন না। যখন প্রত্যেক জীবনব্যাপারে আমরা আর ক্ষুদ্র আমিত্বের খেলা দেখিতে পাইব না, তখনই তাহার ভিতর দিয়া ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি দেখিতে পাইব। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এই ভাব জোর করিয়া আসে না। যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টি উচ্চ বা নীচ বিশিষ্ট বস্তু, ব্যক্তি বা সত্ত্বার দিকে থাকিবে ততক্ষণ বিজ্ঞানের আশা নাই। বিজ্ঞান Science বিশিষ্ট ভাবের প্রতিকূল, সে বস্তুকে খোঁজে না, সর্ব্বদাই একতার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সামান্য কার্য্যের জীবনব্যাপার পরিদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সামান্য কার্য্যের ভিতর দিয়াও যে শক্তির অভিব্যক্তি হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলে মানবের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত শক্তিকেও বুঝা যায়, ইহা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত ভাব নাই ও ব্যক্তিগত ভাব থাকিলে বিজ্ঞানের আশা নাই। এইত গেল শক্তির কথা। পরাবিদ্যা-সমিতির মধ্যে কয়জন এই ভাবে দাঁড়াইতে পারিয়াছেন, কয়জন নগণ্য, সামান্য মানবের ভিতর এই শক্তির আভাস পাইয়াছেন। কেবল বড় কথা বলিলেই হইবে না, কেবল অযথা মহাপুরুষগণের নাম করিলেই ক্ষুধা মিটিবে না, তৃপ্তি হইবে না। যদি সত্যদর্শী হইয়া থাক তাহা হইলে ক্ষুদ্র সংসারী মানবের জীবনের মধ্যে ঐশী শক্তির ব্যঞ্জনা দেখিতে পাইবে। শুধু হিমালয়-বাসী জনৈক খ্যাতনামা ঋষির দোহাই দিয়া তাঁহার উক্তির ভেদভাবাপন্ন

কদর্থ করিলে চলিবে না। যে শক্তি দেখিবার জন্য আমরা রামশ্যামাদি ব্যক্তিগণের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছি তাহা সর্ব্ব প্রথমে আমার ভিতর দেখা চাই ও আপনাকে সেই মহাশক্তিদ্বারা শক্তিমান্ ও প্রতিষ্ঠিত মনে করা চাই কিন্তু তাহা হইলে আর বাহিরে লোকের সন্ধানে বেড়ান হইবে না।

বিদ্যার অর্থ কি? বিদ্যা চৈতন্যরূপিণীরই অভিব্যক্তি। ঈশ্বর চৈতন্যই বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে খেলিতেছেন। দেবী ভাগবতে আছে—

ভেদবুদ্ধিস্তু সংসারে বর্ত্তমানা প্রবর্ত্ততে।
অবিদ্যেয়ং মহাভাগ বিদ্যা চ তন্নিবর্ত্তনম্॥ (১—১৮—৪২)

চৈতন্যের (consciousness) একটী স্বাভাবিক ভাব আছে। চৈতন্য যে ভাবেই খেলা করুন না কেন সর্ব্বদা সর্ব্বভাবেই আমি বা আত্মাকে দেখাইতেছেন। চৈতন্যময়ীর খেলা দুইটী মহাভাবে হইয়া থাকে, চৈতন্য আমি কে দেখান ও তৎসঙ্গে সর্ব্ব বা জগৎকেও দেখান। যে ভাবে আমি কে দেখান তাহার নাম "সোঽহং" ভাব। যে ভাবে জগৎকে দেখান তাহার নাম "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ভাব। দুইটী ভাব বাস্তবিকই পৃথক্ নহে, তবে যেমন অঙ্ক কষিতে গেলে আমরা পর্য্যায়ক্রমে অঙ্ক কষি তদ্রূপ সে মহান্ বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার একতা বুঝিতে গেলে ক্ষুদ্র মানব হয় প্রধানতঃ আমিকে অবলম্বন করিয়া নয় প্রধানতঃ সর্ব্বকে অবলম্বন করিয়া বলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই দুই ভাবের মধ্য দিয়াও বিদ্যা সর্ব্বদা পরমাত্মা বা ব্রহ্মেরই স্থাপনা করেন। সাধক না হইয়াও Father Damien প্রভৃতি কত লোকে মানবের Humanityর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে তাঁহারা ক্ষুদ্র মানবের মধ্যে কি এক অপরূপ, অপূর্ব্বভাব দেখিতে পাইয়াছেন যে তাহাতে আকৃষ্ট হইযা পৃথক আমির তৃষ্ণাও ভুলিয়া যান। তাহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে অভেদাত্মক প্রকৃত আমির অভিব্যক্তি হইতে আরম্ভ হয়, কর্ম্মযোগ এই জ্ঞানে স্থাপিত। কর্ম্মযোগে সর্ব্বং খল্বিদং ভাব পরিপুষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধকেরা মানব সেবায় রত থাকিয়াও প্রকৃত পক্ষে মানবের ঐশ্বিরিক ভাবের উপাসক, সেই জন্য তাঁহাদের সাধনাতেও বিদ্যা আছে।

বিদ্যা ঈশ্বর-উন্মুখিনী ও অবিদ্যা বিশিষ্টতার ব্যঞ্জিকা। এই মহাসত্যটী

বুঝিতে হইবে। দুইএর মূলে এক জাতীয় শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়। দুইই আমি দেখাইতে চেষ্টা করে। তবে অবিদ্যার ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত আমি সর্ব্বদা ভেদাত্মক। যতক্ষণ সাধনা, প্রযত্ন ও ক্রিয়ার ফলে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে "আমি," গুরু, ভগবান্ প্রভৃতি যে কোন নামধেয় ভেদাত্মক জ্ঞানের পরিপুষ্টি হয়, যদি সাধনার ফলে আমরা আপনাকে সমষ্টি জীবভাব হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়া ফেলি তবে জানিব যে বিদ্যা আমাদের ভিতর অবিদ্যা রূপে খেলিতেছেন। আর যখন কি সামান্য মানসিক প্রভৃতি ব্যাপারে, কি বহির্জগতের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ঘটনার মধ্যে অপরিস্ফুট ভাবে সেই পরম একরস আত্মতত্ত্বের বা ভগবানের ব্যঞ্জনা দেখিতে পাই তবে জানিব যে তিনি বিদ্যা স্বরূপে খেলিতেছেন।

ব্রহ্ম-বিদ্যাই বিদ্যা। ব্রহ্ম বিদ্যায় বিভিন্ন লোক, বিভিন্ন জীব, বা বিভিন্ন শক্তির বর্ণনা থাকতে পারে কিন্তু তাহাতে সাধকের মনে ব্রহ্মভাবই ফুটিয়া উঠে। যদি তাহা না ঘটে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এখনও ব্রহ্মবিদ্যা আমাদের ভিতর খেলিতেছেন না। হিমালয়গহ্বরে স্থূল বা সূক্ষ্ম ভাবে রক্ষিত গ্রন্থাদির মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা নাই। হিমালয়বাসী কঠোর তপঃশীল রাম বা শ্যামাভিধেয় কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঋষির মধ্যেও ব্রহ্মবিদ্যা নাই। কিন্তু পত্র, পুষ্প, ফল বা তোয়ঃ দ্বারা ভূবিনির্ম্মিত শিবলিঙ্গের উপাসনাকারিণী অজ্ঞ স্ত্রীলোকের মধ্যেও এবং কেবল কুষ্ঠ রোগীদের সেবায় জীবন উৎসর্গকারী Father Damienএর মধে ও থাকিতে পারে সেইজন্য বলি বিশিষ্ট লোকে, বিশিষ্ট মতে, বিশিষ্ট সমাজে ব্রহ্মবিদ্যা খুঁজিতে যাইও না। ভাব সংশুদ্ধি কর, নিজের সামাজিক বা ধর্ম্মজীবনে ভেদাত্মক "আমির" খেলা দেখিতে যাইও না। তাহা হইলে এক দিন হয়ত চৈতন্যময়ী বিদ্যারূপে তোমার ভিতরে খেলিতে পারেন ও আপাততঃ বিভিন্ন বস্তু ও শক্তিনিচয়ের মধ্য দিয়া সর্ব্বদা পরিব্যক্ত ব্রহ্মের ব্যঞ্জনা শিখাইতে পারেন, তাই এস সকলে মিলিয়া সেই গায়ত্রীরূপিণী মহাভাবময়ী মহাবিদ্যার উপাসনা করি। ব্যক্তিগত ভাব লইয়া কলহ ও দ্বন্দ্ব করিলে কিছুই হইবে না।

আমাদের সকলের মধ্যেই আমি জ্ঞানটী আছে, সেইটী নূতন করিয়া আনিতে হইবে না। যাহা আছে তাহার জ্বালায়ই অস্থির কারণ তাহা

সর্ব্বদা বিশিষ্টতা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কি যোগে, কি ভোগে, কি জ্ঞানে, কি অজ্ঞানে, কি স্থূলে, কি সূক্ষ্মে, আমরা সেই ভেদাত্মক আমি স্থাপনা করিতে ব্যস্ত, আবার মোহের বশে সেই পন্থাকে যোগ নামে অভিহিত করি। ইহাকেই সংসার-রোগ বলে। "ভেদ বুদ্ধিস্তু সংসারে বর্ত্তমানা প্রবর্ত্ততে"। তবে কি প্রকারে সেই বিদ্যা আমাদের ভিতরে প্রকটিত হইতে পারেন তাহার আলোচনা করা যাউক। আমরা দেখিয়াছি যে যেমন আমি তেমনই জগৎ যেমনই জগৎ তেমনই আমি। ক্ষুদ্র কেন্দ্রীভূত আমি ভুলিতে গেলে Humanity বা সমষ্টি মানব ভাবের প্রতিষ্ঠা করা চাই। কার্য্যের ফলাফল যদি ক্ষুদ্র আমিত্বে লীন হয় তাহা হইলে কি প্রকারে আমাদের প্রকৃত আমির অভিব্যক্তি হইবে? কি ধর্ম্মে, কি সংসারে আমাকে ভুলিয়া সমষ্টি মানবের কল্যাণ ও উন্নতির কামনায় প্রণোদিত হইয়া যদি কার্য্য করিতে শিখি তাহা হইলে অল্পে অল্পে সেই বিশ্বাত্মিকা দেবীর একতা ভাব হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে। *সেই জন্য ব্রহ্ম বিদ্যা বা পরাবিদ্যা সমিতির গন্তব্য একমাত্র ব্রহ্ম হইলেও উহার* মধ্যে এত করিয়া সমষ্টি মানব বা জীবকুলের সেবা ধর্ম্মটী এক মাত্র প্রধানতম উদ্দেশ্য হইতেছে। জীব সেবাব্রতটী কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা ভগবান্‌কে পাইবার জন্য সাধনা করি। কিন্তু তাহার মধ্যেও ভেদাত্মক আমি রহিয়া যায়। কিছুতেই উহার হাত এড়াইতে পারি না। সেই জন্য আর সাধানার ভিতর দিয়া ভেদভাবাত্মক আমির অনুসন্ধান করিলে চলিবে না। অথচ ভেদভাবাত্মক আমি ভিন্ন যে অন্য আমি আছে তাহাও সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারি না। সেই জন্য সর্ব্বপ্রকার কৈতবশূন্য হইয়া জীবসেবা ব্রতে ব্রতী হওয়া চাই। জীবের সেবাই আমাদের সমস্ত কর্ম্মের কষ্টিপাথর করিতে হইবে। অথচ ঐ সেবা অহংকার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া করিলে হইবে না। যখন সাধন করিতে বস, তখন দেখিও যে সাধনার ফল কোথায় যাইতেছে, কে খাইতেছে, সংসারের অন্যান্য কার্য্যের মধ্যেও দেখিতে হইবে যে কাহার প্রতিষ্ঠা হইতেছে। সাবধান থাকিতে হইবে যে কোন প্রকার ব্যক্তিগত ভাবে জীবের প্রকৃত হিত ভুলিয়া না যাই। এখন বুঝিয়া দেখ জগতে জীবকুলের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতির কতটা আবশ্যক আছে। ধর্ম্ম ও নীতি দ্বারাই ক্ষুদ্র জীব ক্ষুদ্র আমিত্বের ভাণ কতকটা অতিক্রম করে এবং

অন্যান্য জীবের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য দেখিতে পায়, এইরূপে জীব বুঝিতে পারে যে সকল জীবই পরস্পর সংশ্লিষ্ট। যখন কোটী জীবের আত্মোৎসর্গ দ্বারা এক একটী স্থূল ইন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি হইয়াছে তখন অন্যান্য ব্যাপারেও যে আমি জীবের নিকট কত ঋণী তাহা বুঝিতে পারা যায়। বুঝি বা না বুঝি, বাস্তবিক পক্ষে সকল জীবের একই জীবন। নীতি বা ধর্ম্ম এই ভাব দেখাইবার চেষ্টা করে। উহারা সেই পরমা বিদ্যারই ব্যঞ্জক ও একত্বের জ্ঞাপক। সেই জন্য পুনশ্চ বলি যে সকল ব্যাপারেই জীবের হিত আমাদের কর্ম্মের মান বলিয়া গণ্য করা চাই, তবেই বিশিষ্ট অহং ভাবের মোহ অতিক্রম করিতে পারা যায়। কিন্তু যদি তাহা না দেখিয়া, ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্যের দিকে না চাহিয়া তাহাদের ক্ষমতা বা অধিকারের দিকে চাই তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান ও প্রযত্ন ভেদভাবে পরিস্থ্যূত হইবে। আমরা অবিদ্যার বশীভূত হইব ও পরাবিদ্যা সমিতির মধ্যে থাকিয়াও নিত্যস্মরণীয়, প্রশান্ত মহাপুরুষগণের অভেদাত্মক প্রেমরস দ্বারা সদা উজ্জীবিত থাকিয়াও অবিদ্যাবশে একরস ভগবান্‌কে না দেখিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখিয়া ফেলিব।

পন্থা ও পরাবিদ্যাসমিতি এই মহা সমস্যাস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। "সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধং ঈদৃশং"। একবার অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধনের ব্যাপারটী স্মরণ কর। এক জন নিরস্ত্র সাক্ষীস্বরূপ ভগবান্‌কে সারথীস্বরূপ পাইয়াই সন্তুষ্ট, আর একজন ভগবানকে না দেখিতে পাইয়া দৈবশক্তিসম্পন্ন অক্ষৌহিনী পাইয়াই তুষ্ট। পরাবিদ্যা সমিতি দ্বারা জগতের অশেষ উপকার সাধন করিবার চেষ্টা করিলেও যদি সর্ব্বসাক্ষী একরস ভগবান্‌কে দেখিতে না শিখি ও "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাভাবের সাধন জন্য সমগ্র জীবকুলের হিতসেবায় ও মঙ্গলে ভেদাত্মক আমি হারাইতে না পারি, তাহা হইলে এই পরাবিদ্যা সমিতি কাহাকে দেখাইবে, কাহার ব্যঞ্জক হইবে। আর যদি ব্যক্তিগত ভাব ত্যাগ করিয়া সাধনা ও প্রযত্নের মধ্যে ও ভেদাত্মক আমির প্রতিষ্ঠা কার্য্য হইতে বিরত হই, যদি পরাবিদ্যা সমিতির মধ্যে বাম শ্যামনাম-ধেয় বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার ব্যঞ্জনা করিতে নিবৃত্ত হই, যদি আমাদের প্রত্যেক প্রযত্নে আমরা যে আমাদের বাহিরে স্থিত অসহায় ও এমন কি বাক্‌শক্তিহীন মানব বা জীবকুলের মঙ্গলই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া

বুঝি, তবে এই অভেদ জ্ঞানে পরিপুষ্ট চিত্তের মধ্যে এক দিন সেই মহাবিদ্যার আবির্ভাব হইতে পারিবে। ভাই, পরাবিদ্যাসমিতির মন্দির নির্ম্মাণে ব্যস্ত হইয়া যদি অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ভুলিয়া যাও, যদি অবিদ্যাবশে শিব গড়িতে বানর গড়িয়া বস, যদি ঈশ্বরকে না দেখিতে পাইয়া ব্যক্তিগত ভাবের পূজা করিয়া ফেল, তাহা হইলে পরাবিদ্যা সমিতির প্রকৃত কার্য্য হইল না। তাহা হইলে পিতৃমাতৃহীন (Orphan Humanity) জীবকুলের সেবা হইল না, তাহা হইলে নানা রত্ন সুশোভিত মন্দির মধ্যে বেদী শূন্য রহিয়া গেল। মহামায়া মহাবিদ্যার আবির্ভাব হইল না ও ভগবানের প্রতিষ্ঠা হইল না। অতএব এস ভাই, যাহাতে পন্থা ও পরাবিদ্যা সমিতি ঈশ্বরী কাত্যায়ণীর কৃপা লাভ করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা কি বিশিষ্ট আমি জ্ঞানে, কি বাহিরের জীবজ্ঞানের মধ্যে অনুস্যূত ও তাহা হইতে আভাসরূপে সর্ব্বদা প্রকাশিত পরমতত্ত্বের ব্যঞ্জনা হয় তাহারই চেষ্টা করি। তাহা হইলেই আমাদের সকলের জীবন সার্থক। নতুবা অসংখ্য জীবকুলরূপ সমুদ্রের মধ্যে বুদ্বুদ্‌বৎ পরাবিদ্যা সমিতি দ্বারা জগতে কিছু লাভালাভ নাই, মত লইয়া কিছু আসিয়া যায় না। আশ্চর্য্যের কথা, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নয় বলিয়া চীৎকার করিয়া আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মতের গর্ত্তে পড়িয়া যাই। মনোবুদ্ধি চিত্ত অহংকার প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিসকল কেবল ভগবানের ব্যঞ্জনা করিবার জন্যই আছে, আমাদের সম্পত্তি নহে। বলি ও ইন্দ্র সাধনা করিতে যান। বলি চক্ষুর অধিষ্ঠাতা দেবতাকে দেখিয়া আপনার অহংকে স্থাপনা করেন। ইহা অবিদ্যা। ইন্দ্র উহা হইতেই "সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত" তত্ত্বকে দেখিতে পান, ইহাই বিদ্যা।

ব্রহ্ম অজ্ঞেয়।

উপনিষদের মতে নির্গুণ ব্রহ্ম অজ্ঞেয়। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সমস্তেরই অবিষয়; বচনের, গ্রহণের, মননের অতীত। একথা প্রতিপাদনের জন্য উপনিষদ হইতে অনেক বচনই উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে কয়েকটী মাত্র শ্রুতিবাক্য নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্।

তাঁহার রূপ দৃষ্টিপথের অতীত; চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায়না।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। কঠ ৬।১২।

তাঁহাকে বাক্য দ্বারা, মনদ্বারা, চক্ষুদ্বারা পাওয়া যায় না। *

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। তৈত্তি ২।৪।

'বাক্য ও মন যাঁহার লাগ না পাইয়া হটিয়া আইসে'।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ্ গচ্ছতি
ন মনঃ ন বিদ্মো ন বিজানীমঃ

'সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না। তিনি বিদিত হয়েন না, বিজ্ঞাত হয়েন না'।

অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাম্, বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্। কেন ২।১১।

'যাহারা জানে, (ব্রহ্ম) তাহাদের অবিজ্ঞাত; যাহারা জানেনা, তাহাদের বিজ্ঞাত'। অর্থাৎ কাহারই বিজ্ঞাত নহেন।

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে †। বৃ ৪।২।৪

'এই আত্মা অগৃহ্য, তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না'। তিনি নেতি নেতি, ইহা নহেন ইহা নহেন।

অতএব তাঁহার একমাত্র পরিচয়ঃ—

অথাত আদেশো নেতি নেতি।

---

* ব্রহ্ম যে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির অতীত একথা "কেন" উপনিষদের ৪-৮ শ্লোকে বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

† এই বচন বৃ ৪।৪।২২,৪।৫।১৫ও৩।৯।২৬ অধ্যায়েও দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্ম কেন অজ্ঞেয়? এই প্রশ্নের উত্তর উপনিষদে দুইভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উত্তর এই যে ব্রহ্ম যখন নির্ব্বিশেষ, তাঁহাতে যখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান একাকার, বিষয় ও বিষয়ী (Object ও Subject) দ্রষ্টা ও দৃশ্য একীভূত, তখন তাঁহার জ্ঞান সম্ভবে না, কারণ জ্ঞান বলিলেই বিষয় বিষয়ীর, জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের ভেদ বুঝায়। যেখানে এ ভেদ তিরোহিত, সেখানে জ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়।* দ্বিতীয় উত্তর এই যে ব্রহ্ম যখন বিষয়ী (Subject), তখন তিনি বিষয় হইতে পারেন না। কারণ বিষয় হইলে তিনি আর বিষয়ী থাকিতে পারেন না।।

ব্রহ্মই যে বিষয়ী (knowing subject) একথা নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে।

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ। কঠ ২।১৮।
>
> সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ। শ্বেত ৬।১৪।
>
> এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুঃ ইমা ষোড়শকলাঃ। প্রশ্ন ৬।৫।

'তিনি বিপশ্চিৎ (জ্ঞাতা), জন্মমৃত্যুহীন। তিনি সাক্ষী, চেতন, কেবল, নির্গুণ। এই পরিদ্রষ্টার সেই ষোড়শকলা।' বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিষয়ী বলিয়া ব্রহ্মের অজ্ঞেয়ত্ব একাধিক স্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

> যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ
>
> বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি। বৃ ২।৪।১৪।

ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ ন মতের্মন্তারং মন্বীথাঃ ন বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। বৃ ৩।৪।২।

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতৃ নান্যদ্ অতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ। বৃহ ৩।৮।১১।

---

* The Supreme Atman is unknowable because he is all comprehending unity whereas all knowledge presupposes a duality of subject and object Deussen p. 79

। The Atman as the knowing subject can never become an object for us and is therefore itself unknowable Deussen. p. 403

'যাঁহা দ্বারা এই সমস্ত জ্ঞাত হয় তাঁহাকে কিরূপে জানিবে'? জ্ঞাতা (যিনি দ্রষ্টা সাক্ষীমাত্র) তাঁহাকে কিরূপে জানিবে ?'

'দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা, শ্রুতির শ্রোতা, মতির মন্তা, বিজ্ঞাতির বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে ?'

'হে গার্গি! সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) অদৃষ্ট কিন্তু দ্রষ্টা, অশ্রুত কিন্তু শ্রোতা, অমত কিন্তু মন্তা, অবিজ্ঞাত কিন্তু বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই, অন্য শ্রোতা নাই, অন্য মন্তা নাই, অন্য বিজ্ঞাতা নাই।'

এই বিষয় কেন উপনিষদে অতি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।

যদ্বাচা নাভ্যুদিতম্ যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদম্ যদিদম্ উপাসতে।
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদম্ যদিদমুপাসতে॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদম্ যদিদমুপাসতে॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদম্ যদিদমুপাসতে॥ কেন ৪-৮।

'বাক্যের দ্বারা যাঁহার বচন হয় না, যাঁহা দ্বারা বাক্য উক্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকে জান। এই যাহা উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে।'

মনের দ্বারা যাঁহার মনন হয় না যিনি মনকে মনন করেন তিনিই ব্রহ্ম, ইত্যাদি।

চক্ষুদ্বারা যাহার দর্শন হয় না, যিনি চক্ষুকে দর্শন করেন তিনিই ব্রহ্ম, ইত্যাদি।

কর্ণের দ্বারা যাঁহার শ্রবণ হয় না, যিনি কর্ণকে শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্ম ইত্যাদি।

ঘ্রাণের দ্বারা যাঁহার আঘ্রাণ হয় না, যিনি ঘ্রাণকে আঘ্রাণ করেন, তিনি ব্রহ্ম ইত্যাদি।'

সেইজন্য তাঁহাকে শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু বলা যায়।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো মনো যদ্বাচোহবাচং স উ। প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুঃ। কেন ২।

অর্থাৎ ব্রহ্ম, যিনি একমাত্র দ্রষ্টা, একমাত্র বিষয়ী (subject), তিনি কখনও দৃশ্য, বিষয়, (object) হইতে পারেন না। অতএব তিনি অজ্ঞেয়।

ব্রহ্ম ভূমা,

যোবৈ ভূমা তৎসুখম ভূমৈব সুখম্ ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।

[ছান্দোগ্য ৭।২৩।১]

'যিনি ভূমা তিনিই সুখ, ভূমাই সুখ, ভূমাকে জানিতে হইবে।'

ভূমা কি ?

যত্রনান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎশৃণোতি অন্যৎ বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং। [ছান্দোগ্য ৭ ২৪ ১]

'যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয় না, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয় না, অন্য বস্তুর মনন হয় না তিনিই ভূমা, আর যেখানে অন্য বস্তুর দশন হয়, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয়, অন্য বস্তুর মনন হয়, তাহা অল্প ; যিনি ভূমা, তিনি অমৃত। যাহা অল্প, তাহা মর্ত্ত্য।'

ব্রহ্ম যখন ভূমা তখন তাঁহাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একাকার ভাব। তিনি অদ্বৈত।

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

নানাত্বের ভেদের, দ্বৈতের তাঁহাতে অবকাশ নাই। অতএব তিনি কিরূপে জ্ঞেয় হইবেন ? এই তত্ত্ব বৃহদারণ্যক উপনিষদে অতি মনোজ্ঞভাবে বিবৃত হইয়াছে।

যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি। তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরম্ শৃণোতি তদিতর ইতরং অভিবদতি তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্রবা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎতৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎকেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং অভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎকেন কং

বিজানীয়াৎ। [বৃ ২।৪।১৪]। অর্থাৎ যেখানে দ্বৈতের ভাণ হয় সেখানেই অপর অপরকে আঘ্রাণ করে,অপর অপরকে দর্শন করে, অপর অপরকে শ্রবণ করে, অপর অপরকে বচন করে, অপর অপরকে মনন করে, অপর অপরকে বিজ্ঞান করে, কিন্তু যখন সমস্তই আত্মা (ব্রহ্ম) হইয়া যায় তখন কে কাহার দর্শন করিবে, কে কাহার শ্রবণ করিবে, কে কাহার বচন করিবে, কে কাহার মনন করিবে কে কাহার বিজ্ঞান করিবে।” অতএব ব্রহ্ম যখন অদ্বৈত, একাকার, ভূমা, তখন তিনি জ্ঞেয় হইতে পারেন না।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ত্রিমূর্ত্তি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি বিরাজিত। সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী নর বানর চন্দ্র সূর্য্য মন বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই বা অনুভব কবি তৎসমুদায়েই তিনটি শক্তি স্পষ্ট লক্ষিত হয়। মনে করুন কতকগুলি পরমাণু ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, ক্রমশঃ তাহারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া গতিযুক্ত হইল এবং অবশেষে দুইটি দুইটি মিলিত হইয়া দ্ব্যণুকরূপে প্রকাশ পাইল। এখানে তিনটি শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। যে শক্তিদ্বারা তাহারা বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল ছিল তাহা এক শক্তি, যদ্দ্বারা আকৃষ্ট ও পরিচালিত হইল তাঁহা আর এক শক্তি, এবং যে শক্তি দ্বারা তাহারা নূতনরূপে বা আকারে প্রকাশিত হইল তাহা তৃতীয় শক্তি। প্রথম শক্তিটীর নাম তমঃ, দ্বিতীয়টির নাম রজঃ এবং তৃতীয়ের নাম সত্ত্ব। আপনি কতকটা হাইড্রোজেন ও কতকটা অক্সিজেন আনিয়া এক পাত্রে মিশাইলেন। কোন ক্রিয়াই লক্ষিত হইল না ; ইহা দেখিয়া তন্মধ্যে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত করিলেন। ফল কি হইল? একটা নূতন পদার্থের আবির্ভাব! তমঃ প্রভাবে বাষ্পদ্বয় মিলিতে পারিতেছিল না। তড়িৎ প্রবাহদ্বারা যেমন রজঃ প্রবল হইল অমনি সত্ত্ব প্রভাবে জলের প্রকাশ হইল। দিয়াসিইলায়ের একটি কাঠিতে তমঃ প্রভাবে অগ্নি সুপ্ত রহিয়াছে। ঘর্ষণ দ্বারা রজের উদ্রেক

করিবামাত্রই সত্ত্বের প্রবলতা হেতু অগ্নি প্রকাশিত হইল। একটি তানপুরার তারে শব্দ প্রচ্ছন্ন আছে। অঙ্গুলির মৃদু আঘাতরূপ রজোগুণ প্রবল হইবামাত্র তমঃ পরাভূত হইয়া সত্ত্বপ্রভাবে শব্দ প্রকাশ পাইল।

সর্ব্বত্রই সকল পদার্থেই তিনটি শক্তি আছে। তবে কোনটিতে তমঃ প্রবল, কাহাতে বা রজঃ প্রবল এবং কাহাতে বা সত্ত্ব প্রবল। রজঃ প্রবল হইয়া তমকে এবং সত্ত্ব প্রবল হইয়া রজকে পরাভূত করে। তমের পর রজঃ, রজের পর সত্ত্ব। আবার সত্ত্বের পর তমঃ, তমের পর রজঃ, রজের পর সত্ত্ব। এইরূপ ক্রমাগত চলিতেছে। যতদিন সৃষ্টি ততদিন এই ক্রম অব্যাহত আছে ও থাকিবে। একটি বীজে তমঃ প্রবল; সুতরাং ভবিষ্যৎ বৃক্ষটি উহাতে অব্যক্ত ও অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। মাটিতে পুতিলে উহার রজঃ শক্তিটি জাগিয়া উঠে এবং তৎপ্রভাবে উহা জল বায়ু প্রভৃতি আকর্ষণ করে। তখন পরমাণুগুলি বিশেষভাবে আন্দোলিত, ক্ষোভিত ও সংযোজিত হইতে থাকে এবং ইহার ফলে সত্ত্ব প্রবল হইয়া একটি অঙ্কুর উৎপাদন করে। যতক্ষণ সত্ত্ব প্রবল থাকে, ততক্ষণ অঙ্কুরটি প্রকাশিত থাকে। যদি সত্ত্ব চিরকাল প্রবল থাকিত, অন্যগুণ প্রাধান্যলাভ না করিত, তাহা হইলে অঙ্কুরটিও চিরকাল ঐ ভাবেই থাকিত, কোনরূপ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত বা রূপান্তরিত হইত না। কিন্তু তাহা ঘটে না। যেমন অঙ্কুরটির পূর্ণ বিকাশ হইল, অমনি তমঃ উহার ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইল। এবং একদিকে যেমন উহা অল্পে অল্পে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে লাগিল, অন্যদিকে রজঃ ও সত্ত্ব উহাকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিল। এইরূপে পুনঃ পুনঃ তিনটি শক্তি পর্য্যায়ক্রমে প্রবল হইয়া অঙ্কুরকে কাণ্ডে, পল্লবগুলিকে শাখা প্রশাখায় এবং পত্রকে পুষ্পে পরিণত করে। আবার পুষ্প যদি চিরকালই পুষ্পরূপে থাকে তাহা হইলে ফলের সম্ভাবনা কোথায়? পুষ্পত্বের বিলোপ না ঘটিলে ফলের বিকাশ হইতে পারে না। তাই তমঃ প্রভাবে পুষ্পটি শুষ্ক হইতে থাকে এবং রজঃ ও সত্ত্ব প্রভাবে ফলের আবির্ভাব হয়। একটি শিশু জন্মিল। শিশুর আবির্ভাব সত্ত্বগুণ সাপেক্ষ। এই সত্ত্ব যদি প্রবল থাকিয়া যায় তাহা হইলে উহার শিশুত্ব ঘুচিবে না। তাই তমঃ শিশুত্বের বিনাশ সাধন করিল এবং রজঃ ও সত্ত্ব, পরবর্ত্তী অবস্থা বালকত্ব) উন্মেষিত করিয়া দিল। পুনরায় তমের দ্বারা বালকত্বের

অপনোদন এবং রজঃ ও সত্ত্বের, দ্বারা যৌবনের বিকাশ। এইরূপে তমঃ রজঃ সত্ত্ব, তমঃ রজঃ সত্ত্ব—ক্রমাগত চলিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে যে শক্তি কিছু একটা করিতে, গড়িতে বা সৃষ্টি করিতে চায় তাহার নাম রজঃ বা ক্রিয়াশক্তি। যে শক্তি সৃষ্ট বস্তুটিকে প্রকাশিত রাখিতে বা রক্ষা করিতে চায় তাহাই সত্ত্ব বা পালন শক্তি। এবং যে শক্তি বস্তুটিকে বা বস্তুর তদবস্থাকে ছিন্নভিন্ন, বিশৃঙ্খল ও বিনষ্ট করিতে চায় তাহাই তমঃ বা সংহার শক্তি। শাস্ত্র এই শক্তিত্রয়কে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহারাই পুরাণের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং তন্ত্রের ব্রহ্মাণী, লক্ষ্মী ও কালী। ইহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

রজঃ	সত্ত্ব	তমঃ
ক্রিয়াশক্তি	পালনশক্তি	সংহারশক্তি
ব্রহ্মা	বিষ্ণু	শিব
ব্রহ্মাণী	লক্ষ্মী	কালী

বিশ্বের আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব অনন্তকাল ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে চলিতেছে। এই তিরোভাবের নাম প্রলয়। প্রলয়ে ভগবানের এই শক্তিত্রয় সাম্যাবস্থাতে (in Equilibrium) থাকে ; অর্থাৎ কোনটির প্রবলতা থাকে না, তিনটি সমান বল বিশিষ্ট থাকায় পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করে। এই সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। তখন প্রকৃতি ভগবানে বিলীন থাকে। এই অবস্থা যে কিম্ভূত তাহা আমাদের কল্পনা করা অসম্ভব। সে যাহা হউক, এই এক এবং অদ্বিতীয় অবস্থায় ভগবান যেমন বহু হইবার ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার ক্রিয়াশক্তিটি বা রজোগুণ প্রবল হয় এবং ইহাই অনুলোম ক্রমে মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত এবং অসংখ্য জীব সমন্বিত বিরাট ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে। যেমন সৃষ্টি হইতে থাকে, অমনি দ্বিতীয় শক্তিটি (বিষ্ণু) প্রবল হইয়া সৃষ্ট বস্তুগুলিকে ধারণ বা রক্ষা করিতে থাকেন। যতদিন ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে ততদিন ভগবান এই শক্তিটিকেই (সত্ত্বকে) প্রবল রাখিবেন। যখন প্রলয়কাল উপনীত হইবে তখন তিনি সত্ত্বকে দুর্ব্বল করিয়া তমকে (শিবকে) প্রবল করিবেন, সুতরাং ক্ষিতি অপে, অপ্ তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে ইত্যাদি প্রতিলোম ক্রমে বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া সেই অনাদি

পুরুষে বিলীন হইবে। তখন তিনি আবার সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং" অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। পুনরায় যখন তাঁহার সিসৃক্ষা (সৃষ্টির ইচ্ছা) হইবে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রজঃ ও সত্ত্বকে প্রবল করিয়া বিশ্বাদি রচনা করিবেন এবং প্রলয় সমাগত হইলে তমঃ প্রবল করিয়া সমস্ত সংহার করিবেন। এইরূপ সৃষ্টি ও লয়, সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা (Activity and passivity) সগুণভাব ও নির্গুণভাব ঘড়ীর পেণ্ডুলমের ন্যায় অনাদিকাল চলিতেছে।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহার ব্যাপারে এই ত্রিমূর্ত্তি যেরূপ প্রকটিত, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে, যাবতীয় ক্ষুদ্র অংশে ইনি সেইরূপই প্রকাশিত; প্রভেদ এই যে সমগ্র ইনি সমষ্টিভাবে ক্রিয়াশীল, অংশে ব্যষ্টিভাবে ক্রিয়াযুক্ত। যখন এক রাজমিস্ত্রি এক অট্টালিকা নির্ম্মাণের সংকল্প করিয়া ইষ্টক কাষ্ঠাদি সংগ্রহপূর্ব্বক নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তখন তাঁহাতে ব্রহ্মার ভাব প্রবল। অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হইলে যখন তিনি আনন্দ বা প্রীতিলাভ করেন তখন বিষ্ণুভাব প্রবল। এবং ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই ভাবিয়া যখন ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হন তখন তাঁহার শিবভাব প্রবল। জীবগণ (বৃক্ষ পশু মানবাদি) জন্মিয়া কেমন হৃষ্ট পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে—ইহাই ব্রহ্মভাব, যৌবন প্রাপ্তি, বিষ্ণুভাব; মলিন, কৃশ ও জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—শিবভাব। শিশু জাগরিত হইয়া আহার অন্বেষণে ধাবিত হইল- ব্রহ্মভাব; উদরপূর্ত্তি হইলে সুখে খেলিতে লাগিল—বিষ্ণুভাব, ক্রমশঃ আলস্য ও তন্দ্রায় অভিভূত হইল—শিবভাব। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন—ব্রহ্মভাব; মধ্যগগনে উপস্থিত হইলেন—বিষ্ণুভাব; অস্তগমনোন্মুখ হইলেন—শিবভাব।—শশিকলার দিনে দিনে বৃদ্ধি শুক্লপক্ষ—ব্রহ্মভাব, পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ—বিষ্ণুভাব; দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্তি (কৃষ্ণপক্ষ)—শিবভাব। জীবের ভোগ তৃষ্ণা—ব্রহ্মভাব; ভোগে সুখ বোধ—বিষ্ণুভাব; ভোগে বিরাগ—শিবভাব। কত উদাহরণ দিব? সর্ব্বত্রই ত্রিমূর্ত্তি।

বসন্ত আসিল। মলয় মারুত বহিল। তরুলতা নবপত্র ও পুষ্পে সুশোভিত হইল। বিহগগণ সুস্বরে গান ধরিল। প্রকৃতি বুক ভরা আশা ও উদ্যম লইয়া যেন জাগিয়া উঠিলেন। ক্রমে নিদাঘ আসিল। পুষ্প ফলে

পরিপ্লুত হইল। পশুপক্ষী নানাপ্রকারে আহার বিহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। কিন্তু সুখ চিরকাল থাকে না, শীত উপস্থিত। গাছে ফল পুষ্প নাই, পাতাগুলিও শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। বিহগগণ গান ছাড়িয়া কোটরে লুকাইল, প্রচণ্ড শীতল বায়ু বহিয়া জীবগণকে শুষ্ক, শীর্ণ ও কাতর করিয়া তুলিল। জগতের দিকে চাহিলে মনে হয় যেন সব ঘুমাইয়াছে বা মরিয়াছে! আবার সমুদ্রের দিকে দেখুন—ঐ জোয়ার আসিয়াছে। বিশাল জলধিবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড তরঙ্গমালা কত দিক্ দিগন্তে ছুটিতেছে। দেখিতে দেখিতে কত নদ, নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী, খাল, বিল, খানা, ডোবা, জলে পূর্ণ হইয়া গেল। আহা! প্রকৃতির মূর্ত্তি এখন কেমন জীবন্ত, পূর্ণ, গম্ভীর! আবার একি? জল সরিয়া যাইতেছে কেন? ইহাকেই কি বলে ভাটার টান? হায় হায়! সব যে শুষ্ক হইয়া গেল। খানা, ডোবা, নদী, নালা—কোথায়ও এক ফোঁটা জল নাই। প্রকৃতির এমন শীর্ণ, দরিদ্র, মলিন, মৃতপ্রায় অবস্থা তো আর কখনো দেখি নাই। পাঠক! বুঝিয়াছেন তো? এই বসন্তই ব্রহ্মা, নিদাঘ বিষ্ণু, শীত শিব; এই জোয়ারের আরম্ভই ব্রহ্মা, জোয়ারের পূর্ণতা বিষ্ণু, ভাঁটা শিব।

বাহিরে যেমন, ভিতরেও তেমন। আমাদের মনের মধ্যে এই বসন্ত শীত এই জোয়ার ভাঁটা নিয়ত খেলিতেছে। জীবমাত্রই অনুক্ষণ কোন না কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, বাসনা-তাড়িত হইয়া উহার দিকে ছুটিতেছে, উহা লাভ করিয়া ক্ষণিক সুখ বোধ করিতেছে, এবং পরক্ষণেই বিরক্ত হইয়া উহা ত্যাগ করিতেছে। একটি সুন্দর উদ্যান দেখিয়া আমার লোভ জন্মিল। বহুবর্ষ শ্রম করিয়া আমি যে অর্থোপার্জ্জন করিলাম তদ্দ্বারা সেই প্রকার এক বাগান প্রস্তুত করিলাম। কত যত্নে, কত পরিশ্রমে, কত অর্থব্যয়ে, আমি শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজি রোপণ করিলাম, মধ্যভাগে এক পুষ্করিণী খনন করাইলাম, রাস্তা বাঁধাইলাম চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত করিলাম। বাগানটি সম্পূর্ণ হইলে, কিয়ৎকাল তদ্দর্শনে আমি একটু সুখও বোধ করিলাম। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই কেমন একটা বিরক্তি আসিল। যেন আর তাহা ভাল লাগে না, যেন আর তাহাতে সৌন্দর্য্য নাই, তাহা যেন পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। সযত্ন রোপিত বৃক্ষাদি অযত্নে বনজঙ্গলে পরিণত

হইল, প্রাচীরটি স্থানে স্থানে ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইতে লাগিল, পুষ্করিণী আবর্জ্জনাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপ জোয়ার ভাঁটা আমাদের অন্তরে নিয়ত হইতেছে ও হইবে। ইহা লইয়াই সংসার, ইহা লইয়াই জগৎ; যেমন জোয়ারের স্রোত আইসে, অমনি কত বাসনা, কত অনুরাগ, কত আশা, কত উৎসাহ, কত উদ্যম, কত অধ্যবসায় অন্তরে জাগিয়া উঠে, আবার ভাঁটার টানে সবই শুষ্ক হইয়া যায়, তখন নৈরাশ্য, নিরুৎসাহ, আলস্য, জড়তা, ত্যাগ ও বৈরাগ্য হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

ক্রমশ

শ্রীমাখন লাল রায়চৌধুরী।

মানবের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪) আর্য্যজাতির চতুর্থ বিভাগ।

(কেল্‌টিক জাতি—Keltic Sub-race)

মহাত্মা অরফিউস্ (Orpheus) এই বিভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পশ্চিম দিকে লইয়া গিয়া গ্রীস্ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। তাহারাই পরবর্ত্তী গ্রীকজাতি। তাহারা তথা হইতে ইটালি ও ফরাসি দেশে, তদনন্তর আরও উত্তরে পুরাতন দৈত্যরাজ্যের ভগ্নাবশেষ আয়র্লণ্ড ও স্কটলণ্ড দ্বীপে এবং পরে আধুনিক ইংলণ্ডে গিয়া বসতি স্থাপন করিল। তখন এই জাতি ও তৎসমসাময়িক পুরাতন অপর জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক ও ধর্ম্মবীরগণ, নাগ (Serpent ও Dragon) নামে খ্যাত ছিলেন। বেবিলনিয়া ও মিশর দেশের ধর্ম্মযাজকগণ খ্রীষ্টিয়ান রাজ্যের পুরোহিতগণ (Druids) এবং ফিনিসিয়া দেশীয় ধর্ম্মবীরগণ সকলেই এই নাগগণের বংশধর। "নাগ" প্রবীন ও প্রাচীণ ধর্ম্মবীরগণের পরিচায়ক চিহ্ন। এই চিহ্ন অতি প্রাচীনকাল হইতে, এমন কি দৈত্য দানবজাতির রাজত্ব সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও প্রচলিত আছে।

(৫) আর্য্যজাতির পঞ্চম বিভাগ।

(টিউটনিক্‌জাতি = Teutonic Sub-race)

এই টিউটনিক্‌ জাতি আর্য্যজাতির কেন্দ্রস্থান, মধ্য-এসিয়া হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিয়া সমস্ত মধ্য-ইউরোপ অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানে তাহারা প্রায় সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার অধিকাংশ স্থান তাহারা অধিকার করিয়া তথা হইতে আদিম অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আধুনিক অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিলেণ্ড দেশ প্রাচীন দানবরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এই দেশদ্বয় সুদূর অতীতের সাক্ষীস্বরূপ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। এই টিউটনিক্‌ জাতি উক্ত রাজ্যদ্বয়কেও অধিকার করিয়া দানবরাজত্বের ও দানবজাতির চিহ্ন পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে লোপ করিয়া ফেলিতেছে।

এই গর্ব্বিত জাতি অভিমান ভরে মস্তকোত্তোলন করিয়া পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাজ্য ও দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ভবিষ্যতে এই জাতি সুবিস্তৃত এক সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করিয়া তাহা বহুকাল ব্যাপিয়া শাসন করিবে ও সভ্য জগতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জগতে এক অভিনব সভ্যতার অবতারণা করিবে।

কালসহকারে এই সভ্যতা এবং সাম্রাজ্য সহ এই জাতি অতীতের গর্ভে বিলীন হইবে। ক্রৌঞ্চ মহাদ্বীপও সময়ে প্লক্ষ, শাল্মলী এবং কুশ দ্বীপের ন্যায় বিনাশ পাইবে। বিধির অলঙ্ঘ্য নিয়ম কে খণ্ডাইবে?

৭। উপসংহার।

বর্ত্তমান উত্তর-আমেরিকা কালে ভূমিকম্পে ও আগ্নেয় গিরির স্রাবে ধ্বংস হইয়া সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে। সময়ে তথায় ষষ্ঠ মৌলিক জাতির আবাস ও রাজ্যস্বরূপ শাকদ্বীপ নামক মহাদেশের উৎপত্তি হইবে। সময় পূর্ণ হইলে নিয়তির বশে, কুশ ও পুষ্কর দ্বীপের ন্যায় শাকদ্বীপও সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে

বর্ত্তমান দক্ষিণ-আমেরিকা কাল সহকারে প্রলয়ে ধ্বংস হইবে। তথায় ভাবী সপ্তম মৌলিক জাতির রাজ্যস্বরূপ পুষ্কর দ্বীপ নামক মহাদেশের

আবির্ভাব হইবে। কালপূর্ণ হইলে এই জাতি স্বীয় রাজ্যসহ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পৃথিবীরও পরমায়ু শেষ হইয়া আসিবে।

বসুমতী প্রলয়-পয়োধিজলে নিমগ্ন হইয়া কালের করাল কবলে নিপতিত হইবে এবং চিরকালের মতন দৃষ্টিশক্তির বাহিরে যাইবে।

সব ফুরাইবে। সসাগরা ধরার বিচিত্র-ঘটনাপূর্ণ ইতিহাস মানবের স্মৃতিপথ হইতে চির দিনের মতন অপসৃত হইবে। চিহ্নমাত্র থাকিবে না! গ্রহের পর গ্রহ, মণ্ডলের পর মণ্ডল এবং চক্রের পর চক্র আসিতেছে, যাইতেছে। কাহারই স্থায়ীত্ব নাই, সকলই নশ্বর ও ভঙ্গুর। কিন্তু একমাত্র পরমাত্মা অজর, অমর ও অবিনশ্বর। মানবদেহাবলম্বনে, মানবসমাজে যে আত্মা প্রকাশিত হইয়াছিলেন, সেই ক্ষণভঙ্গুর দেহ, এবং বিনশ্বর সমাজ লোপ পাইলেও নিষ্কল ব্রহ্ম চৈতন্য আবহমানকাল বিরাজমান থাকিবেন। তাঁহার বিনাশ নাই, তাঁহার ধ্বংস নাই! তিনি অবিনশ্বরভাবে বিরাজিত থাকিয়া "একং সৎ" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ," "তত্ত্বমসি", এই মহাবাক্যত্রয়ের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন।

যুগল সেবক।

ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম শব্দ ধৃ-ধাতু হইতে আসিয়াছে, অতএব ধর্ম্ম অর্থে বুঝায়—যাহা হইতে ধারণ বা যাহার দ্বারা পালন। যাহা এই সংসার, এবং এই সংসারের প্রাণীগণের আধার এবং যাহায় অভাবে এই সংসারচক্র চলিতে পারে না তাহাই ধর্ম্ম। ভগবান ধর্ম্মের দ্বারা জীবের বিকাশ, তাহার রক্ষা বা পালন ও সৃজন করিতেছেন। অতএব শাস্ত্রে আছে—"ধর্ম্মরূপীজনার্দ্দনঃ"।

শ্রুতিতে আছে—

ধর্ম্মোবিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা
লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি
ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তীতি ॥

(ধর্ম্মই জগতের আধার, সংসারে, লোকে ধার্ম্মিকের অনুসরণ করে; ধর্ম্মের দ্বারা পাপ দূর হয়; সমস্তই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত; অতএব ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ পদার্থ।)—স্মৃতিতে আছে;—

ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহু র্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যস্মাদ্ধারয়তে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥

(ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম্মের এই নাম হইয়াছে; সমস্ত লোকই ধর্ম্মের দ্বারা ধৃত হইয়াছে। ধর্ম্মই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রিলোককে ধারণ করিতেছে)।

আবার আছে,—

ধর্ম্মঃ সতাং হিতঃ পুংসাং ধর্ম্মশ্চৈবাশ্রয়ঃ সতাম্।
ধর্ম্মাল্লোকাশ্রয়স্তাত প্রবৃত্তাঃ সচরাচরাঃ॥

মহাভারত—শান্তি—অধ্যায়ঃ ২০৮।

(ধর্ম্মই সৎপুরুষের হিত, সৎপুরুষের ধর্ম্মই আশ্রয়, সচরাচর তিন লোক ধর্ম্মের দ্বারা চলিতেছে)।

বিহিত ক্রিয়য়া সাধ্যোধর্ম্মঃ পুংসাং গুণোমতঃ।
প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়াসাধ্যঃ স গুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে॥

(বেদাদি শাস্ত্রে মানবের কল্যাণকর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম যাহা বর্ণিত আছে, তাহার পালনে যে মনুষ্যের প্রবৃত্তি তাহাকে ধর্ম্ম বলে, আর হিংসাদি নিষিদ্ধ কর্ম্মে যে ইচ্ছা তাহাকে অধর্ম্ম বলা যায়)।

যে কর্ম্মের দ্বারা প্রাণীগণের উন্নতি এবং রক্ষা হয়, তাহাকে ধর্ম্মকর্ম্ম এবং যাহার দ্বারা কাহারও কোনও প্রকারে হানি হয়, তাহাকে অধর্ম্ম বলে। আমাদিগের হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিভিন্ন অস্তিত্ব ও কার্য্য আছে সত্য, কিন্তু তাহারা বাস্তবিক এক দেহেরই বিভিন্ন অংশমাত্র, এবং প্রত্যেকের সুখ ও দুঃখে অপরটিরও সুখ ও দুঃখ হয়। আমাদিগের হস্ত, আমাদিগের পদ হইতে পৃথক হইলেও একের হানিতে অপরটিরও ক্ষতি বোধ হয়। হস্ত যদ্যপি কোনও দূরস্থ বস্তু আনিতে প্রয়াসী হয়, তাহা হইলে পদের সাহায্য ব্যতিরেকে সক্ষম হয় না। এইরূপে প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পরস্পরের সাহায্যে নির্ভর করিয়া আছে।

কোনও একটী বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন হইতে হইলে একটী ইন্দ্রিয়ের আপন নিয়মিত কর্ম্ম করিলেই চলিবে না; অপর ইন্দ্রিয়েরও সহানুভূতি ও সহায়তাকার্য্য আবশ্যক। একের কার্য্যে যদ্যপি অপর ইন্দ্রিয়গণ না সাহায্য করে তাহা হইলে অনেক কার্য্যই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়।

সেইরূপ এই সম্পূর্ণ জগৎ বিরাট, পুরুষের মহাশরীর এবং প্রাণীগণ দেহের ইন্দ্রিয়াদির মত তাঁহার বিভিন্ন অংশ। অতএব ইন্দ্রিয়াদির মত প্রত্যেক প্রাণীরই এক একটি বিশেষ নিয়মিত কর্ম্ম আছে; সেইটী তাহার বিশেষ ধর্ম্ম। আর সমস্ত জীবের পরস্পরের সহায়তায় যে কর্ম্ম তাহা তাহাদের সাধারণ ধর্ম্ম। সমস্ত প্রাণীই সম্বন্ধযুক্ত, একটী একটী হইতে পৃথক থাকিতে পারে না, সমস্ত গুলিরই পুষ্টিতে তবে সেই বিরাট বপুর পুষ্টি হইবে। কেহই অনাবশ্যক নহে। সমুদ্র তটস্থ বালুকণায় যেমন কর্ত্তব্য আছে, যেমন আবশ্যক আছে, জগতের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মাদিগেরও সেইরূপ আবশ্যক আছে। আমরা উভয়েরই কাছে ঋণী। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে,—

ইদং মানুষং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য
মানুষস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু॥ ১৩
অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ
সর্ব্বাণি ভূতানি মধু॥ ১৪

(সমস্ত ভূত লইয়া মনুষ্য মধু, অর্থাৎ আবশ্যকীয় ও লাভকারী; আর মনুষ্যের নিমিত্তই সমস্ত জীব মধু)। ১৩

(সমস্ত জীবকে লইয়াই আত্মা মধু এবং আত্মার নিমিত্ত সমস্ত জীব মধু।) ১৪

শঙ্করাচার্য্যস্বামী লিখিয়াছেন,—"যস্মাৎ পরস্পরোপকার্য্যোঽপিকারক ভূতং জগৎ সর্ব্বংপৃথিব্যাদি—

(পৃথিব্যাদি বিশ্ববস্তু পরস্পর হইতে উপকার প্রাপ্ত হইতেছে ও পরস্পরকে উপকার করিতেছে)।

সমস্ত লোক ও জীব সেই বিরাটপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অংশ; অতএব একের হানি বা লাভে অপরের হানি বা লাভ হয়; অপরের সহায়তা ভিন্ন একের কোনও কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারে না; সেই জন্য সর্ব্ব জীব

মধ্যে ঐক্যতা সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য; প্রেমের বিমল বন্ধনে সকলকে বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। অতএব আমরা দেখিতেছি যে সকলের উপর বিরোধ ত্যাগ এবং পরের সহায়তাই আমাদিগের মুখ্য কর্ম্ম; এবং ইহার বিপরীতাচরণ—পরের প্রতি ঘৃণা করা বা কাহারও হানি করা অথবা হানি করিবার ইচ্ছা করাও অধর্ম্ম। এই বিরাট বিশ্ব অশ্বত্থরূপী একটী মহান বৃক্ষ; ভগবান আপন বীর্য্য প্রকৃতির ক্ষেত্রে বক্ষণ করিয়া এই সংসাররূপী বৃক্ষে পরিণত করিয়াছেন। একটী বৃক্ষের সমস্ত শক্তি তাহা হইতে জাত বীজে যেমন গুপ্ত ও অপ্রকাশিত থাকে; সেইরূপ ভগবান-স্থাপিত বীর্য্যেও তাঁহার শক্তি গুপ্ত থাকে এবং তাহারা ধীরে ধীরে প্রকাশ হইতে থাকে। অবশেষে সেই বৃক্ষের আবার ফল জন্মায় ও ফলেব বীজ হইতে নূতন বৃক্ষের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেইরূপ এই সংসার বৃক্ষেবও অনেক ফল জন্মায় এবং তাহা হইতে নূতন সৃষ্টিকার্য্য হইতে থাকে। যাহা দ্বারা এই কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত হইতে পারে তাহাই ধর্ম্ম। সমস্ত প্রাণীই এই সংসারবৃক্ষের বিভিন্ন অঙ্গ; অতএব প্রত্যেকের এমন কার্য্য করা উচিত যাহা দ্বারা আপন আপন নিয়মিত কর্ত্তব্য ও সেই সংসার-বৃক্ষের পুষ্টি সাধন হইতে পারে। সংসার বৃক্ষের পুষ্টিতেই তাহার আপনার পুষ্টি নির্ভর করিতেছে—সম্পূর্ণের উন্নতিতে অংশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। যেরূপ বৃক্ষের এক অঙ্গের হানিতে সমস্ত বৃক্ষের হানি সেইরূপ এক প্রাণীর নাশেও সংসারের হানি হয়। বৃক্ষের এক অঙ্গের উপর জলসিঞ্চন করিলে কি সমস্ত বৃক্ষের উন্নতি হয়, না সেই অঙ্গেরই উন্নতি হয়? সেইরূপ স্বার্থ ভুলিয়া আপনার প্রতি অতিমমতা ছাড়িয়া পরের উপকার কবিলে তবে সংসারবৃক্ষের উন্নতি হইবে এবং তাহার সহিত আপন আপন উন্নতি হইবে। স্বার্থচিন্তা দ্বারা যাহা হওয়া অসম্ভব, স্বার্থ-ত্যাগ করিলে তাহা আপন হইতে আসিয়া পড়ে।

ধর্ম্মরূপ জলসিঞ্চন জানিলে সংসাররূপী বিবাট বৃক্ষেব উন্নতি ও তাহার সহিত অন্যোন্নতি হইতে থাকে।

যস্য বাঙ্‌মনসী স্যাতাং সম্যক্ প্রণিহিতে সদা।
তপস্ত্যাগশ্চ যোগশ্চ স বৈ পরম মাপ্নুয়াৎ॥ ৪

মহাভারত—শান্তি পর্ব্ব অধ্যায়। ১৮৫

(যাঁহার বাক্য ও মন ভাল এবং অপরের ভাল করিতে নিয়ত রত, এবং যিনি নিয়ত তপ, ত্যাগ ও যোগযুক্ত থাকেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন।)

যখন "আমিই যথার্থ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছি" এইরূপ অহঙ্কারে আস্ফালিত জাজলি ঋষি আকাশ বাণীতে রোষাবিষ্ট হইয়া বারাণসীবাসী তুলাধারের সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহাকে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় পরায়ণ দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন "হে বণিকপুত্র, তুমি রস, গন্ধ, বৃক্ষ, ওষধি ও ফলমূল সমুদয় বিক্রয় করিয়াও কিরূপে এরূপ নিশ্চল বুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিলে?" তখন তিনি কি উত্তর পাইয়াছিলেন? তুলাধার তাঁহাকে বলিলেন,—

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব—২৬২ অধ্যায়)

বেদাহং জাজলে। ধর্ম্মং সরহস্যং সনাতনং
সর্ব্বভূতহিতং মৈত্রং পুরাণং যং জনা বিদুঃ।৫

(জাজলে। আমি সর্ব্বভূত হিতকর পূর্ব্বতন সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছি।

সর্ব্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্ব্বেষাঞ্চ হিতে রতঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স ধর্ম্মং বেদ জাজলে॥

যে ব্যক্তি সকলের সুহৃদ্ এবং যিনি কায়মনোবাক্যে সকলের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ।)

ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

পরহিতলাগি তজে জো দেহী।
সন্তত সন্ত প্রসংসহি তেহী॥
পরহিত বস জিন্‌কে মন মাঁহী।
তিন্‌কহঁজগ দুর্লভ কছু নাহী॥
ক্ষমাশীল জে পর উপকারী।
তে দ্বিজ প্রিয় সোহি যথা খরারী॥
বড়ে সনেহ লঘুন পর করহী।
গিরি নিজ সিরন সদাতৃণ ধরহী॥
জলধি অগাধ মৌলি বহ ফেনু।
সংতত ধরনী ধরত সির রেণু॥

তাহাই শাস্ত্রে আছে,—

আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
পুণ্যং পরোপকারায় পাপায় পরপীড়নম্ ॥

(সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া, এবং বিচার করিয়া এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে—পরোপকারেই পুণ্য, এবং অপরকে দুঃখ দেওয়াতেই পাপ)।

বেদে আছে—"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।"

(অহিংসা পরম ধর্ম্ম)। বাক্য বা চিন্তার দ্বারা অপরের অমঙ্গল করাই হিংসা। আপনার যাহাতে সুখ বা দুঃখ হয়, আপনার যাহাতে মঙ্গল বা অমঙ্গল হইবে মনে হয়, পরেরও তাহাতে হয় এইটী জানা থাকা চাই।

শান্তি পর্ব্বে আছে,—

জীবিতং যঃ স্বয়ং চেচ্ছেৎ কথং সোহন্যং প্রঘাতয়েৎ।
যদ্যদাত্মনি চেচ্ছেত তত্‌পরস্যাপি চিন্তয়েৎ ॥ ২১

(যে আপনার জীবন বাঞ্ছা করে, সে কি করিয়া অপরের হিংসা করিতে পারে, আপনার যাহা পাইতে ইচ্ছা হয়, তাহা অপরেরও যেন হয় এইটী ইচ্ছা করা একান্ত কর্ত্তব্য)।

প্রাণা যথাত্মনোহভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ ॥

হিতোপদেশ।

ওইরূপ প্রেমবান লোকের যদ্যপি কেহ অনিষ্ট করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের দুষ্ট কর্ম্মের ঋণ পরিশোধ হইতেছে।

মনুস্মৃতিতে আছে,—

যদ্ধ্যায়তি যত্‌কুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্রচ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যো হিনস্তি ন কিঞ্চন ॥

(যিনি কাহারও হিংসা করেন না, তিনি যাহা কিছু ধ্যান করেন, বা যে কোনও শুভ বিষয় লাভ করিতে মনের একাগ্রতা করেন, তিনি সে সমস্ত বিনা আয়াসে লাভ করেন।)

ন জাতি দৃশ্যতে রাজন্। গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থং পরার্থে যস্য জীবিতং।
অহোরাত্রং চরেৎকান্তিংতং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

মহাভারত বনপর্ব্ব, অজাগর পর্ব্বাধ্যায়।

জন্মের দ্বারাই জাতি নিরাকৃত হইতে পারে না; ইহা কল্যাণকারক গুণের দ্বারা হইয়া থাকে। যে সমস্ত লোক ধর্ম্মের নিমিত্তই জীবিত, যে সমস্ত লোক কেবল পরোপকার করিবার জন্যই আছেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা হয়।

অপরের দ্বারা আমাদিগের যে সমস্ত ক্ষতি হয়, তাহা আমাদিগের ক্লেশকারী স্বভাবের প্রতিফলে হইয়া থাকে। আমরা অপরের শত্রু, সেই নিমিত্ত অপরেও আমাদিগের উপর শত্রুতা করে। আমরা ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য, জিহ্বার বা উদরের তৃপ্তির জন্য বা অপর কোনও অচির বাসনার চরিতার্থতার জন্য সংসারে আসিয়া অকারণে যে প্রাণী বধ করি, তাহার ফলে আমাদিগের কত যে অনিষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ করিতে কে পারে? আমরা কি কখনও একবার ভাবিয়াছি, ব্যাঘ্র, সর্পাদি হইতে আমরা যে এতদূর শত্রুতা পাই, তাহার কারণ আমাদিগের নিষ্ঠুর আচরণ দ্বারা পশ্বাদি ইতর জন্তুর সাধারণ জীবাত্মাকে (group soul) আমাদিগকে ভয় করিতে ও আমাদিগের অনিষ্ট করিতে শিখাই। যে পুরুষ কাহাকেও কোনও প্রকারে কষ্ট দেন নাই বা কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই, বরঞ্চ তাহাদের প্রতি প্রেম ও দয়া দেখাইয়া আসিয়াছেন, তিনি অরণ্যে যাইয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু দিগের সহবাসে থাকিলেও, তাঁহার কোনও ভয়ের কারণ থাকে না। পরার্থে যাহার জীবন, দিবারাতি যিনি মঙ্গল কর্ম্ম পরায়ণ তাঁহাকে দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

যাহা অনুসরণ করিলে, প্রাণীমাত্রের উন্নতি হয়, এবং তাহার সহিত অবশ্য কর্ত্তারও উন্নতি হয় তাহাকে সাধারণ ধর্ম্ম বলে। ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে জীবের বিশেষ হানি হয় ও তৎসঙ্গে কর্ত্তারও হানি হয়। অতএব সাধারণ ধর্ম্ম পালন বিশেষরূপে আবশ্যকীয়। শ্রীভগবান এই সাধারণ ধর্ম্মের এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং, শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

ধীবিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।

গীতা ৬ অধ্যায়—৮২ শ্লোক।

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ, এই দশটি ধর্ম্ম লক্ষণ।

ক্রমশঃ

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বেদান্তাভাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উগ্রাসনে বীরাসনে,
হবনেত্রে স্থির নয়নে,
বসি পঞ্চমুণ্ডী 'পরি
করে শক্তি উপাসনা॥ ৩১।
এই তাপ সংগ্রহ করে,
তাই তপস্বী নাম ধরে,
তপস্যা ধর্ম্মাঙ্গ খলু
তপস্যা ধ্যান ধারণা॥ ৩২।
আছে যাগ যজ্ঞ যত,
তপস্যার অনুগত,
এই তাপের সমাচার
চিন্তা করি মন দেখ না॥ ৩৩।
ধর্ম্মপথে অপ্রবিণ,
কর্ম্মগুণে দৃষ্টিহীন,
ফলশ্রুতির লক্ষ্য ফলে
শোনে যে শাস্ত্র বর্ণনা॥ ৩৪।

সে সংসার-আসক্ত গীত,
কর্ম্ম ফলানুসেবিত,
নাহি জানি আত্মতত্ত্ব,
স্বর্গভোগ করে কামনা॥ ৩৫।

ব্রহ্মময় যে জন ভবে,
তার লোকালোক কি সম্ভবে,
যথা রহি সেই ব্রহ্মলোক,
স্বাতন্ত্র্য বৃথা কল্পনা॥ ৩৬।

এই স্বাতন্ত্র্য আলম্বনে,
লোকালোক পরিচিন্তনে,
যে করে জ্ঞান গরিমা
সে গরিমা অজ্ঞান শোভনা॥ ৩৭।

তার অজ্ঞান সঙ্গে তাহার,
অলক্ষিতে করে বিহার,
ছায়ারূপে হায় যেমতি
শশাঙ্কে শশ লাঞ্ছনা॥ ৩৮।

এই কল্পনা যার উঠেনা
কল্পনায় যার মন ভোলে না
সে দেখে সংসার ধাঁধা
ধাঁধা পর ধাঁধা খোজ না॥ ৩৯।

ক্রমশঃ

নিষ্কাম কর্ম্ম।

হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব নিষ্কাম কর্ম্ম পরের উন্নতি বর্দ্ধনে আনন্দিত হইয়া পরের উপকারে ব্রতী থাকিয়া কর্ম্ম করাই প্রধান কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য পালন ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রভেদ নিতান্ত অল্প নহে, অনেকের বিশ্বাস বুদ্ধির প্রেরণায় অনুষ্ঠিত কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। অর্থাৎ ইউরোপীয় duty ও ভারতীয় নিষ্কাম

কর্ম্ম একই পর্য্যায়ের বস্তু। এ বিশ্বাস একেবারে ভিত্তিশূন্য না হইলেও ইহা যে ভ্রমজড়িত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কর্ত্তব্যপালনে একটা কঠোর ভাব জড়িত আছে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মে কঠোরতার লেশ মাত্র নাই। ইহা অতীব রুচিকর হৃদ্য পদার্থ।

দীন দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করিয়া দাতার যে আনন্দ, শিশুকে স্তনপান করাইয়া মাতার যে আনন্দ, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতার সেই জাতীয় একটা আনন্দের অনুভব হয়। কর্ম্মফলের প্রত্যাশী না হইয়া কর্ম্ম করা। ভগবানের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করা। অর্জ্জুন যখন কুরুক্ষেত্র সমর সময়ে নিরস্ত হইতেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া গীতায় বলিতেছেন :—

নিরাশির্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।

'কর্ম্মরাশি আমাতে সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ কর।' নিষ্কাম কর্ম্মের প্রথম স্তর ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর। আমরা সাধারণতঃ ফললাভের লোভে পড়িয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করি। মনে কর যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিগ্রস্ত হইতে পারিলে ধনাগম, উচ্চপদ প্রাপ্তি হইবে তাহা হইলেই আমরা নির্ম্মম পরীক্ষা নিষ্পেষণীতে আত্মপেষণ করিতে সমর্থ হই। এস্থলে ফলাকাঙ্ক্ষাই আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের একমাত্র প্রবর্ত্তক। এস্থলে ফলাকাঙ্ক্ষা এমন প্রবল, ফলে আসক্তি এমন তীব্র, যে যদি সে ফল লাভে বঞ্চিত হই তবে ক্ষোভ ও পরিতাপের সীমা থাকে না। ফললাভ না ঘটিলে হৃদয় নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। অনেক সময়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া দারুণ মোহ আসিয়া মনকে অস্থির করিয়া থাকে। তাহার ফলে অনেককে আত্মজীবনও তুচ্ছজ্ঞান করিতে শুনা গিয়াছে। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ফলের আসক্তি নিবন্ধন কর্ম্মানুষ্ঠানের ইহা অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এরূপ কর্ম্ম সকাম কর্ম্ম, এই কর্ম্মে শোক তাপে তাপিত হইতে হয়। কিন্তু নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে এরূপ ঘটে না। নিষ্কাম ব্যক্তি ফলের প্রত্যাশা করেন না, কর্ম্ম করিতে হয়, করিতেছেন মাত্র। তিনি বুঝেন যে,

'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

'কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে কদাচন নহে।'

সেই জন্ত তিনি অনাসক্ত হইয়া অর্থাৎ ফলে আসক্তি রহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ভগবান বলিতেছেন :—

'তস্মাৎঽসক্ত সততম্ কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার।
ঽসক্তশ্চারণ্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

"সেই হেতু অনাসক্ত হইয়া সতত অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের আচরণ করিবে। অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিলে পরম পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

এই নিষ্কাম কর্ম্মই জীবের আনন্দ বৃদ্ধি করে. জীবের মোহাবস্থায় অনেক দুঃখ নিপীড়িত হইয়া জীব সর্ব্বদাই যন্ত্রণা পাইয়া থাকে, আনন্দ কিরূপ তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় না। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বিতীয় স্তর নিরহঙ্কার অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বা-ভিমানশূন্যতা। আমরা যে কর্ম্মই করি না কেন, তাহা আমরা ভাবি যে, ঐ কর্ম্ম আমরা করিলাম। আমি করিতেছি এই অহঙ্কার—তজ্জন্যই কর্ম্মফলের বন্ধনে পড়িয়া সুকৃতির ফল সুখ ও দুষ্কৃতির ফল দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি—এই ভোগের হেতু কর্ত্তৃত্বাভিমান। কিন্তু এই ভাব ঠিক নহে, নিষ্কাম কর্ম্মী তাহা বুঝেন : সেই জন্য তিনি আপনাকে কর্ত্তৃপদে অধিরূঢ় করেন না। তিনি বুঝেন সকল কর্ম্মই প্রকৃতির গুণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সেই জন্য তিনি প্রকৃতিকে যথার্থ কর্ত্তা এবং আপনাকে দ্রষ্টা মাত্র অনুভব করেন। ভগবান গীতাতে বলিতেছেন :—

প্রকৃতৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
য পশ্যতি তথাত্মনম্ কর্ত্তারং স পশ্যতি॥

গীতা ১৩।২৯।

"যিনি সকল কর্ম্মকে প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বুঝিতে পারেন এবং আত্মাকে কর্ত্তা দেখেন না তিনিই যথার্থদর্শী।"

তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত—নিরহঙ্কার। তাঁহাকেই ভগবান সর্ব্ব কর্ম্মকারী বলিয়াছেন। তিনি কর্ম্মঠ। ইহার উপর আর একটি স্তর আছে। সেই স্তর ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ, যজ্ঞার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান। নিষ্কাম কর্ম্মী সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে। সে যে কিছু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহার উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মপ্রীতি নহে। তাহার লক্ষ্য ঈশ্বরের কার্য্য সাধন। অর্থাৎ সে নিজেকে ঈশ্বরের করণমাত্র মনে করে। ঈশ্বরে আপনার ক্ষুদ্র সত্বা

ডুবাইয়া দেয়। সেই জন্য তাহার কর্ম্মে সকামতার লেশ মাত্র থাকে না। এইরূপে সে সকল কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করে। যৎকিঞ্চিৎ করিবে তৎসমস্তই ভগবানে সম্প্রদান করিবে; এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করা। যজ্ঞের ইংরাজি নাম Sacrifice। Sacrifice কথাটায় মনে ত্যাগের ভাবই উদয় হয়। বাস্তবিকই যজ্ঞের প্রধান উপাদান ত্যাগ। মহাযজ্ঞ আর কিছুই নহে, ভগবানের উদ্দেশ্যে যে ত্যাগ, শাস্ত্রোক্ত তাহাই যজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে প্রকৃত যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়। সেইরূপ কর্ম্মই যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম। সে যজ্ঞের বেদী জগতের মঙ্গল, ত্যাগ আত্ম বলিদান, ও যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং শ্রীভগবান্।

কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া উদাসীন ভাবে সর্ব্ব কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে প্রফুল্লকে দেখিয়াছি। সেই প্রফুল্ল নিষ্কাম কর্ম্ম শিখাইয়াছে, প্রফুল্ল গরিবের কন্যা হইয়াছিল, এই জন্য প্রফুল্ল সমাজচ্যুত হইয়া স্বামীগৃহবাসে বঞ্চিত হইয়াছিল। পরে প্রফুল্ল শ্বশুরের নিকট তাড়িত হইয়া অরণ্য মধ্যে বহু ধন রত্নাদি লাভ করে, তাহার এক কপর্দ্দকও স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মপ্রীতির জন্য খরচ করে নাই। সৎকার্য্য করিয়া নিয়মমত ধর্ম্ম ব্রত পালন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিত ও সমস্তই মহামূল্য ধন রত্নাদি দান বিতরণ করিয়া আনন্দিত হইত। কিছু মাত্র না রাখিয়া সমস্তই দান করিয়াছিল। প্রফুল্ল—নামে—দস্যুগণের রাণী, কার্য্যে অতি কঠোর ব্রতে ব্রতী হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে শিখিয়াছিল। প্রফুল্ল সমাজচ্যুত হইয়া স্বামীগৃহ বাসে বঞ্চিত হইয়া মহারণ্যে দস্যুপতি ভবানী পাঠকের শিষ্যা হইয়া দস্যুদলে রাণীগিরি করিতেছিলেন। সেই প্রফুল্ল এখন এসো! সমাজে এসো! সর্ব্ব সমক্ষে একবার দাঁড়াও, বল আমি পুরাতন, নূতন নহি। দেখুন সেই প্রফুল্লমুখী শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী ও সপত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে কেমন নির্ব্বিবাদে নিষ্কাম করিয়া স্বামী-গৃহ আলোকিত করিতেছে। ও কিরূপ সুশৃঙ্খলভাবে সংসার নির্ব্বাহ করিতেছে। এখন তাহার শ্বশুর সর্ব্বকর্ম্মেই তাহার মত লইয়া কার্য্য করিতেছেন। প্রফুল্লকে কি কেহ চেনেন? শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবুর দেবীচৌধুরাণী। দস্যুদলে ইনি এই নামেই পরিচিতা ছিলেন। দেবী চৌধুরাণীতে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু নিষ্কাম কর্ম্ম উত্তমরূপে ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আধুনিক বঙ্গভাষায়

সর্ব্বসমক্ষে প্রফুল্ল নিষ্কাম কর্ম্মের একটি মহৎ উদাহরণ। দস্যুরাণী দেবী চৌধুরাণী কিন্তু কখনও একটি লোকের অনিষ্ট না করিয়া নিজের প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরের প্রাণ রক্ষার্থে সদাই ব্যস্ত থাকিতেন। প্রফুল্ল যথার্থই নিষ্কামী।

ঐ দেখ আবার কে? যাদুধাণী কর্তৃক অতি ক্ষুদ্রাকারের দেহ প্রাপ্ত হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট সমভিব্যাহারে আসিতেছেন উনি কে? 'রোজিমাইট' একটি কীটাপেক্ষাও ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র বালিকা। ইনি অতি ক্ষুদ্রাবস্থায় ও মহৎ মহৎ তিনটি কার্য্য সমাধা করেন। কীটগণ, শশক, প্রভৃতির একমাত্র রক্ষক। ইনি জীবগণের যথেষ্ট উপকারী। তাহা কি বলিব? (Verra petrovena Jhelevaskey) ভেরা পেট্রোভেনা ঝেলিভেস্কি) এই রোজিমাইট নামক পুস্তকখানিতে নিষ্কাম কর্ম্ম ও সত্যতা বিশেষরূপে বিবৃত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। জগতের যাবতীয় জীব, বৃক্ষ, লতা, কীট প্রভৃতি সকলেই রোজিমাইট (Rosymite) নামক ক্ষুদ্র বালিকাটির অনুগ্রহপ্রার্থী ও সকলেই তাহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকে এবং ভালবাসে। রোজিমাইট (Rosymite) জানিতেন যে 'might is not right, but in right,' 'শক্তিই যথার্থ ক্ষমতা নয়, সত্যই যথার্থ ক্ষমতা।

একদিন একটি নিবিড় অরণ্যের পার্শ্বের ময়দানে তাহার ভ্রাতার সহিত এই সম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে সেই স্থানে দুষ্টা যাদুধাণী কোকিলরূপে নিকটস্থ কোন এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া শ্রবণ করে, সেই যাদুধাণী কখনও পেচকরূপ, কখনও কোকিলরূপ ইত্যাদি ধারণ করিয়া ঐ অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকে লোকমুখে এ কথা শুনা যায়। এক্ষণে সেই যাদুধাণী কোকিলরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া কুহু কুহু শব্দে অরণ্য স্তম্ভিত করিল। তৎশ্রবণে বালিকা ভীতা হইল ও তাহাকে মন্দজীব বলিল, কারণ তাহারা উপকারী জীব নহে। তৎশ্রবণে সেই কোকিলরূপিণী যাদুধাণী "রোজিমাইট"কে অতি ক্ষুদ্রাকারে যাদু করিয়া রাখিল এবং বলিল "দেখ এবার তোমার সত্য কতদূর ক্ষমতা হইতে পারে এক্ষণে তোমাকে একটি কীটাপেক্ষাও ক্ষুদ্রাকারে পরিবর্ত্তন করিলাম,

এমন কি একটি কীটও তোমাকে পীষণ করিয়া ফেলিবে।" অতএব বোজিমাইট কীটগণ সহ বাস করিতে লাগিল ও যথাসাধ্যরূপে তাহাদের মহৎ মহৎ কার্য্য করিতে লাগিল, তজ্জন্য সর্ব্বজীব তাহার নিকট ভালবাসার দ্রব্য হইল ও সে নিজেও সকলের নিকট ভালবাসার পাত্রী হইল। সমস্ত বিবরণ লিখিতে হইলে প্রবন্ধ বৃহৎ হইয়া পড়িবে অতএব সংক্ষেপে নিঃশেষ করিতেছি।

এইরূপে তিনি জগতকে পবিত্রভাবে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন ও শিখাইয়াছেন। তাহার মহৎ মহৎ কর্ম্ম সকল সমাধা হইবার পর যাদুধাণী আসিয়া বলিল "তুমি কি তোমার পূর্ব্বদেহ পুনঃ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর? বালিকা বলিল "তাহা কি সম্ভব?

যাদুধাণী বলিল "সম্ভব, যদি তুমি তোমার পরিবর্ত্তে তোমার ভ্রাতাকে এইরূপ ক্ষুদ্রদেহ প্রাপ্ত ইচ্ছা কর তাহা হইলে তুমি তোমার পূর্ব্বাকার লাভ করিবে, নচেৎ নহে।"

তৎশ্রবণে বালিকা বিরক্তভাবে বলিল, 'কি! আমার ভ্রাতা? আমার পরিবর্ত্তে আমার ভ্রাতা এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিবে—না কখনই নহে—এ জগতের কেহই এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিবে না এই আমার ইচ্ছা। আমাপেক্ষা সকলেই অতি মূল্যবান।

সপ্তম বর্ষীয়া বালিকার এই আশ্চর্য্য প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্মিত হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই কিন্তু সেই ভয়ঙ্করী যাদুধাণী তৎশ্রবণে ক্রোধস্বরে বলিল, "তবে তুমি এরূপ অবস্থায় যাবজ্জীবন বাস কর।" বালিকা বলিল "তাহাও স্বীকার, তথাপি আমি কাহাকেও এরূপ অবস্থায় রাখিতে ইচ্ছা করি না।"

বালিকার এরূপ প্রতিজ্ঞাসূচক বাক্য শুনিয়া কাহার না হৃদয় দ্রবীভূত হয়? এরূপ নিস্বার্থভাব কাহার থাকা সম্ভব? বালিকা মহা বিপদে পড়িয়া বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরের মঙ্গল কামনা করিতেছে। কিন্তু যাদুধাণী তাহাকে পুনরায় বিশেষরূপে ভয় প্রদর্শন করিল, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না বুঝিয়া পরিশেষে বিকৃত হাস্য পূর্ব্বক সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। বালিকা জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিল।

ক্ষণিক পরে বালিকার জ্ঞান সঞ্চার হইবার পর দেখিল যে সে পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্দর্শনে সে আনন্দিত হইয়া গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। কীটগণ, শশকগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগণ সকলেই তাহার আনন্দে আনন্দিত হইয়া তাহার অগ্রপশ্চাৎ আনন্দ সহকারে তাহাকে বাটীতে লইয়া চলিল। পুষ্পগণ আনন্দে তাহার মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বৃক্ষগণ তাহার আগমনে ঈষৎ নত হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণভাবে প্রণাম করিল। রোজিমাইট (Rosymite) এতকাল কীটগণ সমভিব্যাহারে বাস করিতেছিল, অদ্য কতদিন পরে বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, তাহার আনন্দে জগৎ আনন্দ। তাহার পিতামাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় ছিলে এত দিন রোজিমাইট ?" সে আনন্দের সহিত উত্তর করিল, "আমি দিনকতক ভালবাসা শিখিতে গিয়াছিলাম—কিরূপে তোমাদের ও এই সমগ্র জগৎকে ভালবাসিতে হয় তাহাই শিক্ষার্থে গিয়াছিলাম।" রোজিমাইট যথার্থই পবিত্র বিশ্বপ্রেমিকা ছিলেন।

'রোজিমাইট' যথার্থই পবিত্র ভালবাসা বা প্রেম এই জগতে বিতরণ করিয়াছিলেন তাহা রোজিমাইট নামক পুস্তকখানি পাঠ করিলে বিশেষ বুঝা যায়। জগৎকে ভালবাসিয়া জগতের উপকার করাই আত্মবিসর্জ্জন বা (Self Sacrifice)। ইহাও নিষ্কাম কর্ম্মের একটি অঙ্গ। এইরূপে এই উদাহরণ সহ আমাদের নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের সাহায্যকারী লাভ হইলে আমরা কার্য্যতৎপর হইয়া অনুষ্ঠান কর্ম্মে নিযুক্ত হই এস।

এস সকলে একত্রিত হইয়া নিষ্কাম ব্রত অবলম্বন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে শিখি। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে নিষ্কাম কর্ম্ম স্তুতির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে ভূয়োভূয়ো প্রণাম করি। তিনি আমাদের একমাত্র উপায়। নিরুপায় হইয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে শিখি এস। তিনি গীতাতে কি বলিতেছেন শুনি এস।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ গীতা ২।৪০।

"নিষ্কাম কর্ম্মে প্রযত্নের নাশ হয় না এবং প্রত্যবায় ও ঘটে না ; স্বল্পমাত্র হইলেও মহান ভয় হইতে পরিত্রাণ হয়।"

•নিষ্কাম কর্ম্মে আমরা এইটুকু বুঝিতেছি যে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ও কর্তৃত্বাভিমানশূন্যতা। অর্থাৎ কর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকিয়া কর্ম্ম করাই উদ্দেশ্য। এই কর্তৃত্বাভিমান দূর করিব তবেই আমি কর্ত্তা থাকিব না। আমরা ও মানব মাত্রেই যে সকল নানাবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই তাহাই একটা একটা মনের খেয়ালের বশে করিয়া থাকি। এক এক সময়ে এক একটা ভাব অন্তরে ফুটিয়া উঠে এবং তাহারাই ইন্দ্রিয়গণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। এই ভাবময় জগৎ আলোচনা করিয়া যিনি বুঝিয়াছেন যে প্রাকৃতিক জড়শক্তির নিয়ম শৃঙ্খলা বশেই ঐরূপ ভাব সমূহ প্রকাশ পায়, তিনি আর নিজেকে কর্ত্তা জ্ঞান করেন না। তখন তিনি কর্ম্মকর্ত্তা অহঙ্কারকে জড়পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারেন। তখন তাঁহার অন্তরে কোন কর্ম্ম করিবার উদ্যম উপস্থিত হইলে তিনি ইহা বুঝিতে পারেন যে বাহিরের কোন জড়শক্তির বশে তাঁহার এই প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্ম কর্ত্তাকে জড়শক্তি বুঝিয়া কর্ম্মকর্ত্তা অহঙ্কার হইতে চেতন পুরুষকে যিনি পৃথকভাবে দেখিতে শিখিয়াছেন অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা পরবশ কিন্তু চেতন পুরুষ আত্মবশ এই প্রভেদ যিনি বুঝিয়াছেন তিনি অহংকার শূন্য। যিনি কর্ম্মের হেতু অহংকারকে জড়শক্তি বশতাপন্ন পরবশ জড়পদার্থ বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং স্বাধীন আপনাকে চেতন পুরুষ বলিয়া জানিয়াছেন অহঙ্কারের কর্ম্ম নিবন্ধন তিনি দায়ী হন না।

অহংকারশূন্য হইয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালনের নামই নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ। উক্ত নায়িকাদ্বয় যেরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত করিয়াছে তাহাই কর্ম্মযোগ নামে কথিত।

'যোগ কর্ম্মসু কৌশলং।'

কৌশলে কর্ম্মযোগ করার নামই নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রেততত্ত্ব।

ঈশ্বর সৎ। সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি হইতে পারে না। তাঁহার ঈক্ষণে সৃষ্টি। তিনি এক ছিলেন বহু হইলেন—আপনাকে বহুধা করিলেন মাত্র। মহাসমুদ্রের জলে যে সকল পরমাণু বা উপাদান থাকে তাহার খানিকটা জল স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিলে সে সকল উপাদান অক্ষুন্নভাবে ইহাতেও থাকিবে তবে উপাধিভেদে পদার্থের বিকাশের ব্যতিক্রম হইতে পারে। যখন জীব ঈশ্বরের বহুর একটি তখন ঈশ্বর ও জীব একই। কেবল জীব উপাধিযুক্ত হওয়াতে তাহার ঐশ্বরিক বিকাশ নাই।

জীব যখন ঈশ্বর তখন ঈশ্বরের সমস্ত শক্তি নিশ্চয়ই জীবে আছে—অব্যক্ত ভাবে, যেহেতু উপাধি একমাত্র অন্তরায়। জীবের জীবত্ব সংজ্ঞা উপাধি হেতু। যদি উপাধিতে তাহার আত্মবুদ্ধি না থাকে তাহা হইলে সে দেহে থাকিয়াও মুক্ত। মুক্ত অংশের শক্তি মহান অংশীর সমান।

কর্ম্মের বশে জীবের গতাগতি। সে যদি জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম করে তাহা হইলে তাহার অধ্যাসবুদ্ধি কমিয়া আসে, বন্ধন শিথিল হয়; কিন্তু মায়া বা প্রকৃতির মোহিনী আবর্ত্তে পড়িয়া সে যে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ইহা ভুলিয়া গিয়া আপনাকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া ক্রমেই মোহের ঘনজালে আপনাকে ঢাকিয়া ফেলে; নিজের বন্ধনে নিজেকে বদ্ধ করে। এই বন্ধনের নাম কর্ম্ম। কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার দুই উপায়:—১ম, জ্ঞান দ্বারা মোহকে নাশ করা। ২য় নিজের সৃষ্ট কর্ম্ম নিজে ভোগ করিয়া আপনাকে শুদ্ধ করা।

যতদিন না জীবের দিব্যজ্ঞান বা কর্ম্মশেষ হয় ততদিন তাহার মুক্তি নাই। বদ্ধজীব হইলে উপাধি থাকিবেই। উপাধি দুই প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম।

স্থূল জগতের যাহা কিছু সবই স্থূল। স্থূল দেহে স্থূল কর্ম্ম ভোগ হয়। সে সকল কর্ম্ম ভোগ করিতে জীবের স্থূল দেহের প্রয়োজন হয়। কর্ম্ম অনুযায়ী জীবের জাতি, আয়ু ও ভোগ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যখন জীব জন্ম লয় তখন তাহাকে নির্দ্ধারিত কর্ম্মভোগ করিতে দেওয়া হয় এবং সেই কর্ম্মগুলি ভোগ করিতে যে পরিমাণ আয়ু ও যে স্থান ও সঙ্গ প্রয়োজন সেইরূপ স্থানে ও সেইরূপ পাত্রের মধ্যে সে জন্ম লয়। নির্দ্ধারিত কর্ম্ম ক্ষয় হইলেই তদনুযুক্ত

দেহ অনাবশ্যক বলিয়া উহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। এই পরিবর্ত্তনের নাম মৃত্যু।

মৃত্যুতে স্থূলদেহের নাশ হইল, কিন্তু দেহ নাশেত কর্ম্ম নাশ হইল না। তাহার প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্ম এখনও বহু থাকিল। যাহা ভোগ করিতে আসিয়াছিল তাহাত ভোগ করিল কিন্তু এখনও পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম বহু বাকি—সে সকল ক্ষয় না হইলেত মুক্তি হইবে না। কাজেই বদ্ধজীব এক দেহ ছাড়িয়া অপর দেহের আশ্রয় লয়। স্থূল জগতের স্থূল শরীর ছাড়িয়া সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম শরীরে সে আপনাকে ঢাকিল। এ দেহেও দেহীর ভোগ ও ভোগ্য আছে।

এ সূক্ষ্মেরও ক্রম আছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জীব যে দেহে থাকেন তাহা যদিও সূক্ষ্ম তথাপি তাহার পরমাণু স্থূলের সন্নিকট—সুতরাং ঐ দেহে অবস্থান কালীন জীব স্থূলসংস্পৃষ্ট হয়। ইহারই নাম প্রেত অবস্থা।

এই স্থূলসংস্পৃষ্ট অবস্থা হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জন্য আর্য্য ঋষিগণ শ্রাদ্ধের আদেশ করিয়াছেন। মন্ত্র শব্দ। শব্দই ব্রহ্ম। মন্ত্রের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়। তখন উহার দ্বারা একটি দেহ নাশ করিয়া অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মদেহে তাহা রক্ষা কি অসম্ভব? মহাভারতকার জরৎকারুর উপাখ্যানে উহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন, সেই জন্যই

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা
পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্।

স্থূল শরীরে জীব যে লোকে থাকে তাহার নাম ভূলোক। সূক্ষ্ম শরীরে—ভুবর্লোক। কেহ যেন না ভাবেন যে ভূঃ ও ভুবঃ ভৌগলিক স্থান বিশেষ। যত লোক আছে সবই একত্র স্থানে ওতপ্রোতভাবে; কেবল উহাদের অধিবাসী জীবের অবস্থা ও চৈতন্য স্বতন্ত্রমাত্র।

যেমন ভূর্লোকে নানা জাতীয় জীবের বাস—যথা পশু, পক্ষী, মানব ইত্যাদি, তেমনি ভুবর্লোকেও নানা জাতীয় জীব আছে। আমরা তাহাদিগকে প্রেত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, দেব ইত্যাদি পর্য্যায়ে আখ্যাত করিয়া থাকি। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জীব যে সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করে তাহা তাঁহার পূর্ব্ব স্থূল শরীরেরই অনুরূপ। যতদিন প্রেতলোকের নিম্নস্তরে সে থাকে তত

দিন সেই দেহেই তাহাকে থাকিতে হয়। পরে শ্রাদ্ধাদি বিহিত কর্ম্মের সহায়ে ও তৎলোকের ভোগ সমাপনান্তে সে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম শরীর পায়। এই রকমভাবে ক্রমেই সূক্ষ্ম হইতে অতি সূক্ষ্ম শরীরে যাইয়া পরে আবার প্রাক্তন কর্ম্মভোগের জন্য মানবদেহে আগমন করিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্থূল কর্ম্ম স্থূল শরীরে ভোগ করিতে হয়। সূক্ষ্ম কর্ম্ম—যথা রাগ দ্বেষাদি জনিত, যাহা কেবল জীবের স্থূল শরীর থাকা কালীন জন্মাইয়াছিল অথচ তাহার কার্য্য স্থূলে পরিণত হয় নাই সে সকল কর্ম্ম এই প্রেতলোকে ভোগ করিতে হয়। যে সকল কামনা সে হৃদয়ে পোষণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিতেছিল অথচ পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই তাহাদের কার্য্য এই শরীরে ভোগ হয়।

মানবের চিন্তামাত্রেই এক একটি জীবন্ত পদার্থ। কোন চিন্তাকে মনে একবার স্থান দিয়াছ—দেখিবে সেইটি আবার আর এক সময় তোমার মন অধিকার করিয়াছে। সেই জন্যই কোন চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিবার পূর্ব্বে তাহার পরিণাম কি বিবেচনা করিবে। যে সকল চিন্তা তোমাকে কুপ্রবৃত্তির পথে লইয়া যাইবে বা মনের স্থৈর্য্য নষ্ট করিবে বলিয়া মনে করিবে তাহা-দিগকে দৃঢ়তার সহিত পরিহার করিবে। ইহারই নাম অন্তরশৌচ।

অনেক কামনা এমন আছে যাহা পরিতৃপ্ত করিতে স্থূল শরীর প্রয়োজন। প্রেতদেহে অবস্থান কালীন যখন স্থূলদেহ থাকে না অতএব নিজ সৃষ্ট কামনা জীবন্ত মূর্ত্তিতে আক্রমণ করিয়া প্রবৃত্তির প্রবল স্রোতে টানিয়া লইয়া যায়—তখন প্রেত সমপ্রবৃত্তিপরায়ণ মানব দেহে আবিষ্ট হইয়া তাহার স্থূল শরীরের সহায় লইয়া আপনার কামনা পরিতৃপ্ত করে। এই অবস্থার নাম ভূতাবেশ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীললিত মোহন মল্লিক।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৩শ ভাগ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ সাল। | ২য় সংখ্যা।

অদ্বৈত-স্তোত্র।

আদিতে ওঙ্কার-নাদে, স্বেচ্ছাকৃত বহুরূপগুণে,
শ্বেত পীত নীল রক্তে, কৃষ্ণ কিম্বা কপোত হরিতে,
বহুবর্ণে, বিবর্ণের মাঝে,
প্রাণাপান, ব্যানোদান, দেহস্থিত সমান পবনে,
একব্যাপী সত্ত্বা মম রাজে।

২

পাতালে বা অন্তরীক্ষে, দশদিক্ষে, সাগরে, ভূধরে,
কাষ্ঠে, লোষ্ট্রে, স্বর্ণে, ভস্মে, ক্ষিতিজলে, জঙ্গমে, স্থাবরে,
সমীরণে, সর্ব্বৌষধি মাঝে,
পুষ্পে, পত্রে, তৃণশীর্ষে, বীজরূপে, সুরাসুর নরে,
একব্যাপী সত্ত্বা মম রাজে।

৩

শবদে, শবদাতীতে, রবিশশী নক্ষত্র কিরণে,
কামে, ক্রোধে, লোভে, মোহে, হিতাহিতে কিম্বা বিনোদনে
হাস্যক্রীড়া কৌতুকের মাঝে,
সুপ্তি-স্বপ্ন-জাগরণে, স্নেহে, প্রেমে, সত্ত্বরজতমে,
একব্যাপী সত্তা মম রাজে।

৪

শীতে, উষ্ণে, শুভাশুভে, ভবভয় গহন মাঝারে,
পুণ্যে, পাপে, রাগদ্বেষে, ঋতুরিপু বিরাগবিকারে,
কাল কিম্বা অকালের মাঝে,
সৌখ্যে, দুঃখে, শুদ্ধাশুদ্ধে, বুদ্ধিচিত্তে, মনোময় কোষে,
একব্যাপী স্বত্তা মম রাজে।

৫

দেবে, দৈত্যে, যক্ষে, রক্ষে, যতী-মুনি-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে,
যোগে, ভোগে, বিরাগে বা গুণাগুণে, গ্রহের ভিতরে,
বাল্যে, জরা তারুণ্যের মাঝে,
বেদে, সাংখ্যে, ন্যায়ে, তর্কে, বুধকৃত মীমাংসা পুরাণে,
একব্যাপী সত্ত্বা মম রাজে।

৬

জ্ঞানে, ধ্যানে, প্রমাণে বা অস্তি, নাস্তি, প্রকাশে, বিলয়ে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্ররূপে, কূলময়ে, অকূল ভিতরে,
বিশ্বরূপে, বিরূপের মাঝে,
মন্ত্রে, যন্ত্রে, অবাধে বা সর্ব্বতীর্থে, সুরেন্দ্রভবনে,
একব্যাপী সত্ত্বা মম রাজে।

৭

ধর্ম্মে, কর্ম্মে, যজ্ঞ-যূপে, যপতপ নিয়ম আসনে,
স্নানে, দানে, বিধানে বা অহঙ্কারে, কর্ত্তার অন্তরে,
বিরচিতে, কৃতান্তের মাঝে,

কূর্ম্মে, কীটে, পশুপক্ষী পতঙ্গ বা সর্ব্বাত্ম ভিতরে,
একব্যাপী সত্বা মম রাজে।

৮

স্থূলে, সূক্ষ্মে, কারণে বা বিচলিত দৃঢ়মতিময়ে,
মূর্ত্তিরূপে, অমূর্ত্তিতে, মেঘ-ঝঞ্ঝা-দামিনী-দমকে,
সিদ্ধ-দেব পিশাচের মাঝে,
ধূর্ত্তে, দূষ্যে, বিচারকে, দৈত্যে, লিঙ্গে, ধূর্জ্জটী-পিনাকে,
একব্যাপী সত্বা মম রাজে।

৯

মণি রত্নে, ধূলিরেণু, বজ্রসার কঠিনে, কোমলে,
ধূপে, দীপে, প্রবালে বা স্বর্ণ রৌপ্য-অয়স-পিত্তলে,
কৌস্তুভ বা পারিজাত মাঝে,
শুদ্ধবুদ্ধে, শাস্ত্রচয়ে, স্নিগ্ধ রুদ্র বিশাল জ্যোতিতে,
একব্যাপী সত্বা মম রাজে।

১০

ধৃতিধ্যানে, অধ্যানে বা নিদিধ্যানে, যপে বা অযপে,
ভাবাভাবে, বিভাবে বা বামারামে, লোভে বা অলোভে,
অমৃত বা হলাহল মাঝে,
স্বর্গে, নর্কে, অনর্কে বা চেতাচেতে, বিচেতে, অখিলে,
একব্যাপী সত্বা মম রাজে।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

৩

শবদে, শবদাতীতে, রবিশশী নক্ষত্র কিরণে,
কামে, ক্রোধে, লোভে, মোহে, হিতাহিতে কিম্বা বিনোদনে,
হাস্যক্রীড়া কৌতুকের মাঝে,
সুপ্তি-স্বপ্ন-জাগরণে, স্নেহে, প্রেমে, সত্বরজতমে,
একব্যাপী সত্বা মম রাজে।

৪

শীতে, উষ্ণে, শুভাশুভে, ভবভয় গহন মাঝারে,
পুণ্যে, পাপে, রাগদ্বেষে, ঋতুরিপু বিরাগবিকারে,
কাল কিম্বা অকালের মাঝে,
সৌখ্যে, দুঃখে, শুদ্ধাশুদ্ধে, বুদ্ধিচিত্তে, মনোময় কোষে,
একব্যাপী স্বত্বা মম রাজে।

৫

দেবে, দৈত্যে, যক্ষে, রক্ষে, যতী-মুনি-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে,
যোগে, ভোগে, বিরাগে বা গুণাগুণে, গ্রহের ভিতরে,
বালো, জবা তাকণ্যের মাঝে,
বেদে, সাংখ্যে, ন্যায়ে, তর্কে, বুধকৃত মীমাংসা পুরাণে,
একব্যাপী সত্বা মম রাজে।

৬

জ্ঞানে, ধ্যানে, প্রমাণে বা অস্তি, নাস্তি, প্রকাশে, বিলয়ে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্ররূপে, কুলময়ে, অকুল ভিতরে,
বিশ্বরূপে, বিরূপের মাঝে,
মন্ত্রে, যন্ত্রে, অবাধে বা সর্ব্বতীর্থে, সুরেন্দ্রভবনে,
একব্যাপী সত্বা মম রাজে।

৭

ধর্ম্মে, কর্ম্মে, যজ্ঞ-যূপে, যপতপ নিয়ম আসনে,
স্নানে, দানে, বিধানে বা অহঙ্কারে, কর্ত্তার অন্তরে,
বিরচিতে, কৃতান্তের মাঝে,

কূর্ম্মে, কীটে, পশুপক্ষী পতঙ্গ বা সর্ব্বাত্ম ভিতরে,
একব্যাপী সত্বা মম রাজে।

৮

স্থূলে, সূক্ষ্মে, কারণে বা বিচলিত দৃঢ়মতিময়ে,
মূর্ত্তিরূপে, অমূর্ত্তিতে, মেঘ-ঝঞ্ঝা-দামিনী-দমকে,
সিদ্ধ-দেব পিশাচের মাঝে,
ধূর্ত্তে, দূষ্যে, বিচারকে, দৈত্যে, লিঙ্গে, ধূর্জ্জটী-পিনাকে,
একব্যাপী সত্বা মম রাজে।

৯

মণি রত্নে, ধূলিরেণু, বজ্রসার কঠিনে কোমলে,
ধূপে, দীপে, প্রবালে বা স্বর্ণ রৌপ্য-অয়স-পিত্তলে,
কৌস্তুভ বা পারিজাত মাঝে,
শুদ্ধবুদ্ধে, শাস্ত্রচয়ে, স্নিগ্ধ রুদ্র বিশাল জ্যোতিতে,
একব্যাপী সত্বা মম রাজে।

১০

ধৃতিধ্যানে, অধ্যানে বা নিদিধ্যানে, যপে বা অযপে,
ভাবাভাবে, বিভাবে বা রামারামে, লোভে বা অলোভে,
অমৃত বা হলাহল মাঝে,
স্বর্গে, নর্কে, অনর্কে বা চেতাচেতে, বিচেতে, অখিলে,
একব্যাপী সত্বা মম রাজে।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

চৈতন্য কথা।

অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ ও সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদ।

একজন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু আমাকে বলেন যে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ আমার প্রবন্ধে প্রস্ফুটিত হয় নাই। আর একজন বলেন আমার ভ্রম দ্বারা আমি ঐ মতকে বিকৃত করিয়াছি। কেহ কেহ বলেন আমি শঙ্করাচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাব দেখাইয়াছি। অনেকের ধারণা আমি শঙ্করাচার্য্যের মত বুঝিতে পারি নাই

অন্তর্যামী ভগবান্ জানেন, জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ ভাব নাই। অন্য অভিযোগগুলি সকলই সত্য হইতে পারে।

তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে শঙ্করাচার্য্যের মত সত্য কিনা, সে সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলি নাই। বলিবার অধিকারও নাই। ঈশ্বর, জগৎ ও জীব মায়ার কল্পনা কিনা, তাহা ঈশ্বরপ্রণোদিত বেদবাক্য দ্বারা জানিবার উপায় নাই। ঈশ্বর অজ ও অনাদি। জগৎ ও জীবের প্রবাহও অনাদি। সেই প্রবাহ যদি মায়াময় হয়, যদি সেই প্রবাহের ঈসিতা মায়াময় হয়, তাহার শাস্ত্রপ্রমাণ অসম্ভব। কারণ যেখানে "শাস্ত্রযোনি"র আসন টলমল করে, সেখানে শাস্ত্র কি করিতে পারে যদি সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মে বিবর্ত্ত মাত্র হয়, তাহাতে শাস্ত্রের হানি হইতে পারে, ঈশ্বরত্বের হানি হইতে পারে, কাল, কর্ম্ম, স্বভাবের হানি হইতে পারে কার্য্য কারণের অভাব হইতে পারে, ক্রমোদ্ভব ও ক্রমলয়ের কল্পনা তিরোহিত হইতে পারে, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, উপাসনার ত্রিপুটি নাশ হইতে পারে, তথাপি গুণের সম্পূর্ণ বিবর্ত্ত, জীব ও ঈশ্বরব্যাপী বিবর্ত্ত অসত্য, একথা কেহ বলিতে পারেনা।

অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের দোহাই দিয়াছেন, শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে তাঁহার একমাত্র বল যুক্তি। সে যুক্তি এই যে ঈশ্বর যদি মায়ার কল্পনা না হয়, তাহা হইলে মুক্তির অনবস্থা দোষ হয়। "মুক্তি" এই কথা কেবল মিথ্যা প্ররোচনা হয়।

জীব মরিলেই তাহার দেহ হইতে মুক্তি হয়। কিন্তু সে মুক্তি কোন্

কাজের মুক্তি? আবার কিছুকাল পরে পুনর্জন্ম হয়। আবার দেহের বন্ধন হয়।

স্বর্গকাম হইয়া যজ্ঞ করিলে, স্বর্গে অমর হয়। অমর হইয়া দেহবন্ধন বিমুক্ত জীব স্বর্গ ভোগ লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—

"অপাম সোম অমৃতা অভূম"

সে কেবল কথার কথা।

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ

যজ্ঞৈ বিষ্ট্বা স্বর্গাতিং প্রার্থয়ন্তে," কিন্তু

"গতাগতং কামকামা লভন্তে।"

আচ্ছা, সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম, নিষ্কাম কর্ম্ম করিলাম, ভগবানের উপাসনা করিলাম, ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম, এইবার ত মুক্তি লাভ করিলাম।

সে কি কথা? যতদিন ব্রহ্মার জীবন থাকিবে, ততদিন ব্রহ্মলোক থাকিবে। যখন ব্রহ্মার জীবনের অবসান হইবে, তখন তুমি ব্রহ্মাণ্ডগত প্রকৃতির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

যা গেল! ব্রহ্মাণ্ডগত প্রকৃতি আবার কি? আবার অন্যরূপ প্রকৃতি আছে? কেন শুদ্ধসত্ত্বময় প্রকৃতি। বৈকুণ্ঠে সকলই শুদ্ধসত্ত্বময়। সেখানে গেলে সত্য সত্যই মুক্তিলাভ। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।"

শাস্ত্রের কথা কে বিশ্বাস করিবে? এককালে স্বর্গ চরম ছিল। পরে মহর্লোক 'চতুর্থ' ও চরম হইল। পরে ব্রহ্মলোক চরম হইল। আবার "আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনঃ" হইয়া বৈকুণ্ঠলোক চরম হইল। শাস্ত্রের এ ধোঁকায় কে বিশ্বাস করিবে? ক্রম মুক্তির স্থিরতা নাই। ক্রম মুক্তির ভরসা নাই। শাস্ত্রের চরমতা নাই। শাস্ত্রের সকল সিদ্ধান্তই "অরুন্ধতী ন্যায়ের" সিদ্ধান্ত।

যদি মুক্তির এইরূপ অনবস্থা দোষ হয়, তাহা হইলে মুক্তির কেবল কল্পনা মাত্র। আর মুক্তি যদি কল্পনা না হইয়া সত্য হয়, তাহা হইলে

জগৎ, জীব ও ঈশ্বর কল্পনা মাত্র। এই যুক্তি দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদ Metaphysical necessity হইয়া পড়ে। এ যুক্তি কেহ খণ্ডন করিতে পারেন নাই। কাজে কাজে শঙ্করাচার্য্যের সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদ অসত্য একথা কেহ বলিতে পারেন না।

তবে উপনিষদে এই সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদ নাই, ব্যাসের উপনিষৎ-সমন্বয় রূপ-শারীরক সূত্রে এই অদ্বৈতবাদ নাই। একথা রামানুজস্বামী প্রতিপন্ন করিয়াছেন, একথা চৈতন্য মহাপ্রভুও বলিয়াছেন এবং আজকাল Thibaut সাহেবও সেই কথা বলিতেছেন।

শাস্ত্রে এ অদ্বৈতবাদের কথা বলে না, বেদে এ অদ্বৈতবাদের কথা বলে না। বেদ ও শারীরক সূত্র মোচড়াইয়া এরূপ অর্থ বাহির করা অনুচিত।

শঙ্করাচার্য্যের সহিত চৈতন্য দেবের এইমাত্র বিবাদ।

অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ উপনিষদে আছে, শারীরক সূত্রে আছে, পুরাণে আছে, এবং চৈতন্যদেবও সে অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত চৈতন্যদেবের মতে উপনিষৎ ও গীতার প্রামাণিক ভাষ্য। ভাগবত পুরাণেও এই অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদের কথা আছে।

আত্মমায়ামৃতে রাজন্
পরস্যানুভবাত্মনঃ।
ন ঘটেতার্থ সম্বন্ধঃ
স্বপ্নদ্রষ্টু রিবাঞ্জসা॥ ২।৯।১

অনুভবাত্মক পরমাত্মার মায়া ব্যতিরেকে অর্থের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। যতক্ষণ আমরা অনুভব করি, ততক্ষণ দ্বৈতের সহিত, সম্বন্ধ থাকে। যখন আমরা অনুভব না করি, তখনই সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়।

স্বপ্নাবস্থায় আমাদের স্থূল দেহের সহিত বা স্থূল পদার্থের সহিত সম্বন্ধ থাকে না। কারণ স্বপ্নাবস্থায় আমরা সূক্ষ্মদেহ ও সূক্ষ্মজগতের অনুভব করি। এইরূপ জাগ্রত অবস্থায়, আমরা স্বপ্নাত্মক পদার্থের অনুভব করি না।

যখন আমরা এই দেহের এককালীন অনুভব করিনা, তখন এই দেহের মৃত্যু হয়। তখন আমাদের নূতন অনুভবে দেহ মিথ্যা পদার্থ হয়।

ঈশ্বর জগতের অনুভব করিতেছেন বলিয়া জগতের প্রবাহ চলিয়া

যাইতেছে। ঈশ্বর প্রলয়ানুভবে মগ্ন হইলেই, জগতের নাশ হয়। অনুভবের তারতম্যে নৈমিত্তিক প্রলয় কিম্বা প্রাকৃতিক প্রলয় হয়।

জীবও ক্ষুদ্র ঈশ্বর। জীব যদি জগতের অনুভবকে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা একবারে স্থান না দেয়, তাহা হইলে, জগৎ তাহার পক্ষে মিথ্যা হইবে, সে অদ্বৈতানুভবে স্থিত হইবে, ইহার আর বিচিত্রতা কি?

"যদ্ বৈতন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি
নহি দ্রষ্টু র্দৃষ্টেবিপরিলোপো বিদ্যতে
বিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি
ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ॥"

বৃহদারণ্যক—৪—৩—২৩।

যখন অদ্বৈতানুভব হয়, তখন জীবন্মুক্ত পুরুষ দেখিয়াও দেখেন না। দৃশ্য বিষয় সম্মুখে থাকিলেও তিনি দেখেন না। দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তির লোপ হয় না। কিন্তু তাঁহার অনুভবে সকলই আত্মময়। সেই অদ্বৈতানুভবে কোন ভেদ থাকে না, কোন বিভাগ থাকে না, কোন দ্বিতীয় পদার্থ থাকে না, যাহার তিনি অনুভব করিতে পারেন।

ঈশ্বরেও এই শক্তির নাশ হয় না। এই শক্তির বলে অনুভব দ্বারা জগৎ আছে, অননুভব দ্বারা জগৎ নাই। এই শক্তিই মায়া শক্তি।

"যত্রান্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ"। বৃঃ আঃ ৪—৩—৩১।

যখন অন্য পদার্থের অনুভব হয়, তখন অন্য অন্যকে দেখে। যখন সকলই আত্মময় হয়, তখন

"সলিল একো দ্রষ্টাদ্বৈতো ভবতি।"

অনুভব সাপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব লইয়াই অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ। অনুভব করি না করি, জগৎ নাই, জীব নাই, ঈশ্বর নাই, এরূপ অদ্বৈতবাদের অবতারণা উপনিষদে নাই, ব্রহ্মসূত্রে নাই, শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রে নাই। এই সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদ ধর্ম্মের বিরোধী, কর্ম্মের বিরোধী, উপাসনার বিরোধী, ভক্তির বিরোধী। এই "অসৎশাস্ত্র মায়াবাদ খণ্ডন" করিবার জন্য পুরাণের উদ্যম, রামানুজাদি আচার্য্যের উদ্যম এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেরও উদ্যম। কিন্তু এ উদ্যম চৈতন্যদেবের অবান্তর উদ্যম। তাঁহার মুখ্য উদ্যমের

কথা পরে বলিব। সেই মুখ্য উদ্যম সাধনার্থই তাঁহার শঙ্করাচার্য্যের প্রতি কটাক্ষ।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথমে ধৃতি। ধৃতি অর্থে সন্তোষমিশ্রিত ধৈর্য্য।

"ধৃতিযোগসমুৎপন্নঃ প্রাজ্ঞঃ সংহৃষ্টমানসঃ।"

অতিশয় দৈন্য ও দুঃখের দশায় পড়িয়াও, তাহাতে ক্ষুভিত না হওয়া, এবং বিনা শোকে সেই অবস্থায় থাকার নাম ধৈর্য্য; এবং সেই অবস্থাকে আনন্দিত মনে আলিঙ্গন করার নাম সন্তোষ। সকল জীবেরই প্রতি জন্মে নিজ প্রাক্তন-কর্ম্মবশতঃ সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক আপনার সহিত জন্মে। জীব সগুণ; সর্ব্বদা নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে, আত্মা গুণশূন্য, প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌, তিনি সাক্ষী থাকিয়া কর্ম্মফল ভোগ করান। জীব নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ না করিলে কোনও কালে সেই ফল ক্ষয় হয় না। সেই জন্য নীতিশাস্ত্রবীৎ বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ, বিপৎকাল উপস্থিত হইলে, কখনও কাতর হন না। দুঃখ, শোক, এই সমস্ত আমাদিগের পূর্ব্বকৃত কুকর্ম্মের ফলে হইয়া থাকে; অতএব শোক দুঃখ আসিলে, সকলেরই ধৈর্য্য ধরিয়া সন্তোষ মনে তাহা সহ্য করা উচিত। সংসারে থাকিয়া যতই মানবের বিষয়প্রাপ্তি হইতে থাকে, ততই তাহার ভোগলালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, যতই তাহার তৃষ্ণা বাড়িতে থাকে ততই শান্তির অভাব বোধ বৃদ্ধি পায় আমরা কার্য্যক্ষেত্রে ভুলিয়া যাই যে, লাভ বা অলাভ পূর্ব্বকর্ম্মের দ্বারাই নিয়মিত হয়। শান্তি লাভ করিতে সন্তোষের সাধনা একান্ত প্রয়োজনীয়। সন্তোষের অভাবে লোভরূপী দৈত্য হৃদয়ে আস্তানা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়; এবং তাহার প্রভাবে চিত্ত চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়। এইরূপ চঞ্চল চিত্ত ঈশ্বর লাভের একান্ত অনুপোযোগী তৃষ্ণার ত্যাগ ও সন্তোষ অবলম্বনের দ্বারা আনন্দ প্রাপ্তি হয়।

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাং।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাং ॥

(সন্তোষরূপ অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত এবং শান্তচেতা পুরুষের যে সুখ বহুধন লোভী ইতস্ততঃ গমনশীল লোক তাহা কোথায় পাইবে)

পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে,—

(সন্তোষ হইতে অতি উত্তম সুখলাভ হয়।)

কুন্তিদেবী সন্তোষসাধনায় সক্ষম হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, ভগবানের নিকট কেবল দুঃখ চাহিয়াছিলেন। সাধন-পথাবলম্বীর সাংসারিক দুশ্চিন্তা সর্ব্বতোভাবে দূর করা কর্ত্তব্য। অভাব বোধ যতই কমিবে, মানবের ধৈর্য্যগুণ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, তাহার সাংসারিক দুশ্চিন্তাভার ততই হ্রাস হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভোগ লালসার বৃদ্ধির সহিত মানবের অশান্তি বাড়িতে থাকে। জগতে মানবের প্রকৃত অভাব অতি অল্প, কল্পিত অভাবই আমাদিগের সর্ব্বনাশ করে। আমার এইরূপ আহার আবশ্যক, এইরূপ সাজসজ্জা না হইলে লোকসমাজে বাহির হইব কি করিয়া ইত্যাদি রূপ চিন্তায় আমরা অস্থির হইয়া পড়ি। কোন একটা ভাল বিষয়ে মন ডুবাইতে শিখিলে অনেক দুশ্চিন্তা কমিয়া যায়। সাধুদিগের সংসর্গে থাকিয়া সৎকথার আলোচনায় ও ভগবৎ চিন্তায় সাংসারিক দুশ্চিন্তা অনেক হ্রাস হয়। অতএব সাধুসঙ্গ ও সৎবিষয়ে মনকে ডুবাইতে অভ্যাস করিবে। আপনার অপেক্ষা হীনতর অবস্থার লোকের দিকে লক্ষ্য থাকিলে মানব অনেক সময় আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা তাহা না করিয়া, আমাদিগের অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থার লোকের সুখসমৃদ্ধি দেখি বলিয়াই, আমাদিগের নিজের অবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট হই। সদ্ভাবশতকে কৃষ্ণ মজুমদারের কবিতাটী অতিশয় শিক্ষাপ্রদ।

"একদা ছিল না 'জুতো' চরণ যুগলে,
দহিল হৃদয়মন সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে,
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।

দেখি তথা একজন পদ নাহি তার,
অমনি জুতোর খেদ ঘুচিল আমার।"

ধনবানের কেবল সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করিলে, তোমার নিজ দুরবস্থার জন্য মনে যন্ত্রণার উদয় হইতে পারে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদ্যপি সেই লোকটাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে বিচার কর, তাহা হইলে দেখিবে তাহার এত দুঃখের কারণ আছে, যাহার কোনটিও তোমার নাই। তাহার ভাণ্ডার ধনধান্যে পূর্ণ, কিন্তু হয়ত তাহার স্বাস্থ্য ভাল নয়; হয়ত তাহার পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন তাহার মনোমত নয়; হয়ত কাহারও নিস্বার্থ-প্রেম সে উপভোগ কবিতে পায় না, হয়ত সে বিষয়ে এতদুর মগ্ন, যে ভগবৎচিন্তায় তুমি যে বিমল সুখ উপভোগ কর, তাহার কণামাত্রও সে কখনও আস্বাদ করিতে পারে নাই। তবে, কেন ভাই, তুমি নির্ধনী, সে সমৃদ্ধিশালী এই চিন্তা তোমার মনকে মলিন করে?

ভগবান যীশুখ্রীষ্ট কি সুন্দর শিক্ষা দিয়াছেন। "তোমরা তোমাদিগের প্রাণ ধারণের জন্য বৃথা চিন্তা করিও না। ব্যোমচারী পক্ষীদিগকে দেখ, তাহারা বীজ বুনে না, ফসল কাটে না, তথাপি, ভগবান তাহাদিগকে আহার করাইয়া থাকেন। পরিধেয় বসনের জন্য চিন্তিত আছ? স্থলপদ্মগুলিকে দেখ, তাহারা কেমন সাজিয়া আছে, সোলেমান বাদসার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ও তাহার সাজের সহিত তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু, পদ্ম কি তাহার সুবেশের জন্য শ্রম করে, না কাপড় বুনে? তাহাই বলিতেছি 'আমরা কি আহার করিব? কি পান করিব?' এইরূপ চিন্তা করিও না। তোমাদিগের স্বর্গীয় পিতা জানেন, তোমাদিগের এই সকল বিষয়ে প্রয়োজন আছে। তোমরা তাঁহার ধর্ম্মবিধানের অন্বেষণ কর; আহার্য্য, পরিধেয় সামগ্রী তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হইবে। অতএব কাল কি আহার করিবে, তাহার চিন্তা করিও না।"

শ্রীমদ্ভাগবৎ এই সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখা যাউক।

সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈ-
র্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিম্।

অতঃ কবির্ণামসু যাবদর্থঃ
স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায় বুদ্ধিঃ।
সিদ্ধেঽন্যথার্থে ন যতেত তত্র
পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাণঃ॥ ২য় স্কঃ, ২য় অঃ ৩ শ্লোঃ।
সত্যাঞ্জলৌ কিং পুরুধান্ন পাত্র্যা
দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ॥ ঐ ৪ শ্লোঃ।
চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্
রুদ্ধা-গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্‌ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥ ঐ ৫ শ্লোঃ।

(যাবন্মাত্র ভোগ্যবিষয়দ্বারা দেহধারণ করা যাইতে পারে, পণ্ডিত ব্যক্তি তাবন্মাত্রেই বিষয় ভোগ করেন, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হয়েন না; কেন না, তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে, তাহাতে সুখ নাই। আর যদি অন্য প্রকারে সেই দেহ-ধারণ-রূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে, কেবল পরিশ্রম-মাত্র জানিয়া, তাঁহারা বিষয় ভোগ চেষ্টাও করেন না। ভূমি থাকিতে শয্যায় আয়াস পাইবার প্রয়োজন কি? আপনার নিজ বাহুদ্বয় থাকিতে উপাধানের আবশ্যকতা কি? অঞ্জলি থাকিতে বিবিধ ভোজন পাত্রের জন্যই বা কেন ব্যস্ত হইতে হইবে? দিক এবং বল্কলাদি থাকিতেই বা পট্টবস্ত্রাদির নিমিত্ত প্রয়াস কেন? পথে কি চীরখণ্ড পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষ সকল পরের ভোগের নিমিত্তই ফল প্রসব করিয়া থাকে; অতএব তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিলে, তাহারা কি ভিক্ষাদান করে না? নদী সকল কি শুষ্ক হইয়াছে? গিরির গুহা সকল কি কেহ রোধ করিয়াছে? হরি কি ভক্ত ব্যক্তিদিগকে আর রক্ষা করেন না? তবে পণ্ডিতগণ কি কারণে ধনমদে অন্ধপ্রায় ধনীদিগের উপাসনা করিবেন?)

আচার্য্য শ্রীধর স্বামী এই শ্লোক ব্যাখ্যায় শাস্ত্র হইতে লিখিতেছেন,—

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে॥

সন্তোষই সর্ব্বসুখের মূলীভূত কারণ। সর্প বায়ুপান করিয়া জীবিত থাকে, তাহাতে বাস্তবিক সে কি দুর্ব্বল হয়? বন্য হস্তী শুষ্ক তৃণ খাইয়া জীবন ধারণ করে, কিন্তু তাহার অপেক্ষা অধিকতর বলশালী আর কে আছে? ঋষিরা ফলমূলাহারে যে জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা আমাদিগের মত বিলাস-ভোজন করেন না, তাহাতে কি তাঁহাদিগের চিন্তা-শক্তি কমিয়া যায়?

সর্পাঃ পিবন্তি পবনং নচদুর্ব্বলাস্তে শুষ্কৈ স্তৃণৈর্বনগজা বলিনো ভবন্তি।
কন্দৈঃ ফলৈর্মু নিবরা গময়ন্তি কালং সন্তোষ এব পুরুষস্য পরং নিধানং॥

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অভাব বোধই দুঃখের কারণ, অভাব বোধ না থাকিলে আত্মার পূর্ণতা অনুভব হয়, ইহাকেই আত্মারাম বলে। যযাতি রাজা বৃদ্ধাবস্থায়ও ভোগ তৃষ্ণা দূর করিতে পারেন নাই বলিয়াই নিজ পুত্রের যৌবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও যখন তাঁহার ভোগ তৃষ্ণা দূর হইল না বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন পুত্রের যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন,

"যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভি র্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতাম্।
তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে॥"

(পামরগণ যে তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারে না, বৃদ্ধ হইলেও যাহা ক্ষীণ হয় না, পণ্ডিতগণ সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখে কাল অতিবাহিত করেন।)

যখন ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির আত্মীয়বিরহে কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতামহ, ধনক্ষয় অথবা স্ত্রী পুত্র ও পিতার মৃত্যুতে কোন্ বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক শোক হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়?" ভীষ্ম উত্তর করিয়াছিলেন, "অর্থনাশ, পিতৃমাতৃবিয়োগ ও পুত্র কলত্রের মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি নিতান্ত কাতর হয়, শমগুণাদি অবলম্বন করিয়া তাহার শোক নিবারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।" বিষয় সমুদায়ের মধ্যে যাহাতে মমতা জন্মে, তাহাই পরিতাপের কারণ হইয়া উঠে; আর যাহা যাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, সেই সকল হইতেই সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যচ্চ কামসুখংলোকে যচ্চদিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

(সন্তোষ হইতে নিরতিশয় আনন্দলাভ হয়। কাম অর্থাৎ লৌকিক বিষয় জনিত যে সমস্ত সুখ এবং দিব্য অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্র হইতে লব্ধ যে সমস্ত সুখ ইহার কোনটীই তৃষ্ণাক্ষয় সুখের ষোডশভাগের এক ভাগেরও তুল্য নয়)।

মহাভারতের পিঙ্গলানামক বেশ্যার উপাখ্যানে এই শিক্ষা অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। একদা ঐ বেশ্যা সঙ্কেতস্থানে স্বীয় প্রিয়তম কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল। সেই মহাক্লেশের সময় তাহার শান্তবুদ্ধি উপস্থিত হইল। এখন সে ক্ষোভ করিয়া কহিতে লাগিল, হায়। যে সর্ব্বান্তর্যামী নির্ব্বিকার পুরুষ আমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন, আমি এতদিন কামাদির দ্বারা তাহা সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি ; একদিনও হৃদয়ানন্দকর পরমাত্মার শরণাপন্ন হই নাই। এক্ষণে আমার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, আর আমি বাসনার দ্বারা চালিত হইব না। আশাবিহীন মহাত্মারাই স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করে। এইরূপ চিন্তার দ্বারা পিঙ্গলা আশার উচ্ছেদ করিয়া পরম সুখের আস্বাদ লাভ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় ধর্ম্ম ক্ষমা।

সত্যপি সামর্থ্যে অপকার সহনং ক্ষমা।

কেহ অপকার করিলে, অপকারের প্রতিশোধ দিবার ক্ষমতা সত্বেও তাহা না দেওয়ার নাম ক্ষমা। কেহ তোমার অনিষ্ট করিল, কিন্তু তাহার অনিষ্ট করিতে তোমার শক্তি নাই বলিয়া তুমি তাহা করিলে না, ইহাতে তাহাকে তোমার ক্ষমা করা হইল না। কেহ যদ্যপি তোমায় দ্বেষ করে, এবং তাহার বিনিময়ে তুমিও যদ্যপি তাহাকে দ্বেষ করিতে থাক, তাহা হইলে উভয়ের দ্বেষ মিলিত হইয়া পুষ্ট হইতে থাকে, এবং তাহার প্রভাবে উভয়ের, এবং এমনকি অপরেরও অনিষ্ট হইতে থাকে ; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তুমি যদ্যপি তাহাকে ক্ষমা করিতে, তাহা হইলে তাহার দ্বেষের অপকার করিবার শক্তির হ্রাস হইত এবং তাহার দ্বেষের বিনিময়ে তুমি যদ্যপি তাহার প্রতি প্রেমবান

হইতে পারিতে, তাহা হইলে ভালবাসার কোমল স্পর্শে তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইত। পূর্ব্বজন্মের কোনও কুকর্ম্মের ফলে আমাদিগের পরস্পরের প্রতি দ্বেষ বা ঘৃণা স্বতঃই জাগিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু, দ্বেষ বা ঘৃণা মানবের উন্নতির পথের অন্তরায়। সকলেই আমরা ভগবানের অংশ। এখন যাহা পৃথক পৃথক মনে হইতেছে, পরে তাহা আবার তাঁহাতে যাইয়া যুক্ত হইবে। এই পৃথক ভাব নাশ করাই যদ্যপি মানবের চরম লক্ষ্য হয় তাহা হইলে ঘৃণা ও দ্বেষ পোষণ করা অতীব অন্যায়। এই সংসারক্ষেত্রে আমরা যে একত্রে আসিয়াছি—রাজা, প্রজা, শত্রু, মিত্রভাবে পরস্পর যে সংমিলিত হইয়াছি, তাহার কি কোনও উদ্দেশ্য নাই ? আমরা যে পূর্ব্বজন্মের ঋণবন্ধনে পরস্পর জড়িত হইয়াছিলাম, তাহারই পরিশোধের সুযোগ হইয়াছে মাত্র। অতএব ঘৃণা বা দ্বেষের ভাব বর্দ্ধন না করিয়া শত্রুর যে গুণগুলি ভাল আছে তাহারই চিন্তা করা উচিত। একজন সাধক লিখিয়াছেন, "Hatred is an attribute of the physical spheres, a direct outcome of their peculiar constitution. He who desires to escape from physical life can only do so by passing through the School of love ; *there is no other way* ... Those to whom Four tenderness is given will taste the sweetness of divine life, will witness the majesty of resurrection, will themselves become aware of the power of the unseen. Thus, in saving your own soul you will help to save the soul of the world, and will take upon yourself the work of the divine spirit, the creative and saving force of life (ধর্ম্ম)। * ভগবান যীশু বলিয়াছেন, "I judge no man"—আমি কাহাকেও বিচার করি না। তিনি কাহার বিচার করিবেন ? তাঁহারত ভেদজ্ঞান ছিল না , শত্রু, মিত্র, পাপী, পুণ্যবান তাঁহার নিকট সকলেই অভেদ, তিনি নিজ হইতে সকলকে অপৃথক্ দেখিতেন। মহামতী বেসান্ত লিখিয়াছেন,—"To catch a glimpse of the beauty of that high conception, the greatness of the unity in which 'I' and 'mine', 'you'

* Mabel Collin's "Green Leaves", Chapter III.

and 'yours', have vanishad, in which we are all one life, even to do that lifts the whole nature towards divinity, and those who can even *see that unity is fair*, they are the nearer to the realisation of the Beauty that is God." †

ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

অতিবাদং স্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
নচেমং দেহমাশৃত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥
মনু—৬ অঃ ৪৭।
ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ ॥ ঐ ৪৮।

(দুরুক্তি বা অপমান-জনক বাক্য সকল সহ্য করিয়া থাকিবে, কাহাকেও অপমান দ্বারা পরিভব করিবে না ; এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না। কেহ ক্রোধ করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবে না; কেহ অক্রোধের কথা কহিলে তাহার প্রতি কুশল বাক্য প্রয়োগ করিবে।)

সকল সাধক ও ভক্ত সেই একই শিক্ষা দিয়াছেন। মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন, "জো তোম্‌কো কাঁটা বুবে, তাহি কেয় তুম্ ফুল।"

মহাভারতে আছে

আক্রুশ্যমানো ন বদামি কিঞ্চিৎ
ক্ষমাম্যহং তাড্যমানশ্চ নিত্যং।
শ্রেষ্ঠং হ্যেতৎস্বৎ ক্ষমামাহুরার্য্যাঃ
সত্যং তথৈবার্জ্জবমানৃশংসাম্ ॥

(কেহ গালি দিলেও কোন উত্তর দিই না, প্রতিদিন তাড়িত হইয়াও ক্ষমা করিয়া থাকি ; আর্য্যলোক ক্ষমাকে শ্রেষ্ঠ কহে, আর সত্যকে, কোমলতাকে এবং দয়ালুতাকে।)

পূর্ব্বে যে তুলাধার-জাজলি সংবাদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেই আছে,—মহাত্মা তুলাধার জাজলিকে বলিতেছেন,—

† Mrs. Besant's "Introduction to Yoga", page 135

যো হন্যাদ্যশ্চ মাং স্তৌতি তত্রাপি শৃণু জাজলে।
সমৌতাবপি মেস্যাতাং নহি মেহস্তি প্রিয়াহপ্রিয়ং॥

ব্রহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, তাঁহার কি কি গুণে ভূষিত থাকা উচিত, মহাভারত তাহার উল্লেখ করিতেছেন—

যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
নক্রুধ্যেন্ন প্রহৃষ্যেচ্চ মানিতোহমানিতশ্চ যঃ।
সর্ব্বভূতেষভয়দস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

(যিনি সদা সত্য কথা বলেন, গুরুলোককে সন্তুষ্ট রাখেন, কেহ অনিষ্ট করিলে, তাহার প্রতি অনিষ্টাচরণ করেন না; যিনি অপমানিত হইলেও ক্রুদ্ধ হন না, সম্মানিত হইলেও অতি প্রফুল্লিত হন না; যিনি সর্ব্বভূতে অভয় দান করেন, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলেন।)

মানবকে তাহার চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে, যে উদ্দেশ্যে ধর্ম্মের নির্দ্দেশ সেই মহাপূর্ণতা উপলব্ধি করিতে হইলে, তাহার ক্ষমার সাধনা একান্ত প্রয়োজনীয়। ক্ষমারূপ পাথেয় সংগৃহীত না থাকিলে সেই মহাতীর্থে প্রবেশ লাভ করিবার প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই যে সংসারক্ষেত্রে আসিয়া মানবের অনন্তকালব্যাপী কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম, তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহা কি, কখনও ভাবিয়াছ? যে দুরারুহ সাধন-শৃঙ্গে উঠিতে যত্ন করিতেছে, তাহা কি পাইবার জন্য, তাহাও কি কখনও চিন্তা করিয়াছ? তাহা "আমি," "আমার," "তুমি," "তোমার," ইত্যাদি ভাব ডুবাইয়া দিয়া একত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য। মহাবিদ্যাভাব হৃদয়ে না ফুটিলে সে অবস্থায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। মহাবিদ্যাভাব কি তাহা কি বুঝিয়াছ? মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবতাদিগের স্তোত্রে এই ভাব কেমন ফুটিয়াছে দেখুন—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ॥
নমস্তস্যৈ॥
নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ ॥
নমস্তস্যৈ ॥
নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
"ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ ॥"

তবে পাপীর প্রতি বিরাগ ও পাপের প্রতি বিদ্বেষভাব সাধনমার্গের এক অবস্থায় প্রয়োজন। পাপে ঔদাসীন্য—এটা প্রশংসাই নয়; ঔদাসীন্য একটা তামসিক বৃত্তি। তাহাই ক্ষমার সাধনা আরও আবশ্যক। ক্ষমার সাধনায় বিদ্বেষভাবের অপকার করিবার ক্ষমতার লাঘব হয়। ক্ষমাগুণ প্রকট হইলে পাপী বা পাপের দিকে তত লক্ষ্য থাকে না। পাপী বা পাপ শিক্ষা যাহাতে জগৎকে বিপথগামী না করিতে পারে, বিদ্বেষভাব তৎনিবারণচেষ্টায় পরিণত হয়। কেবল বিদ্বেষভাব পরিপোষণে জগতের অনিষ্ট সাধিত হয়। যেমন একদিকে তুমি ঐরূপ করিতে থাকিবে অপরদিকে আবার একদল পাপীর কার্য্যকলাপ ও পাপশিক্ষা রঞ্জিত করিয়া জগতে প্রচার করিতে থাকিবে। এটা প্রকৃতির নিয়ম। ইহাতে নিজের অধোগতি হয়, ও সেই সঙ্গে জগতের অনিষ্ট হয়। ধর্ম্ম ও নীতির দ্বারাই ক্ষুদ্র মানব আমিত্ব-মোহ কতকটা দূর করিতে পারে। তাহাই ধর্ম্ম ও নীতির শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা; তাহাই পাপ শিক্ষা দূর করিবার চেষ্টার আবশ্যকতা। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাব লইয়া কলহ ও দ্বন্দ্ব করিলে কিছুই হইবে না। শ্রদ্ধাস্পদ রাজেন্দ্র বাবু যথার্থই লিখিয়াছেন, "ঐশীশক্তি সর্ব্বব্যাপিনী, পাপী ও পুণ্যাত্মা সকল প্রকার জীবকেই ধারণ করিয়া রহিয়াছে। চোর যে হস্ত দিয়া পরস্বাপহরণ করে তাহার মধ্যেও ঐ শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়। কিন্তু তাহা দেখিতে গেলে ক্রিয়া বা ব্যক্তির বিশিষ্টভাব বা বিশিষ্টতা বাচক মাণ ভুলিয়া যাওয়া চাই।" সাধন পথের প্রথমেই ক্ষমাগুণের অনুশীলন আরম্ভ হইলে তবে পরে এই ভাব আসিতে পারে। প্রথমেই এই সাধনা না আরম্ভ করিলে পরে তাহা করা অতিশয় দুরূহ।　　　(ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আমি ও আমার দেহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহর্লোক। বিজ্ঞানময় কোষ।

আমাদের শাস্ত্রে 'ভূ ভুর্বঃ স্ব' এই ত্রি-লোকের কথাই অধিক শুনিতে পাওয়া যায়, সপ্ত-লোকের উল্লেখ অপেক্ষাকৃত বিরল। ইহার কারণ এই যে, সাধারণ মানবের কেবল এই তিন লোকের সহিতই সম্পর্ক, অন্য উচ্চতর লোকের সহিত এখনও তাহার বড় একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। গতবারে বলিয়াছি, সাধারণ সাধকের গতি 'ধূমযান' বা 'পিতৃযান' পথে। 'দক্ষিণ মার্গ' ও 'কৃষ্ণ পথ' এই পথেরই নামান্তর। এই পথ আবর্ত্তরূপী, চক্রাকার—ভূর্লোক হইতে স্বর্লোক পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় ভূর্লোকের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছে। ভূর্লোক হইতে ভুবর্লোক, তাহার পর আপন আপন পুণ্যানুসারে কিয়ৎকাল স্বর্গভোগ করিয়া পুনরায় সেই পুরাতন পথে মর্ত্তে প্রত্যাগমন—ইহাই হইল দক্ষিণমার্গীর পরিণাম। "চোখঢাকা কলুর বলদে"র মত পুনঃ পুনঃ এই একই পথে যাতায়াত ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর নাই।

"ধূমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥"

গীতা ৮।২৫।

"ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয়মাস—ইহাতে গমন করিলে যোগী চন্দ্রলোক * প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন।"

উপনিষদেও এই কথা দেখিতে পাওয়া যায়—

"তস্মিন্যাবৎসংপাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুন র্নিবর্ত্তন্তে"—

ছান্দোগ্য ৪।১০।৫।

দক্ষিণমার্গী চন্দ্রলোকে কর্ম্মক্ষয় অবধি বাস করিয়া যে পথে আকাশে আগমন করিয়াছিলেন সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

---

* গতবারে বলিয়াছি 'চন্দ্রলোক' স্বর্লোকেরই অংশ বিশেষের নাম।

পক্ষান্তরে যাঁহারা "দেবযান" "উত্তরমার্গ" বা "শুক্লপথে" গমন করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন এবং সেখান হইতে আর তাঁহাদিগকে ফিরিতে হয় না।

"অগ্নি র্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥"

গীতা ৮।২৪।

"অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস, ইহাতে যে সকল ব্রহ্মবিদ্ প্রয়াণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন।"

"শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥"

গীতা ৮।২৬।

"শুক্ল ও কৃষ্ণ,—জগতের এই চিরন্তন দুই গতি; একটি দিয়া গিয়া আর ফিরিয়া আইসে না, আর একটি দিয়া ফিরিয়া আইসে।" উপনিষদও এই কথার সমর্থন করিয়াছেন।

শুক্ল পথে বিচরণ করিতে হইলে কামনা বর্জ্জন করিতে হয়—কামনার ভার লইয়া সে পথে চলা যায় না। সকাম কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলাভ ঘটিতে পারে বটে কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই শেষ—তাহার উপরে আর যাওয়া ঘটে না, ঐখান হইতেই ফিরিতে হয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥"

গীতা ৯ অঃ ২০।২১।

"বেদত্রয় বিহিত কর্ম্মপরায়ণ জনগণ যজ্ঞ সকল দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া যজ্ঞশেষে সোমরস পান করেন এবং তদ্দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন। ঐ সকল ব্যক্তি পুণ্যফল রূপ ইন্দ্রলোক (স্বর্লোকের অংশ বিশেষ) প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উত্তম দেবভোগ সকল ভোগ করেন। কিন্তু তাঁহারা সেই

বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার মর্ত্তলোকে প্রবেশ করেন; এইরূপে বেদত্রয়বিহিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া কামনা-পরবশ হওয়ায় সংসারে গতায়াত করিয়া থাকেন।"

স্বর্লোকের উর্দ্ধে সকামব্যক্তির স্থান নাই। স্বর্লোকের পর মহর্লোক। এই লোকে যে দেহ লইয়া কার্য্য করা যায় তাহা কামনা বর্জ্জিত বিশুদ্ধ চিন্তার আধার। বৈদান্তিকগণ এই দেহের নাম দিয়াছেন "বিজ্ঞানময় কোষ"। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়—এই তিনটী কোষ লইয়া আমাদের "সূক্ষ্ম-দেহ" গঠিত। বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষই সূক্ষ্মতম।

আমরা সাধারণতঃ সাকার বস্তুর বিষয় চিন্তা করিয়া থাকি। কোন প্রকার আকার বা রূপ অবলম্বন করিয়াই আমাদের চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়। মনোময় কোষ এই 'রূপে'র গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে না। কোন বৃক্ষ বা চক্রের বিষয় আমরা সহজেই চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু বৃক্ষ বা চক্র ছাড়িয়া দিয়া কেবল 'বৃক্ষত্ব' বা 'চক্রত্ব' বিষয় ভাবনা করা আমাদের পক্ষে বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাস্তবিক নিরাকার বা অরূপ বিষয়ের চিন্তা করা মনোময় কোষের অসাধ্য। নিরালম্ব (abstract) চিন্তা করিতে হইলে বিজ্ঞানময় কোষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যিনি এরূপ চিন্তা করিতে পারেন, বুঝিতে হইবে তাঁহার বিজ্ঞানময় কোষের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। গভীর চিন্তাশীল শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ এই শ্রেণীভুক্ত। বলিতে গেলে তাঁহারাই যথার্থে "বৈজ্ঞানিক"। "বিজ্ঞান" শব্দে আমরা এখন স্থূল আকারের জ্ঞানই বুঝি, কিন্তু নানাবিধ স্থূল জ্ঞানের সমন্বয় করিয়া যে সূক্ষ্ম জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়—যাহা দর্শনের উপপাদ্য বিষয়—তাহাই বস্তুতঃ "বিজ্ঞান" বা বিশেষ জ্ঞান। এই বিজ্ঞানের আধার বলিয়াই "বিজ্ঞানময় কোষের" এরূপ নামকরণ হইয়াছে।

সাধনার প্রণালী সম্বন্ধে ভাগবত বলিয়াছেন, "ধারণার অভ্যাসার্থ প্রথমতঃ ভগবানের মূর্ত্তির এক এক অবয়ব চিন্তা করিয়া দৃঢ়তা সহকারে সমস্ত মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির করিতে হইবে।" পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা এ কথার উল্লেখ করিয়াছি। তাহার পর ভাগবত বলিতেছেন, "পরে মন হইতে ভগবানের মূর্ত্তিও পরিহার করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না।" (২।১।১৯)

এই শেষোক্ত ব্যাপার বিজ্ঞানময় কোষের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ভাগবতের কথার অর্থ এই যে, প্রথমে 'মূর্ত্তি' চিন্তা করিয়া মনোময় কোষের সম্যক বিকাশ সাধন করিবে, তাহার পর 'মূর্ত্তি' ছাড়িয়া দিয়া নিরালম্ব চিন্তা দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষের বিকাশ সাধনের চেষ্টা করিবে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে 'অধিকারী' ভেদে সাকার ও নিরাকার উভয়বিধ উপাসনারই ব্যবস্থা দেখা যায়। সাকার উপাসনা নিরাকার উপাসনারই প্রথম সোপান। কিন্তু এ সোপানে পদার্পণ না করিয়া একেবারে পরবর্ত্তী সোপানে আরোহণের চেষ্টা করিলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

সাকার ও নিরাকার উপাসনার কথা প্রসঙ্গে একটী গল্প মনে পড়িল। অনেক বৎসরের কথা হইল একবার পূজার সময় এই কলিকাতা সহরের কোন সুপ্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে তদানীন্তন কালের বড় লাট সাহেব নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন। তিনি আসিয়াই ঠাকুর দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পূজার দালানের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। লাট সাহেব ঠাকুর দেখিলেন। তাহার পর তিনি গৃহস্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি যদি রাগ না করেন, তাহা হইলে একটী কথা আপনাকে বলিব।" গৃহস্বামী বলিলেন, "আপনি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন।" সাহেব বলিলেন, "আপনার ন্যায় বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের কি এই পুতুল পূজা করা সাজে? পুতুল ত ছেলেদের খেলা করিবার জিনিষ।" গৃহস্বামী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন, পুতুল ছেলেদের খেলা করিবার জিনিষই বটে, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে কি আমরা এখনও শিশু মাত্র নই?" এই উত্তরে লাট সাহেবের মনের ভাব কি হইয়াছিল জানি না, কিন্তু বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখিলে অনেকেই ইহার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ভগবান পতঞ্জলি বলেন, "ধ্যান পরিপক্ক হইয়া ধ্যেয়াকারে পরিণত হইলে যে অবস্থা হয় তাহাকে সমাধি বলে। এই সমাধি দুই প্রকার; সবীজ বা সংপ্রজ্ঞাত এবং নির্ব্বীজ বা অসংপ্রজ্ঞাত। সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বস্তু সম্যকরূপে প্রজ্ঞাত হয়। কিন্তু অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না।" পাতঞ্জলদর্শনের এই উক্তি দ্বারা

ভাগবতের উপরে উদ্ধৃত বাক্য সমর্থিত হইতেছে। সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে 'মূর্ত্তি' থাকে, অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে 'মূর্ত্তি' তিরোহিত হইয়া যায়। সংপ্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থায় যোগী সর্ব্বোচ্চ 'রূপ'রাজ্যে বাস করেন, অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থায় তিনি 'রূপ' রাজ্য ছাড়াইয়া 'অরূপ' রাজ্যে উপস্থিত হন। প্রথম অবস্থায় 'স্বর্লোকে' অবস্থিতি, দ্বিতীয় অবস্থায় 'মহর্লোকে'। প্রথমে 'মনোময় কোষের' সম্যক অভিব্যক্তি, তাহার পর 'বিজ্ঞানময় কোষের' বিকাশ।

নিষ্কাম চিন্তা দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষের পুষ্টি সাধন হয়। কিন্তু রূপের ফাঁদ ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে না পারিলে নিষ্কাম চিন্তা দূর করা দুষ্কর। রূপই কামনার জনক। এটা ছোট ওটা বড়, এটা কদাকার ওটা সুন্দর—এই জ্ঞানই আমাদিগের মনে নানা কামনা জাগাইয়া দেয়। তাহার ফলে ক্রোধ মোহ ইত্যাদি জন্মে (গীতা ২ অঃ ৬২.৬৩)। রাগ দ্বেষাদি বর্ত্তমানে নিষ্কাম চিন্তা মনে স্থান পায় না। যাহার উপর অনুরাগ তাহার উন্নতি ও যাহার উপর দ্বেষ তাহার বিনাশ সাধন করিতে মন স্বতই ছুটিয়া যায়। সুতরাং বিজ্ঞানময় কোষের বিকাশ করিতে হইলে 'আকার' ভুলিতে হইবে। আত্মপর বিস্মৃত হইয়া সুন্দর কুৎসিৎ নির্ব্বিশেষে সেবা করাই এ সাধনা সোপানের প্রথম পীঠ। এরূপ সেবাব্রতধারী মহাপুরুষের বিজ্ঞানময়কোষ ক্রমশই অধিকতর দীপ্তিশালী হইয়া চতুর্দ্দিকে মনোহর আভা বিকীরণ করিতে থাকে।

পক্ষান্তরে যাঁহারা প্রভূত চেষ্টায় মনোময় কোষের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া অসাধারণ মানসিক শক্তি অর্জ্জন করেন, কিন্তু অবশেষে সেই শক্তি পরহিতার্থে প্রয়োগ না করিয়া অহংকারের বশীভূত হইয়া নীচ স্বার্থ সাধনে নিয়োজিত করেন, তাঁহাদের বিজ্ঞানময় কোষ ক্রমশঃ ঘোর কালিমায় রঞ্জিত হয়। ইঁহারাই আমাদের পুরাণোক্ত 'দৈত্য' 'দানব' ইত্যাদি। ব্রাহ্মণসন্তান রাবণ বহু বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া যে দেববিজয়ী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা যদি জগতের কার্য্যে ব্যয় করিতেন তাহা হইলে তিনি ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার মতি বিপরীত দিকে ছুটিল—ফলে তিনি ঘোর রাক্ষসে পরিণত হইলেন। অমরত্ব করায়ত্ত

করিয়াও বুদ্ধির দোষে সকলই হারাইলেন। অজ্ঞতা অপেক্ষা' জ্ঞানের অপব্যবহারের ফল অনেক অধিক ভয়ানক। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "অজ্ঞ পাপী অপেক্ষা বিদ্বান অথচ স্বার্থান্ধ 'ফরিসী' (উৎকট নিষ্ঠাবান য়ীহুদী সম্প্রদায় বিশেষ) ভগবানের নিকট হইতে অধিকতর দূরে অবস্থান করে।"

অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষের তুলনায় বিজ্ঞানময় কোষ নিত্য। ইহলোকে আমাদের পরমায়ু ফুরাইলে আমাদের অন্নময় ও প্রাণময় কোষ ধ্বংস হয় এবং আমরা আমাদের মনোময় কোষ লইয়া ভুবর্লোকে গমন করি। তথায় ভোগকাল গত হইলে মনোময় কোষের স্থূলতর অংশ (অর্থাৎ কামময় কোষ) ঝরিয়া পড়ে এবং আমরা উহার সূক্ষ্মতর অংশ লইয়া স্বর্লোকে গমন করি। সেখানে অবস্থিতির কালপূর্ণ হইলে মনোময় কোষের এই সূক্ষ্মতর অংশও বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই রূপে একে একে অন্নময়, প্রাণময়, কামময় ও মনোময় দেহ নাশপ্রাপ্ত হইলেও বিজ্ঞানময় কোষ নষ্ট হয় না। স্বর্গসুখ ভোগের পর যখন আমরা পুনরায় মর্ত্তে ফিরিয়া আসি, তখন আমরা স্বর্লোক ও ভুবর্লোক হইতে নূতন মনোময় কোষ সংগ্রহ করিয়া আনি এবং ভূর্লোক হইতে নূতন প্রাণময় ও অন্নময় কোষ প্রাপ্ত হই, কিন্তু যে পুরাতন বিজ্ঞানময় কোষ লইয়া উপরে গিয়াছিলাম, তাহা তখন ও বর্ত্তমান থাকে। প্রতি জন্মে আমাদের অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষ নবীভূত হয়, কিন্তু একই বিজ্ঞানময় কোষে লইয়া আমাদের জন্মের পর জন্ম কাটিয়া যায়। এই হিসাবে অন্নময়াদি কোষকে আমাদের বস্ত্রের সহিত ও বিজ্ঞানময় কোষকে আমাদের দেহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। আমাদের স্থূলদেহ অনিত্য হইলেও আমাদের বস্ত্রের তুলনায় তাহা নিত্য। আমরা বস্ত্র প্রায়ই পরিবর্ত্তন করি, কিন্তু এক দেহ মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকে। সেইরূপ এক কল্পের মধ্যে আমাদের অন্নময়াদি কোষ অনেকবার নূতন হয়, কিন্তু এক বিজ্ঞানময় কোষ কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী। দেহ যেমন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হয়, বিজ্ঞানময় কোষও সেই রূপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু একবার বাড়িলে আর সাধারণতঃ ছোট হইয়া যায় না।

আমরা যে সকল নীচ বাসনার দ্বারা কামময় দেহের পুষ্টি সাধন করি, কামময় দেহের ধ্বংস হইলেও তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। সংস্কার

বা সূক্ষ্ম-বীজরূপে সেগুলি উচ্চতর মনোময় কোষে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মনোময় কোষ বিনষ্ট হইলে বিজ্ঞানময় কোষের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর বাসনার বীজ উচ্চতর লোকে ক্ষেত্রাভাবে ফুটিতে পারে না, মৃতবৎ এক কোণে পড়িয়া থাকে। কিন্তু মানব যখন মর্ত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে তখন সে গুলির জীবনী শক্তি পুনরায় বিকাশ পায়। উচ্চতর প্রবৃত্তিগুলি স্বর্লোক হইতে ও নিম্নতর প্রবৃত্তি সমূহ ভুবর্লোক হইতে স্বপ্রকৃতি অনুযায়ী উপাদান সংগ্রহ করিয়া যথা ক্রমে নূতন মনোময় ও কামময় দেহ সৃষ্টি করে। সুতরাং বিজ্ঞানময় কোষস্থিত সংস্কাররূপী বীজগণ হইতেই নূতন মানব সৃষ্ট হয় বলিতে হইবে। এইরূপে জন্মের পর জন্ম বিজ্ঞানময় কোষকে আশ্রয় করিয়া হয় বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে 'কারণ দেহ' এই নাম দিয়াছেন। * আমাদের সকল জন্ম এই এক সূত্রে গ্রথিত, সুতরাং বিজ্ঞানময় কোষে প্রতিবিম্বিত আত্মা "সূত্রাত্মা" নামে অভিহিত হয়।

একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক। বিজ্ঞানময় কোষ উপরি উক্ত সংস্কার গুলির আধারমাত্র। তাহাদের দ্বারা উহার নিজের কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয় না। বরং সময়ে সময়ে উহাতে কলঙ্ক ধরিয়া উহার অনিষ্ট হয়। যাহারা সুধু নীচ কামনা করিয়া ক্ষান্ত হয় না, অধিকন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করে, তাহাদের বিজ্ঞানময় কোষ ক্রমশঃ মলিন হইতে থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞানময় কোষের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে নিষ্কাম কামনা, নিষ্কাম কর্ম্মের প্রয়োজন। আমাদের এক একটী নিষ্কাম চিন্তা আমাদের বিজ্ঞানময় কোষরূপী পরিচ্ছদের এক একটী হেম সূত্র। আমরা যতই এই সূত্র সংযোগ করিতে পারিব, ততই আমাদের পরিচ্ছদের ঔজ্জ্বল্যে দিগ্‌দিগন্ত প্রভান্বিত হইতে থাকিবে।

---

* এই স্থলে একটু বক্তব্য আছে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা দেহগুলিকে 'স্থূল' 'সূক্ষ্ম' ও 'কারণ' এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। সে বিভাগ অনুসারে 'কারণ শরীর' অর্থে আনন্দময় কোষকে বুঝায়, বিজ্ঞানময় কোষকে বুঝায় না। উপরেই বলিয়াছি, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ 'সূক্ষ্ম শরীরের' অন্তর্গত। 'স্থূল শরীর' অন্নময় কোষেরই নামান্তর মাত্র।

অন্যান্য লোক। আনন্দময় কোষ।

মহর্লোকের পর ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর আরও তিনটী লোক আছে। তাহাদের যথাক্রমে নাম—জন, তপঃ ও সত্য। সত্য লোকেরই আর একটী নাম ব্রহ্মলোক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই অত্যুচ্চ লোক গুলির সহিত সাধারণ মানবের সম্পর্ক নাই; সুতরাং এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবারও প্রয়োজন নাই—দুই এক কথা বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব।

আনন্দময় কোষ এই লোকত্রয়ে বিচরণ করিবার যান। যোগিগণ এই কোষের সাহায্যে অসীম ব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্র্য মধ্যে একত্ব অনুভব করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ভেদ বুদ্ধিই অশান্তির কারণ, ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইলে শান্তি আপনা হইতেই করতলগত হয়। যে মহাপুরুষগণ এই সকল উচ্চ লোকে অবস্থান করেন তাঁহারা আর মানবে মানবে, জীবে জীবে প্রভেদ দেখিতে পান না। তাঁহাদের চক্ষে তখন সব এক—'এক' বই 'দুই' নাই। সুতরাং তাঁহাদের চিত্তের প্রশান্তি কিছুতে নষ্ট হয় না। যেখানে "আমি" ছাড়া আর কিছুই থাকে না—'পরে'র অস্তিত্ব-মাত্র বিলুপ্ত হইয়া যায়—সেখানে শান্তির ব্যাঘাত করে কে?

কিন্তু এ অবস্থাও চরম অবস্থা নহে। এ অবস্থা হইতেও পতনের সম্ভাবনা আছে। ইহা ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমা বটে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডও ভঙ্গুর। ব্রহ্মা অমর নহেন, তাঁহারও আয়ুর পরিমাণ আছে। ব্রহ্মার জীবন দ্বিপরার্দ্ধ কালস্থায়ী। * তাঁহার আয়ুর অবসান হইলে ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হয়, সুতরাং ব্রহ্মলোকবাসী সাধককেও ফিরিয়া আসিতে হয়। স্বর্গবাসীর সহিত তাঁহার প্রভেদ এই যে স্বর্গবাসী অপেক্ষাকৃত শীঘ্রই ফিরিয়া আসেন,

---

* ব্রহ্মার এক দিনের নাম 'কল্প'। ৪৩২ কোটী মানববৎসরে এক কল্প হয়। ব্রহ্মার রাত্রি ও এককল্পস্থায়ী। এইরূপ ৩৬০ দিবারাত্রিতে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়। ব্রহ্মার পরমায়ু এইরূপ বৎসরের ১০০ বৎসর বা 'দ্বিপরার্দ্ধ' কাল। প্রতিকল্পান্তে 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' এই তিন লোকের ধ্বংস হয়, কিন্তু উচ্চতর লোক গুলি বর্ত্তমান থাকে। ইহার নাম 'কাল্পিক প্রলয়'। মহর্লোকও এসময় বাসের অযোগ্য ও অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং কার্য্যতঃ পুনঃসৃষ্টি পর্য্যন্ত নিম্নতর চারিটী লোকের অস্তিত্ব থাকে না, অপর তিনটীর থাকে। ব্রহ্মার আয়ু শেষ হইলে সপ্ত লোকেরই নাশ হইয়া 'মহাপ্রলয়' হয়। ইহাকে 'প্রাকৃতিক লয়' বলে।

আর তাঁহাকে ব্রহ্মার জীবনকালের মধ্যে ফিরিতে হয় না। বস্তুতঃ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাইতে না পারিলে আবর্ত্তনের শেষ নাই। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ভগবানের পরম ধাম (পুরাণোক্ত 'গোলকধাম') অবস্থিত। সেখানে গিয়া ভগবানের সহিত মিলিত হইলে আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। অমৃতের সহিত অনন্ত মিলনে মিলিত হইয়া সাধক একেবারে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হইলে আর নদী থাকে না সমুদ্র হইয়া যায়, জীব সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইলে আর জীব থাকে না ব্রহ্ম হইয়া যায়। গীতা পুনঃ পুনঃ সাধককে এ অবস্থাকেই চরম লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন,—

"ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।"
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥" গীতা ১৫।৪।

"তদনন্তর 'যাঁহা হইতে চিরন্তন সংসার প্রবাহ প্রবৃত্ত হইয়াছে সেই আদি-পুরুষকে আশ্রয় করি' এই বলিয়া সেই স্থান অন্বেষণ করিবে যেখানে গিয়া আর পুনরাবৃত্তি হয় না।"

শ্রীভগবান পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "যদি চির শান্তি লাভ করিতে চাও ত আর সকল ছাড়িয়া কেবল আমাকেই পাইবার চেষ্টা কর। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—সর্ব্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর। যদি আমার পরমধামে গিয়া আমার সহিত মিলিত হইতে পার তবেই তোমার আবৃত্তির শেষ হইবে, নতুবা নহে।"

ভগবানের সেই পরম ধাম কিরূপ ?—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥" গীতা ১৫।৬।

"যে স্থানকে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশিত করিতে পারে না—যেখানে গিয়া আর নিবৃত্তি হয় না, তাহাকেই আমার পরমধাম জানিবে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথমোহন বসু।

রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী।

বরাহ। ব্রাহ্মকল্পে বরাহ দেবের বারদ্বয় আবির্ভাব শ্রবণ করা যায়। তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে কৃষ্ণবর্ণ চতুষ্পাদ বরাহ এবং দ্বিতীয় চাক্ষুস মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারও প্রাচেতস দক্ষের দৌহিত্র হিরণ্যাক্ষের বিনাশের নিমিত্ত জল হইতে শুক্লবর্ণ নৃবরাহ আবির্ভূত হয়েন। ইহাঁর বাসস্থান শ্রীবৈকুণ্ঠ ও মহর্লোক। বরাহাদি তির্য্যগরূপী বা নৃবরাহাদি মিশ্ররূপী অবতার সকল ও কাল্পনিক নহেন; কারণ, ইহাঁদিগের মন্ত্রোপাসনাদি উক্ত হইয়া থাকে এবং শতপথাদি ব্রাহ্মণে তৈত্তিরীয়াদি সংহিতাতে ও আরণ্যকেও ইহাঁদের উল্লেখ দেখা যায়।

পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন কল্পের কথা উক্ত হইয়াছে। কোন্ কল্পে কোন্ বিষয় কিরূপ ছিল, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? বিশেষতঃ পুরাণে অনেকানেক উচ্চতর লোকের কথা উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল লোকের ঘটনা এই ভূর্লোকের পক্ষে অদ্ভুত প্রতীয়মান হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। লক্ষ লক্ষ বৎসরের অতীত ঘটনা সকল এবং স্বর্গাদি উচ্চতর লোকের ঘটনা সকল কি ইদানীন্তন ঐতিহাসিক অল্পীয় ঘটনা সকলের সহিত এবং ভূর্লোকীয় ঘটনা-বলীর সহিত তুলনায় সমালোচিত হওয়া যুক্তিযুক্ত? মানবের দর্শন বিজ্ঞান যাহা স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই, এমন অনেক বিষয় কি অনাদি অনন্ত বিপুল বিশ্বরাজ্যে থাকিতে পারেনা? উহা থাকিতে পারে না, বলা বা মনে করাও ধৃষ্টতার কার্য্য—দাম্ভিকতার পরিচয় মাত্র। সীমাবদ্ধ স্থূল দৃষ্টিতে যাহা অসম্ভব বোধ হয়, উত্তরোত্তর মুক্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব বিবেচনা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আবার দম্ভাহঙ্কারবিশিষ্ট হইয়া ঐ সকল পৌরাণিক ঘটনার প্রকারান্তরে অর্থ কল্পনা করিতে যাওয়াও অপরাধ বলিয়া উক্ত হয়। বিশেষতঃ ঐরূপ কল্পনায় আংশিক অসামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক অংশের রূপক যখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখান সম্ভব নহে, তখন মোটামুটি একটী রূপক সজ্জিত করিতে চেষ্টা করাও বিড়ম্বনামাত্র।

মৎস্য। বরাহবতারের ন্যায় মৎস্যাবতারের ও ব্রাহ্মকল্পে বারদ্বয় আবির্ভাব শ্রবণ করা যায়। তন্মধ্যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবসানে হয়গ্রীব

নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া অপহৃত বেদের আহরণার্থ একবার এবং চাক্ষুস মন্বন্তরের অবসানে ভাবী বৈবস্বত মনু রাজা সত্যব্রতকে কৃপা করিবার নিমিত্ত আর একবার মৎস্য দেবের অবতার উক্ত হইয়া থাকেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে প্রতি মন্বন্তরেই একবার করিয়া মৎস্যাবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই অবতারে এক কল্পের সুরক্ষিত বীজ অপর কল্পে নীত হইতে দেখা যায়। সংহিতাদিতেও অবতারের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়।

যজ্ঞ। শ্রীভগবান্ রুচি হইতে আকুতিতে যজ্ঞরূপে অবতরণ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্র যমাদি দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন। ইহাঁর অপর নাম হরি।

নরনারায়ণ। শ্রীভগবান্ জ্ঞানপ্রচারার্থ ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তিতে নর ও নারায়ণ ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের হরি ও কৃষ্ণ নামক আর দুই সহোদরের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব চতুঃসনের ন্যায় ইহাঁদিগের ও চারিটিতে একটি অবতার গণনা করা হয়।

কপিল। কপিলদেব জ্ঞান প্রচারার্থ কর্দ্দম ঋষি হইতে দেবহূতিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁর বর্ণ কপিল। ইনি ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে সেশ্বর সাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন।

দত্ত। দত্ত বা দত্তাত্রেয় জ্ঞান প্রচারার্থ অত্রিমুনি হইতে অনসূয়াতে আবির্ভূত হইয়া অলর্ক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।

হয়শীর্ষা। হয়গ্রীব অবতারে শ্রীভগবান ব্রহ্মার যজ্ঞে সুবর্ণবর্ণে আবির্ভূত হইয়া বেদাপহারী মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বেদের প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন।

হংস। হংস নামক অবতারে শ্রীভগবান্ ভক্তি প্রচারার্থ জল হইতে হংসরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া দেবর্ষি নারদকে ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছিলেন।

ধ্রুবপ্রিয। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ধ্রুবকে ধ্রুবগতি প্রদান করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ ধ্রুবপ্রিয় নামে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁর অপর নাম পৃশ্নিগর্ভ ঋষভ।

এই অবতারে শ্রীভগবান্ আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি হইতে মেরুদেবীতে অবতীর্ণ হইয়া পারমহংস্য ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন।

নৃসিংহ। ষষ্ঠ চাক্ষুস মন্বন্তরে সমুদ্র মন্থনের পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ সিংহরূপে অবতরণ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুর বিনাশ ও প্রহ্লাদের পবিত্রাণ সাধন করিয়াছিলেন। বেদে নৃসিংহদেবের উল্লেখ দেখা যায়।

কূর্ম্ম। কল্পের আদিতে পৃথ্বীধারণার্থ যে কূর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন, তিনিই পুনর্ব্বার চাক্ষুস মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়া পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচল ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্র মন্থন কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। বেদে এই অবতারেরও বহুল প্রচার দেখা যায়।

ধন্বন্তরি। সমুদ্রমন্থনকালে শ্রীভগবান্ ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মোহিনী। সমুদ্রমন্থনকালে শ্রীভগবান্ মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া দৈত্যগণের ও মহাদেবের মোহন করিয়াছিলেন।

বামন। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মকল্পে ক্রমান্বয়ে তিনবার বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বাস্কলি নামক দৈত্যের যজ্ঞে, দ্বিতীয়তঃ বৈবস্বত মন্বন্তরে ধুন্ধুনামক অসুরের যজ্ঞে এবং তৃতীয়তঃ ঐ মন্বন্তরের সপ্তম চতুর্যুগে কশ্যপ হইতে অদিতিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিরাজার যজ্ঞে গমন পূর্ব্বক ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। সংহিতাতে ও আরণ্যকে এই অবতারের উল্লেখ আছে। পরশুরাম। বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তদশ চতুর্যুগে শ্রীভগবান্ গৌরবর্ণ পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন।

শ্রীরাঘবেন্দ্র। বৈবস্বত মন্বন্তরীয় চতুর্ব্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতায় শ্রীভগবান্ ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সহিত নবদূর্ব্বাদল-শ্যামকান্তি শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতরণ পূর্ব্বক রাক্ষসকুল সংহার করিয়াছিলেন।

ব্যাস। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় দ্বাপরে শ্রীভগবান্ পরাশর হইতে সত্যবতীতে ব্যাসরূপে অবতরণ পূর্ব্বক বেদরূপ কল্পতরুর শাখা বিভাগ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

ত্রি-মূর্ত্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই জোয়ারকে আমরা সাধারণতঃ "জীবন" এবং ভাটাকে "মরণ" বলি। কিন্তু তাহা না বলিয়া একটিকে প্রবৃত্তি ও অপরটিকে নিবৃত্তি বলাই অধিকতর সমীচীন। ভগবান্ বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া যে শক্তি দ্বারা বহির্ম্মুখী হইলেন, সেই বহির্ম্মুখিনী শক্তির নামই প্রবৃত্তি বা রজঃ সত্ব, বা ব্রহ্মা বিষ্ণু বা লক্ষ্মী; এবং তিনি পুনরায় "এক ও অদ্বিতীয়" হইবার ইচ্ছা করিয়া যে শক্তিদ্বারা অন্তর্ম্মুখী হইলেন, সেই অন্তর্ম্মুখিনী শক্তিই নিবৃত্তি, বা তমঃ. বা শিব বা কালী। প্রবৃত্তির কার্য্য—বহুর সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপন করা, বহুর দিকে জীবকে টানিয়া আনা, নিবৃত্তির কার্য্য—বহুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করা, একের দিকে তাহাকে টানিয়া আনা। তাই লক্ষ্মীদেবী ধনধান্য পুত্র কলত্রাদি দিয়া আমাদের সংসারটি বজায় রাখিতেছেন, বিকট-বদনা কালী সংসারকে শ্মশানে পরিণত করিয়া নরমুণ্ড চিবাইতে চিবাইতে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন।

কিন্তু দুইটিই চাই,—দুইটি না থাকিলে জীবের—জগতের জন্ম ও উন্নতি হইত না। ব্রহ্মা ও শিব, লক্ষ্মী ও কালী—দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি, তাই দু'য়ের মধ্যে নিত্য বিরোধ, সর্ব্বদা কলহ। জীবসৃষ্টির জন্য প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞ করিলেন, শিব কতকগুলা ভূত প্রেত লইয়া যজ্ঞ ভাঙ্গিয়া দিলেন। এই দক্ষ যজ্ঞের অভিনয় জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ঘটিতেছে। একটি নবজাত বৃক্ষ দক্ষের কৃপায় কেমন হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে দেখিয়া শিব রুষ্ট হইলেন। ঝড, বৃষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে জীর্ণশীর্ণ করিয়া শেষে প্রাণে মারিলেন। শিব তো মঙ্গলময়। তবে এত অত্যাচার করেন কেন? এ গুলি অত্যাচার নহে, কৃপাবৃষ্টি। যদি এ অত্যাচার না হইত, যদি জীব পদে পদে ধাক্কা না খাইত, তাহা হইলে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি জাগিত কি? আজ যে জীব বৃক্ষরূপে অচেতনপ্রায় রহিয়াছে, ঝড়বৃষ্টিরূপ চাবুক খাইয়া তাহার চৈতন্যের ক্রমে.ন্মেষ হইতেছে। চৈতন্যটি যখন এরূপ জাগিতেছে যে বৃক্ষরূপ উপাধিতে তাহার আর বিকাশ পাওয়া অসম্ভব, তখন শিব তাহার বৃক্ষ-দেহটি ধ্বংস

করিয়া দিতেছেন—এবং ব্রহ্মা তাহার জন্য একটি পশুদেহ রচনা করিতেছেন। মনে করুন একটি ক্ষুদ্র পিঞ্জরে এক পক্ষিশিশু আবদ্ধ আছে। পাখীটি দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল, ক্রমে ঐ পিঞ্জরে তাহার আর স্থান হয় না। খাঁচাটি এরূপ নির্ম্মিত যে তাহার কোন দরজা নাই, সুতরাং না ভাঙ্গিলে পাখীটিকে বাহির করা যায় না। এ স্থলে আপনি কি করিবেন? খাঁচাটি ভাঙ্গিয়া পাখীটিকে বাহির করিয়া অবশেষে এক বড় খাঁচাতে রাখিবেন। ঠিক এইরূপই ঘটিতেছে। শিব নিয়ত খাঁচা ভাঙ্গিতেছেন, ব্রহ্মা নূতন খাঁচা গড়িতেছেন এবং বিষ্ণু ফল মূল দিয়া পাখীটিকে আবদ্ধ রাখিতেছেন। যখন আমার জীবাত্মাটি এরূপ বাড়িয়াছে যে বর্ত্তমান দেহে তাহার আর স্থান হয় না, তখন শিব তাহা ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহাকেই আমরা বলি "মরণ"। 'মরণ" না বলিয়া ইহাকে "উচ্চতর জীবন" বলা উচিত নয় কি?

ব্রহ্মা পিঞ্জর গড়িতেছেন, শিব তাহা ভাঙ্গিতেছেন। ইহাই-দক্ষযজ্ঞ। একটি জীব আজ মানবদেহরূপ পিঞ্জরে বদ্ধ আছে। সে ক্ষুদ্র দেহটি লইয়াই ব্যস্ত—দেহের সুখেই সুখ, দেহের দুঃখেই দুঃখ বোধ করে। ক্রমশঃ সে বাড়িতে লাগিল, তাহার শক্তি বাড়িল, জ্ঞান বাড়িল, প্রেম বাড়িল। তখন ক্ষুদ্র পিঞ্জরে তাহার স্থান হয় না। ইহা দেখিয়া শিব এই পঞ্জরটি ভাঙ্গিয়া দিলেন, ব্রহ্মা পরিবাররূপ নূতন পিঞ্জর গড়িলেন, বিষ্ণু এই নূতন পিঞ্জরটি রক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন জীব পরিবার লইয়াই ব্যস্ত হইলেন, স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজনের সুখেই সুখ এবং তাহাদের দুঃখেই দুঃখ বোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে জীব আরও বাড়িল,—জ্ঞান ও প্রেম আরও প্রসারিত হইল। পরিবার-পিঞ্জরে তাঁহার স্থান হইল না। সুতরাং স্বদেশ-পিঞ্জর রচিত হইল। এখন তাঁহার সত্তা স্বদেশে মিশিয়া গেল, তিনি সমগ্র স্বদেশ ব্যাপিয়া রহিলেন। স্বদেশের একটি প্রাণী খাইতে না পাইলে তিনি অনাহারক্লেশ বোধ করেন, স্বদেশের পশু পক্ষীগুলিকেও আনন্দিত দেখিলে তিনি আনন্দ লাভ করেন। দেখিতে দেখিতে জীব আরও বাড়িয়া উঠিল, কারণ বৃদ্ধির সীমা নাই। তখন স্বদেশপিঞ্জর অতি সঙ্কীর্ণ বোধ হইল। শিব উহা ভাঙ্গিয়া দিলেন, ব্রহ্মা সমগ্র স্থূল জগৎ-রূপ পিঞ্জর গড়িলেন। এখন জীবের অবস্থাটি ভাবিয়া দেখুন। তাহার

জ্ঞান ও প্রেম সমগ্র স্থূল জগতে প্রসারিত, প্রত্যেক ঘটনাই তিনি জানেন ও বুঝেন, প্রত্যেক জীবই তাঁহার নিজের। সুতরাং তিনি যাহা কিছু করেন,—জগতের জন্য, যাহা কিছু ভাবেন—জগতের জন্য। জ্ঞান ও শক্তি বাড়িয়া চলিল,—ক্রমশঃ তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি খুলিল, তিনি ভুবঃ, স্ব, মহ, আদি ভুবন দেখিতে পাইলেন, তথাকার অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহার আমিত্ব মিশাইয়া দিলেন, তাঁহাদের সহিত একযোগে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। শিব দেখিলেন স্থূল জগৎরূপ পিঞ্জরে উক্ত জীবের স্থান হইতেছে না, তাঁহার আয়তন এত বাড়িয়াছে ; সুতরাং উহা ভগ্ন করিলেন এবং ব্রহ্মা এক বিরাট সূক্ষ্মোপাধি গড়িয়া দিলেন। এইরূপ বাড়িতে বাড়িতে লক্ষাধিক কল্পান্তে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়া উঠিলেন। এখন ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক স্থানে তিনি বিদ্যমান , কারণ, এই ব্রহ্মাণ্ডটাই তাঁহার বিরাট দেহ হইয়াছে। তাঁহার শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম এতই বাড়িয়াছে যে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব তাহা কল্পনা করিতে পারে না, প্রত্যুত তিনি এখন একটি ব্রহ্মাণ্ডপতি বা ঈশ্বর হইয়াছেন। কিন্তু এখনও তাঁহার একটি পিঞ্জর বা উপাধি আছে। ইহাই শেষ উপাধি এবং ইহার নাম মায়া। ইহাকে আর পিঞ্জর বলা যায় না ; কারণ তিনি এখন বদ্ধ নহেন, তিনি ইচ্ছা করিলেই ইহা ত্যাগ করিয়া অনন্ত "সৎ" এ বিলীন হইতে পারেন।

অনন্ত ব্রহ্মের প্রত্যেক বিন্দু,—প্রত্যেক পরমাণুই এক একটি জীব ; এবং প্রত্যেক জীব কোন না কোন কালে এক একটি ঈশ্বরে উন্নীত হইবে, প্রত্যেক পরমাণু এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইবে। এই ক্রমোন্নতি বা ক্রম-বিকাশ সাধনের জন্যই ত্রিমূর্ত্তির আবির্ভাব,—সৃষ্টি, পালন, সংহার। যতকাল এক একটি ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে, ততকাল দক্ষযজ্ঞ চলিবে, ততকাল লক্ষ্মী পূজা ও কালী পূজা থাকিবে। প্রত্যেক জীবকে লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজা করিতেই হইবে, কারণ ইহা লইয়াই জগৎ, ইহা লইয়াই জীব। যতদিন জীব প্রবৃত্তি-মার্গে থাকেন, ততদিন তিনি লক্ষ্মীপূজা করেন,—লক্ষ্মীদ্বারা পরিচালিত হন ; ততদিন ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য, প্রভাব, প্রতিপত্তি, স্ত্রী, পুত্র, বিভব, বিলাস, ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব, প্রজাপতিত্ব প্রভৃতি কামনা করেন এবং প্রাপ্ত হন। কিন্তু কালীর কৃপা হইলে, জীব নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করেন। তখন তাঁহার হৃদয় ক্রমশ

শ্মশানে পরিণত হয়, তাহাতে কেবল জ্ঞানের ও প্রেমের অগ্নি নিরন্তর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে এবং সেই আগুনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দর্প, অভিমান, যাবতীয় বিষয়বাসনা ও ভোগতৃষ্ণা, এমন কি ইন্দ্রত্বাদি লাভের কামনা পর্য্যন্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়; তখন সেই ভস্ম-রাশির মধ্যে তিনি একাকী বসিয়া থকেন এবং তাঁহার অন্তরের অন্তর হইতে স্বতঃই এই আবাহন গীতি উচ্ছ্বসিত হয়—

"শ্মশান ভাল বাসিস্ ব'লে, শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা, থাক্‌বে তাহে নিরবধি॥
আর কিছু, মা, নাইকো চিতে, নিরবধি জ্বল্‌ছে চিতে,
ভস্মরাশি চারি ভিতে, রেখেছি মা আসিস্ যদি॥"

সন্তানের এই কাতর ক্রন্দনে মা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তৎক্ষণাৎ তিনি নিজ মূর্ত্তিতে দেখা দেন, ভক্তের হৃদয়-শ্মশানে পূর্ণভাবে আবির্ভূতা হন। উঃ কি ভয়ঙ্করী! কি নিষ্ঠুরা!! অথচ কি আনন্দময়ী!!! কোটি যোজন ব্যাপী করাল জিহ্বা বিস্তার করিয়া সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতেছে! দয়া নাই, মায়া নাই, মমতা নাই। অসংখ্য পশু, পক্ষী, কীট, মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা, ইন্দ্র, চন্দ্র, মনু, প্রজাপতি—কেহই সেই ভীষণ কবল হইতে নিস্তার পাইতেছে না। সকলকেই উদরসাৎ করিতেছে এবং তাহাদের রক্তে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া বিকট আনন্দে অট্টহাস করিতেছে!

কিন্তু একি! যাহার বুকে ইনি একবার পা দিতেছেন, (যাহার অন্তরে এই মহাশক্তি পূর্ণভাবে জাগিতেছে), সে আর জীব নাই, তৎক্ষণাৎ শিব হইয়া যাইতেছে! তখন পদদলিত পুরুষের দুর্দ্দশা দেখিয়া পার্শ্বস্থ লক্ষীমান্ ব্যক্তিগণ উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "হাঁরে সর্ব্বনাশিনি! তুই করিলি কি? উহায় সব নাশ করিলি? বহুমূল্য বস্ত্রাদি ছাড়াইয়া কৌপীন পরাইলি, আবার এখন দেখিতেছি তাও নাই,—বাঘছাল! সুন্দর অট্টালিকা ছাড়াইয়া বনবাসী করিলি, তাতেও সাধ মিটিল না, শেষে কিনা নবকঙ্কালাবৃত পূতিগন্ধময় ভীষণ শ্মশানে আনিলি! ছি ছি! একবারে লক্ষীছাড়া করিয়া দিলি। তৈল বিনা সুন্দর কেশগুলি ভীষণ জটায় পরিণত হইয়াছে, সুচিক্কণ গাত্র শুষ্ক, রুক্ষ, মলিন

হইয়াছে! মণিময় সুবর্ণহারের পরিবর্ত্তে গলে হাড়মালা! আবার সঙ্গীগুলোই বা কেমন! যাহারা সর্ব্বত্র অনাদৃত, ঘৃণিত, পরিত্যক্ত, বিতাড়িত, যাহাদিগকে দেখিলেই জীবের ভয় ও অবজ্ঞার উদ্রেক হয়, যাহারা কোন স্থানে কৃপা বা আশ্রয় পায় না—এরূপ কতকগুলা ভূত প্রেত ও বিষধর সর্পকে সর্ব্বদা বুকে পিঠে ও মাথায় তুলিয়া রাখে। আবার সর্ব্বদা নেশা করায় চক্ষু দুটো করমচার ন্যায় লাল ও অর্দ্ধনিমীলিত। কেহ কেহ বলে ঐ নেশার নাম মহাভাব। সেটা কি তাতো বুঝি না। কাজ কর্ম্ম কিছুই করে না, নেশায় ঝুম হইয়া একটা নিশ্চল অজগরের ন্যায় চুপ্ চাপ্ পড়িয়া থাকে। তবে মাঝে মাঝে এক একবার গা ঝাড়া দিয়া উঠে। তখন বোধ হয় ক্ষুধা পায়, কারণ উঠিয়াই আহারের চেষ্টা করে। তাও কি একটা ভাল জিনিষ খায়? সবই বিকট। খায় কেবল বিষ! পাছে সাপগুলো অপরকে কাম্ড়াইয়া মারে, তাই প্রথমে তাদের বিষটা খাইয়া ফেলে। তার পর জগতের যেখানে যত বিষ আছে—হিংসাবিষ, দ্বেষ-বিষ, জিঘাংসাবিষ—কত নাম করিব, সব উদরসাৎ করে। শুনা যায় জীবসমুদ্র মন্থনকালে এই রকমের একটা ভয়ঙ্কর বিষ উত্থিত হয়। সকলেই ভয় পাইল, ত্রিলোক যায় যায়। তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া এই বেটা সমস্ত বিষটা খাইয়া ফেলিল, তখন থেকে ব্যাটার কণ্ঠটা নীলবর্ণ হইয়া আছে। এমন বিষ-খোর আর কোথায়ও দেখি নাই।"

ইহা শুনিয়া কালী একটা বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন "তোদেরও এককালে এই দশা হইবে। জীবের সর্ব্বনাশ করাই আমার কাজ। তোদের যা কিছু আছে, সবই আমি খাইব। ভয় পাস্ কেন? সসীমতার নাশ না হইলে অসীমতা মিলে কি?"

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

মরণ ও মরণান্তে।

আত্মঘাতী ও আত্মঘাতে মৃত মানব।

কাল পূর্ণ না হইতেই যাহারা অকস্মাৎ আত্মহত্যা করিয়া ফেলে, বা অন্য কর্তৃক হত হয, কিম্বা কোন দুর্ঘটনা বশতঃ যাহাদেব অপঘাত মৃত্যু ঘটে, তাহাবা কামলোকে অবস্থান কবে। ইহলোকে তাহাবা পুণ্যাত্মা ছিল কি পাপাত্মা ছিল, এবং কি অবস্থায পড়িয়া আত্মহত্যা কবিযাছে, তৎসমুদায়েব ইতর বিশেষানুসারে তাহাদের কাহাবও কামলোকে অবস্থানকাল অল্পস্থায়ী এবং কাহাবও দীর্ঘস্থায়ী হয়। কাবণ, স্বীয় জীবন স্বহস্তে বিনাশ কবিলেই যে সর্ব্বাবস্থায় আত্মহত্যাব পাপে পাপী হইতে হইবে এমন নহে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তাহা অনুমোদনীয় এবং প্রশংসনীয হইয়া থাকে। জনৈক ত্রিকালজ্ঞ পূজ্যপাদ ঋষি এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, শুন--

"আত্মঘাতীদেব ষষ্ঠ ও সপ্তমরূপ (বুদ্ধি ও আত্মা) তাহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় বটে, কিন্তু যে সময় তাহাদেব স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিত, সেই সময় পর্য্যন্ত তাহাবা (আত্মঘাতীগণ) তাহাদেব উন্নত রূপসমূহ হইতে বহুদূবে সরিয়া পড়ে। তাহাদেব ষষ্ঠ ও সপ্তমরূপ নিষ্ক্রিয় ও নিস্তব্ধভাবে অবস্থান কবে। কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনা বশতঃ যাহাদেব মৃত্যু হয, তাহাদেব উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট উভয় প্রকাবেব রূপসমূহই প্রকৃতপক্ষে পবস্পব পবস্পরকে আকর্ষণ কবে। অধিকন্তু যাহাবা সৎ ও নির্দ্দোষ, তাহাদের অপকৃষ্ট রূপসমূহ, উৎকৃষ্টতব ষষ্ঠ ও সপ্তম রূপেব দিগে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়; তাহাতে তাহাবা সুখস্বপ্নময় তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে, অথবা স্বাভাবিক মবণকাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বপ্নহীন গভীব নিদ্রায় বিভোর থাকে। ক্ষণকাল চিন্তাব পব ভগবানের অলঙ্ঘ্য নিয়মেব ও সুশাসনেব প্রতি লক্ষ্য করিয়া হয়ত তুমি বলিবে, কেন এমনটী হয়? তাহাব উত্তর এই, ভালই হইক, আব মন্দই হউক, অপঘাতে মৃত ব্যক্তি তাহাব মবণের জন্য স্বয়ং দায়ী নহে। এমনও হইতে পাবে যে, তাহাব জন্মান্তরীন্ কোন কুকর্ম্মেব ফলে এইরূপ অপঘাতে বমৃত্যু ঘটিয়াছে। বিধাতাব অলঙ্ঘ্য নিয়মেব বশে, কর্ম্মেব অবশ্যম্ভাবী ফলে

দরুণ, তাহার এই শাস্তিভোগ ঘটিল বটে, কিন্তু এই অপঘাত মৃত্যু তাহার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত নহে। এইরূপ অস্বাভাবিক ভাবে তাহার মৃত্যু না ঘটিলে সে তাহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত করিবার যথেষ্ট সুবিধা পাইয়া জীবন সংশোধন ও উন্নত করিতে পারিত। কাজেই অপঘাতে মৃত মানবের দায়িত্ব, আত্মহত্যাকারীর দায়িত্ব অপেক্ষা অনেক লঘু। ইহলোকস্থ দেহধারী মানবের জীবনের গতি কোন্ দিকে কি ভাবে পরিচালিত হইবে, তাহার উপর মহাযোগী, মহাজ্ঞানী ধ্যান-চোহানদের কোন হাত নাই। কিন্তু যখন আকস্মিক দুর্ঘটনা বশতঃ কোন হতভাগার অকালে অপঘাত মৃত্যু ঘটে, কিম্বা যদি কেহ কোন দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক নিহত হয়, তবে এই করুণানিধান্ সূক্ষ্মদেহধারী ধ্যানচোহানগণ সেই অসহায় নরনারীদিগকে পরলোকে রক্ষা করেন এবং এই অচিন্ত্য ও অপরিচিত যমলোকে আসিয়া যে পর্য্যন্ত তাহারা প্রকৃতিস্থ না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সন্তর্পণে প্রতিপালন ও সস্নেহে রক্ষণাবেক্ষণ করেন।"

আত্মঘাতী ও অপঘাতে মৃত নরনারী পৃথিবীর লোকের সংসর্গে আসিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অনিষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তন্মধ্যে যাহারা সৎ ও নিরীহ, তাহারা অবশিষ্ট জীবনের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণকাল সুখে নিদ্রার ক্রোড়ে অভিভূত থাকে। কিন্তু অপঘাতে মৃত ব্যক্তি যদি অসৎ ও কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে তাহার দশা শোচনীয় হয়। উক্ত মহাত্মা আরও বলেন—

"পাপাসক্ত ও কামাতুর মানব নিতান্ত হতভাগার ন্যায় তাহার নির্দ্দিষ্ট জীবনের পরিমাণকাল বিষণ্ণভাবে কামলোকে বিচরণ করে। ভোগবাসনার পূর্ণ আবেগের সময় যখন তাহারা বিষয়-বিলাসে মত্ত থাকে, তখন তাহাদের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হওয়াতে তাহাদের পরিত্যক্ত আত্মীয়কুটুম্ব, ধনসম্পত্তি, বিষয় বিভব, ঘরবাড়ী প্রভৃতির প্রতি তাহাদের মন সবিশেষ আকৃষ্ট থাকে; কিন্তু ইচ্ছাসত্ত্বেও সুযোগের অভাবে তাহাদের কামপ্রবৃত্তি পূরণ করিতে অক্ষম হয়। প্রেতবাদীদের চক্রে আবিষ্ট ব্যক্তির সাহায্যে তাহাদের সেই সুবিধা সুযোগ ঘটে। ইহারাই ভূত, প্রেত, পিশাচ। ইহারা অজ্ঞাতসারে যে দুর্ভাগাদের ঘাড়ে চাপে, তাহাদের দ্বারা অনেক গর্হিত কার্য্য সাধন করাইয়া উল্লাসে উন্মত্ত হয়। এই সকল নারকীয় জঘন্য জীবগণ যে কেবল আবিষ্ট ব্যক্তিরই সর্ব্বনাশ সাধন করে এমন নহে; তাহারা ঘোরতর কুকার্য্যে রত থাকিয়া

তাহাদের স্ব স্ব স্বাভাবিক জীবনের পরিমাণকাল অবসান হইলে তাহারা সময়-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে পৃথিবীর গণ্ডীর বাহিরে পতিত হইয়া দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে থাকে ; শেষে চির দিনের মত সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়।

এইজন্য আত্মহত্যাকে শাস্ত্রে অতি বিগর্হিত মহাপাতক বলিয়া নিতান্ত তীব্র ভাষায় ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করা হইয়াছে।

"অগ্নি, বিষ, অস্ত্র, উদ্বন্ধন প্রভৃতি দ্বারা যে ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়, অর্থাৎ ক্রোধাদি বশতঃ ইচ্ছা করিয়া (যে কোন রূপে) আপনাকে আপনি যে হত্যা করে, সে ব্যক্তি অতি পাপিষ্ঠ, যেহেতু সে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম স্বীয় প্রাণকে নষ্ট করিয়াছে।"

"উক্ত আত্মঘাতী ব্যক্তির মৃত্যুতে অশৌচ হইবে না। তাহাদের মৃত্যুর পর দহন, বহন ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি করিতে নাই , করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। পতিতের উত্তরাধিকারী, পাতিত্যের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, ঐ সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন , কিন্তু আত্মঘাতীর কিছুই নাই। উহাকে অন্ত্যজ দ্বারা নদীতে বা বৃক্ষমূলে প্রক্ষেপ করিবে। গঙ্গায় প্রক্ষেপ করাই উহাদের একমাত্র সদ্গতির উপায়। ("নারায়ণ বলি" কার্য্যবিশেষ করিয়া, অন্ত্যেষ্টিকার্য্য করা যায়, কেহ কেহ বলেন)।

শ্রীযুত মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন প্রণীত হিন্দু সৎকর্ম্মমালা। ৪র্থ ভাগ। ৯৩ পৃষ্ঠা।

ক্রমশঃ

শ্রীসুদর্শন দাস।

গুরুদেব।

খুঁজিলাম বার বার
খুলিয়া হৃদয় দ্বার
আমি বলে কই সেথা কিছুই ত নাই
সুধু চারি ধার ঘেরে
জ্বলে চিতা ধূ ধূ করে
রয়েছে ছড়ান সুধু যত চিতা ছাই
প'ড়ে সুধু আছে শব
হইছে ডমরু-রব
বাজিছে শিবের নাম বৈরাগ্য সানাই

আছে হাড় জড় করা
অস্থির হইছে ছড়া
সংহার লহরীমালা বহিছে সদাই
হেরিয়া শিবের মুর্ত্তি
হইছে জীবের স্ফুর্ত্তি
জীব শিব হইতেছে শিবপদে যাই
হইয়াছে শিব ময়
শিবেতে হইছে লয়
নাচিতেছে ভূতগণ শিব জয় গাই।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—সুবিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ ক্যামিল ফ্লামারিয়ণ (Camille Flammarion) সাহেব বলিতেছেন যে, প্রতিদিন ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৮ ইঞ্চি করিয়া উত্থান পতন হয়। এই গতির সহিত জোয়ার ভাটার কোন সম্বন্ধ নাই, সম্ভবতঃ সূর্য্যের প্রভাবে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত Secret Doctrine নামক প্রাচীন ঋষিগণের আবিষ্কৃত তথ্যপূর্ণ অমূল্য গ্রন্থের একস্থানে লিখিত আছে যে, "যেমন প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক উদ্ভিদ, এমন কি প্রত্যেক শিলাখণ্ড নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে এই বিশ্বও সেইরূপ করিয়া থাকে। আমাদের পৃথিবীও প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে।" ফ্লামারিয়ণ সাহেবের আবিষ্কারের সহিত এই উক্তির সামঞ্জস্য দেখিলে বিস্ময়াপন্ন না হইয়া থাকা যায় না। বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে, আমরা ততই পুরাতন ঋষিবাক্যগুলির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

বিস্ময়কর ভৌতিক ঘটনা

ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন ভারতবর্ষে অবস্থান কালে সকলের নিকটে আর্থার ওয়েলেস্‌লি নামে পরিচিত ছিলেন। উক্ত ডিউকের অধীনে কর্ণেল উইলসন নামক এক ব্যক্তি সমরবিভাগে কোন উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন।

কর্ণেল এখানে সকলের নিকট বিশেষ প্রতিভান্বিত, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। স্যর চার্লস ফারবেশ মহোদয় ষ্ট্রাটডম নামক স্থানে শিকার ব্যপদেশে উক্ত কর্ণেলের সহিত আমার আলাপ পরিচয় করাইয়া দেন, ক্রমে ঐ আলাপে আমাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্টতা ও মাখামাখি হয়।

নিম্ন বিবৃত ঘটনা আমুল কর্ণেলের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই প্রকাশ করা হইল; তবে এই সম্বন্ধে কর্ণেলের কিরূপ মতামত ও বিশ্বাস ঘটনাটী বলিবার পূর্ব্বে তাহা পাঠকগণকে জানাইতেছি। "কর্ণেল নিজে যে নাস্তিক এ কথা প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। ভারতের নানাপ্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতামত দেখিয়া তিনিও অনেকের ন্যায় ধর্ম্ম বিশ্বাসে সন্দেহ করিতেন। ভল্নে ভলটেয়ার প্রভৃতি লেখা সর্ব্বদা পড়িতেন। তাহাতেই মানবের মৃত্যুর পর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার যে সন্দেহ জন্মে তাহা বিশেষ বদ্ধমূল হয়।

মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে যদি কেহ তাঁহাকে বুঝাইতেও যাইত তাহা তিনি আদৌ বিশ্বাস বা গ্রাহ্য করিতেন না। এ প্রকার লোকের মুখে শ্রুত নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে পাঠকগণের বিশ্বাস জন্মিবে এরূপ আশা করা যায়।

১৮০১ খৃঃ অব্দে তিলেবেরী নামক স্থানে ১৯ সংখ্যক ড্রাগুণ সেনাদলের তিনি অধিপতিত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ফরাসী ভাষায় লিখিত কাব্যাদিতে বিশেষ আগ্রহ থাকায় রোমান ক্যাথলিকদিগের ধর্ম্মযাজক ডুবো নামক একটী পাদ্রীর সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্টতা হয়। ঐ পাদ্রী সাহেব ধর্ম্ম বিষয়ে ও লেখা পড়ায় বিশেষ বিচক্ষণ ছিলেন। যদিও সম্প্রদায়গত পার্থক্য ছিল তথাপি তিনি বিশেষ উদার স্বভাবের লোক ছিলেন, তিনি বহুল বিষয় অবগত ছিলেন, সর্ব্বোপরি তাঁহার রীতিনীতি, আদব কায়দা বিশেষ সন্তোষজনক হওয়ায় সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ধর্ম্মযাজক ও রাজসিক গুণান্বিত যোদ্ধৃপুরুষ একত্র অবস্থান করিতে বিশেষ ভাল বাসিতেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিশেষ ভালবাসা ও ঘনিষ্টতা জন্মিল। পাদ্রী সাহেব এই যোগে তাহার বন্ধুকে ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে প্রায়ই পরস্পরে কথাবার্ত্তা হইত। ইহাতেও কর্ণেলের নাস্তিকতা ও সর্ব্ব বিষয়ে সন্দেহ বিনষ্ট হইল না।

১৮১১ খৃঃ অব্দে জুলাই মাসে ধর্ম্মজাযকটি খুব অসুখে পড়িলেন এবং মারা গেলেন। ছোট টেনিচাবী গ্রামে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা কবিত ও ভাল বাসিত, সকলেই তাঁহাব জন্য আক্ষেপ কবিতে লাগিল। এ দিকে সে সময ভেলোরে সিপাই বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় কর্ণেলকে তথায় যাইতে হইল। সেই সহরের বাহিবে খোলা যাযগায় দলসহ যাইয়া তাঁবু ফেলিযা বহিলেন।

বাত্রি গুমট হওয়ায কর্ণেল একটী মাত্র সার্ট পরিযা ও একটা পাতলা কাপড়ে পা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া তাঁবুব মধ্যে একটী কোচে অর্দ্ধশায়িত ভাবে নিদ্রা যাইবাব চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু পাবিলেন না। ঘুমুতে না পাবায় এ দিক্ ও দিক্ চাইতে হঠাৎ প্রবেশ-দবজাব দিকে তাঁহাব দৃষ্টি পড়িল, এবং দেখিলেন যে পবদা তুলিয়া যাজক ডুবো তথায় উপস্থিত হইযাছেন। বন্ধু ডুবোব মলিন মুখ ও আগ্রহপূর্ণ চেহাবা, নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ ভাবে তাঁহাব সামনে উপস্থিতহওয়ায় তাঁহাব বিশেষ চিত্তাকর্ষণ করিল। তিনি তাহাব নাম ধবিয়া ডাকিলেন কিন্তু কোন উত্তর দেওয়াব পূর্ব্বেই পবদাটা পড়িযা গেল এবং মূর্ত্তিটী অদৃশ্য হইল। এই ঘটনায কর্ণেল সজোবে উঠিযা দাডাইলেন এবং তাড়াতাড়ি জুতা পরিয়া তাঁবু হইতে বেগে বাহিব হইলেন। তাঁবু হইতে তখনও আবছায়া মত দেখা যাইতেছিল, ছাযা সমতল ভূমিব দিকে ক্রমে অগ্রসব হইতেছে এরূপ বোধ হইল। কর্ণেল পেছুনে পেছুনে ছুটিতে লাগিলেন। এত তাড়াতাড়ি সেই মূর্ত্তিটীব অনুসবণ কবিলেন যে শিবিবেব অন্যান্য লোক জাগিয়া উঠিযাও তাঁহাকে দৌড়াইয়া ধবিতে পাবিল না। কেবল মাত্র কর্ণেল ঐ মূর্ত্তিটী দেখায় অন্যান্য লোক মনে কবিল কর্ণেল ঘুমেব ঘোবে প্রলাপ বকিতে বকিতে ছুটিয়া যাইতেছেন। কিন্তু ডাক্তাব তখনই তাঁহাব হাত দেখিয়া বলিলেন উহাব হাতেব নাড়ী কোন প্রলাপেব বোগীব মত চঞ্চল নহে। নাড়ীব স্পন্দন সমভাবেই চলিতেছে। এই দৃশ্যে কর্ণেল মনে কবিলেন যে সম্ভবতঃ বন্ধু ডুবো মারা গিয়াছে, কারণ তাহাদেব ছাড়াছাড়ির সময় ডুবো বলিয়াছিলেন যদি তিনি আগে মারা যান তবে প্রেতাত্মায় তিনি কর্ণেলেব সহিত সাক্ষাৎ কবিবেন। তাঁহাব সঙ্গে যাহাবা একত্র কাজ কর্ম্ম কবিতেন তাহাদিগকে ঘটনাটি ও তাহাব সময় লক্ষ্য বাখিয়া লিপিবদ্ধ কবিতে বলেন, তাহাবা তাহাব নির্দ্দেশ মত ঘটনাটী লিখিয়া বাখাব পব তেনাচাবী হইতে প্রথম ডুবোর ব্যাবাম তাবপর কর্ণেল যে সময় ডুবোর প্রেতাত্মা দেখেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মৃত্যু সংবাদ পাইলেন।

ওঁ
পন্থা
মহাজনো যেন গতঃ স
সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

১৩শ ভাগ } আষাঢ়, ১৩১৬ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

নিরুপাধি ব্রহ্ম।

নির্গুণ ব্রহ্মেব পবিচয়স্থলে শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প, নিরুপাধি—এই বিশেষণে অনেকবাব বিশেষিত কবিয়াছেন। এই নিরুপাধি শব্দটী আমাদিগেব লক্ষ্য কবিবাব বিষয়। নিরুপাধি বলিলে কি বুঝায। ব্রহ্ম উপাধি বহিত। উপাধি কাহাকে বলে? জর্ম্মান দর্শনে যাহাকে Category বলে উপাধি তাহাবই অনুরূপ। জর্ম্মান দার্শনিক Kant দেখাইয়াছেন যে সমস্ত ব্যাবহাবিক জগৎ (Phenomenal existence) দেশ, কাল ও নিমিত্ত এই ত্রিবিধ Categoryর অধীন। এবং যাহা পবমার্থ (Noumenon) তাহা দেশ, কাল ও নিমিত্তাতীত, তাহা এই তিন Categoryর অপবামৃষ্ট। দেশ = space, কাল = time, এবং নিমিত্ত = Causality. (কার্য্যকারণসম্বন্ধ) ব্রহ্ম নিরুপাধি, এই বাক্যেব বিবরণ কবিয়া শ্রীশঙ্কবাচার্য্য বহুবার ব্রহ্মকে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত বলিয়া নির্দ্দেশ কবিয়াছেন। সর্ব্বোপনিষৎসাবে এইরূপে ব্রহ্মেব পবিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। "ব্রহ্ম সত্যম্ অবিনাশি নাম-দেশ-কাল

বস্তুনিমিত্তেষু বিনশ্যৎসু যন্নবিনশ্যতি অবিনাশি তৎ সত্যমিত্যুচ্যতে।" অর্থাৎ দেশ কাল নিমিত্ত প্রভৃতি উপাধির নাশে যাঁহার নাশ হয় না তিনিই অবিনাশী সত্য স্বরূপ।" অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরুপাধি—দেশের অতীত, কালের অতীত এবং নিমিত্তের অতীত। *

ব্রহ্মের এই দেশাতীতত্ব, কালাতীতত্ব নিমিত্তাতীতত্ব উপনিষদ্ কি ভাবে বুঝাইয়াছেন ইহা আমাদের জানা আবশ্যক।

ব্রহ্মের দেশাতীত ভাব যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকোপনিষদে অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন

"স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্ব্বাক্ পৃথিব্যা, যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে, যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশে এব তদোতং চ প্রোতং চেতি। বৃ ৩। ৮। ৭

ছান্দগ্যোপনিষদের ঋষি ব্রহ্মের দেশাতীত ভাব লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন। "স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বম্।" ছা। ৭। ২৫। ১

তিনি অধে তিনি উপরে তিনি পশ্চাতে তিনি সম্মুখে তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে, তিনি এই সমস্ত।

ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র আসীদেকোঽনন্তঃ প্রাগনন্তো দক্ষিণতোঽনন্তো প্রতীচ্যনন্ত উদীচ্যনন্ত উর্দ্ধং চ অবাঙ্ চ সর্ব্বতোঽনন্তঃ। মৈত্র্যুপনিষৎ ১৭।

ন হ্যস্য প্রাচ্যাদিদিশঃ কল্পন্তেঽথ তির্য্যগ্বাঽবাঙ্ বোর্দ্ধং বাঽনূহ্য এষ পরমাত্মাঽপরিমিতোঽজঃ।

ব্রহ্মই অগ্রে এই (জগৎ) ছিলেন। এক—অনন্ত, পূর্ব্বে অনন্ত, পশ্চিমে অনন্ত, দক্ষিণে অনন্ত, উত্তরে অনন্ত, ঊর্দ্ধে অনন্ত, অধে অনন্ত, সর্ব্বতঃ অনন্ত। তাঁহার পক্ষে পূর্ব্ব পশ্চিম ভেদ নাই, উত্তর দক্ষিণ ভেদ নাই। ঊর্দ্ধ অধঃ ভেদ নাই। তিনি নিরাধার, অপরিমিত।

---

* In Indian language, Brahman, in contrast with the empirical system of the universe is not like it in space but is spaceless, not in time but timeless, not subject to but independent of the law of causality—Deussen's Philosophy of the Upanishads, page 150

দেশ হইতেই পরিমাণের সিদ্ধি হয়। যাহা দেশাতীত তাহার পরিমাণ নাই। ব্রহ্ম যখন দেশের অপরিচ্ছিন্ন, তখন তিনি পরিমাণেরও অতীত। এই জন্য উপনিষদ্ ব্রহ্মকে কোথায়ও "বিভু, ব্যাপক, মহান্" বলিয়াছেন। কোথায়ও "অণু, আরাগ্রমাত্র কেশের শতভাগের পরিমিত" বলিয়াছেন।

"মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি। কঠ।২।২২,৪।৪

মহান্ বিভু আত্মাকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোকমুক্ত হন।

অব্যক্তাৎ পরঃ পুরুষঃ ব্যাপকোহলিঙ্গ এবচ।

প্রকৃতির ও পরতর পুরুষ (ব্রহ্ম)। তিনি ব্যাপক ও অলিঙ্গ! আবার তিনি অণু।

"অণুরেষ আত্মা।" এই আত্মা অণুর পরিমাণ।

আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোহপি দৃষ্টঃ।

ব্রহ্মের পরিমাণ সূচীর অগ্রভাগ মাত্র।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবস্য বিজ্ঞেয়ঃ।

'কেশকে শতভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে শতভাগ করিলে তাহাই জীবের পরিমাণ।' দেশাতীত বস্তুর পরিমাণ নির্দ্দেশ যে কথামাত্র তাহাই বুঝাইবার জন্য উপনিষদ একই বাক্যে ব্রহ্মকে অণুর অণু ও মহতের মহান্ বলিয়াছেন।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, বহুবার উপনিষদে এই শব্দের যোজনা দৃষ্ট হয়। *

অর্থাৎ ব্রহ্ম অণুর অপেক্ষাও অণু এবং মহতের অপেক্ষাও মহান্। ছান্দোগ্য উপনিষদ এই ভাবে ব্রহ্মের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"এষ ম আত্মাহন্তর্হৃদয়েহণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্ বাএষম আত্মাহন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ান্ অন্তরীক্ষাৎ জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।

'এই আমার আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। ইনি ব্রীহির অপেক্ষা, যবের অপেক্ষা, সর্ষপের অপেক্ষা, শ্যামাকের অপেক্ষা, শ্যামাক তণ্ডুলের অপেক্ষা,

* কঠ ২।২০, শ্বেত ৩।২০, মহানারায়ণ ১০।১

অণু। এই আমার আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অবস্থিত। ইনি পৃথিবীর অপেক্ষা অন্তরীক্ষের অপেক্ষা, দিবের অপেক্ষা, সমস্ত ভুবনের অপেক্ষা বৃহৎ।'

যিনি দেশাতীত, পরিমাণের অনবচ্ছিন্ন, তাঁহার বিভাগ সম্ভবে না, সুতরাং তিনি অবয়বহীন—কলাতীত। সেই জন্য উপনিষদ্ ব্রহ্মকে অকল নিষ্কল এই বিশেষণে অনেক স্থলে বিশেষিত করিয়াছেন। কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

নিষ্কল = Partless = অকল। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।
শ্বেত।৬।১৯

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। মুণ্ডক ২।২।৯

পরঃ ত্রিকালাৎ অকলোপি দৃষ্টঃ। শ্বেত ৬।৫

স এষ অকলো অমৃতো ভবতি। প্রশ্ন ৬।৫

ব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ "অকল নিষ্কল" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম দেশ-উপাধির অপরিচ্ছিন্ন (not limited by space) ইহাই জ্ঞাপন করা।

ব্রহ্ম কেবল দেশের অনবচ্ছিন্ন নহেন কালেরও অনবচ্ছিন্ন। কাল ত্রিবিধ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। ব্রহ্ম যখন কালাতীত, তখন তিনি ত্রিকালেরই অনবচ্ছিন্ন. শ্বেতাশ্বতর তাঁহাকে বলিয়াছেন "পরঃ ত্রিকালাৎ"। শ্বেত ৬।৫ বৃহদারণ্যক তাঁহার কালাতীতত্ব জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন—

যস্মাদ্ অর্ব্বাক্ সংবৎসরঃ অহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্ দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ আয়ুর্হোপাসতেঽমৃতং॥
বৃ ৪।৪।১৬

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং। কঠ ৬।১৫

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে। শ্বেত ৫।১৩

'[illegible]কে স্পর্শ না করিয়া সম্বৎসর দিবসের সহিত পরিবর্ত্তিত হয় দেবগণ তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতি অমৃত আয়ুঃ বলিয়া উপাসনা করেন।' তিনি কি ভূত [illegible] না বর্ত্তমান ?

যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইত্যাচক্ষতে। বৃ ৩।৮।৭

তিনি সকলই অথচ কিছুই নহেন। তিনি সনাতন—সদাকাল বর্ত্তমান. (Eternal Now)। তিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন।

অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ। কঠ ২।১৪।

সেইজন্য উপনিষৎ তাঁহাকে ভূত ও ভব্যের অধীশ্বর বলিয়াছেন।

ঈশানং ভূত ভব্যস্য। বৃ।৪।৪।১৫, কঠ ৪।৫,১২ ও ১৩।

যেমন তাঁহার দেশাতীতত্ব জানাইবার জন্য উপনিষৎ তাঁহাকে অণুর অণু অথচ মহানের মহান্ বলিয়াছেন সেইরূপ তাঁহার কালাতীতত্ব জানাইবার জন্য তাঁহাকে একদিকে অনাদি অনন্ত অর্থাৎ চিরন্তন আবার অন্য দিকে ক্ষণস্থায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

অনাদ্যনন্তং মহতঃপরং ধ্রুবং। কঠ ৩।১৫

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে। শ্বেত ৫।১৩

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যংব্রহ্ম সনাতনং। কঠ ৫।৬

ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত, মহতের পর, ধ্রুব। অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম (কলিলের) জগতের মধ্যে। সনাতন গুহ্য ব্রহ্ম তোমাকে বলিতেছি। এইরূপ ব্রহ্মের ক্ষণস্থায়িত্বও শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন—

"তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্ যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তং। বৃ ২।৩।৬

সেই পুরুষের রূপ কেমন? যেমন বিদ্যুতের ক্ষণিক ভাতি।

বিদ্যুদ্ ব্রহ্মেত্যাহুঃ। বৃ ৫।৭।১। ব্রহ্মকে বিদ্যুৎ বলা হয়।

যদেতৎ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ। * ন্যমীমিষদ্ আ। কেন ২৯।৩০

যেন বিদ্যুতের চকিত, যেন চক্ষের নিমেষ।

ব্রহ্ম যেমন দেশ কালের অতীত সেইরূপ তিনি নিমিত্তেরও অতীত। যিনি নিমিত্তের অতীত তাঁহাতে বিকার সম্ভবেনা। * ব্রহ্ম নির্ব্বিকার।

---

* Just as Brahman, independent of space, is figuratively represented not only under the figure of infinite vastness but also at the same time of infinite littleness, so his independence of time appears on the one hand as infinite duration, on the other as an infinitely small moment, as it is symbolically represented in consciousness by the instantaneous duration of the lightning or flash of thought Deussen, page 154.

* মহানারায়ণ ১।৮ ও ২।৭।৬ দ্রষ্টব্য। Taken together, their aim is to lay stress upon his instantencousness in time that is in figurative language timelessness (Deussen, page 154

* Where there is no change there is no causality.

অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। কঠ ২।১৪

এইজন্য তাঁহাকে ধ্রুব, শাশ্বত, নিত্য, পুরাণ বলা হয়।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ। কঠ ২।১৮

একধেবানু দ্রষ্টব্যং এতদ্ অপ্রময়ং ধ্রুবং।

বিরজঃ পর আকাশাৎ অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥ বৃ ৪।৪।২০

'ব্রহ্ম অপ্রমেয় ও ধ্রুব। তাঁহাকে এক বলিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি রজোহীন, আকাশের অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তিনি অজ, মহান্, ধ্রুব।' অর্থাৎ তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, অপচয়, উপচয় নাই।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ। কঠ ২।১৮

জাত এব ন জায়তে কোন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ।

বৃহ ৩।৯।২৮।৭

তিনি কুটস্থ,—একরূপে বর্ত্তমান।

অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতং কঠ ২।২২

সেইজন্য উপনিষদে ব্রহ্মের একটী স্বার্থক নাম "অক্ষর।"

"তদেতৎ অক্ষরং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি।

এতস্যৈব অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি—বৃহদারণ্যক ॥

তদ্বা এতদ্ অক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ। বৃ

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদসত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম।

অথ পরা যয়া তদ্ অক্ষরং অধিগম্যতে। মুণ্ড ১।১।৫

অক্ষর—যাঁহার ক্ষরণ নাই। যিনি অজর, অমর, স্থাণু, নির্ব্বিকার, অতএব নিমিত্তাতীত।

এইরূপে দেখা যায় যে উপনিষদের মতে ব্রহ্ম দেশ, কাল, নিমিত্তাতীত। অর্থাৎ তিনি দেশ কাল ও নিমিত্ত এই ত্রিবিধ উপাধির অপরিচ্ছিন্ন—অতএব নিরুপাধি। *

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

* Independent of all limitation of time, space and cause.

অভ্যাস।

পদার্থের একটি বিশেষ ধর্ম্ম এই যে উহা যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থাতেই সর্ব্বদা থাকিতে চায়, অন্য অবস্থায় আনিতে হইলে বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। যদি কোন বলপ্রয়োগ না হইত স্থির বস্তু চিরকালই স্থির থাকিত এবং সমগতিবিশিষ্ট পদার্থ চিরকালই নির্দ্দিষ্ট সরলরৈখিক পথে ভ্রমণ করিত। পদার্থের এই ধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিকগণ Inertia of matter বা জড়ের নিশ্চেষ্টতা বলেন। এই রক্ষণশীলতা বা অবস্থান্তরগ্রহণবিমুখতা যখন কোন জীবের দেহে (উপাধিতে * প্রকাশ পায়, তখনই ইহা সাধারণতঃ Habit বা অভ্যাস নামে আখ্যাত হয়।

এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে আনিতে হইলে বলপ্রয়োগ করিতে হয়। একখানি নূতন কাগজকে দুই বা ততোধিক ভাঁজে মুড়িতে চেষ্টা করুন, দেখিবেন উহার পরমাণুগুলি আপনার চেষ্টার কিরূপ বিরোধী। কিন্তু বলপূর্ব্বক উহাকে পুনঃপুনঃ কয়েকবার মুড়িলে, উহা এই নূতন অবস্থায় এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যাইবে যে তখন আর সহজে তাহা ত্যাগ করিবে না। সকলেই অবগত আছেন নূতন পাদুকা প্রথমে পদদ্বয়ের কিরূপ বিদ্রোহাচরণ করে। কিন্তু দু'চার দিন একত্রাবস্থান করিতে করিতে উহার আকৃতি প্রকৃতি পদদ্বয়ের ঈদৃশ অনুরূপ হইয়া যায় যে পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত হয়। তখন যদি কোন অপরিচিত চরণযুগল অতর্কিতে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, উহা একবারে ভীষণ প্রতিবাদ করিয়া উঠে।

আমাদের দেহগুলি জড় পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত সুতরাং তাহাদেরও ধর্ম্ম নিশ্চেষ্টতা। এই নিশ্চেষ্টতা বশতঃই তাহারা যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থাতেই থাকিতে চায়। অবস্থান্তরপ্রাপ্তি বলপ্রয়োগের অপেক্ষা করে। কিন্তু এই বলটি কোন বাহ্য বল নহে, ইহা একটি আভ্যন্তরিক বল এবং ইহার নাম ইচ্ছাশক্তি। আমি শয়ন করিয়া আছি। হস্ত পদাদি নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল রহিয়াছে। হঠাৎ কপোলে একটি মশক দংশন করিল। তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা হইল এই কণ্ডুয়ন ক্লেশটি নিবারণ করি। যেমন ইচ্ছার উদয় অমনি মস্তিষ্কে তাহার ক্রিয়া হইল,

* "দেহ" বা "উপাধি" শব্দে স্থূল, সূক্ষ্ম, ও কারণ,—ত্রিবিধ দেহই আমার লক্ষ্য।

সঞ্চালক স্নায়ুগুলি (motor nerves) হস্তের পেশীনিচয়কে আকুঞ্চিত করিল, হস্ত উঠিল ও তৎস্থান মর্দ্দন করিতে লাগিল। এক শিশু এখনও উঠিতে ও হাঁটিতে শিখে নাই। কিন্তু সে নিয়ত লোকজনকে হাঁটিতে দেখিতেছে এবং প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার মনে ঐরূপ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। এই ইচ্ছাশক্তিই অল্পে অল্পে তাহার দেহের পেশী অস্থি প্রভৃতির এরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে যে কালক্রমে সে একটি সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা (গমন পটুতা) প্রাপ্ত হইতেছে। বাস্তবিক, যাহাকে আমরা দৈহিক শিক্ষা বলি (যথা, গমন, সন্তরণ, অশ্বারোহণ, কথন, লিখন, পঠন, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, গীত, বাদন, বয়ন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ইত্যাদি ইত্যাদি)—সমস্তই আমাদের দৈহিক অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র এবং ইচ্ছাশক্তিই ইহার মূল।

একটি বালক লিখিতে পারে না, লিখন শিক্ষা করিতেছে। ইহার অর্থ কি? অর্থ এই যে সে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা হস্তের পরমাণু ও পেশী প্রভৃতিকে এক নির্দ্দিষ্ট পথে পুনঃ পুনঃ পরিচালিত করিতেছে। ক্রমাগত এইরূপ করিতে করিতে জড় পরমাণুগুলি তাহাদের স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতা বশতঃ বিনা চেষ্টাতে, (অথবা অল্প চেষ্টাতেই) ঐ নির্দ্দিষ্ট পথে ধাবিত হয়। ইহারই নাম লিখন শিক্ষা। মনে করুন উক্ত বালক 'বৈশাখ,' 'শারীরিক' ও 'পিতা'—এই তিনটি শব্দ 'বইসাক', 'সারিরীক' ও 'পীতা' এইরূপ বানান করিয়া বহুকাল লিখিল। ইহার ফল কি হইবে? যেমন ঐ শব্দগুলি লিখিবার ইচ্ছা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইবে, অমনি (তাহার অজ্ঞাতসারে) হস্তের পরমাণুনিচয় তাহাদের চিরাভ্যস্ত পথে গতিযুক্ত হইবে; সুতরাং বর্ণাশুদ্ধি জানিতে পারিলেও সে তাহা হঠাৎ বা দু এক দিনে রহিত করিতে পারিবে না। কারণ, দীর্ঘকাল ধরিয়া হস্ত যে পথে সঞ্চালিত হইয়াছে, জড়ের স্বধর্ম্মানুসারে সে স্বতঃই সেই দিকে ছুটিবে। ইহাই অভ্যাস। এই অভ্যাসটি ত্যাগ করিতে হইলে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা হস্তকে একটি নূতন ভাবে চালিত করিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে হস্তটি এই নূতন পথে চলিতে আবার এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে যে সহজে তাহাকে উহা হইতে বিচ্যুত করা যাইবে না। লিখন সম্বন্ধে যে নিয়ম, আমাদের যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই।

একটি সমতল ভূমির উপর বৃষ্টিপাত হইলে, জলরাশি সর্ব্বত্র সমভাবে

দণ্ডায়মান হয়। কিন্তু যদি ঐ জমীর মধ্যে মধ্যে খাদ কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বৃষ্টি হইবামাত্র জল ঐ সকল প্রণালীদ্বারাই বাহির হইয়া পড়ে। আবার যদি এই প্রণালীগুলি মৃত্তিকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া নূতন কয়েকটি প্রণালী খনন করা হয় তাহা হইলে জল এই নূতন পথ দিয়াই বাহির হইয়া থাকে। অধ্যাপক জেম্‌স্ বলেন আমাদের এক একটি অভ্যাস এক একটি প্রণালী স্বরূপ। যেমন মস্তিষ্কে একটি ইচ্ছাশক্তির আবির্ভাব হয়, অমনি উহা অভ্যাসরূপ প্রণালী দ্বারা বাহির হইবার চেষ্টা করে। * আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। একটি পিত্তলের গোলককে তড়িৎযুক্ত (Electrified) করা গেল। এখন যদি ভূমিসংলগ্ন একটি তাম্র তার গোলকের সহিত সংযোজিত হয়, তাহা হইলে তড়িৎপ্রবাহ ঐ তার দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। কিন্তু এই তারটি পরিত্যাগ করিয়া যদি আর একটি তার ঐরূপে সংযোজিত হয় তাহা হইলে তড়িৎস্রোত এখন এই নূতন তার দিয়াই প্রবাহিত হইবে। আমাদের অভ্যাসগুলিও আভ্যন্তরিক শক্তি নির্গমনের এক একটি রাস্তা। কিছু বলিবার ইচ্ছা হইল; তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা অভ্যস্ত ভাষা দ্বারা বাহির হইয়া পড়িল। অনভ্যস্ত ভাষা অবলম্বন করিলে, বহুকাল ধরিয়া আবার একটি নূতন খাদ কাটিতে হইবে। কাটা সম্পূর্ণ হইলে রক্তবাস্রোত এই নূতন খাদেই বহিতে থাকিবে, তখন পুরাতনটি আবর্জ্জনাদিতে প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিবে। কিছু লিখিবার ইচ্ছা হইল; অমনি দক্ষিণ হস্ত অজ্ঞাতসারে উঠিল, কলম ধরিল এবং অভ্যস্ত পথে চলিতে লাগিল। কিন্তু এই ইচ্ছাকে যদি অভ্যস্ত পথে বাহির হইতে না দিয়া বামহস্ত বা দক্ষিণ পদরূপ নূতন রাস্তা দিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করি (মুখ দিয়া অথবা পা দিয়া লিখিতে পারেন এরূপ ব্যক্তিও দেখা যায়), তাহা হইলে আবার অনেক কাল শ্রম করিয়া এই নূতন রাস্তাটি প্রস্তুত করিতে হইবে। এবং এইটি যতই প্রস্তুত হইতে থাকিবে, পূর্ব্বেরটি গতায়াত অভাবে ততই বন জঙ্গল পূর্ণ এবং গমনের অযোগ্য হইয়া পড়িবে।

---

* "An acquired habit from the physiological point of view is nothing but a new pathway of discharge formed in the brain, by which certain incoming currents ever after tend to escape."

Prof. James's Text Book of Psychology, P. 134.

আমাদের শরীরের অস্থি, রক্ত, পেশী, স্নায়ু, পরমাণু প্রভৃতি দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা দ্বারা যে পথে চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সেই পথে চলার নামই স্বাভাবিক বা সুস্থ অবস্থা (normal state)। যদি ইহারা হঠাৎ অন্য পথে চালিত হয় তাহা হইলে এই নূতন গতি প্রথমে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় এবং ইহাকেই আমরা বিকৃত বা অসুস্থ অবস্থা (morbid state) বলি। যকৃতের স্বাভাবিক যেরূপ গতি আছে যদি কোন কারণে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তাহা হইলে উহা অধিক অথবা অল্প পিত্ত নিঃসারণ করে এবং ইহা একটি পীড়া বলিয়া গণ্য হয়। আবার যত অধিকবার ইহারা নূতন পথে চালিত হইতে থাকে, (জড়ের স্বধর্ম্মানুসারে) তাহাদের এই পথে চলিবার ততই একটা প্রবণতা (tendency) জন্মিয়া যায়। এই জন্যই দেখা যায় যাঁহার একবার কোন পীড়া হয়, দ্বিতীয়বার তাহা হইবার সম্ভাবনা অধিক এবং যত অধিকবার তিনি আক্রান্ত হইতে থাকেন, পুনরাক্রমণের সম্ভাবনাও ততই বাড়িয়া যায়; অবশেষে এই বিকৃত অবস্থাই তাঁহার স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।* মনে করুন এক ব্যক্তি স্বভাবতঃ কফপ্রধান নহেন, কিন্তু একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার খুব সর্দ্দি কাসি হইল, অর্থাৎ তাঁহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (mucous membranes) অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া একটি নূতন পথে চলিতে লাগিল। এখন এই ঝিল্লিগণকে যদি অধিককাল বা অধিকবার এই পথে চলিতে দেওয়া হয় (অর্থাৎ সর্দ্দিকাসি হইবামাত্র যদি ঔষধাদি দ্বারা উহা দমিত না হয়) তাহা হইলে উহারা সর্ব্বদাই এই পথে চলিতে চাহিবে, সুতরাং তাঁহার সমগ্র জীবনে একটা সর্দ্দি কাসি স্থায়িভাবে লাগিয়া থাকা বিচিত্র নহে।

শরীরের পক্ষে যে নিয়ম মনের পক্ষে ও ঠিক তাই। শরীর যেরূপ সর্ব্বদা অভ্যস্ত পথে চলিতে চায়, মনও তাহাই চায় (কারণ মনোময় কোষও একটি জড়পদার্থ)। মনোময় কোষের সূক্ষ্ম পরমাণুগুলি নিয়ত স্পন্দিত হইতেছে। এই এক একটি স্পন্দনই আমাদের এক একটি চিন্তা। একটি বিষয় অধিক-

* "Joints that have once been attacked by rheumatism or gout, mucous membranes that have been the seat of catarrh are with each fresh recurrence more prone to a relapse, until often the morbid state chronically substitutes itself for the sound one."

James's Psychology, Chap. on Habit.

ক্ষণ চিন্তা করার অর্থ এই যে সূক্ষ্ম পরমাণুগুলিকে অনেকক্ষণ একটি নির্দ্দিষ্ট দিকে স্পন্দিত রাখা বা চালিত করা। এইরূপ করিতে করিতে, উক্ত পরমাণু-গুলি (জড়ের স্বধর্ম্মানুসারে) সর্ব্বদাই সেইভাবে স্পন্দিত হইতে চায়। এই জন্যই দেখা যায় যে ব্যক্তি যে বিষয় অধিককাল চিন্তা করিয়াছেন, সেই চিন্তাতেই তিনি স্বস্থতা ও স্বচ্ছন্দতা অনুভব করেন। যিনি সর্ব্বদা অর্থ চিন্তা করিয়াছেন, অর্থ চিন্তাই তাঁহার সহজ ও স্বাভাবিক বোধ হয়; যিনি দর্শন চর্চ্চা করিয়াছেন, দর্শনই তাঁহাব প্রিয় এবং যিনি দীর্ঘকাল ধর্ম্মচিন্তায় ব্যাপৃত, ধর্ম্মালাপ ভিন্ন আর কিছুই তাঁহাব ভাল লাগে না। যিনি বহুকাল কোটবে বাস কবিয়াছেন, কোটরই তাঁহাব প্রিয়, বাজপ্রাসাদকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান কবেন। দেখা গিয়াছে দীর্ঘকালেব পব কাবামুক্ত বন্দিগণ পুনবায় কাবাগারে যাইবাব প্রার্থনা করে। অভ্যাসই সমাজকে ধাবণ কবিয়া আছে, ঘোব বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব হইতে বক্ষা কবিতেছে। যিনি যে অবস্থায় আছেন তিনি যদি তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিতেন, ভাবিয়া দেখুন সমাজে কি ভয়ানক বিপ্লব ও অশান্তি ঘটিত। যে কৃষক বৌদ্রাতপ উপেক্ষা কবিয়া সারা জীবন ক্ষেত্রে অতি-বাহিত করিতেছে, তাহার যদি ধনীব অট্টালিকা ও বিভবাদিব প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইত, যে দুর্ভাগ্য মজুব সূর্য্যালোক হইতেও বঞ্চিত হইয়া অঙ্গার খনিব ভীষণ অন্ধকাবে চিরজীবন যাপন করিতেছে, সে যদি মানব সমাজকে নিষ্ঠুব ও স্বার্থপব না ভাবিয়া আক্রমণ কবিত, যে জাতি দীর্ঘকাল পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া অভ্যাস বশতঃ শৃঙ্খলকে বত্নমালা বোধে কতই আদব কবিতেছে সেজাতি যদি স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বদা বদ্ধপবিকব হইত, তাহা হইলে সমাজে একটা স্থিরতা ও শান্তি থাকিত না, সর্ব্বদাই ঘোব পরিবর্ত্তন ও ভীষণ সংগ্রাম চলিত।

কিন্তু এই পরিবর্ত্তন বা ক্রমাভিব্যক্তি জগতেব অখণ্ড্য নিয়ম—ভগবানের দুর্লঙ্ঘ্য বিধি। কৃষক অনন্ত কাল কৃষক থাকে না, পবাধীন চিবকাল পবাধীন থাকেনা, সকলেই ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে ও হইবে। তবে কি না করুণাময় এই অভ্যাস রূপ তমোগুণ জীবে নিহিত করিয়া তাঁহার সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন মাত্র, নিত্য বিপ্লব হইতে সমাজকে বাঁচাইতেছেন। বিশেষতঃ উন্নতির যে সোপানে যে অবস্থিত, সেই সোপানে তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে পরিপক্ক

করাই অভ্যাসের অন্যতম অভিপ্রায়। যখন যে উদ্ধতন সোপানের সম্যক্ অধিকারী হয়, তখন অভ্যাসের নিগড় ছিন্ন করিয়া সে পরবর্ত্তী সোপানে আরোহণ করে। যত দিন শিশু অপরিপুষ্ট থাকে ততদিনই গর্ভে বাস করে, পরিপক্ক হইলে সে আপনিই বাহির হইয়া আসে। তখন গর্ভ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে কি ?

অভ্যাসের একটী বিশেষ গুণ এই যে উহা আমাদের কার্য্যগুলিকে সহজ ও সুখসাধ্য করিয়া দেয়। উক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে আমাদিগকে আদৌ শ্রম বা জ্ঞানপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে হয় না। এককালে জীবের এরূপ অবস্থা ছিল, যখন তাহাকে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া, হৃদয়ের ক্রিয়া, পাকস্থলীর ক্রিয়া প্রভৃতি জ্ঞান পূর্ব্বক চেষ্টা দ্বারা (with conscious efforts) করিতে হইত। সহস্র সহস্র জীবনের চেষ্টা দ্বারা উহা এখন তাহার এরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, তদ্দিকে তাহাকে আদৌ মনোযোগ দিতে হয় না, যন্ত্রগুলি স্বতঃক্রিয়াশীল (automatic) হইয়াছে, স্বভাবতঃ নিজ নিজ কার্য্য করিয়া যায়। মুখ মধ্যে খাদ্যদ্রব্য দিবামাত্র দন্ত জিহ্বা প্রভৃতি স্বতঃই স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকে। যদি প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাদিগকে জ্ঞানপূর্ব্বক চালনা করিতে হইত, ভোজন ব্যাপারটা দুর্ব্বিষহ ক্লেশকর হইত সন্দেহ নাই। গমন করিবার সময় আমরা পদদ্বয়ের কার্য্যকুশলতার উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকি, পদদ্বয় বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করে। গান শিখিবার সময় প্রথমে বিশেষ চেষ্টা করিয়া প্রত্যেক স্বরটি কণ্ঠ হইতে বাহির করিতে হয় এবং কোথায় 'পঞ্চম', কোথায় 'ধৈবত' প্রভৃতি লাগে তাহার প্রতিও খুব মনোযোগ রাখিতে হয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ চালিত হইয়া যখন জিহ্বা কণ্ঠ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট পথে অভ্যস্ত হইয়াছে, তখন গায়ক অন্যমনস্ক থাকিলেও তাহারা নিজ নিজ কার্য্য করিয়া যায়। দর্শন করিবার সময় নেত্র-গোলকটিকে (Lensটিকে) এখন আর চেষ্টা করিয়া সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিতে হয় না ; উহা নিজের কার্য্য নিজেই করিয়া যায়।

উত্তম অভ্যাস আমাদের জীবনে যে কত প্রয়োজনীয় তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এগুলি আত্মার এক একটি যন্ত্র, এগুলির দ্বারাই আত্মা জগতে কর্ম্ম করেন। সুতরাং ইহারা যদি সর্ব্বদা আত্মার কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকে, আজ্ঞাবহ সেবকের ন্যায় সর্ব্বদা আত্মার প্রিয় কার্য্য

সাধন করে, যদি আত্মাকে জ্ঞানপূর্ব্বক চেষ্টা দ্বারা কিছুই করিতে না হয়, তাহা হইলে তিনি দৈহিক ও মানসিক যাবতীয় ক্রিয়ার ভার ইহাদের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে স্বরাজ্যে বাস করিতে পারেন। যদি হস্ত স্বতঃই জগতের হিতসাধনে লেখনী ধারণ করে, পদদ্বয় পরসেবার জন্য সর্ব্বদা ধাবিত হইতে চায়, কর্ণ ভগবৎ কথা ও জীবের দুঃখ কাহিনী শ্রবণের জন্যই উন্মুক্ত থাকে, চক্ষু স্বভাবতঃ কুদৃশ্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং সর্ব্বত্র ভগবৎ মূর্ত্তি দেখিতে পায়, রসনা সত্য, মধুর পবিত্র ও হিতজনক বাক্য উচ্চারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং মনে পবিত্র ভাব পবিত্র চিন্তা ব্যতীত অন্য ভাব আদৌ আসিতে না পারে, তাহা হইলে আমরা নবনীতের ন্যায় অসিক্তদেহে সংসার জলে ভাসিতে পারি, নর্ত্তকীর ন্যায় শীর্ষস্থিত কুম্ভের প্রতিই মন রাখিয়া সংসার-রঙ্গভূমে স্বচ্ছন্দে নাচিয়া গাহিয়া যাইতে পারি। বাস্তবিক আমাদিগকে যদি প্রতিমুহূর্ত্তে অশন, ভূষণ, গমন, কথন, শ্রবণ, মনন, উপার্জ্জন, আদান, প্রদান, ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈহিক ও মানসিক ব্যাপারের প্রতি সর্ব্বদা মনোযোগ রাখিতে হয়, তাহা হইলে উচ্চ চিন্তা করিবার মোটেই অবসর থাকে না। কিন্তু এই ছোট ছোট কার্য্যগুলি অভ্যস্ত হইয়া গেলে আমরা দেহের ও মনের স্বতঃক্রিয়াশীলতার (automatismএর) উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বদাই উচ্চ চিন্তাতে মগ্ন থাকিতে পারি।

কু-অভ্যাস বর্জ্জন এবং সদভ্যাস অর্জ্জন কিরূপ প্রয়োজনীয় ও হিতকর তাহা আমরা কতকটা বুঝিলাম। এখন প্রশ্ন এই যে কিরূপে ইহা সাধিত হইতে পারে। সদভ্যাস-অর্জ্জনের কোন নিয়ম আছে কি? অধ্যাপক বেন্ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে দুইটি নিয়ম পাওয়া যায়। প্রথম, যে অভ্যাসটি অর্জ্জন করিতে আমরা সঙ্কল্প করির তাহার অনুকূলে যতদূর প্রবল যুক্তি সংগ্রহ করা যাইতে পারে, ততদূর করা কর্ত্তব্য। অভ্যাসটির দ্বারা কত দিকে কত উপকার হইবে—শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক—এইগুলি সর্ব্বাগ্রে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে হইবে। পরে ভাবিয়া দেখিতে হইবে ইহার বিপরীত অভ্যাসটি (যাহা পরিহার করিতে যাইতেছি) কি বিষম অনিষ্টকর, নিন্দনীয় ও ঘৃণিত! এইরূপ করিলে, অভ্যাসটি লাভ করিবার জন্য এক দুর্দ্দমনীয় বলবতী ইচ্ছা জাগিয়া উঠিবে, তখন মনে হইবে যেরূপেই হউক ইহা

করিবই করিব। এই ইচ্ছাশক্তির উদ্রেক করাই সর্বাগ্রে কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় নিয়ম এই যে যদবধি নূতন অভ্যাসটি সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত না হয়, জীবনে দৃঢ় ভাবে বদ্ধমূল হইয়া না যায়, তদবধি যেন একটিমাত্রও পদস্খলন না ঘটে। আপনি হয়ত বহুদিন চেষ্টা করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ প্রলোভনে পড়িয়া পুরাতন অভ্যাসটিকে একবার প্রশ্রয় দিলেন। এই একটি স্খলন আপনার বহু দিনের শ্রমকে ব্যর্থ করিয়া দিবে। এইজন্য প্রথমতঃ সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে যেন একটি মাত্রও পরাজয় না ঘটে। *

অধ্যাপক জেমস্ আর একটি নিয়ম দিয়াছেন। ইহা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন কেবল সঙ্কল্প করিলে চলিবে না, কার্য্য করা চাই। কোন সৎকার্য্য করিবার বাসনা যেমন অন্তরে জাগিয়া উঠিবে, যেমন একটি সঙ্কল্পের উদয় হইবে, সেই মুহূর্ত্তে (অথবা যথাসম্ভব সত্বর) তদনুরূপ একটি কার্য্য করিতে হইবে। কারণ, কার্য্যের দ্বারাই অভ্যাস গঠিত ও দৃঢ়ীভূত হয়, কেবল চিন্তা দ্বারা নহে।

মনোবিজ্ঞানের একটি প্রধান নিয়ম এই যে অগ্রে চিন্তা পরে কার্য্য (Thought precedes action)। চিন্তা, ভাব, বাসনা—এগুলি মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্র, ইহাদের স্বভাবই এই যে ইহারা অনুরূপ কার্য্যে আমাদিগকে প্রণোদিত করে। এবং এই কার্য্যগুলি আমরা যতই করিতে থাকি, ততই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার নিয়মানুসারে (by the law of the action and re-action) এই ভাবগুলিও ক্রমশঃ অধিকতর বলবান্ ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু যদি ভাবগুলিকে স্বাভাবিক পথে (কার্য্যের পথে) যাইতে না দিয়া মনের মধ্যে কেবল ধরিয়া রাখি তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ আন্দোলিত হইয়া তাহারা স্থৈর্য্যধারণ করিবে। বাষ্পযানের বয়লারে যে ষ্টীম সঞ্চিত হয় তাহা সুপথে পরিচালিত হইলেই সুন্দর ও বিস্ময়জনক ফল উৎপাদন করে; কিন্তু যদি উহাকে কেবল বয়লারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে উহা তন্মধ্যে কিয়ৎক্ষণ ছটোপাটি করিয়া শীতল হইয়া পড়ে।

* "It is necessary, above all things, in such a situation never to lose a battle. Every gain on the wrong side undoes the effect of many conquests on the right."—BAIN.

দয়া, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক মাত্র কোন না কোন কার্য্য করা চাই। না করিলে তাহারা যে কেবল নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহা নহে, আর একটি বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। ভবিষ্যতে কার্য্যকরী শক্তিটাই একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে। অন্তরের ভাবকে যদি ক্রমাগত অন্তরেই বিলীন হইতে দেওয়া হয়,—যদি উহাকে কার্য্যে পরিণত করা না হয়, তাহা হইলে এইরূপ বিলীন হইয়া যাওয়া উহার অভ্যাস বা স্বভাবই দাঁড়াইয়া যায়। তখন অন্তরে ভাবের উদ্রেক হইলে উহা কেবল হৃদয়ের চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়াই নিরস্ত হয়, কোন কার্য্য প্রসব করিতে পারে না। যেমন বয়লারের স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকিলে ষ্টীম এই ছিদ্র পথেই অলক্ষ্যে বাহির হইয়া যায়, কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধন করিতে পারে না, ইহাও ঠিক সেইরূপ। ইহা মানবের একটি বড়ই শোচনীয় অবস্থা। ভাব আছে, অথচ কর্ম্ম করিতে পারে না। এই ভাবযুক্ত কর্ম্মপঙ্গুতা বা কর্ম্মশূন্য ভাব প্রবণতাকে ইংরাজীতে Sentimentalism বলে। অতিরিক্ত সঙ্গীত চর্চ্চা, কাব্যালোচনা বা উপন্যাস পাঠের দ্বারা এই অবস্থা আসিতে পারে। ক্রমাগত হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক হয় অথচ একটি ভাবও কার্য্যে পরিণত করা হয় না। এইরূপ করিতে করিতে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে তিনি কেবল নাটক উপন্যাসাদিতেই দয়া ও ভক্তির পাত্র দেখিতে পান. প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ পাত্র তাঁহার নয়নগোচর হয় না। হয়ত King Lear পাঠ করিতে করিতে Lear এর দুঃখে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না, অথচ গৃহে নিজ পিতাকে খাইতে দেন না। "প্রত্যেক জননীর স্বীয় সন্তান পালন করা কর্ত্তব্য"—এই অর্থে হয় ত একটা খুব ভাবপূর্ণ বক্তৃতা করেন অথচ স্বীয় সন্তানকে লালনপালনের জন্য অনাথ-আশ্রমে পাঠাইয়া দেন। অধুনা আমাদের দেশেও ঈদৃশ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কেহ হয় ত দুইহস্ত পরিমিত ভূমির জন্য স্বীয় সহোদর ভ্রাতার মুখাবলোকন করেন না অথচ মুসলমানাদির সহিত সামাজিক আহার বিহার ও বিবাহ প্রথা প্রচলন করিয়া ভ্রাতৃত্বস্থাপনে সমুৎসুক! কেহ বা নিজ ঔরসজাত পুত্রদিগের ভরণপোষণ বা শিক্ষাদান দূরে থাক্, সংবাদও রাখেন না অথচ ডোম, হাড়ি, চণ্ডাল প্রভৃতির সন্তানগণ শিক্ষিত হয় না ইহা ভাবিয়া চক্ষের জলে স্বীয় বক্ষ ভাসাইয়া দেন।

কর্ম্মশূন্য ভাবপ্রবণতা প্রায় সকলের মধ্যেই অল্পাধিক দৃষ্ট হয়। ইহা বদ্ধমূল

হইয়া না যায় তজ্জন্য আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। ইহা নিবারণের একমাত্র উপায় কর্ম্ম। যেমন অন্তরে কোন ভাবের উদয় হইবে, তৎক্ষণাৎ কোন না কোন কার্য্য করিতেই হইবে। অবশ্য, খুব একটা বৃহৎ বা জগদ্ব্যাপী মহৎ কার্য্য করিবার সুবিধা সকলের না হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকেই স্বীয় ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ স্বচ্ছন্দে অভ্যাস করিতে পারেন। দয়া হইবামাত্র দরিদ্র বা ভিক্ষুককে যৎকিঞ্চিৎ দান বা পীড়িতের সেবা, স্নেহের উদয় মাত্র শিশু সন্তানগুলিকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন অথবা বালক বালিকাদিগকে কিঞ্চিৎ ভোজ্যবস্তু দান, প্রেমের উদয়ে বন্ধুবান্ধবের কিঞ্চিৎ উপকার সাধন অন্ততঃ সাদর সম্ভাষণ, ভক্তির উদ্রেক হইবামাত্র গুরু দেবতাদির চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ইত্যাদি ছোট ছোট কার্য্যগুলি আমরা অনায়াসেই করিতে পারি। এবং অগ্রে এইগুলি অভ্যাস না করিলে একটি বৃহৎ কার্য্য করিবার আশা সুদূর-পরাহত। জেমস্ বলেন যে এমন কি একটি সঙ্গীত শ্রবণেও হৃদয়ে যে ক্ষণিক কোমলতাটুকু আইসে, তাহাও যেন শুধু শুধু বিলীন না হয়। ইহাকে কার্য্যে পরিণত করা উচিত। কার্য্যটি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন—ঠাকুরমাকে দুটি মিষ্ট কথা বলা অথবা ট্রাম গাড়ীতে অপরের জন্য নিজস্থান ছাড়িয়া দেওয়া—যাহাই হউক না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না ; কিন্তু কার্য্যটি চাই।

কর্ম্মের দ্বারাই ভাব পরিপুষ্ট, বদ্ধমূল ও ক্রমশঃ আমাদের স্বভাবের অংশী-ভূত হইয়া যায়। এই জন্যই আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে গেলে সাধনার প্রয়োজন। সাধনা কর্ম্মেরই নামান্তর মাত্র। সাধনা ব্যতীত কেহই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে পারেন না। কেবল শাস্ত্রালোচনা করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া যায় না,—কর্ম্মের প্রয়োজন। যদি বেদান্ত পাঠ করিলেই ব্রহ্ম-জ্ঞান হইত, তাহা হইলে বহুসংখ্যক ব্যক্তিরই এতদিনে নির্ব্বাণ মুক্তি হইয়া যাইত। একটি গল্প আছে। এক পণ্ডিত সমগ্র জীবন বেদান্ত চর্চ্চায় অতি-বাহিত করিয়া যুক্তি ও বিচারে বেশ বুঝিতে পারিলেন যে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। একদা তিনি এক সাধকের নিকট তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় দিতেছিলেন। সাধক ঈদৃশ জ্ঞানের অসারতা বুঝাইয়া দিবার জন্য মায়াবলে একটি ব্যাঘ্র সৃষ্টি করিলেন। ব্যাঘ্রটি পণ্ডিতের অদূরে আস্ফালন করিতে লাগিল। হায়, হায়! কোথায় পণ্ডিতের জগতের

মিথ্যাত্ব জ্ঞান এবং কোথায় বা তাঁহার "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"? তিনি ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া দ্রুতপদে পলায়নপর হইলেন। তখন সাধক মৃদুহাস্যে ব্যাঘ্রকে অপসারিত করিয়া পণ্ডিতের ভীতি অপনোদন করিলেন। প্রকৃত জ্ঞানী হইতে হইলে অগ্রে সাধক হওয়া চাই। "মাতৃবৎ পরদারেষু" এই কথা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে চলিবে না, রমণীমাত্রকে "মা" বলিয়া ডাকিতে হইবে, পুষ্পচন্দনে চরণ পূজা করিতে হইবে, তবেই ক্রমশঃ সকলের প্রতি মাতৃভাব আসিবে। শুনা যায় কোন সাধকশ্রেষ্ঠ সাধনার প্রথমাবস্থায় ভেদজ্ঞান দূর করিবার জন্য এক হস্তে টাকা ও অপর হস্তে মাটি লইয়া "টাকা মাটি, মাটি টাকা" এই কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতঃ দুইটিই গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতেন। বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান কেবল পুস্তক পাঠেও হয় না, কেবল চিন্তা দ্বারাও হয় না, মধ্যে মধ্যে বিষ্ঠাকে চন্দনের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়, সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া এমন কি লেহন করিয়াও দেখিতে হয় চিত্তবিকার জন্মে কি না। সুরক্ষিত অট্টালিকার মধ্যে বসিয়া "আমি অজর, অমর, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অতএব আমার কিসের ভয়" এইরূপ চিন্তামাত্র করিয়া ভয়কে জয় করা যায় না, প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়, অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে মহাশ্মশানে একাকী গিয়া শবের উপর আরোহণ করিয়া দেখিতে হয় চিত্ত নির্ব্বিকার ও জপে একাগ্র থাকিতে পারে কি না। আপেক্ষিকগুরুত্ব (Specific gravity) নিয়মানুসারে এবং বল-সমান্তরিকের (Parallelogram of force এর) নিয়মানুসারে মানব অনায়াসে সাঁতার দিতে পারে দ্বিতল গৃহের উপর বসিয়া ইহা বিচার করিলেই সাঁতার শিখা যায় না, জলে নামিয়া হাত পা ছুঁড়িতে হয়। ফল কথা এই যে সাধনার দ্বারাই ভাব দৃঢ়, স্থায়ী ও বাস্তব (Real) হইয়া থাকে।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

মরণ ও মরণান্তে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতেবপব)

তৃষ্ণা কি? না, বাচিযা থাকাব ঐকান্তিক ইচ্ছা। তৃষ্ণাকে বৌদ্ধগণ "তন্‌হা" কহেন। এই তৃষ্ণা বা তন্‌হা এবং তাহাব উপাদানই "নূতন জীব" ও কর্ম্ম নিরূপণেব মূলকাবণ।

ভূতভাবোদ্ভবকবো বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ॥--গীতা। ৮ম অঃ।

কর্ম্মই ভূতেব (জীবেব) উৎপাদক ও নিয়ামক।

তৃষ্ণাই জীবকে পুনঃ পুনঃ মর্ত্ত্যলোকে অনয়ন কবে। জন্মে জন্মে তাহাব কিরূপ কর্ম্ম সাধন কবিতে হইবে, কি প্রকাবেব সুখ দুঃখ ভোগ কবিতে হইবে ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম্মই তৃষ্ণা দ্বাবা স্থিবীকৃত হয়। কথা এই, যাহারা স্বাভাবিক ভাবে কালগ্রাসে পতিত হয, তাহাবা অবস্থাভেদে কযেক ঘণ্টাকাল বা কয়েক বৎসবকাল পৃথিবীব আকর্ষণ শক্তিব অধীনে কামলোকে অবস্থান কবে। কিন্তু আত্মঘাতী ও অপঘাতে মৃত ব্যক্তিগণ এই নিয়মেব অন্তর্ভূত নহে। কাজেই তাহাদেব মধ্যে যদি কেহ আশি বা নব্বই বছবের পবমায়ু লইয়া জন্ম গ্রহণ কবে, কিন্তু যদি সে বিশ বছব বয়সে আত্মহত্যা কবে বা অপঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে কয়েক মুহর্ত্ত বা কয়েক বৎসব মাত্র অবস্থান কবিয়াই কামলোক হইতে পবিত্রাণ পাইবে না। তাহাকে তাহার স্বাভাবিক পরমায়ু-কালেব অবশিষ্ট ষাট বা সত্তব বৎসবকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী ভূতেব ন্যায় কামলোকে অতিবাহিত কবিতে হইবে। তাহাদেব তুলনায় যাহাবা পূর্ব্বোক্ত রূপে সুখস্বপ্নে আকাশ ক্রোড়ে শয়ান থাকে, তাহাদিগকে সহস্রগুণে অধিক ভাগ্যবান বলিতে হইবে।

এখন ভাবিয়া দেখ, এইরূপ নিবাপদ শান্ত অবস্থা হইতে যাহারা তৃষ্ণাব আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আবিষ্ট ব্যক্তিব নিকট উপস্থিত হয়, তাহাদেব কতই না উদ্বেগ, কতই না যন্ত্রণা উপস্থিত হয়? আবার যাহাবা সুখ স্বপ্নেব অবস্থা হইতে তাহাদিগকে আহ্বান ও আকর্ষণ করিয়া আনে, তাহাদেরই না কত কষ্ট হয়? ইহা কি অপরিণামদর্শী প্রেততত্ত্ববাদী বা তাহাদেব আবিষ্ট ব্যক্তি একবাব

ভাবিয়া দেখে? এইরূপে অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করায় তাহাদের বিষয়তৃষ্ণা ও বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইয়া উঠে, তাহাতে নব নব স্কন্ধ সমূহের বিষয়প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয় এবং জন্মান্তরে তাহার নবদেহে কামাদিরিপুগণ গতজীবনাপেক্ষা অধিকতর তীব্র ও প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে। এই সকল দ্বারাই তাহার ভাবী জীবনের অবস্থা স্থিরীকৃত হয়। অতএব আবিষ্ট ব্যক্তিদ্বারা জীব কামলোক হইতে আকৃষ্ট হইয়া আসিলে তাহার পরবর্ত্তী জীবনের ঘোর অনিষ্ট ও অমঙ্গলের বীজ রোপণ করা হয়। তজ্জন্য বলি, তাহাদিগকে এইরূপে না আনাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কুকার্য্য, অত্যধিক অধ্যয়ন বা কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছায় অকাল মৃত্যু ঘটিলে, জীবের কামলোকে অবস্থানকাল অধিক হয় বটে, তবে উদ্দেশ্য ও মরণের প্রকার ভেদে তথায় তাহাদের অবস্থার সমূহ ইতরবিশেষ হইয়া থাকে।

কতকগুলি কুকার্য আছে যাহাতে রত থাকিলে অকালে পরমায়ু শেষ হয় এবং আত্মহত্যারূপ মহাপাপে পাতকী হইতে হয়। কিন্তু মহামায়ার মায়ার এমনই মোহ যে, এই পাপাশয়গণ এই বিষময় পরিণামের প্রতি ভ্রমেও লক্ষ্য করিতে চায় না। কিন্তু হইলে কি হয়? পাপের শাস্তি এড়াইবার কি যো আছে? কার্য্যের ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়াই দণ্ডের তারতম্য হইয়া থাকে, কার্য্যের ফলের দ্বারা বিচার হয় না। ঝড়তুফানে সাগরজলে পড়িয়া মরিলেও তাহাকে আত্মঘাতী বলা যাইতে পারে, আবার অপরিমিত অধ্যয়ন ও তীব্র মানসিক শ্রমে যাহার অকাল মৃত্যু ঘটে, তাহাকেও আত্মঘাতী বলা যায়। সমুদ্র ভ্রমণে জলমগ্ন হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে। অত্যধিক মানসিক শ্রমে মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া তদ্স্থিত কোমল পদার্থ গলিয়া গিয়া মৃত্যু ঘটাইতে পারে। এই ভয়ে কি কেহ কালাপানি পাইড় হইবে না? বা জলমগ্ন হইয়া সংজ্ঞালোপ হওয়ার ভয়ে সাগর জলে অবগাহন করিবে না? অথবা কোন মহৎ কার্য্যের জন্য জীবনদান করা দূরে থাকুক, যে সব সৎ ও কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রাণ বিনাশের কিঞ্চিন্মাত্রও আশঙ্কা আছে, সেই সকল অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ হইতে কি এজন্য বিরত থাকিতে হইবে? কখনই না! তাহা হইলে প্রকৃত মানবজীবনের সার্থকতা রহিল কৈ? তবেই বুঝিতে হইবে, যে সব

উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া স্বীয় জীবননাশক কার্য্য করা যায়, সেই সকল উদ্দেশ্য (Motives) ই মূল।

যে হতভাগা মুখ্যভাবে নিজ দায়িত্বে আত্মহত্যা করে, কেবল সেই তাহার অবিমৃষ্যকারিতার কঠোর শাস্তিভোগ করে, অপরে সেরূপ শাস্তিভোগ করে না। আত্মঘাতীগণ সবিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া, স্বেচ্ছায় দৃঢ় সংকল্প করিয়া এবং উপস্থিত কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী আশু ফলের বিষয় অবগত থাকিয়া নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে! তাই, তাহার কৃতকার্য্যের পরিণাম ফল অতি শোচনীয়। কিন্তু যদি কেহ সাময়িক উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়া ফেলে, তবে তাহাকে আত্মঘাতী বলা যায় না। এই রকমের লোক কামলোকে অবস্থান করিয়া ভোগবাসনার লোভে আকৃষ্ট না হইয়া গভীর নিদ্রার ক্রোড়ে এতাবৎকাল শয়ান থাকে।

অতএব দেখা গেল যে নানারূপ বিসদৃশ ও অতি ভয়ানক চরিত্রের লোক দ্বারা কামলোক পূর্ণ থাকে, কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় যাহাদের হঠাৎ মৃত্যু ঘটে, হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত হইয়া আদালতের বিচারে যাহাদের প্রাণদণ্ড হয়, বা যাহারা অন্য কর্ত্তৃক নির্দ্দয়রূপে হত হয়, তাহারা সকলেই রাগ, দ্বেষ, প্রতিহিংসার তীব্র ইচ্ছা, অতৃপ্ত লালসা প্রভৃতি অত্যুগ্র ভাবাদিতে উত্তেজিত থাকিয়া কামলোকে বাস করে। তাহারা বড়ই সাংঘাতিক ও ভয়ানক জীব। খুনী, হত্যাকারীগণ সমাজের কণ্টক স্বরূপ সত্য, কিন্তু হত্যাপরাধে তাহার ফাঁসি হইলে, কামলোকে গিয়া সে অধিকতর ভয়ানক ও অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। হত্যাকারীর হাত হইতে নিরাপদ থাকার জন্য সমাজ প্রতিকার করিতে পারে, কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অজ্ঞাবস্থায় শেষোক্ত জীবের হাত হইতে নিরাপদ থাকা বড় কঠিন কাজ। আত্মঘাতী সম্বন্ধে এখানে এই পর্য্যন্তই বলা হইল। পরিশিষ্টে এই বিষয়ের উপসংহার করিব।

কামলোকে ভোগাবসান।

অবশেষে আবরণস্বর রূপত্রয় কামদেহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কামলোক হইতে প্রস্থান করে। অন্তর্ম্মুখী মন অহংকারের রশ্মি; এই রশ্মীগত জীবনের নানারূপ দৃশ্যাবলিতে অনুরঞ্জিত হইয়া আহৃতি সংস্কার সমূহ সহ তাহার

উৎপাদক যে অহংকার, তাহাতে গিয়া মিশে। ভৃত্য কৃষকক্ষেতের কাজ সমাধা করিয়াছে, প্রভু তাহাকে ডাকিলেন! ভাল হউক মন্দ হউক, অধিক হউক অল্প হউক, যে যেরূপ পরিশ্রম করিয়া যে পরিমাণ শস্য সংগ্রহ করিয়াছে, যাহার ভাগ্যে যেরূপ ঘটিয়াছে, তাহা নিয়াই সে বাড়ী ফিরিল। যখন অবিনশ্বর জীব কামলোক পরিত্যাগ করে, তখন সে সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীর গণ্ডি ও আকর্ষণের বাহিরে চলিয়া যায়। তখন আর ইহলোকে যাতায়াত করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুদর্শন দাস।

রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামী।

কল্কি—

কলিযুগের অবসানে শ্রীভগবান বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণ হইতে কল্কিরূপে অবতরণ করিয়া দস্যু প্রকৃতি নরগণের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক কলাপ গ্রামস্থ যোগযুক্ত চন্দ্রবংশীয় শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি ও সূর্য্যবংশীয় মরু দ্বারা পুনর্ব্বার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন।

মন্বন্তরাবতার যজ্ঞ প্রথম মন্বন্তরাবতার। ইনি লীলাবতারের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। দ্বিতীয় মন্বন্তরাবতার বিভু। ইনি বেদশিরা নামক পিতা হইতে তুষিকা নাম্নী জননীতে আবির্ভূত ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য উপদেশ করিয়াছিলেন। তৃতীয় মন্বন্তরাবতার সত্যসেন। ইনি ধর্ম্ম হইতে সূনৃতাতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ইন্দ্রের শত্রু সকল বিনাশ করিয়াছিলেন। চতুর্থ মন্বন্তরাবতার হরি। ইনি হরিমেধা হইতে হরিণীতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্র শত্রু সকলের বিনাশ সাধন ও কুম্ভীরের মুখ হইতে গজেন্দ্রের উদ্ধার করিয়াছিলেন। পঞ্চম মন্বন্তরাবতার বৈকুণ্ঠ। ইনি শুভ্র হইতে বৈকুণ্ঠাতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ মন্বন্তর পালন ও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বৈকুণ্ঠলোক রচনা করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ মন্বন্তরাবতার অজিত। ইনি বৈরাজ হইতে সম্ভূতিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন। ইনিই উক্ত মন্বন্তরে কূর্ম্মাদিরূপ পরিগ্রহ করিয়া-

ছিলেন। বামন দেবই সপ্তম মন্বন্তবাবতাব হইয়াছিলেন। অষ্টম মন্বন্তবাবতার সার্ব্বভৌম। ইনি উক্ত মন্বন্তবে দেবগুহ্য হইতে সবস্বতীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া পুবন্দব নামক ইন্দ্র হইতে স্বর্গরাজ্য হবণ পূর্ব্বক বলি বাজাকে অর্পণ কবিবেন। নবম মন্বন্তবাবতার ঋষভ। ইনি আয়ুষ্মান হইতে অম্বুধবাতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক শম্ভু নামক ইন্দ্রকে স্বর্গবাজ্য অর্পণ কবিবেন।

একাদশ মন্বন্তরাবতাব ধর্ম্মসেতু। ইনি আর্য্যক হইতে বৈধৃতাতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নিজ মন্বন্তর পালন কবিবেন। দ্বাদশ মন্বন্তাববতাব সুধামা। ইনি সত্যবহা হইতে সুনৃতাতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ মন্বন্তব পালন কবিবেন। ত্রয়োদশ মন্বন্তবাবতাব যোগেশ্বব। ইনি দেবহোত্র হইতে বৃহতীতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ মন্বন্তব পালন কবিবেন। চতুর্দ্দশ মন্বন্তবাবতাব বৃহদ্ভানু। ইনি সত্রায়ন হইতে বিনতাতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ মন্বন্তব পালন কবিবেন। এক কল্পে ব্রহ্মাব একদিনে এই চতুর্দ্দশটি মন্বন্তবাবতাব হয়েন। অতএব ব্রহ্মাব একমাসে ৪২০টি, এক বৎসবে ৫০৪০টি ও শত বৎসরে ৫০৪০০০০টি মন্বন্তবাবতাব হইয়া থাকেন।

যুগাবতার। যুগাবতাব চাবিটি। মন্বন্তবাবতাব সকলই নিজ নিজ মন্বন্তরে যুগাবতাবরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া যুগ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন কবেন। সত্যযুগে শুক্ল নামক যুগাবতার, ত্রেতাযুগে বক্ত নামক যুগাবতাব, দ্বাপব যুগে শ্যাম নামক যুগাবতার, এবং কলি যুগে কৃষ্ণ নামক যুগাবতাবেব কথা শ্রবণ কবা যায়। সত্য যুগে শুক্লবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, জটিল, বল্কলাম্বব, কৃষ্ণমৃগচর্ম্মধাবী, যজ্ঞসূত্র বিশিষ্ট, অক্ষমালা-বিভূষিত, দণ্ডকমণ্ডলুধাবী ব্রহ্মচাবী বেশে অবতবণ কবিয়া ধ্যান-ধর্ম্ম প্রচাব কবিয়া থাকেন। ত্রেতাযুগে বক্তবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, ত্রিমেখল, হিবণ্যকেশ, বেদাত্মা এবং স্রুকস্রুবাদি দ্বাবা উপলক্ষিত যজ্ঞমূর্ত্তিতে অবতবণ কবিয়া যজ্ঞধর্ম্ম প্রচাব করিয়া থাকেন। দ্বাপব যুগে কখনও শ্যামবর্ণ, কখনও শুকপত্রবর্ণ, কখনও হবিদ্বর্ণ, কখনও পীতবর্ণ হইয়া অবতবণ কবিয়া থাকেন। অতীত দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান পূর্ণব্রহ্ম অতসীকুসুমের ন্যায় বা নবীন নীবদেব ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবর্ণ, বক্ষঃস্থলের বামভাগে দক্ষিণাবর্ত্ত বোমাবলিরূপ শ্রীবৎস চিহ্ন ও কবচরণাদিতে পদ্মাদিরূপ চিহ্ন দ্বাবা চিহ্নিত এবং কৌস্তুভাদি লক্ষণে উপলক্ষিত শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া অর্চ্চনরূপ যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কলিযুগে শ্রীভগবান

কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদ আবেশরূপে অবতরণ পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের প্রচার করিয়া থাকেন। বিশেষ বিশেষ দ্বাপরে ও বিশেষ বিশেষ কলিতে স্বয়ং ভগবানই অবতরণ করিয়া থাকেন। যে দ্বাপরেও সে কলিতে স্বয়ং ভগবানের অবতার হয়, সেই দ্বাপরেও সেই কলিতে আর পৃথক যুগাবতারের প্রয়োজন হয় না। তৎকালে যুগাবতার শ্রীভগবানেই প্রবিষ্ট হইয়া যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন।

স্বয়ং রূপাবতার। ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম শ্বেত বরাহ কল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশচতুর্যুগস্থ বর্ত্তমান কলিযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপর যুগের সন্ধ্যাংশ সময়ে, অর্থাৎ ৮৬৩,৮০ অব্দ গতে দক্ষিণায়নে, বর্ষাকালে, ভাদ্র মাসের অষ্টম দিবসে, কৃষ্ণ পক্ষীয়া অষ্টমী তিথিতে, বুধবারে, রোহিণী নক্ষত্রে, আয়ুষ্মান যোগে কৌলবকরণে, ষটচত্বারিংশদ্দণ্ডে, রাত্রির চতুর্দ্দশ দণ্ড গতে, বৃষলগ্নে, শুক্রের ক্ষেত্রে, সূর্য্যের হোরায়, বুধের দ্রেক্কাণে, শুক্রের নবাংশে, মঙ্গলের দ্বাদশাংশে, বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে বৃষরাশিস্থ চন্দ্রে, মকররাশিস্থ মঙ্গলে, কন্যারাশিস্থ বুধে, তুলারাশিস্থ শুক্রে ও শনিতে, মীন রাশিস্থ বৃহস্পতিতে, সিংহ রাশিস্থ রবিতে ও বৃশ্চিক রাশিস্থ রাহুতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা মণ্ডলে অবতরণ করিয়াছিলেন। বেদে, রামায়ণে, পুরাণে ও ভারতে, সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের অবতার গীত হইয়া থাকে। সকল বেদেই শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়। নিদর্শন স্বরূপ ঋগ্বেদের তৃতীয় অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায় দেখ।

ঐ স্থানে উক্ত হইয়াছে,—"ওঁ কৃষ্ণং ত এম রুশতঃ পুরোভাশ্চরিষ্ণ্বর্চ্চির্বপুষা-মিদেকং যদপ্রবীতা দধতেহগর্ত্তং সদ্যশ্চিজ্জাতো ভবসীহ দূতঃ" ইতি। কৃষ্ণম্ এম প্রপ্নুয়াম্, যস্য তে তব রুশতঃ রোচমানস্য পুরোভাঃ পুরস্তাদ্দীপ্তিঃ ভবিতা। চরিষ্ণু সঞ্চরণশীলম অর্চ্চিঃ বপুষাং বপুষ্মতাম্ একম্ ইৎ এব যৎ যং ত্বাম্ অপ্রবীতা, নাস্তি প্রকর্ষেণ বীতং গমনং যস্যাঃ সা নিগড়িতা দেবকী কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়েতি ছান্দোগ্যে পঞ্চম প্রপাঠকে দেবক্যা এব কৃষ্ণ মাতৃত্বদর্শনাৎ, গর্ত্তং হ দধতে ধারয়তি। সদ্যশ্চিৎ সদ্যঃ এব ইহ জাতঃ আবির্ভূতঃ সন দূতঃ মাতুর্বিয়োগ দুঃখপ্রদঃ ভবসি ইতি ভাবার্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি। তিনি পুরোভাগে দীপ্তিমণ্ডল মণ্ডিত। তিনি সঞ্চরণশীল, তেজের প্রভায় অদ্ভুত শরীর ধারণ পূর্ব্বক অদ্বিতীয় শরীরী হয়েন।

নিগড়িতা দেবকী তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি দেবকীর গর্ভ্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া ব্রজে গমন পূর্ব্বক জননীর সম্বন্ধে বিয়োগ দুঃখপ্রদ হয়েন।

পুনশ্চ ঋগ্বেদে ১০ম মণ্ডলে খিলসূক্তে এই মন্ত্রটি পঠিত হয়।

"কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তু তে।"

এই শ্রুতির অর্থ অতিশয় স্পষ্ট। সমস্ত বেদে অর্থাৎ মন্ত্রে, ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে ও পুরাণেতিহাসে, এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়। আবার শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবরূপ পরম উৎকর্ষও বেদে উক্ত হইয়া থাকেন। ঋগ্বেদের পরিশিষ্ট খণ্ডে শ্রীরাধামাধবের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে ;—যথা "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা" ইত্যাদি।

এই শ্রুতির অর্থ অতিশয় স্পষ্ট— (ক্রমশঃ)

ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভগবান মনু উল্লিখিত দশলক্ষণযুক্ত সাধারণ ধর্ম্মের* ধৃতি ও ক্ষমা, এই নামের দুইটী লক্ষণের আলোচনা করা হইয়াছে। এইবার আমরা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট "দম" ধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিব।

দম, তৃতীয় ধর্ম্ম।

বেদান্তসার বলিয়াছেন, "তৎ তু বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। —"তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম।"

অপরের মত কিন্তু অন্যরূপ। "বিষয়াদ্ ব্যাবৃত্তস্য মনসো যথেষ্টবিনিয়োগ যোগ্যতা।"—নানা বিষয়ে আসক্ত মনকে, সমস্ত বিষয় হইতে টানিয়া, কোনও ইষ্ট বস্তুতে বিনিয়োগের যোগ্যতার নাম দম। ভগবান মনু এই শেষোক্ত অর্থে দম কথার প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি যে অর্থে "ইন্দ্রিয় নিগ্রহ" ব্যবহার করিয়াছেন, বেদান্তসার সেই অর্থে "দম" ব্যবহার করিয়াছেন ; তিনি যে অর্থে

---

* ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ মনু ৬।৯২]

"দম" ব্যবহার করিয়াছেন, বেদান্তসারে সেই অর্থে "শমের" প্রয়োগ দেখা যায়। বেদান্তসার "শমের" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।" শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দশম অধ্যায়ের চারের শ্লোকের টীকায় ভগবান শঙ্করাচার্য্য "শম" ও "দমের" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"দমোবাহ্যেন্দ্রিয়োপশমঃ", শমোহন্তঃকরণস্যোপশমঃ।" শ্রীধরস্বামীকৃত টীকায়ও তাহাই আছে,—"দমো-বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ," "শমোহন্তঃকরণসংযমঃ।" বর্ত্তমান পরাবিদ্যাসমিতির পুস্তকা-দিতেও "শম" ও "দমের" এই উপরিউক্ত ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। পূজনীয়া মহামতী বেসান্ত তাহাদিগের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ;—*"Shama control of the mind, that definite regulation of thought, that definite understanding of the effects of thought, and of his relation to the world around him. as he effects it for good or for evil by his own thinking." তাঁহার মতে শমের অর্থ, "মনঃসংযম ; মানব চিন্তার দ্বারা জগতের কি ইষ্টানিষ্ট সাধন করিতে পারে তাহা জানিয়া, কিরূপ চিন্তায় কিরূপ ক্রিয়া হয় তাহা জানিয়া, জগতের মাঝে মানবের কি মহান কর্ত্তব্য ইহা উপলব্ধি করিয়া, মানব যে গুণের সাধনায় আপন চিন্তাশক্তিকে সংযত করে, তাহাই শম।" তিনি "দম" অর্থে এইরূপ বুঝেন ;—"Dama—Control of the senses and the body, that which we may call regulation of conduct'* দমের অর্থ বহিরিন্দ্রিয় ও দেহের সংযম ; ইহার দ্বারা মানব সংযতভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়।'

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভগবান মনু "মনঃসংযম" অর্থে "দম" ব্যবহার করিয়া-ছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমৎ কুল্লুভট্ট এই শ্লোকব্যাখ্যায় লিখিয়া-ছেন, "মনসো দমনং দম ইতি সনন্দবচনাৎ।" নানালোক নানাভাবে ইহা-দিগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাহাদিগের অর্থ সম্বন্ধে এত বিষদভাবে আলোচনা করিলাম। আমার বিশ্বাস যদ্যপি কেহ কেবল কথার জন্য মারামারি না করিয়া, লেখকের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার কোনও ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা নাই। কেবল যে ভগবান মনু এই অর্থে "দম" শব্দের

[* The path of discipleship—page 79.]
[* The path of discipleship—page 80.]

প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নহে। কেনোপনিষদেও এই শব্দের এই অর্থ দেখা যায়; এবং সেখানে ভগবান শঙ্করাচার্য্যও তাহার "শম" অর্থ দিয়াছেন।

"তস্যৈ তপোদমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্"—কেন·৩৩

(তপঃ, দম, কর্ম্ম, বেদ ও বেদাঙ্গ, ইহাবা ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তির উপায় এবং সত্য উহার আশ্রয়।)

উপবি উদ্ধৃত উপনিষদেব বচনে দমকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মনই সমস্ত কর্ম্মেব কারণ, এবং মনকে সংযত করিতে পারিলে, আত্মজ্ঞান সহজসাধ্য হয়। যজুর্বেদে আছে,—

"যন্মনসা ধ্যায়তি তদ্‌বাচা বদতি—যৎবাচা বদতি তৎকর্ম্মণা করোতি যৎকর্ম্মণা কবোতি তদভিসংপদ্যতে।"

"যাহা মনে মনে ধ্যান কবা যায়, তাহাই মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, যাহা মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, তাহাই কর্ম্মে প্রকাশ পায়; এবং যেরূপ কর্ম্ম করা যায়, ফলও তদনুযায়ী হয়।"

আমরা অহর্নিশি কত কি চিন্তা কবিতেছি, সদসৎ কত কি ভাবনা চিত্তে পোষণ করিতেছি, তাহাব সংখ্যা কে কবিতে পাবে? তাহার কতকগুলি তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হয়; কিন্তু অধিকাংশেবই কার্য্যক্ষেত্রে কোনও প্রকাশ দেখা যায় না। বাহিবে প্রকাশ হইয়া না পডিলেও চিন্তাব কার্য্যকাবিতা শক্তির নাশ হয় না। মানবেব মানসে কোনও চিন্তা বা বাসনা উদ্ভূত হইলেই, তাহা তাহার চিত্তকে বিকৃত করে, এবং সেই সঙ্গে একটী মানসিক মূর্ত্তি সূক্ষ্মলোকে সৃষ্ট হয়। দেবাধিষ্ঠান-রঞ্জিত অণু দিয়াই আমাদিগের কাম ও মনোদেহ গঠিত এবং এই সমস্ত অণুই আবাব চিন্তামূর্ত্তি সৃজন করে। কোনও বাসনা হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেই সূক্ষ্মলোকের সূক্ষ্ম অণুব স্পন্দন হইতে থাকে এবং পরে তাহা নির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণত হয়। এই নব-নির্ম্মিত আকার-মন্দিরে সেই লোকের একজন দেবযোনি আসিয়া আশ্রয় লয়। তমোগুণের ভাবনা হইলে তমোগুণী দেব যোনি আসিয়া, রজোগুণের ভাবনায় রজোগুণী দেব-যোনি আসিয়া, সাত্ত্বিক চিন্তায় সত্ত্ব-ধর্ম্মী দেব-যোনি আসিয়া, সেই আকারমন্দিরে আশ্রয় লয়। যে ভাবনা হইতে কোন চিন্তামূর্ত্তি উদ্ভূত হয়, সেই ভাবনার তীব্রতা ও একাগ্রতার উপর ঐ মূর্ত্তির জীবন নির্ভর করে। যাহাকে বিশেষ তীব্রতা ও

মনোযোগিতার সহিত ধ্যান করা যায় তাহা হইতে যে মূর্ত্তি উদ্ভূত হয়, তাহা অধিককাল স্থায়ী ; কিন্তু যে সমস্ত ভাবনা মানসে উদিত হয় মাত্র, কিন্তু, বিশেষভাবে ধ্যেয় হয় না, তাহাদিগের দ্বারা যে সমস্ত মূর্ত্তি সৃষ্ট হয় তাহারা অতি শীঘ্র নষ্ট হয়।

আবার চিন্তামূর্ত্তির সহিত, চিন্তাকারীর একটা বৈদ্যুতিক সম্বন্ধ আছে। তাহারই ফলে কোন চিন্তায় একবার অভ্যস্ত হইলে, মানবের ইচ্ছা না থাকিলেও তজ্জাতীয় চিন্তা আসিয়া স্বতঃই চিত্ত অধিকার করিয়া বসে। কেবল যে আপনার অতীত সৃষ্ট চিন্তা এইরূপে মানস অধিকার করে তাহা নহে ; অপরের সৃজিত সমস্বভাব-সম্পন্ন চিন্তাস্রোতও আকর্ষিত হয়। এইরূপে সৎচিন্তামূর্ত্তি অপর সৃষ্ট সৎচিন্তামূর্ত্তিসকলকে, অসৎচিন্তামূর্ত্তি অপর সৃষ্ট অসৎচিন্তামূর্ত্তিসকলকে আকৃষ্ট করিয়া প্রবল হইতে থাকে ; এবং মানবের স্বভাবকে অধিকতর উন্নত বা অধিকতর অবনত করিতে থাকে। এইরূপে কোনও লোকের সহিত আমরা পার্থিব সংযোগে না আসিলেও আমাদিগের চিন্তা দ্বারা আমরা অপরের ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধন করিতে পারি। আমরা সৎচিন্তার দ্বারা জগতের উপকার, অসতের দ্বারা তাহার অনিষ্ট সাধন করি। অপরের সহিত দৃষ্টতঃ কোনও সংস্রবে না আসিয়াও আমরা অপরের কর্ম্মের আংশিক দায়ী।* তাহাই শুক্রনীতিতে আছে,—

"মনসা চিন্তযন্ পাপং কর্ম্মণা নাভিরোচয়েৎ।
স প্রাপ্নোতি ফলং তস্যেত্যেবং ধর্ম্মবিদোবিদুঃ॥"

(যদ্যপি মানসকৃত পাপচিন্তা কার্য্যে পরিণত না হয়, তাহা হইলেও ওই পাপের ফল চিন্তাকারীতে আশ্রয় লয়।)

মন বা মনোময় কোষ আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বপ্রকার ভাবের উৎপত্তি হয় ;

* আমরা স্থানাভাব বশতঃ চিন্তা ও চিন্তামূর্ত্তির বিষয় আর অধিক আলোচনা করিতে পারিলাম না। যদ্যপি কেহ এই তত্ত্ব আরও বিশদভাবে জানিতে উৎসুক হন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গত বর্ষের পত্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত মৎকৃত "কর্ম্মতত্ত্ব" ও পূজনীয়া শ্রীমতী আনি বেসান্তের Thought Powr, its Control and Culture নামক পুস্তক পাঠ করিবেন।)

এবং ভাব হইতে কর্ম্মের সৃষ্টি একথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। ভগবান মনুও বলিয়াছেন,—

"তস্যেহ ত্রিবিধস্যাপি ত্র্যধিষ্ঠানস্য দেহিনঃ।
দশলক্ষণযুক্তস্য মনো বিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম্॥ ১২।৪.

(দেহীর মনকেই, মনোবাক্কায়াশ্রিত উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিন প্রকার কর্ম্মের প্রবর্ত্তক জানিবেন। এই ত্রিবিধ কর্ম্ম, বক্ষ্যমাণ দশলক্ষণযুক্ত।)

মনই সর্ব্বকর্ম্মের প্রবর্ত্তক। মন বা মানবের মনোময় কোষ হইতে সর্ব্ববিধ ভাবের উৎপত্তি হয়; এবং ভাব হইতেই কার্য্য হয়। সেইজন্য মনকে সংযত করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য এবং সেইজন্যই মনঃ-সংযম সাধন-পথের একটী অত্যাবশ্যকীয় পাথেয় বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মানব বাসনার দাস হইয়া কামনাচরিতার্থ করিতে সদাই ব্যস্ত। মনকে সেই দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে হইবে; পরে তাহাকে সমস্ত ইন্দ্রিয়যন্ত্রের প্রভুত্বে স্থাপনপূর্ব্বক আত্মকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্‌চৈব দশমীস্মৃতা॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়ানি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্যনুপূর্ব্বশঃ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি পঞ্চৈষাং পায্বাদীনি প্রচক্ষ্যতে॥
একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকং।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকোগণৌ॥ ৯২

মনু—২য় অধ্যায়ঃ

(কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচ ও পায়ু, উপস্থ, হস্ত পদ এবং বাক্য এই পাঁচ. উভয়ে দশ ইন্দ্রিয় জানিবে। ইহার মধ্যে আনুপূর্ব্বীক্রমে শ্রোত্রাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পায়ু প্রভৃতি পাঁচটীকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা হয়। মন একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা নিজগুণে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়েরই আত্মা স্বরূপ। ইহাকে জয় করিতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত দশ ইন্দ্রিয়কে জয় করা যায়।)

ভগবান মনু আরও বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-প্রসক্তি হইতেই মনুষ্য দূষিত হইতে থাকে, তাহাদিগের সংযম করিতে পারিলে তবে সিদ্ধি হয়।

কাম্য বিষয়ের উপভোগে কামনার শান্তি হয় না, পরন্তু ঘৃতাহুতিযোগে অগ্নি যেমন আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, বিষয়-উপভোগে কামনারও তদ্রূপ বৃদ্ধি হয়। যিনি সমস্ত কামনার বিষয় প্রাপ্ত হইতেছেন, আর যিনি সমস্ত কাম্য বিষয় ত্যাগ করিতেছেন, এতদুভয়ের মধ্যে ত্যাগবানই শ্রেষ্ঠ। অতএব দমগুণের অনুশীলন দ্বারা মনকে বশীকরণ করিতে চেষ্টা করিবে। দুষ্ট ভাবনার চিন্তা হইতে, বিষয় ভাবনা বা বিষয় পাইবার লালসা হইতে, এবং দুষ্ট সংকল্প হইতে মন নিরোধের নাম "দম"। শাস্ত্র বলিয়াছেন,

কুৎসিতাৎ কর্ম্মণো বিপ্র যচ্চচিত্ত নিবারণং।
সকীর্ত্তিতো দমঃ প্রাজ্ঞৈঃ সমস্ত তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে।

দম গুণের সাধনার দ্বারা মানব কুৎসিৎ কর্ম্ম হইতে চিত্তকে নিবারণ করিতে সক্ষম হয়। মুক্তি মার্গের প্রথম ও প্রধানতম সোপানই চিত্তবৃত্তির দমন। ক্ষিপ্ত মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া মুক্তিমার্গে পদক্ষেপ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। সাধন পন্থায় যাইবার প্রারম্ভেই যেমন মনকে স্ববশে আনয়ন করা একান্ত আবশ্যকীয়, তথায় প্রবেশ লাভ করিয়া, সাধনায় কিছু অগ্রসর হইলে মনকে আত্ম অধীনে রাখা তদ্রূপ আবশ্যকীয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিরূপে মানব-চিন্তা অপরের ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধন করে। ধ্যানধারণাদিদ্বারা যখন সাধকের চিন্তাশক্তি অধিকতর শক্তিশালিনী হয়, তখন চিন্তার অপরের ইষ্টানিষ্ট করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। সাধন-পথে কিছু অগ্রসর হইলে, সাধক আত্ম চিন্তাশক্তির ক্রিয়া দেখিয়া অনেক সময়ে স্তম্ভিত হন। তাঁহার মনে কোনও রূপ বাসনা আসিবামাত্রই তাঁহার অভিলষিত বস্তু সম্মুখে রহিয়াছে দেখিতে পান; কোনও তর্ক বা সন্দেহ আসিবামাত্রই সেই তর্ক ও সন্দেহ তাঁহার পার্শ্বস্থ অপরের মনে ও স্বতঃই উদিত হয়; নিজের মত, ভাষায় ব্যক্ত না হইলেও, শীঘ্রই শত বাধা ও আপত্তি চূর্ণ করিয়া তাঁহার ভক্ত বা অপরের মত হইয়া যায়। তজ্জন্যই তাঁহার দায়িত্ব অধিক এবং অতি সংযত ভাবে তিনি তাঁহার চিন্তাশক্তিকে পোষণ করিতে থাকেন। পতঞ্জলি ঋষি সাধন পাদে চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতার বিষয় বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সমুদায়ের বিধান আছে। দম-গুণের সাধনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকে।

কেবল আহ্নিক, ধ্যানাদির সময় মনকে শাসন করিলে চলিবে না। অবশ্য প্রতিদিন পূজাদির সময় মনের দমন অভ্যাস করা চাই। যখন মানবের বিষয়-আসক্তি কমিয়া যায়, তখন ধ্যানাদির সময় তাহার মনের অল্পাধিক সাম্য অবস্থা আসে। কিন্তু, ইহাই শেষ নয়। জীবনের প্রতি কার্য্যে, সর্ব্বক্ষণ, দমগুণের সাধন করিতে হইবে। যখন যে কার্য্য করিবে, মন তাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট রাখিবে; প্রবৃত্তির বশে সেই সময় মন যদ্যপি বিষয়ান্তরে আসক্ত হইতে ছুটে, তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া আবার সেই কার্য্যে নিবিষ্ট করিবে। যখন কোনও পুস্তক পাঠ করিবে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করিবে, পার্শ্বে কে কি বলিতেছে, সম্মুখে কি হইতেছে তাহাতে লক্ষ্য রাখিবে না। প্রজাপতি যেমন এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে আশ্রয় করে, সেইরূপ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে কার্য্য করিবে না। মনে একটা প্রবৃত্তি জাগিলেই, বিচার করিবে যে, তাহাতে তোমার ও জগতের কি উপকার হইবে। যদ্যপি সেই প্রবৃত্তিটা তোমার বিবেক বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে তাহার পোষণ করিবে। যদ্যপি তোমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি তাহা অনুমোদন না করে, তৎক্ষণাৎ তাহা দমন করিবে। সৎ চিন্তার দ্বারা অপরের উপকার করিতে চেষ্টা করিবে। সৎকথায় উপদেশাদির দ্বারা যেমন কাহারও চরিত্রের সংশোধন হয়, সেইরূপ চিন্তাশক্তির দ্বারাও হইতে পারে। মনে মনে কল্পনার সাহায্যে বিপথগামীর একটা মূর্ত্তি সৃজন করিয়া, সেই কাল্পনিক মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া সৎচিন্তা করিতে থাকিবে। দমগুণের সাধনায় তুমি যদ্যপি মনের বল বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সৎচিন্তার দ্বারা তাহার মনে শীঘ্রই সৎভাব জাগিতে থাকিবে। এইরূপে ঘোর আততায়ীও ক্রমে হৃদয়বন্ধুরূপে পরিণত হয়।

প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া, সংসারে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে, সেই দিবসে যে যে লোকের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা, যে যে কার্য্য তোমায় করিতে হইবে, যে বিপদে হয় ত তোমায় পড়িতে হইবে, যে সমস্ত স্থলে তোমার চিত্তের ক্ষমতা নাশ হইতে পারে, তাহা একবার কল্পনার সাহায্যে আলোচনা করিয়া লইবে, এবং সেই সেই অবস্থায় ও স্থলে, তোমার কিরূপ কর্ত্তব্য তাহাও স্থির করিয়া রাখিবে। তাহার পর কার্য্যক্ষেত্রে সেইগুলি বা তজ্জাতীয় অপর কোন ঘটনা আসিলে, পূর্ব্বে যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছ, তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া

যাইতে চেষ্টা করিবে। ঘটনার মধ্যে পড়িলে মানবের যে আত্মবিস্মৃতি আসিবার সম্ভাবনা, এইরূপ করিলে আর তাহা হইতে পারে না।

বিপদ আপদ, শত্রুতা মিত্রতা, সুখ দুঃখ, মান অপমান যাহা কিছু আমাদিগের ঘটে, সবই সেই পরম করুণানিদান জ্ঞানময়ের ইচ্ছায়, আমাদিগের উপকারার্থে। প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক ভাবনায় ও অবস্থায় তাঁহারই লীলা দেখিতে শিখিবে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকেই দেখায়। "ইন্দ্রিয়" শব্দের মৌলিক অর্থ ও তাহাই। "ইন্দ্রিয়তে" অর্থাৎ যাহা আত্মার অস্তিত্ব ইঙ্গিত করে। সেইনিমিত্ত উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

* * * *

চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ।

প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি॥ কেন—২

(যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, অর্থাৎ উহাদের সামর্থের হেতুভূত ব্রহ্ম, তিনিই উহাদের প্রবর্ত্তক, তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, এইরূপ জ্ঞানদ্বারা শ্রোত্রাদির স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানিগণ মৃত্যুর পথ হইতে মুক্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন।)

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।

তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৪

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৫

এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া "দম"-গুণের সাধনা করিলে কোনও ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। সমস্ত চিন্তাকে ঈশ্বর ভাবে পবিত্রীকৃত করিয়া লইয়া তাঁহারই প্রীত্যর্থে কার্য্য করিতেছি এই ভাব থাকিলে কাহারও অনিষ্ট হয় না, পরন্তু সকলেরই উপকার হয়। যেমন কোনও নগরীতে জল, এক উচ্চস্থানে রক্ষিত জলাধারে প্রথম আনীত হয়, পরে জল-প্রণালীর সাহায্যে গৃহে গৃহে জীবনরূপে সঞ্চালিত হয়, ঠিক সেইরূপই সমস্ত চিন্তা ভগবান্ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইলে ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই নিকটে তাহা পৌঁছায়। তাই শাস্ত্রকার আদেশ করিয়াছেন যে, মানব শয্যাত্যাগ করিয়া মনে মনে ভাবনা করিবে,—

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

(হে জগদীশ্বর। তোমার আদেশ পালনার্থ ও ত্বদীয় প্রীতিবিধানার্থ আমি সংসারযাত্রায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ত্বদীয় আদেশ ও প্রীতিবিধান কিরূপে হয়, তাহা হৃৎপ্রদেশস্থ যে তুমি, সেই তোমার আজ্ঞা হইতেই তাহা অবগত হই এবং ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে যে নিবৃত্তি, তাহাও তোমা হইতেই হইয়া থাকে, তাহাতে মদীয় কর্ত্তৃত্ব নাই।)

আমাদিগের সারাদিনের সমস্ত কার্য্য, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ব্যবহার যেন এই ভাবের দ্বারা প্রণোদিত থাকে। দম-গুণের সাধনার দ্বারা এইটিকে মনের স্থায়ী ভাব করিতে হইবে। তাহাতে যে কার্য্য করা হইল তাহা, অনুরূপ সাধনার দ্বারা যদ্যপি তুমি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের প্রভু হও, তাহা হইতেও অনেক উৎকৃষ্ট।

ক্রমশঃ

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

গীতাতত্ত্ব।

(শুভরাওয়ের গীতাতত্ত্বের মর্ম্মানুবাদ)

উপক্রমণিকা।

গীতা মহাভারতের অংশ। ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিস্মৃত হইলে ইহার গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য বুঝা যায় না। এই পবিত্র সম্বন্ধ রক্ষা করিবার জন্যই মহামুনি ব্যাস গীতাকে ভারতের যথা স্থানেই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের যথার্থ অবস্থা অবগত না হইলে কখনই কৃষ্ণের উপদেশাবলীর মর্ম্ম অবধারণ করা যায় না।

অর্জ্জুন ভারতে নানাস্থানে নানাবিধ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বিরাট পর্ব্বে এই সমস্ত নামের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করা আছে। অর্জ্জুনের একটি প্রচ্ছন্ন নাম দেখা যায়, নর (সাধারণ মনুষ্য)। এই সাধারণ জাতিবাচক নামে অর্জ্জুন কেন অভিহিত হইলেন তাহা একটি চিন্তার বিষয়।

এই "নর" নাম হইতেই আমরা গীতার সহিত ভারতের ও অর্জ্জুনের সহিত কৃষ্ণের সম্পর্ক বুঝিতে পারি। ব্যাস অর্জ্জুন অর্থে সাধারণ মনুষ্য বুঝিয়াছেন। অর্জ্জুন জীবাত্মা ও কৃষ্ণ পরমাত্মা। কেহ কেহ বলেন যে যুদ্ধ ক্ষেত্র তত্ত্বশিক্ষা দানের স্থান নহে, ইহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ মাত্র। গভীর চিন্তা করিলে এই ভাব অপনীত হইয়া কুরুক্ষেত্রই এরূপ উপদেশের যথার্থ স্থান বলিয়া বোধ হয়। ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম দুইটি রাজবংশের বিবাদ মাত্র। কিন্তু দার্শনিক ভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কর্ম্মক্ষেত্রে মানবাত্মার সহিত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের প্রচণ্ড সংগ্রাম। মানব সংসারে প্রবল প্রবৃত্তিনিচয়ের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আপনার অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া হতাশ্বাসে মলিন হয়। নবীন সাধকের ত কথাই নাই, বলবান প্রবৃত্তি অনেক সময়ে শান্ত সমুদ্র সদৃশ মহাযোগীরও অন্তঃকরণ পাপের ভীষণ ঝটিকায় তরঙ্গায়িত ও ক্ষুব্ধ করে। * যে সমস্ত প্রবৃত্তি সংসারের সমস্ত প্রিয় বস্তু ও প্রিয় ব্যক্তিতে জড়িত হইয়া জন্মে জন্মে সাথী হইয়া আসিয়াছে

* শুভ রাওয়ের মতে অর্জ্জুনের হতাশভাব প্রবৃত্তি ত্যাগের ফল।

তাহাদের সে প্রাণস্পর্শী মমতা কি সহজে বিরাগে পরিণত হয়? সেই বহু কালের ঘনিষ্ঠতা কি সহজে ত্যাগ করা যায়? প্রবৃত্তির নিধন কি উচ্চতর সাধনরূপে আলোকের প্রথমাবস্থায় ক্ষীণ জ্যোতি নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম নহে? এই সমস্ত প্রবৃত্তি ত্যাগ করিলে সাধকের জীবন মরুময় বোধ হয়, কারণ, প্রবৃত্তিই জীবনের অবলম্বন। যতক্ষণ প্রবৃত্তি অপেক্ষা কিছু সুদৃঢ়তর আশ্রয় না পাওয়া যায় ততক্ষণ উপস্থিত বস্তু ত্যাগ করিতে সহজে কেহ সম্মত হয় না। আবার প্রবৃত্তি ত্যাগ না করিলেও অপর আশ্রয় পাওয়া দুরূহ। সেই জন্য প্রবৃত্তি ত্যাগের সময় এরূপ দুর্ব্বিষহ মোহ উপস্থিত হয়।

এই গভীর হতাশের সহিত সংগ্রাম না করিলে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। পণ্ডিতবর মিলের আত্মজীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এক সময়ে তাঁহারও ঠিক এইরূপ মনের অবস্থা হইয়াছিল। মিল একজন প্রধান বৈশ্লেষিক দর্শনকার। তিনি বিস্তৃত ভাবে মানসিক প্রক্রিয়া সমূহের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—"যাহা বরাবর অবিশ্বাস করিতাম এখন দেখিলাম তাহা যথার্থ। অন্য প্রকার মানসিক কার্য্য না করিয়া কেবল বিশ্লেষণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে ভাব সমূহ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে এমন হইল যে, কোন প্রকার আমোদই আমার ভাল লাগিত না।"

এই সময়ে মিলের মনে যে এক গভীর নিরাশার ছায়া আসিয়া পড়িল তাহা বহুবর্ষ ধরিয়া অপগত হয় নাই। মিল মনঃপীড়ায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। শারীরিক পীড়ার উপযুক্ত বৈদ্য ও উপযুক্ত ঔষধ সহজপ্রাপ্য কিন্তু মানসিক পীড়ার ঔষধ ও বৈদ্য সহজে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, মিলকে চিরদিন কষ্ট পাইতে হয় নাই। কবিবর ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের প্রকৃতি ও মানবজীবনের সহিত সহানুভূতিপূর্ণ কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহার মনের এরূপ অবস্থা দূর হয়। তিনি লিখিতেছেন—"ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাই আমার মনের তমোময় ভাব অবসান করিয়া চিরস্থায়ী আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছিল।" সাধকের উচ্চ সংকল্পের জন্য প্রবৃত্তি পরিত্যাগের সময়ে এইরূপই হইয়া থাকে।

গীতার প্রারম্ভে অর্জ্জুনের মনের অবস্থা এইরূপ। শত্রুপক্ষীয় আত্মীয় স্বজন ধ্বংসে তাঁহার কেমন অনিচ্ছা হইতে লাগিল। তিনি স্বভাবতঃই এরূপ কার্য্য হইতে বিচলিত হইলেন।

অর্জ্জুন যেরূপ উচ্চ কার্য্যের জন্য শত্রু ধ্বংস করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন আমরা সেইরূপ উচ্চ সাধনার জন্য প্রবৃত্তি নাশ করিতে আদিষ্ট হইতেছি। প্রবৃত্তির অস্তিত্বই যে দোষাবহ তাহা নহে। তাহাদের ক্ষমতা নাশই প্রয়োজনীয়। অর্জ্জুনের অবস্থা নবীন শিক্ষার্থীর ন্যায়। গুরু যেরূপ শিক্ষার পূর্ব্বে শিষ্যের মনের অবস্থা জানিয়া মন প্রস্তুত করিয়া লন (কারণ মন প্রস্তুত না হইলে যথার্থ শিক্ষা সম্ভব নহে) সেইরূপ গীতায় উপদেশ দ্বারা কৃষ্ণ গুরুরূপে শিষ্য অর্জ্জুনের মন প্রস্তুত করিতেছেন।

গীতা গুরুশিষ্য সম্বাদ। শিষ্য জগতের ভোগাভিলাষ ও উচ্চাশা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু ভাবিতেছে এই সমস্ত ত্যাগ করিলে জীবনের আবশ্যকতা কি? চেষ্টা করিবার জন্য কি অবশিষ্ট থাকিবে? উপস্থিত যাহা আছে তাহা অপেক্ষা ভাল কি হইবে? তাহা যদি না হয় তবে বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তনের ফল কি? কৃষ্ণ এই সমস্ত মীমাংসা করিয়া জীবনের উচ্চ কর্ত্তব্য ও আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন।

গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলি এক সূত্রে বদ্ধ, কোনটিকে বাদ দিলে অপরটি থাকে না। প্রত্যেক অধ্যায়েই মানবজীবনের এক একটি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক গীতায় অনাবশ্যক পুনরুক্তি দেখিতে পাইবেন। ব্যাস মনে কোন একটি বিষয় দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিবার জন্য পুনরুক্তি ভাল বাসিতেন। আরও একটি কারণ, ব্যাস ভারতের প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মত হইতে প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থা দেখাইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে গীতার নীতিশিক্ষা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নহে। কারণ, যদি সকলেই গীতার নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে জগতের উন্নতি আজই রোধ হইয়া যায়। নিঃসন্দেহ গীতার শিক্ষা কতকগুলি লোকের উপকারে আসিতে পারে কিন্তু ইহা সার্ব্বভৌমিক শিক্ষা হইতেই পারে না। কিন্তু ইহা ভ্রম। গীতা নির্দ্দিষ্ট পথ যথার্থরূপে অবধারণ না করার দরুণ এইরূপ ভ্রমে পতিত হইতে হয়। গীতায় কর্ত্তব্য ত্যাগ করিতে বলিতেছে না। যদি এরূপ শিক্ষা গীতায় থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা সাধারণের উপকারে আসিত না, কারণ, অধিকাংশ লোকই সামাজিক বা পারিবারিক কর্ত্তব্য ত্যাগে সম্মত নহে। কিন্তু কৃষ্ণ স্পষ্টই বলিতেছেন সংসার ত্যাগ করিতে হইবে না, বাসনা ত্যাগ কর। বাসনা ত্যাগই

উচ্চ সাধনার মূল। বনে যাইলে কি হইবে, যদি বনে যাইয়া গৃহসুখলালসায় ব্যাকুল হও। মনে ইচ্ছা হইতেছে এরূপ হইলে ভাল হয় তখন প্রকৃত ত্যাগ অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ সেই জন্যই শিক্ষা দিতেছেন যে, গৃহত্যাগ অপেক্ষা বাসনা-ত্যাগই শ্রেষ্ঠ। মানবের কর্ত্তব্যপালনই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, কর্ত্তব্যবোধে কার্য্য করা এক আর চিত্ত প্রাবল্য, সুখ বা বাসনার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কার্য্য করা আর এক। জীবন যাপনের সাধারণ নিয়ম সমূহের ব্যত্যয় না করিয়াও মানসিক শক্তি সকলের যথেষ্ট উন্নতি করিবার ক্ষমতা মানুষের আছে। মানুষ বাসনা ও সুখের আজ্ঞাকারী দাস হইয়া থাকিবে ইহা কোন ধর্ম্মেরই শিক্ষা নহে। সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করাও সকল ধর্ম্মে শিক্ষা দেয় না। *

কেহ কেহ বলেন যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ সংসারী ব্যক্তির জীবন উপায়হীন করিয়াছে। এ যুক্তিটি ভ্রমাত্মক। কারণ এই দুই ধর্ম্ম বাহ্যকর্ম্ম অপেক্ষা সাধকের মনের অবস্থার দিকে অধিক লক্ষ্য রাখে।

কেহ কেহ বলেন যে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে "আমাকে উপাসনা কর" ইত্যাদি কথায় সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে বলিতেছেন। এ যুক্তিও ঠিক নহে। কারণ, যদিও কৃষ্ণ আপনাকে পরব্রহ্ম বলিতেছেন তথাপি তিনি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন। ঈশ্বর আপনাকে পরব্রহ্ম বলিতে পারেন, কারণ, পরব্রহ্মে ও ঈশ্বরে কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। খৃষ্ট প্রভৃতি ভগবানের সকল সন্তানেরাই আপনাকে পরম পিতার সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কৃষ্ণ পরব্রহ্মে আছেন। পরব্রহ্ম সর্ব্বভূতে আছেন। এইরূপে কৃষ্ণ ব্রহ্ম চৈতন্যে আমি সর্ব্ব-ভূতে আছি ইত্যাদি বলিতে পারেন। ঈশ্বর পরব্রহ্মের প্রকাশ বলিয়া এই সমস্ত কথা বলিতে পারেন এবং গুণও অবলম্বন করিতে পারেন। এই জন্যই কৃষ্ণ মুক্তি পাইবার জন্য অর্জ্জুনকে তাহার নিজেরই মহান্ আত্মাকে উপাসনা

* গীতায় জীবের আরম্ভ ও চরম ও ঈশ্বর সাহায্যে কি প্রকারে জীব মুক্তি লাভ করে সমস্তই বর্ণিত আছে। জীবাত্মার উৎপত্তি, স্থিতি ও মুক্তি প্রভৃতির সমস্ত জ্ঞানই গীতায় পাওয়া যায়।

করিতে বলিতেছেন। পরব্রহ্ম যেরূপ কৃষ্ণের আত্মা সেইরূপ অর্জ্জুনেরও আত্মা। অর্জ্জুন তাহা জানেন না সেই জন্যই অর্জ্জুন ঈশ্বর নহেন। আত্মোপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা। আত্মনির্ভরই মুক্তির সেতু। এরূপ উপাসনা কখন সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না।

সাংখ্যদর্শন বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মত আর একটি উল্লেখ যোগ্য বিষয়। বর্ত্তমান সাংখ্য সূত্রগুলি মহর্ষি কপিল প্রণীত বলিয়া ধরা হয় কিন্তু শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সূত্রগুলিকে অপর কোন কপিলের প্রণীত বলেন। কারণ, তাঁহাদের মতে এই সূত্র সমূহে কপিলের প্রকৃত মত দেখিতে পাওয়া যায় না। যথার্থ সাংখ্যদর্শন পিথাগোরস্ প্রণীত সাংখ্যদর্শন ও চালডিয়ার সাংখ্যদর্শন প্রায় একরূপ। কতকগুলি সহজ সংখ্যা সূত্র দ্বারা স্বভাবের কয়েকটি রহস্যময় শক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। যথার্থ সাংখ্য সূত্র পাওয়া যায় না বটে কিন্তু ইহার অস্তিত্ব খুবই সম্ভব। প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে ভূত সমূহের পরিণতি ও মিশ্রণে কি প্রকারের তত্ত্ব সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন যে, লয়তত্ত্ব উপযুক্তরূপে বুঝিতে পারিলে হটযোগ, রাজযোগ ও সাংখ্য দর্শনে কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

পণ্ডিতেরা গুটিকতক কার্য্যকে কর্ম্ম সংজ্ঞা দিয়াছেন। ইহা দার্শনিক মত নহে। শ্রীকৃষ্ণ সৎ বা অসৎ কার্য্য বা চিন্তা সমস্তকেই কর্ম্ম আখ্যা প্রদান করেন।

পাঠক গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শিক্ষা পৃথকভাবে বুঝিতে পারিলে তত্ত্ববিদ্দিগের কল্পিত ঈশ্বর ও মানবাত্মার যথার্থ অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেক দর্শনের গূঢ়তম তত্ত্বই গীতায় সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আপাততঃ স্বতন্ত্রবৎ উপলব্ধ তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তির বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়া মন হইতে গভীর হতাশ দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন "আমি ইহা করিতেছি" বা "আমি ইহা করিতেছি না" ইহা একটি মহাভ্রম। আমিত্ব একটি ভ্রমোৎপন্ন কাল্পনিক পদার্থ। তৎপরে বুঝাইয়াছেন যে, এই ভ্রমাত্মক আমিত্ব বাদ দিলে একটি যথার্থ আমিত্ব পাওয়া যায় যাহার সহিত ঈশ্বরত্বের নিকট সম্বন্ধ। তৎপরে

বলিলেন যে, এই ঈশ্বরত্বে ও পরব্রহ্মত্বে কিন্তু স্বরূপতঃ পার্থক্য নাই। প্রথম একাদশ বা দ্বাদশ অধ্যায়ে যখন অর্জ্জুনকে এইটুকু বুঝাইলেন, তখন অর্জ্জুনের মন হইতে অনেকটা ভ্রম চলিয়া গেল।

পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁহার উদ্দেশ্য স্থির করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। কি প্রকারে প্রকৃতি অন্তর্নিহিত গুণসকল হইতে জগতের উৎপত্তি হইল তাহাও বুঝাইয়াছেন।

গীতা সম্বন্ধে আর একটি বড় আশ্চর্য্য বিষয় আছে। অষ্টাদশ সংখ্যাটি মহাভারতে অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। মহাভারতে ১৮টি পর্ব্ব আছে। সৈন্যদল ১৮ অক্ষৌহিণীতে বিভক্ত। যুদ্ধ ১৮ দিন স্থায়ী, গীতা ১৮ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। বোধ হয় এই সংখ্যাটির সহিত অর্জ্জুনের কোন রহস্যময় সম্পর্ক আছে। অর্জ্জুন নররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পরব্রহ্ম নানা ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হন। কৃষ্ণ বোধ হয় অষ্টাদশ ঈশ্বর। তাঁহার ভগিনীর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ ঈশ্বরের জ্যোতির সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ স্থাপনা করিতেছে। আর একটি কথা, কৃষ্ণ কখন অর্জ্জুনের হইয়া যুদ্ধ করেন নাই, তিনি অর্জ্জুনের সারথীই হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু ও মন্ত্রী ছিলেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মানব নিজেই সংগ্রাম করিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিবে। যথার্থই পথে অগ্রসর হইলে পরমাত্মার নিকট হইতে সাহায্য পাইবে।

শ্রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

---

* সুবিধার জন্য আমি একেবারে Higher individualityকে ঈশ্বরত্ব করিয়াছি, ইহাতে অর্থের কোন গোলযোগ হয় নাই। মানুষ বাস্তবিকই ঈশ্বর, সেই জন্য এই গোলযোগ পূর্ণ আমিত্ব বাদ দিলে ঈশ্বরত্ব আসিবারই কথা।

প্রেতাত্মার মমতা।

আমাদিগের একটী জ্ঞাতি কন্যা আছে, তাহার নাম "নির্ম্মলা", সম্পর্কে সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী। নির্ম্মলা অল্পদিন হইল শশুরালয় হইতে আসিয়াছে। তাহার আকৃতি প্রকৃতি বড় কমনীয়। হাসি ভিন্ন কথা কহিতে জানিত না। গৃহকর্ম্মেও সে বড় সুনিপুণা। পনের বৎসরের মেয়ের এত গুণ দৃষ্ট হয়না।

একদিন রাত্রিতে আমরা আহারাদি করিয়া "শয়নে পদ্মনাভ করিতে যাইতেছি এমন সময় নির্ম্মলা, তাহাদিগের বাটীতে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। শব্দ শুনিয়া আমরা অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়িলাম। ঘটনাস্থলে গিয়া দেখিলাম—নির্ম্মলা কাঁপিতেছে, ও বিকৃতস্বরে ঘটনাটি ব্যক্ত করিতেছে। আমাকে দেখিয়া বলিল—"কাকা! কে যেন আমাকে ধরিতে আসিতেছিল। মেয়েটার একটু শ্রীসৌন্দর্য্য আছে বলিয়া প্রথমে কুধারণা হইল। মনে করিলাম কোন দুষ্টলোক অসদভিপ্রায়ে তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতে-ছিল, কিন্তু যখন শুনিলাম দুষ্ট ব্যক্তিকে স্ত্রীলোক বলিয়া নির্ম্মলার বেশ ধারণা হইতেছে, তখন আর সে ধারণা স্থান পাইল না। যাহাহউক, আমরা বাটীর চারিদিক "অলি গলি" বিশেষ করিয়া খুজিলাম। এইবার নির্ম্মলার ভ্রাতা শ্রীমান পশুপতি বাবাজী ঘরের খিল খুলিয়া বাহির হইলেন, তাহার এত সাহস যে এতক্ষণ সে গৃহে অর্গল বদ্ধ করিয়া পিতার ধনসসম্পত্তি রক্ষার উপায় করিতেছিল। এই সকল যুবকই আবার ভারত উদ্ধার করিবে! পোড়াকপাল আর কাহাকে বলে?

অনেকক্ষণ অনুসন্ধানের পর আমাদের মনে হইল—ইহা মানুষের কার্য্য নহে। বোধ হয় কোন প্রেত এইরূপ ভাবে অভিভূত হইযাছিল। অল্পদিন হইল আমাদের অন্য জ্ঞাতি সম্পর্কীয়া, একজন আত্মীয়া সম্পর্কে জেঠাই (মা) মৃত হইয়াছিলেন, তিনি নির্ম্মলাকে বড় যত্ন করিতেন। অল্পবয়সে মাতৃহীন হইয়াছে বলিয়া নির্ম্মলা প্রভৃতিকে আমরা সকলেই ভাল বাসি, তাহার পিতার দুর্ব্যবহারে এক্ষণে কার্য্যে তাহা দেখাইতে না পারিলেও আমাদের আন্তরিক টান যায় নাই। যাহা-হউক, অতঃপর যথাস্থানে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বল দেখি নির্ম্মল!—লোকটা বাড়ীর কাহার মত! সে বলিল—ঠিক যেন ও বাড়ীর দিদির (মৃত জেঠাই মাতার মত) তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে তাঁহারই প্রেতাত্মা স্নেহ ভুলিতে না পারিয়া নির্ম্মলাকে দেখা দিয়াছিলেন।

পেঁচো-চোয়ালে।

হিন্দুদিগের গ্রাম্য বৃদ্ধাগণ "পেঁচো চোয়ালে" নামক একপ্রকার প্রেতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই প্রেত অচির-প্রসূত সন্তান সন্ততিকে নষ্ট করিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টি পড়িলে শিশু দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে এবং জন্মগ্রহণের অত্যল্পদিন মধ্যেই লীলাসম্বরণ করিয়া থাকে। আমার পূর্ব্বে এই প্রেতের অস্তিত্ব বিষয়ে আদৌ বিশ্বাস ছিলনা, কিন্তু প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বের একটী ঘটনা দেখিয়া সে সংশয় দূরীভূত হইয়াছে।

যে সময়ের কথা হইতেছে সেই সময়ে আমাদের বাটীতে একজন আত্মীয়া স্ত্রীলোক গর্ভবতী ছিলেন। একদিন রাত্রি প্রায় ১০টার সময় তিনি প্রাঙ্গণ দিয়া যাইতে যাইতে আমাদিগের অজ্ঞাতসারে একটী অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; আমরা সকলেই ঘটনাস্থলে ত্বরিত বেগে উপস্থিত হইলে আত্মীয়া ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন একজন কে পশ্চিম দিকস্থ দোয়ানের (ক্ষুদ্র প্রাচীরের) উপর দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার শরীর শীর্ণ; মাথায় আঁকাড়া চুল।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা বাটীর বাহির হইয়া চারিদিক ঘেরাও করিয়া ফেলিলাম, এবং সেই প্রাচীরটীর নিম্নদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, মনে করিয়াছিলাম বাটীতে চোর আসিতেছিল। যখন এইরূপ ভাবের অনুসন্ধান চলিতেছে তখন একজন প্রবীণ ব্যক্তি সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—তোমরা পাগল হইয়াছ। লোক জাগরিত থাকিতে বাটীতে কখন কি চোর প্রবেশ করে।' ও সকল উপদেবতার কার্য্য! এক্ষণে উহাকে (আত্মীয়াকে) ভাল কবচ ধারণ করাইবার ব্যবস্থা কর। নচেৎ গর্ভস্থ শিশু টিকিবে কিনা সন্দেহ।

বৃদ্ধের কথায় আমরা অনুসন্ধান হইতে নিরস্ত হইলাম। যথা সময়ে সেই আত্মীয়া একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। সেটী যেন কঙ্কালের রোগী শীর্ণ বিশীর্ণ। তখন আমাদের সেই পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যে সন্তান বিসদৃশাকৃতি হইয়া ভবধাম ছাড়িয়া গেল। সকলেই বলিল পেঁচো চোয়ালের নিগ্রহে এইরূপ ঘটিয়াছে।

শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যান্নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৩শ ভাগ } শ্রাবণ, ১৩১৬ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

মণি-রত্ন-মালা।

—:*:—

(প্রশ্নোত্তরাকারে)

১

অতল গভীর ভব-জলধির
মাঝারে মগন হতেছি হায়!
কাহার শরণ করিব গ্রহণ?—
তব হরি-পদ-কমল-নায়।

২

বন্ধন কিসে?— বিষয়ের বিষে;
মুকতি?—বিষয়-বিরাগোদয়ে;
নরক গভীর?— আপন শরীর;
স্বরগ?—কামনা-বাসনা-ক্ষয়ে।

৩

সংসার হরে, মোক্ষ বিতরে
কি ভবে ?—সরবে আপন বোধ ;
কে নরক-দ্বারী ?— কামনা-কুমারী ;
কে স্বরগ-দূত ?—অকামক্রোধ।

৪

কে সুখ-শায়িত ?— সমাধি-স্থিত ;
কেবা জাগরিত ?—বিবেকী ভবে ;
শত্রু ভূতলে ?— ইন্দ্রিয়দলে ;
মিত্র ?—তাহারা বিজিত যবে।

৫

দরিদ্র কেবা ?— অতৃপ্ত যেবা ;
ধনী ?—সন্তোষ হৃদয়ে যদি ;
কে মৃত ভুবনে ?— উত্তম-হীনে ;
অমৃত ?—সুখদা নিরাশা-নদী।

৬

শৃঙ্খল খান্ ?— মমতাভিমান ;
সুরা-মত্ততা কে আনে ?—নারী ;
মোহান্ধ কেবা ?— কামাতুর যেবা ;
মরণ ?—ভুবনে অযশ যারি।

৭

কে গুরু বিহিত ?— কহে যেবা হিত ;
শিষ্য কে ভবে ?—গুরু যে ভজে ;
ব্যাধি কি মহীতে ?— ভ্রমণ যোনিতে ;
ঔষধ ?—যবে বিচারে মজে।

৮

ভূষণের সার ?— শীল আপনার ;
তীর্থ পরম ?—বিমল মন ;

কি হেয় নরক ?—　　　　কান্তা-কনক ;
কি শুনিব ?—বেদ, গুরু যা' ক'ন ।

৯

ব্রহ্ম-মিলন　　　　ঘটে কি কারণ ?—
সাধু-সঙ্গতি, বিচার-দান ;
কে সাধু ?—স্ববশ,　　　　বিষয়-বিরস,
'জীব শিব' যার হয়েছে জ্ঞান ।

১০

জ্বর কি দেহীর ?—　　　　চিন্তা গভীর
মূর্খ কে ভবে ?—বিবেকহীন ;
প্রিয় কি করম ?—　　　　আত্ম-সাধন ;
করে কি মোহিত ?—অঘোষ বীণ্ ।

১১

বিদ্যার বল ?—　　　　ব্রহ্ম কেবল ;
কে মূঢ় ?—যে রহে বিচার বিনে ;
লাভ কি বিধানে ?—　　　　আত্মার জ্ঞানে ;
জগ-জয়ী কেবা ?—মন যে জিনে ।

১২

কে বটে মহীর　　　　বীর হ'তে বীর ?—
যে নহে ব্যথিত মনোজ-বাণে ;
প্রাজ্ঞ কে ধীর ?—　　　　যে নহে অধীর
কটাক্ষ যবে ললনা হানে ।

১৩

বিষাদপি বিষ ?—　　　　বিষয়ের বিষ ;
কে দুখী ?—বিষয়ে মমতা যা'র ;
ধন্য কে নর ?—　　　　পরহিত ধর ;
পূজিত ?—যে পূজে আপন সার ।

১৪

বিজ্ঞ কে ভবে ?— সংসারাহবে
নারী-পিশাচীর যে নহে বশ ;
কি সে শৃঙ্খল ?— রমণী চপল ;
ব্রত কি ভুবনে ?—দীনতা-রস।

১৫

ভুবন ভিতরে কি না বুঝে নরে ?—
নারীর চরিত, নারীর মন ,
কিসের পিপাসা ঘুচে না সহসা ?—
আশার তিয়াসা নিবিড়, ঘন !

১৬

কে লঘু ভুবনে ?— যাচক যে জনে ;
গুরু ?—যাচকতা নাহিক যার ,
সফল জনম ?— না হ'লে জনম ;
মৃত্যু সফল ?—মরণ পার।

১৭

মূক ?—যে না কয় সত্য বচন ;
বধির ?—না শুনে সাধুর বাণী ;
কি সুখ ত্যাজ্য ?— রমণী-চর্যা ,
বিশ্বাস ?—নাহি নারীতে জানি।

১৮

কি নহে তৃপ্ত ?— দুরাশা দৃপ্ত ;
দুঃখমূল কিবা ?—মমতা জনে ;
মোক্ষ কি নাশে ?— মনের বিনাশে ,
অভয় কখন ?—মোচন-ক্ষণে।

১৯

কালগতে যবে কালাগত হবে,
কি উপায় তবে করিবে লোক ?—

স্মরিবে তখন বাণী-কায়-মন
কাল-নাশিনীরে, ঘুচিবে শোক।

২০

আস্থ শোভন ?— বিস্থা-কিরণ ;
ভূতহিতকর ?—কেবলি সত্য ;
দেয় কি ভুবনে ?— অভয় জীবনে ;
উপাস্থ ?—গুরু, দেবতা, বৃদ্ধ।

২১

দস্যু কাহারা ?— কুবাসনা যারা ;
কে সভা-শোভন ?—সুবিস্থা যার ;
সুখদা জননী ?— সুবিস্থা গণি ;
কিনা টুটে দানে ?—সুবিদ্যা যার।

২২

ভীতির কারণ ?— এ ভব-কানন,
লোক-অপবাদ কারণ আর :
বন্ধু কে হয় ?— বিপদাশ্রয় ;
কে পিতা ?—জনক, পালক আর।

২৩

কি সুখ লভিলে সুখ-শেষ মিলে ?—
আনন্দ ঘন কারণালয় ;
কি জানিলে আর না রহে জানার ?—
ব্রহ্ম সকল ভুবনময়।

২৪

দুর্লভ কিবা রজনী ও দিবা ?—
সদ্‌গুরু আর সাধুর সঙ্গ ;
কিবা দুষ্কর ?— মায়া মোহকর ;
দুর্জ্জয় কিবা ?—মদন-রঙ্গ।

২৫

কে পণ্ড ভুবনে ?— যেবা নাহি জানে
আপনি নহেক আপন ছাড়া ;
বিষ সুধা সম ?— নারী মনোরম ;
সখা সম অরি ?—তনুজ যারা।

২৬

ক্ষণপ্রভাধিক কি ভবে ক্ষণিক ?—
ধন-যৌবন-জীবন-জন ;
দান সার কবে ? সুপাত্রে যবে ;
সাধনার সার ?—অমল মন।

২৭

চিন্তিব কিবা বিভাবরী দিবা ?—
মিথ্যা ভুবন, আপনি সত্য ;
করিব কি কাজ ?— আত্মবিরাজ ;
কি জানিব ভবে ?—আপন-তত্ত্ব।

২৮

কণ্ঠেতে যার এ রতন-হার
দুলিবে, তাহার ভবের দুখ
ঘুচিবে, ফুটিবে জ্ঞান-গৌরবে
আত্ম-ভানুর বিমল মুখ।

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু বাবুর

"চৈতন্য কথায় অদ্বৈতবাদ।"

চৈতন্য কথার মধ্যে অদ্বৈতবাদের সমালোচনা করিতে শ্রদ্ধেয় পূর্ণেন্দুবাবু যে অনুভবাত্মক ও সর্ব্বনাশী দুই প্রকার অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছেন, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি নাই। অদ্বৈতবাদ অর্থে মোটামুটি এই ধারণা যে জগৎ আপাততঃ বহুত্ববাচক হইলেও বাস্তবিক পক্ষে একত্ব ভিন্ন উহার কোন সত্ত্বা নাই। যদি জগতের মূলে বাস্তবিক এক অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সেই একত্ব জ্ঞানের স্থান হইতে দেখিতে গেলে প্রকাশমান্ বহুত্বের বাস্তবিক সত্ত্বা অলীক বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক পক্ষে আপাততঃ বহুত্বের জ্ঞান হইলেও সে জ্ঞান যে অলীক এবং প্রতীয়মান্ বহুত্ব যে কোন অভিনব প্রকারে মূলগত একত্বের পরিণাম বিকাশ বা ব্যঞ্জক একথা না স্বীকার করিয়া থাকা যায় না। নানাত্বজ্ঞানই মৃত্যু ও একত্বজ্ঞানই জীবন। ইহা শ্রুতির উপদেশ। ভাগবতেও মূলদেশে অবস্থিত তত্ত্বকে "অবশেষমমৃতং" বলিয়া ইঙ্গিত করায় অন্য সকল পদার্থ বা সত্ত্বা যে ক্ষণিক ও মরণধর্ম্মী ইহা বলা হইয়াছে।

জীবও জগতের মূলে অভেদাত্মক অপরিণামী সত্ত্বা না স্বীকার করিলে সামান্য দর্শনাদি ব্যাপার (Perception) সিদ্ধ হয় না। তবে অংশে বা ভাবে জীব ও জগতের মিলন হয় তাহা কি পদার্থ, তাহা জীব না জগৎ, না এতদুভয়ের অতীত অপরিণামী কোন তত্ত্ব? যখন জগৎ মুক্তি অবস্থায় জীবে লয় হইতে পারে, যখন উভয়েই আবার প্রলয়কালে ভাগবতোক্ত একরস পদার্থে নির্ব্বিশেষে লয় হইতে পারে তখন সেই পরমতত্ত্বের দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ অলীক আকাশ-কুসুমবৎ না স্বীকার করিয়া থাকা যায় না। এই একত্ব আছে বলিয়াই লোকে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, ধ্যান, ধারণা, ভক্তি ও জ্ঞান প্রভৃতির সাধনা করে, তবে মায়াবাদের উপর পূর্ণেন্দুবাবু এত কটাক্ষ করেন কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অনুভবাত্মক ও সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদের প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম না। অনুভব

করি না করি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী জীব ও জগৎ, সুতরাং তাহাদের ঈশ্বরও যে বাস্তবিক পক্ষে এক অদ্বয়জ্ঞানের ক্ষণিকবিকাশ একথা বলিলে যে কি সর্ব্বনাশ হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অবশ্য স্বীকার্য্য যে এ কথা সকলের জন্য নহে। যখন জীব অহংকার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে,যখন পরমতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কোন ভাবে আর তাহার তৃপ্তি হয় না, তখন তাহার জন্য শাস্ত্রে এই উপদেশ। তুমি বাপু, বুঝিতে না পার, তোমার যদি হৃদয়ের শান্তি ইহাতে না হয় তোমার ইহা লইবার আবশ্যক কি? যদি পাপপুণ্য নাই, ভেদজ্ঞানশীল সাধকও পাপপুণ্যের অতীত একথা বলিলে পাপপুণ্যের মধ্যে অবস্থিত মানবকুলের হিতসাধন করা হয়, তবে অহংকারের বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত সাধকের নিকট তুমি ও আমি নাই, কেবল ব্রহ্মই আছে একথা বলিলে কি অপরাধ হইল তাহা বুঝিতে পারি না।

প্রমাণ তিন প্রকার সকলেই জানে, তবে শাস্ত্র প্রমাণের বিশেষত্ব এই যে, তদ্দ্বারা জীব অননুভূত সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমাণে জীব আপনার স্থূল সোপাধিক জ্ঞানের সাহায্যে জগৎ বুঝিতে চেষ্টা করে। আমি স্থূল বলিয়া বস্তু স্থূল বলিয়া প্রতীত হয়। আমি সূক্ষ্ম হইলে বস্তু সূক্ষ্ম হইবে। এই গেল প্রত্যক্ষ। অনুমান প্রমাণে আমরা বস্তুর রূপাংশ পরিত্যাগ করিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ স্বভাব, গুণ, শক্তি, ক্রিয়া প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখি এবং তদ্দ্বারা বস্তুর বস্তুত্ব উপলব্ধি করি। কিন্তু অনুমান প্রমাণের গতিও স্বাভাবিক বা প্রত্যক্ষভাব স্থাপনের দিকে স্থূলভাব যদি আমার স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে অনুমানের সাহায্যে বস্তুর স্থূল ভাবই স্থাপিত করি। আমার দৃষ্টি মনোময়ের দিকে থাকিলে তদ্দ্বারা বস্তুর মনোময় অস্তিত্ব অনুমান সাহায্যে স্থাপিত করি। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণই জীবের স্বাভাবিক অথচ সোপাধিক অহংজ্ঞানের উপর পর্য্যবসিত। কিন্তু শাস্ত্রপ্রমাণে আপ্তগণ জীবের অনুভবের বহির্ভূত, তাঁহাদের স্ববোধ সংক্রমণ করিবার জন্য প্রয়োগ করেন। শাস্ত্র বলিলেন প্রকৃতিই কর্ত্তা, তুমি কর্ত্তা নহ। শাস্ত্রোক্ত ভাবটী আমার স্বাভাবিক চৈতন্য কিছুতে গ্রহণ করিতে পারিল না এবং মনে হইল যে এই ভাবটী আমার স্বাভাবিক ভাবের বিপর্য্যয়কারী, স্বাভাবিক ভাবের বিরোধী। কিন্তু তাই বলিয়াই এই উপদেশকে অসৎশাস্ত্র বলিতে পারি না, কারণ শ্রদ্ধার

উদয়ে ঐ জ্ঞান হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে একদিন দেখিতে পাইব যে, কর্তৃত্বাভিমানই ভ্রান্তি।

মনে হয় অদ্বৈতবাদও এই প্রকারে ভেদভাবে অবস্থিত অহংকার ও তদ্দ্বারা উদ্ভাসিত পৃথক্ সত্ত্ব, প্রতিদ্বন্দ্বী জগদ্‌ভাবকে জ্ঞানের সাহায্যে এক করিয়া একত্বে স্থাপন করিতে চেষ্টা করে; অনুভাবাত্মক অদ্বৈতবাদীই ক্রমে সাধনার পুষ্টির সহিত পৃথক্ জগদ্‌ভাবকে লয় করিয়া ফেলে।

শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানভাবে অদ্বয়তত্ত্ব স্থাপনা করিয়াছেন বলিয়া কি পূর্ণেন্দুবাবুর নিকট অপরাধী? কিন্তু প্রহ্লাদও যে অনুভাবাত্মক অদ্বৈতবাদের উপর দাঁড়াইয়া অগ্নি প্রভৃতির হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তাহা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে। অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবার সময়ে প্রহ্লাদ দেখিলেন যে, অগ্নি ও তাঁহার দেহ প্রকৃতপক্ষে একই ভগবানের আপাততঃ প্রতীয়মান বিভিন্ন ভাবমাত্র। তাঁহার সেই সেই অবস্থার জ্ঞান বিশ্লেষণ করিলে কি দেখা যায়? তিনি কি অগ্নিকে ভগবান্ হইতে অতিরিক্ত পরিণাম বলিয়া দেখিলেন? তিনি কি আপনার দেহকে চৈতন্যের আধার সুতরাং সচ্চিদানন্দ ভগবান হইতে কথঞ্চিৎ ভাবেও পৃথক্ বলিয়া দেখিলেন, না তিনি একত্ব জ্ঞানে আপ্লুত হইয়া, মদোন্মত্ত ব্যক্তি যেমন পরিহিত বস্ত্রাদি দেখিতে পায় না তদ্রূপ, দেহ, অগ্নি ও ভগবান্ এই তিনের মধ্যে একই দেখিতে পাইলেন। তিনি ভেদ দেখেন নাই বলিয়া তাঁহার মৃত্যু হইল না। তাঁহার মনে যদি পরিণামবাদ থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার দেহ নিশ্চয়ই দগ্ধ হইত।

পূর্ণেন্দুবাবু কি বলেন যে আমরা কেবল পুস্তক পাঠ, গবেষণা ও চিন্তার সময়ে একত্ব অনুভব করিব, আর কার্য্যের সময়ে ভেদভাবে অবস্থিত হইব? যদি শঙ্করাচার্য্য ভেদভাবে অবস্থিত হন তবে প্রহ্লাদ অপরাধী নন কেন? যখন সুখ-দুঃখ আমাদের পক্ষে নিত্য হইলেও বাস্তবিক আগমাপায়ী ও অনিত্য বলিয়া গীতায় উক্ত হইলে গীতোক্তভাব যথোক্তভাবে পর্য্যুপাসন করিতে পারিলে মঙ্গল হয়, তখন পরপীড়নকারী যে অপর ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়া সুখদুঃখ কিছুই নয় বলিয়া আপনার ক্ষুদ্র বৃত্তিকে সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইবে, এই ভয়ে কি গীতোক্ত উপদেশ অসৎশাস্ত্র মায়াবাদ বলিয়া নিন্দা করিব? আমরা যে অবস্থায়েই থাকি না কেন, তাহার উপরের ভাবমাত্রই আমাদের অভ্যস্ত ভাবের বিপ্লবকারী

বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও "সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং"; সুখদুঃখ কিছুই নয় শুনিয়া অনেকে ভীত হন যে বুঝি চেষ্টা, প্রযত্ন, কর্ম্ম সবই গেল। অনেকে মনে করেন, এইজন্যই ভারতের রাজনৈতিক উন্নতি হইতেছে না। তাঁহারা আরও বলেন যে দয়া, ক্ষমা, ধর্ম্ম জন্মান্তরবাদও অদৃষ্ট—এই সকল তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, হিন্দুজাতি পাশ্চাত্যজাতিদের সহিত সমকক্ষ হইতে পারিতেছে না। একথা সম্পূর্ণ অসত্য। তুমি আমি, জীব ও জগৎ, বদ্ধ ও মুক্ত, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইত্যাদির অলীক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া যে একরস ভগবান্ বা ব্রহ্ম স্বতঃই স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন এবং সেই মহতী সত্তার একরস চৈতন্যে তুমি আমি প্রভৃতি সকলই অসার ও অলীক—এই উপদেশ অনধিকারীর পক্ষে ভ্রমাত্মক বা বিপ্লবকারী বলিয়া মনে হইলেও এতদ্দ্বারা যে প্রকৃত অধিকারীর পরম মঙ্গল সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

সুতরাং আমরা পূর্ণেন্দুবাবুর ভাব ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। আশা করি, তিনি বিষয়টীর সমাধান করিয়া আমাদের সকলকে ঋণী করিবেন। উত্তর প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি।

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

কলিকাতা—১৭, ৭, ০৯।

ঈশ্বর উপাসনা। (ক)

পুত্র। পিতা, বাল্যকালাবধি দেখিতেছি আপনি ঈশ্বরপরায়ণ। উপাসনা নানা প্রকার হইয়া থাকে। কোন্ প্রকার উপাসনাকে আপনি শ্রেষ্ঠ কহেন?

পিতা। জগতে উপাসনা নানা প্রকারে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সকল

(ক) বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচরণ মিত্র, ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর বিশেষ পরিচিত। তিনি কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যা সমিতির (Theosophical Society) প্রথম সভাপতি ছিলেন। একদিকে তিনি যেমন সাহিত্যক্ষেত্রের মহারথী ছিলেন, অন্যদিকে তিনি পরলোক তত্ত্ব সম্বন্ধেও অল্প আলোচনা করিয়া যান নাই। আমরা তাঁহার হস্তলিপি অনুসন্ধান করিয়া এই প্রবন্ধটি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা অসম্পূর্ণ হইলেও তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমরা এই প্রবন্ধকে অতি আদরে পন্থায় স্থান দিয়াছি। আশা করি, ইহা বঙ্গসাহিত্যসেবীর ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের অতি আদরের সামগ্রী হইবে।

পং সং

উপাসনা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার। সাকার উপাসনায় বহু দেবতার উপাসনা হইয়া থাকে; কিন্তু এরূপ উপাসনাতে ক্রমশঃ নিরাকার উপাসনা আইসে। নিরাকার বাদী বলিলেই নিরাকার বাদী হয় না। নিরাকার উপাসনা করিতে গেলে বিশেষ সাধনা করিতে হইবেক।

পুত্র। সে সাধনা কিরূপ হইবে, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।

পিতা। অনেক এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থকারেরা বলেন যে, ঈশ্বর নাই ও সৃষ্টি স্বভাবসিদ্ধ—জনগণের মঙ্গল করাই আমাদিগের কার্য্য। যাহারা নাস্তিক তাহাদিগের সহিত উপাসনা বিষয়ক আলাপ বড় আবশ্যক হইতেছে না, কিন্তু যাহারা শুষ্ক আস্তিক তাহাদিগের পক্ষে ব্রহ্ম জ্ঞান কি উপাসনাতে হইতে পারে, তাহা তাহাদিগের জানা কর্ত্তব্য।

পুত্র। তাহারা কিরূপে এই জ্ঞান লাভ করিবে?

পিতা। আমাদিগের স্থূল শরীরের ভিতরে বিজাতীয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর আছে—সেই শরীর আত্মা-শরীর। সেই সূক্ষ্ম শরীর উদ্দীপন করণ জন্য অভ্যাস এইরূপ করিবে। সম,—বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। দম,—শ্রবণাদি বাহেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি। উপরতি,—ঈশ্বর, পরলোক ও আত্মা-চিন্তা। তিতিক্ষা,—সহিষ্ণু, সমাহিত, শান্ত অবস্থাতে থাকা; এই সকল অভ্যাস করিতে হইবে। এই সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপন যত হইবে তত পারলৌকিক জ্ঞানের বৃদ্ধি ও ধ্যান শক্তির উচ্চতা প্রতীয়মান হইবে। হিন্দু ও অন্যান্য শাস্ত্রে লেখে যে, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপে আত্মার অভ্যন্তরে বিরাজিত। জীব যদবধি ব্রহ্মজ্যোতিঃ লাভ না করে, তদবধি অজ্ঞানাবস্থায় থাকে।

পুত্র। আত্মা শরীরের কোন্ স্থানে আছে?

পিতা। আত্মা মস্তকের মধ্যভাগে আছেন। আত্মা স্বাভাবিক শান্ত ও ঈশ্বরের নিরাকার জ্যোতিঃ। শরীরের নানা অঙ্গে বিস্তৃত হওয়াতে আত্মা বিকার প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু মঙ্গলময়ের কৃপাতে যোগাভ্যাস ও তাঁহার জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে এই বিকার ক্রমশঃ লয় হয় ও জীব শিবত্ব পাইয়া ব্রহ্ম জ্যোতিতে নির্লিপ্ত হইয়া অনন্ত-শক্তিলাভ ও অনন্ত-ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। আত্মার বিকারের নাশ পায়। কেহ কহে বিক্ষেপ, কেহ কহে অসৎ, অমস ও মত্যাময়, কেহ কহে কোস, কেহ কহে প্রকৃতি ও কেহ কহে অনাত্মা।

পুত্র। শরীরের কোন কোন স্থানে বৈকারিক আত্মা ও কি কি আকারে প্রকাশ হয় ?

পিতা। মস্তকের উপরের খুলির মধ্যভাগকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে. সেই স্থান আত্মার স্থান ও সেই স্থান হইতে নিরাকার রাজ্যের প্রারম্ভ। মস্তকের খুলির নিম্নেও মস্তিষ্কের সীমার উপরে যে স্থান তাহা শূন্য স্থান। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আত্মা চক্ষু, নাসিকা, গলা, পাকস্থলি দিয়া তলপেটে যাইয়া কুলকুণ্ডলিনী শৌচ প্রস্রাবের দ্বার দিয়া মেরুদণ্ডের ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুসম্না নাড়ীর সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করে। বৈকারিক আত্মা যেমন নিম্নে আইসেন, তেমনি উর্দ্ধে গমন করেন। ইষ্ট শক্তিই আত্মার শক্তি। এই শক্তিতেই সাকার ও এই শক্তিতেই নিরাকার। শরীরেব বন্ধনে বদ্ধ থাকিলে সাকার ও উর্দ্ধে গমন করিলে নিরাকার। আত্মার নিম্নে থাকাতে দ্বাদশরূপে প্রকাশ হয়। আত্মা মস্তিষ্কের উপবে আসিলে বুদ্ধিরূপে প্রকাশ এবং এই স্থান হইতে মানব প্রকৃতির প্রারম্ভ। মস্তিষ্কের মধ্য স্থানে আত্মা আসিলে জ্ঞানরূপে প্রকাশ। মস্তিষ্কের নিম্নে আত্মা আসিলে স্বরূপে প্রকাশ। কপালের মধ্যভাগে আত্মা আসিলে স্মরণশক্তিরূপে প্রকাশ। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে (imagination appears) চিত্তবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তিরূপে আত্মা প্রকাশ ও কবিতাশক্তিরূপে প্রকাশ হয়। নাসিকার শেষভাগে অহং ভাবের উদয়। জিহ্বার মধ্য ভাগের বিকার বিরত, আলস্য ও মৃদুতা। এই স্থান হইতে রজ, তম ও স্বত্ব গুণ উৎপত্তি হয়। গলার মধ্য ভাগের বিকার, চিত্ত উদয়, সঙ্কলন মনোদয়, পাপজনক ও অহংজনক ইচ্ছা। এই সকল বিকারের সৎকার্য্যও আছে। ইহাদিগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, ও মনশুদ্ধি এবং বুদ্ধিশুদ্ধি। অন্তঃকরণের নানা বিকার। ইন্দ্রিয় সুখ অভিলাষ, রাগ, পার্থিব বিষয়ে অনুরাগ, বিদ্যানুরাগ, দিব্য যশ, তুরীয় অবস্থা, আশ্চর্য্য বিষয়ে অনুরাগ ঈর্ষাগুণ!

ঈশ্বরের সৃষ্টি ভাল মন্দের মিলিত।

হৃদদেশের বিকারের সহিত সৎকর্ম্ম করিলে আনন্দলাভ, আত্ম প্রশংসা।

নাভিদেশে আত্মার বিকারে পঞ্চ তন্মাত্র প্রকাশ অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। কুলকুণ্ডলীতে শুদ্ধ পঞ্চভূত যথা,—পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ।

এই পঞ্চভূত তন্মাত্রে শরীর সম্বন্ধীয় অনেক কার্য্য হয়, এই জন্য ইহা পৃথ্বীতত্ত্ব বলে। এতদ্ব্যতিরিক্ত এই জ্ঞান হইতে ভক্তির ও দুঃখের আবির্ভাব হয়। অতএব দেখ—ব্রহ্মরন্ধ্রে ঐশ্বরিক জ্ঞান। দ্বিতীয় খণ্ডে বুদ্ধি; তৃতীয় খণ্ডে জ্ঞান; চতুর্থ খণ্ডে Prudence; পঞ্চমে স্মরণ; ষষ্ঠে কবিতা শক্তি; সপ্তমে উচ্চতা লাভের বাসনা; অষ্টমে সত্ত্ব, রজ, তম; নবম বিজ্ঞান; দশম রাগ দ্বেষ প্রভৃতি; একাদশ অন্তরিন্দ্রিয়; দ্বাদশ ভূতগ্রাম।

আমরা যাহাকে পাপ বলি, তাহাকে গীতাতে বলে অজ্ঞানতা, পঞ্চদশীতে বলে বিক্ষেপ। যেমন অগ্নি দ্বারা স্বর্ণ মালিন্য শূন্য হয়, তেমনি আত্মার কৈবল্য অবস্থা জন্য বিকারের সৃষ্টি হইয়াছে। বিকারের নিবারণ জন্য সূক্ষ্ম শরীর প্রদত্ত হইয়াছে, সূক্ষ্ম শরীরের বল ধ্যান; ধ্যানের বল পবিত্র চিন্তা, পবিত্র কার্য্য, পবিত্র আহার। পবিত্র চিত্ত, ও কার্য্যের মূলক নিষ্কামভাব; সে নিষ্কামভাব ব্রহ্মজ্যোতিঃ ধ্যান ও অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ কি আত্মা ও কি অনাত্মা এই জ্ঞানে জন্মে।

পুত্র। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থ বটে। অন্তরের বলই বল। শুকদেব, অষ্টাবক্র, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক প্রভৃতি মহর্ষিরা ও সতী সাবিত্রী, সীতা প্রভৃতি নারীরা শরীর সত্ত্বেও শারীরিক ও মানসিক ভাব শূন্য হইয়া আত্মানন্দ উপভোগ করতঃ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেন। নিরাকার অবস্থায় নির্ব্বিকার অবস্থা, নির্ব্বিকার অবস্থায় চিন্ময় ও চিন্ময় অবস্থায় জ্যোতির্ম্ময়। ঐ অবস্থায় বাহ্য শূন্য, অন্তর উজ্জ্বল। আত্মার জ্যোতিঃ অনন্ত জ্যোতির্দাতাতে বিলীন হইয়া কেবল ব্রহ্ম অনুকরণীয় কার্য্য করিতে চাহে। এই প্রকারে মনুষ্য দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

পিতা। পুত্র, যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ। দেবতারা ও দেবী সকলেরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। সকলের অন্তরে উজ্জ্বলতা সমান নহে। তাহারা দেখে যে পরমব্রহ্মের উজ্জ্বলতা অশেষ, অসীম ও অনন্ত—তিনি পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি ও পূর্ণপ্রেম। যে যত জ্যোতিঃ লাভ করে, সে ততই জ্যোতিঃ জন্য পিপাসিত হয়। জ্ঞান শক্তি ও প্রেম ব্রহ্মজ্যোতিঃ দ্বারা প্রসূত হয়। দেবতাদিগের, দেবী সকলের, যোগী সকলের ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সকলের ব্রহ্মজ্যোতিই জীবন ও তাহাদিগের আত্মার আহার ও পান

পুত্র। আপনি বলিলেন যে, আত্মার বিকার শরীরের দ্বাদশ স্থানে আছে, ইহা কি নিমিত্ত হইয়াছে ?

পিতা। কোন কোন যোগী এইরূপ আপরোক্ষজ্ঞান দেন। কোন কোন যোগী বিকারকে ষটচক্ররূপে বর্ণন করেন। শৌচ-প্রস্রাব চক্র, মুনিপুর অর্থাৎ নাভিদেশ, হৃদয়, কণ্ঠদেশ, ভ্রূর অন্তরে। এইমতে প্রাণায়াম, রেচক পূরক ও কুম্ভক অর্থাৎ ডান নাসিকা রোধ করিয়া বাম নাসিকা দ্বার দিয়া বায়ু গ্রহণ, দুই নাসিকাদ্বার বন্ধ করিয়া বায়ু গ্রহণ ও পরে বাম নাসিকার দ্বার বন্ধ করিয়া ডান নাসিকা দিয়া বায়ুত্যাগ। কোন যোগী কেবল কুম্ভক অর্থাৎ বিনা পূরক রেচকে অভ্যাস করিয়া থাকেন।

যোগীদিগের মতে প্রাণায়াম বিকার, বিকার বিক্ষেপ ও সব স্থানের বিকার অপেক্ষা কুলকুণ্ডলিনীর বিকার প্রশস্ত। কারণ ঐ নাভিতে পৃথ্বীতত্ত্ব জন্মে।

কুণ্ডলীচালবিত্বার্থ কুর্য্যাৎ ভস্ত্রাং বিশেষতঃ।

কুণ্ডলী স্বাভাবিক ভুজঙ্গের ন্যায় নিদ্রিত, তাহাকে যাঁতার ন্যায় চালনা করিতে হইবেক। এই প্রাণায়ামের আবশ্যক, এই চালনা জন্য অন্য এক প্রকরণ আছে, তাহা বলি শুন।

প্রথমে ভূতশুদ্ধি চাই। কুণ্ডলী সংযমনে উপরস্থ বিকার সকল শৈথিল্য প্রাপ্ত হয় ও ব্রহ্মরন্ধ্রের পথের বাধা ক্রমশঃ ধ্বংস হয় যোগের উদ্দেশ্য যে, ভূতশুদ্ধি দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব অগে নির্বাণ পাইবে তখন ক্রমে ক্রমে জীব তত্ত্বাতীত হইয়া চক্রাতীত হয়ে। ও ব্রহ্মরন্ধ্রে নির্ব্বিকার অবস্থায় স্থায়ী হইয়া ব্রহ্ম লাভ করেন।

আমি।

আমি মন্দ হইলেও জানি, যে, আমি যেমন করিয়াই হউক ভালই হইব। ১

আমি অতীতে ছিলাম,—বর্ত্তমানে আছি,—ও ভবিষ্যতে থাকিব। আমি ক্ষণিকের হইলেও, অনন্তেই লীন। আমি অনন্তকে জানিব,—উপভোগ করিব। কাজে কাজেই, তজ্জন্য অনন্তকাল আমার থাকা চাই, নচেৎ অনন্তকে জানিব,—ভোগ করিব,—কেমন করিয়া? আমি অণু হইলেও,—এই ধরণীর ধূলি হইলেও,—ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে,—অনন্তে, অসীম আকাশে ও কালে, চলিয়া ফিরিয়া, তাঁহার অনন্ত-মঙ্গল ও অনন্ত-সুন্দর, শক্তি ও কার্য্য, দর্শন এবং উপভোগ করিব,—এবং, মনে মনে, ইহা সকলি আমার মায়ের,—পিতার,—অতএব, আমার, ভাবিয়া, অসীম, অতুল, অশেষ, সুখানুভব করিব। আমার সুখটাই নিত্য, অনন্ত। আমার অসুখটাই সাময়িক,—পেলব,—ভঙ্গুর। সেই অশেষ আনন্দেই আমির উৎপত্তি, স্থিতি, লয় তবে, আর ভয় কার? কিসের?

আমি বিন্দু,—শূন্য। আমি যতই সাজ সজ্জা,—দম্ভ অভিমান করি না,—যতই হীরক মরকত জড়িত হই না,—আমি শূন্য। ছোট শূন্য, বড় শূন্য,—হীরক জড়িত শূন্য, একই, কিন্তু, যখন এই শূন্য সেই একের পার্শ্বে, চরণে দাঁড়ায়,—তখন—তাহার মূল্য কতগুণ বর্দ্ধিত হয়, কোন্ গণিতকার তাহার গণনা ও পরিমাণ করিবেন? পার্শ্বে দাঁড়াইলে, বড় হই বটে, কিন্তু, চরণে পড়িলে খুব অসীম বড় হই। তাই শূন্য আমি কেবল সেই একের চরণেই চিরদিন পড়িয়া থাকিতে চাই। তৃণাদপি সুনীচ হইয়া,—নতজানু হইয়া,—চরণে পড়িয়া থাকাই, শ্রেষ্ঠ স্বার্থের সিদ্ধির উপায়।

আমি সর্ব্বোত্তম স্বার্থসিদ্ধির উপায় জানি না। কেহ কখনও তেমন করিয়া

১। "Oh yet we trust that somehow good,
Will be the final goal of ill."—

Tennyson In Memoriam LIV

'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

—গীতা। ৯। ৩১।

শেখান নাই। স্বার্থপরতাই স্বার্থহানি,—ঠকিবার সহজ, উত্তম, সদুপায়। স্বার্থত্যাগই সর্ব্বোত্তম মঙ্গল, সর্ব্বোত্তম স্বার্থ সাধনের উপায়। অপাতলাভের সম্ভাবনা আমাকে নীচ বুদ্ধি দেয়। স্বার্থপরতা পশুত্বের পথ। কুক্কুর, ভল্লুক, ব্যাঘ্র স্বার্থত্যাগ করিতে জানে না। সন্তান বা প্রভুর জন্য, যখন করে, তখন আমি তাহাদিগকে নমস্কার করি। মনুষ্যের মত পশু হইতে, পশুরাও জানে না। তাহারা প্রকৃতির বশেই চলে। মানুষ তা করিলে তো বাপের ঠাকুর হইত। মানুষ পশু অপেক্ষাও ভয়ানক জানোয়ার।১ আমি আমার এই পশুত্বকে বড় ভয় করি। আমি পশুর মত ভদ্র এবং নিয়মের বশ হইলে তো বাঁচিতাম। আমি তা জানি না। অনেক সময়ে সাময়িক উন্মাদের বশে মানুষ গর্হিত কর্ম্ম করে। আমিও সেই প্রকার কামের সেবায় ও অনুরোধে, দুর্ব্বল,—ক্রোধের উত্তেজনায় ভ্রান্ত,—লোভের ছলনায়, মোহের ভ্রমে, মদের মত্ততায়, হিংসার বৃথা তৃপ্তিচেষ্টায়,—নীচ, ছোট, হইয়া যাই,—আত্মার ধন, বল ও বুদ্ধি হারাই। সাময়িক উন্মাদে, রিপুগণকে বন্ধু বলিয়া মনে হয়,—আত্ম-ঘাতির মত আচরণকে ঠিক মনে হয়,—নিজের পায়ে নিজে কুঠার আঘাত করি। আমি যতটা তৃণাদপিভাবে থাকি, ততই ভাল, মঙ্গল।

বিনয়ই আত্মার কষ্টিপাথর। এখন বুঝিতেছি শ্রীচৈতন্য, শ্রীমদ্ভাগবত, ঈশা, "তৃণাদপি সুনীচ" ভাবের,—"অমানী মনদঃ" ভাবের, এত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন কেন। উহাই যে ধর্ম্মের লক্ষণ! আমি ধর্ম্মের চিন্তা করি,—কথা কই,—চিন্তা লিপিবদ্ধ করি—ধর্ম্মের ধার তো ধারি না। তাই তৃণাদপি ভাবের এতই অভাব! ধর্ম্ম তো কথা নহে, বক্তব্য নহে, কবিত্ব নহে, রচনা নহে। ধর্ম্ম কর্ত্তব্য,—কর্ত্তব্য,—কর্ত্তব্য! ধর্ম্মই জীবন,—হওয়া! তৃণাদপি হইতে পারিলে,তো, বুঝিতাম, অনেকটা পথে আসিয়াছি। "বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ, তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ!" আমার স্বর্গীয় পিতা ও মাতা সর্ব্বদাই শিখাইতেন,—"বড় হবি, তো, ছোট হ।" তা হতে পারিলাম না। তৃণাদপি হওয়া তো সর্ব্বাপেক্ষা সুকঠিন। কিন্তু, হইতে চেষ্টা করিলেও, মহৎ হওয়া যায়।

১। "Than the Brute, beast Man is a beastlier Brute."—
Goethe Faust, Prologue in Heaven.

সত্যের পথে,—ধর্ম্মের পথে,—স্বার্থত্যাগের পথে থাকাই, উচ্চ স্বার্থসিদ্ধির পথ। উহাই হিসাবের কাজ। পবিত্রতার পথই লাভের পথ। কাম, ক্রোধাদির পথ কণ্টকময়,—পাপময়,—বিষময়! স্বার্থপরতার পথ মরণের পথ। স্বার্থত্যাগই জীবন লাভের পথ। জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ সিদ্ধিলাভের উহাই পথ। সংসারের পাস্ ফেল্‌টা কিছুই নহে। সংসার যাহাকে অকৃতকার্য্যতা বলে, তাহার মধ্যেই উত্তম কৃতিত্বের বীজ থাকিতে পারে। স্বার্থ স্বার্থ করিয়া মানুষ আত্মার উপরে সংসারের ধূলি, কর্দ্দম, লেপন করে। স্বার্থত্যাগের দ্বারা, সেই আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া দিলেই, অনন্ত ফল লাভ করি। আপনার জন্য পুঁটুলি বাঁধিতে যাইয়া দেখি, সর্ব্বস্বান্ত হই। পরের জন্য নিজের স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিলে, জীবন ধন্য হয়। কেবলই নিজের সুখ সুখ করিয়া, দুঃখ লাভ করি। পরকে সুখ দিতে পারাই, সুখী হইবার, সহজ, সুলভ, রাজকীয়, পথ, উপায়। আমি অসুখী। কিন্তু, তোমর সুখে সুখী হইতে জানিলে, তো, মোফ্‌ৎ, বিনা মূল্যে, খানিকটা সুখ অর্জ্জন করিলাম, বিনা ব্যয়ে, বিনা মেহনতে, বিনা পরিশ্রমে, তোমার জুড়ি চৌঘুড়িতে চড়ার সুখের, খানিকটা সুখ, আমার করিয়া লইলাম। এটা যেন ফাও পাইলাম। এ কেমন উপ্‌রি রোজ্‌গার বল দেখি? তাই বুদ্ধের ত্যাগে, তিনিও লাভবান,—ও জগৎও লাভবান। ঈশা, মহম্মদের ত্যাগে মানব জাতিই লাভবান। ১ ঈশা বলিয়াছেন,—"বড় হতে হলে, ছোট হতে হবে। ছোট হলে, বড় হবে।" এবং "শেষই প্রথম হবে। প্রথমই শেষ হবে।"২ আমি যতই ছোট হই, ততই বড় হইয়া পড়ি!

১। "So true it is, what I then said, that the Fraction of Life can be increased in Value, not so much by increasing your Numerator, as by lessening your Denominator, Nay, unless, my Algebra deceives me, Unity itself divided by Zero will give Infinity. Make thy claim of wages Zero then; thou hast the world at thy feet. Well did the Wisest of our time write,—"It is only with Renunciation (Entsagen) that Life, properly speaking, can be said to begin."—

Thomas Carlyle. Sartor Resartus II. Ch IX.

২। "11. But he that is greatest among you shall be your servant.

12. And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted."—

Mathew. 23.

আমি যতই বড় হইতে চাই, ততই ছোট হইয়া পড়ি! অধ্যাত্ম রাজ্যের ইহাই বিধি! এই দুর্গতির দিনে ভারতীয় গুরু মনুষ্যের মাথায় পা দেন! কিন্তু মহর্ষি ঈশা শিষ্যদের চরণ ধৌত করিয়া দিয়া, (জন্। ১৩। দেখ।), চিরদিনের জন্য মানব ইতিহাসে ও মানব হৃদয়ে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন স্থাপিত ও উপার্জ্জিত করিয়া গিয়াছেন। নেপোলিয়ান্, তাই, খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন, —"আমার সাম্রাজ্য থাকিবে না, কিন্তু মেরীনন্দনের সাম্রাজ্য চিরবর্দ্ধনশীল!" বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্যের মত, রজেতে লুণ্ঠিত হওয়ার কি এমনই গুণ!!!

চিকুরের মত, মনে অহঙ্কার উদিত হইলেই বুঝি যে, এইবার পতন হইবে। আমি ভাল, বেশ,—অন্যের চেয়ে ভাল, এই জাতীয় চিন্তা হৃদয়কে সঙ্কীর্ণ করিলেই, ঐ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই, আমি ছোট হইয়া যাই,—আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই,—আমার অধ্যাত্ম জীবন নষ্ট হয়। জ্বরের প্রতাপে, যেমন, তাপমান যন্ত্রের পারা উঠে ও নামে, তেমনি, অহঙ্কারবিকারগ্রস্ত হইলেই, আমি-র ধাৎ নামিয়া পড়ে, আমি ছোট হইয়া যাই,—আত্মা ভারি হইয়া পড়ে,—নীচে পড়িয়া যায়। কখনই তাহার অন্যথা হয় না। অনেক আত্মা কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র পাপের ফল ভোগে না। শীঘ্র ফল ফলাই সৌভাগ্য। আর ফল জমে না, শুদে আসলে বাড়ে না। অনেক সময়ে দর্পণে দেহলতাকে দেখিয়া, যেই মনে হয়, এইবার শরীরটা বেশ পূর্ব্ববৎ হইয়াছে, অমনি বুঝি যে, শীঘ্রই উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে, বা রোগগ্রস্ত হইবে। একটু আত্মপ্রসাদ ভোগ করিব, তার যো নাই। যেই মনে হয়, আত্মা এইবার সরস হইয়াছে, অমনিই দেখি,—বসন্ত নিদাঘে,—পুষ্পনিশ্বাস অগ্নিশিখায় পরিণত। পৃথিবীর ঋতুর মত আত্মারও ঋতু ও তাহাদের পরিবর্ত্তন আছে! যেই মনে হয়, এই বার ভাল লোক হইয়াছি, অমনি দেখি, হঠাৎ অকারণ এমন কুকাজ করি, যা ভাবিলে অবাক্ হই। মনে, যে যে বিষয়ের গৌরব ছিল, দর্পহারী, একে একে, সকলই হরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন! গ্রীকদের মত, মনে করিতাম, "বলেতেই যুবা পুরুষের গৌরব।" ক্রমে ক্রমে দেখি, দেহটি চিরদিনের মতই ভেঙ্গে গেল। এম্নি, একে একে, পিতামাতা, আত্মীয় বন্ধু, বিষয় সম্পত্তি সকলই গেল। চরিত্রের গৌরব করিয়া দেখিয়াছি,

---

"16. So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen." – Mathew, 20.

হঠাৎ গভীর পাপের মধ্যে পদস্খলন হইয়া পড়িয়া যাই। এতই ক্ষুরধারের মত এই পথ! মহা মুস্কিল! একটুও ফূর্ত্তি, অহঙ্কার করিবার যো নাই! তাই, অহঙ্কারকে দূর হতে দেখিলেও ভয় পাই, কিন্তু তাহার মোহ ছাড়াইতে পারি কই?

আমি দেখি যে চিৎরাজ্যের ও সংসারের পথ উল্টো,—গতি বিপরীত দিকে। যে পথে চলিলে সংসারের উন্নতি হয়, সেই পথে আত্মার উন্নতি হয় না। যে পথে চলিলে আত্মার কল্যাণ হয়, সে পথে সংসারটা ভাঙ্গিয়া যায়। সেই জন্যই ঈশা বলিয়াছিলেন, "তুমি ঈশ্বর ও সংসারের, এককালে, দুইয়েরই সেবা করিতে পার না", "হয় একটাকে ঘৃণা করিবে ও অপরটাকে ভাল বাসিবে; নয়, একটাকে ধরিয়া থাকিবে ও অপরটাকে অগ্রাহ্য করিবে।" তাই, "কি খাব, কি পরিব, ভাবিও না, কারণ, সাংসারিকগণ উহা লইয়াই ব্যস্ত, এবং, তোমার পিতা জানেন যে, তোমার কি জিনিষের অভাব আছে?

অতএব, আমি বলি, প্রথমে ভগবানের রাজ্য ও ধর্ম্ম অনুসন্ধান কর; তাহা হইলেই এই সকল বস্তু তোমাকে প্রদত্ত হইবে।" ১

১। "24. No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye can ont serve God and Mammon.

25. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on Is not the life more than raiment?

26. Behold the fowls of the air; for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns: yet your Heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

27. Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?

28. And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin;

29 And yet? I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to-day is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith?

31. Therefore take no thought, saying, what shall we eat? or, what Shall we drink? or wherewithal shall we be clothed?

ঈশা ভগবানকে কেবল তাঁহারই পিতা বলেন নাই। এক স্থলে "তোমার পিতা" ১ বলিয়াছেন, এবং শিবিশৃক্ষের প্রার্থনাতে "আমাদের স্বর্গীয় পিতা" ২ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। অন্যত্রে, নানা স্থানে, কি প্রকারে ছেলের মত ছেলে হইতে হয়, তাহার উপদেশ দিয়াছেন। ৩

এই সংসারের লোক বড় হতে চায় ও বলে। কিন্তু ঈশা বলেন, "ছোট হও" ৪ "জীবন দাও, তবে পাবে। জীবন রাখিলে, হারাবে। ত্যাগ করিলে পাবে।" ৫ সংসারের বন্ধু, আত্মীয় স্বজন বলেন,—"টাকা আনো,– তা নৈলে কি হয়,—সংসার কর।" ঈশা বলেন,—' প্রথমে স্বর্গীয় রাজ্য খোঁজ, পরে এ সবই পাবে।" "টাকা টাকা করিও না।" ৬ আমার পুত্র কোমলহৃদয় শ্রীমান্ যোগানন্দ আপন্ মনেতেই গাহে,—

"মিছে ছুটাছুটি, মিছে সব আশা।
দুদিনের তরে, পৃথিবীতে আসা।
ভুলোনাকো, সেই ভুবন পিতায়।"

---

32. For all these things, do the Gentiles seek , for your Heavenly Father knowth that ye have need of these things.

33. But seek ye first the KINGDOM OF GOD and its righteousnees ; and all these things shall be added unto you.—"Mathew 6. 24-34

১। Also Mathew. 6. 4.

২। "9 Our Father whch art in heaven, Hallowed be Thy name 10. Thy Kingdom comeo. Thy will be done on Earth, as it is in Heaven. 11. Give us this day our daily bread.

12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

13. And lead us not into temptation, but deliver us from Evil, for Thine is the Kingdom and the Power and the Glory, for ever. Amen."—Msthew. 6. 9—13 and 43.

৩। Mathew. 5. 1—48. etc.

৪। He that shall humble himself shall be exalted "—

Mathew. 23. 12.

৫। "Whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will o se his life for, my sake, shall find it "—

"Mathew. 16. 25 Vide also John 12. 25

৬ Mathew. 6. 33 and "Lay not up for yourselves treasures on Earth."—Do. 6. 19-21, and also koran,—

Suras. CII, CIII, and CIV.

শিশুর কথা হইলেও, ইহা বড়ই সত্য। সংসারের কুমন্ত্রণা অপেক্ষা ইহা খুব সত্য। সেই পিতার পথে চলাই ঠিক! সংসারের মতে ইহা উন্মাদের লক্ষণ! সংসার যে নিজেই উন্মাদগ্রস্ত তা বোঝে না। বুঝিলে আর উন্মাদ থাকে কই?

যতক্ষণ আমি হৃদয়কে পূর্ণ করে থাকি, ততক্ষণ তিনি প্রকাশিত হন না। তাঁহার জন্য, হৃদয়ে স্থান না হইলে, তিনি প্রকাশিত হইয়া বসিবেন, দাঁড়াইবেন কোথায়? পারশিক কবি নিজামীর গজলের টীকায় একটী সুন্দর গল্প পড়িয়াছি। সেটী এই,—"একদা আমি সংসার তাপে তাপিত হইয়া, ঘনঘটা ও মেঘগর্জ্জনে ভীত হইয়া, বিশ্রাম নিকেতনের দ্বারে আঘাত করিলাম ও ডাকিলাম। আওয়াজ্ আসিল, "কে হে?" উত্তর দিলাম,—"আমি।" পুনর্ব্বার ধ্বনি আসিল,—"ভিতরে, আছি আমি। তুমি-র স্থান নাই।" ভিতরের লোক আমি-কে ঢুকিতে দিল না। ফের যখন আসিয়া চিৎকার ও আঘাত করি, তখন ফের সেই প্রশ্ন,—"কে হে?" এবার বলিলাম, "আমি নই,—তুমিই।" তখন কবাট খুলিল ও আওয়াজ্ হইল, "তবে, এসো।" আ মটা সংযত,—দমিত,—খর্ব্বিত হইলে, তবে সে আওয়াজ্ আসিল! যতক্ষণ আমি, ততক্ষণই বাহিরে ঘুরা ফেরা। আমি না ঘুচিলে, দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। আমি-টাকে ঘুচাইয়া দাও, লোপ কর,—আমি তৎক্ষণাৎ তিনি। সবই তিনি-ময়

তাই চৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ!" তিনি অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, সুনিপুণ ছিলেন, তাই. এই অধ্যাত্ম তত্ত্বটী, সত্য ও উপদেশ আকারে, প্রকাশ করিয়াছিলেন! তাই, বৈষ্ণবগণ বলেন, "বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ। তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ।" তাই, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-বিৎ ঈশা বলিয়াছেন, —"দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই।" ১

আমিই,—আমারই মধ্যে স্বর্গরাজ্য। আমারই মধ্যে আমার সংসার,—ব্যাবিলনের, আশ্‌মানের, বাগানের মত, একটা আমার কল্পনার সৃষ্টি,—ঊর্ণ

১। Mathew. 5. 3.

নাভের জালের মত, আমার স্বরচিত জাল মাত্র। আমিই স্বর্গ। আমিই নরক। আমার স্বর্গ, নরক আমিই সৃষ্টি করি,—নির্ম্মাণ করি,—গঠন করি। আমার তরে করিলেই, আমার চতুর্দ্দিকের সংসার-শুদ্ধ লোকদের জন্যও করা হইল। আমি যেমন, আমার স্বর্গ ও নরকও তেমন। ঈশা বলিয়াছেন,—' দেখ! তোমারই মধ্যে স্বর্গরাজ্য।" ১

মহাকবি মিল্‌টন তাঁহার স্বর্গচ্যুতি কাব্যে গাহিয়াছেন,—

"তাহার অন্তরেই নরক। অন্তরেই নরক আনে,—চতুর্দ্দিকেই রহিয়াছে,—নরক হইতে এক পা চলিবার যো নাই, যেমন স্থান পরিবর্ত্তন দ্বারা নিজেকে (নিজের ছায়াকে ?) ছাড়িবার যো নাই।" ২ নন্দনের পারিজাত,—মান্দার সুবাস-নিশ্বাস, আমারই প্রাণের মাঝে,—দূরে নহে। স্বর্গের সুধাবহ, অমৃতক্ষর, পবন হিল্লোল, আমারই ভিতর বহে! স্বর্গ নরক, আমারই মধ্যে, ইহাই বুঝাইবার মানসে, বোধ হয়, সিরাজ নগরের, সুরসিকা, সুপণ্ডিতা যোষিতাগণ, ("মথুরা নগর যোষিতা, তারা সবহুঁ পণ্ডিতা।"), তত্ত্বজ্ঞানে মাতোয়ারা হাফেজকে, একদা, এক আসবারের দোকানে লইয়া যাইয়া, এক দর্পণের ভিতরে, শয়তানকে দর্শন করিতে বলেন। হাফেজ নিজ মুখ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে, তাঁহার প্রতি তাঁহারা বিস্তর রসকৌতুক করিয়াছিলেন ?

আমি যেমন, আমার সংসার,—আমার স্বর্গ,—আমার নরকও তেমন। আমি উহাকে যেমন সাজে সাজাই,—যেমন চক্ষে দেখি,—তাহাই হয়। আমি যেমন, আমার উপাস্য দেবতাও তেমন। আমি মুখে "হরি! হরি! আল্লা! আল্লা!" করি, কিন্তু হৃদয়ে কেবল স্বার্থ-সাধন-মন্ত্র জপি। একদা এক মুসলমান বাদসাহ, মসজিদে নমাজ করিতে করিতে দেখেন যে, উচ্চৈঃস্বরে নমাজকারী পুরোহিতের দিকে ইঙ্গিত করিয়া, একজন উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি বলিতেছে, "খোদা তেরা পা-কা নীচে! খোদা তেরা পা-কা নীচে!" এই

১। Luke. 19. 21.

২। "The Hell within him ; for within him Hell
He brings, and round about him, nor from Hell
One step, no more than from himself, can fly
By change of place" —P. L. IV. 20 27.

কাফেরের বাণী শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া, বাদসাহ তাহার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। দেহ হইতে ছিন্ন হইয়াও, মস্তক হইতে শব্দ নির্গত হইতে লাগিল,—"খোদা তেরা পা-কা নীচে! খোদা তেরা পা-কা নীচে!" পরে সকলে, বিস্ময়পরবশ হইয়া, নমাজীর পদতল খনন করিয়া দেখে, যে, তন্মধ্যে এক হাজার টাকার একটী তোড়া রহিয়াছে! কারণ, উপাসনা কালে সে খোদাকে না ভাবিয়া, ভাবিতেছিল যে, বাদসাহ যদি আমাকে এখন সহস্র মুদ্রা খয়রাৎ করেন, তো বড়ই সুবিধা হয়। আমি, মুখে যাহাই বলি, আমার হরি,—আমার খোদা,—গড্, হয় তো, আমার টাকা কড়ি, মান সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি, না হয়, আর কিছু না কিছু!

আমি সত্য সত্যই আমি-কে ভুলিয়া যাই বলিয়া, এ প্রকার দুর্দ্দশা আমার ভাগ্যে ঘটে। সংসারের সুখ দুঃখ ভাল মন্দ ও করতালী কটাক্ষপাতের প্রতি, দৃষ্টি না রাখিয়া, যখন আমি-র প্রকৃত স্বরূপ কি ও কিসে আমার হিতাহিত হয়, মনে রাখিয়া চলি, তখন আমি সত্য সত্যই ভাল লোক হইয়া পড়ি,—অন্ততঃ যতক্ষণ ঐ ভাব হৃদয়ে, জীবনে, অক্ষুণ্ণ থাকে, ততক্ষণেরও জন্য।

আমি আমি-কে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। সংসারক্ষেত্রে, কত দেশ বিদেশে—কতই লোকের রাজ্য বাগাইয়া দিলাম,—কিন্তু এই শূন্য, ছাই, ধর্ত্তে ছুঁতে নাই, আমি-টাকে, আমার রাজ্য বিন্দুকে কিছুতেই বাগাইতে পারিলাম না। উহা ছেঁদা ঘটের মত। যতই জলপূর্ণ চিন্তাপূর্ণ পরিপূর্ণ করি—ততই আবার খালি হইয়া পড়ে। ভরে, আর ভরেও না। কত ঔষধ ও টোট্‌কা ব্যবহার করিলাম!—আমি, দেহ মনে,—সুস্থ, ব্যাধিমুক্ত হইতে পারিলাম না!

তাই, একবার মুক্তবায়ু চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিব, ভাবিতেছি। দেখি, একবার, তাঁহারই জীবনপ্রদ সুরভি নিশ্বাসে, আমাকে ভাসাইয়া দিলে,—অবাধে তাঁহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস লইলে,—তাঁহারই জীবনপ্রদ, সহবাস-নিশ্বাসের ওজোন, সেবন করিলে, আমি সুস্থ, সকল সুন্দর, হইতে পারি কি না,—দুঃখ জ্বালার হস্ত এড়াই কি না,—ভববন্ধন,—এই সুদীর্ঘ রোগবন্ধন, মুক্ত হই কি না? আমি অনেক বিপাকে পড়িয়া,—হাবুডুবু খাইয়া,—অবশেষে তাঁহারই চরণ-বন্দরে উপনীত হইয়া বিশ্রাম ও শান্তিলাভ করি।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ

রুইপুর, বীরভূম।

রূপসনাতন ও জীব গোস্বামী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সমস্ত বেদে অর্থাৎ মন্ত্রে, ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে ও পুরাণেতিহাসে, এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়। আবার শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবরূপ পরম উৎকর্ষও বেদে উক্ত হইয়া থাকেন।

ঋগ্বেদের পরিশিষ্ট খণ্ডে শ্রীরাধামাধবের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে ; যথা—

"রাধয়া মাধবোদেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা" ইত্যাদি। এই শ্রুতির অর্থ অতিশয় স্পষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য অবতারের ন্যায় পুরুষের অংশ বা কলা নহেন, পরন্তু তিনি স্বয়ং ভগবান্ এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ নামের সর্ব্বাপেক্ষা মহিমাতিশয্য কথন দ্বারা এবং তদীয় চরণরেণুর লক্ষ্মীদেবীর ও প্রার্থনীয়ত্ব কথন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতুযৎ ফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎপ্রযচ্ছতি॥

মহাভারতোক্ত পবিত্র সহস্র নাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয়, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাঘটিত শত নামের মধ্যে যে কোন একটী নাম একবার কীর্ত্তিত হইয়া সেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

স্কন্দ পুরাণেও বলিয়াছেন, যিনি মধুর হইতেও মধুর, যিনি সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মঙ্গলদায়ক, যিনি সমস্ত বেদ বেদাঙ্গাদির উপাদেয় ফল এবং চিদেক স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রদ্ধা সহকারে অথবা অবহেলা পূর্ব্বক একবার মাত্রও পরিকীর্ত্তিত হইলে, তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।"

"লক্ষ্মীদেবি সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের বক্ষঃস্থলস্থিতা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল স্পৃহা করিয়া থাকেন" এই প্রকার শাস্ত্রোক্তিও দেখা যায়। লক্ষ্মী দেবীর শ্রীকৃষ্ণ স্পৃহা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে একটী উপাখ্যান আছে—"কোন সময়ে লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অবলোকনে, তাহাতে লোলুপ হইয়া তপস্যায়

প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার তপস্যার কারণ কি ?" লক্ষ্মী বলিলেন, "আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে তোমার সহিত বিহার করিতে অভিলাষ করি।" তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "তাহা অত্যন্ত দুর্লভ।" ইত্যাদি।

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥
নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥"

অতএব মহা বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিলাস নহেন, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে।

এই নিমিত্তই ব্রহ্মসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥"
"রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতার মকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান যো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥"

শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাঁহার শরীর। তিনি অনাদি ও সকলের আদি। গোপালন তাঁহার লীলা বলিয়া তাঁহার একটী নাম গোবিন্দ। তিনি নিখিল কারণের কারণ।

যে পরম পুরুষ রামনাদি মূর্ত্তি সমূহে নিয়মিত শক্তির অভিব্যক্তি করিয়া প্রপঞ্চে বিবিধ অবতার করিয়াছেন, আর শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দের ভজনা করি।

এই নিমিত্তই শ্রুতিস্মৃতির তাৎপর্য্যবেত্তা দেবর্ষি নারদ, অন্য কাহাকেও প্রণাম না করিয়া সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব তাঁহার লীলাতেই পরিব্যক্ত আছে। তাঁহার লীলার আলোচনাতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণে মুক্ত মুমুক্ষু ও বিষয়ী, এই ত্রিবিধ সবাই তৎপরায়ণ হইয়া তদীয় দাস্যলাভে সমর্থ হয়েন। বিষয়ীসকল শ্রবণমনোহর জ্ঞানে তদীয় লীলার আলোচনায় ক্রমশঃ তৎপরায়ণ হইয়া তদীয় দাস্যধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন। মুমুক্ষুসকল ভবৌষধ জ্ঞানে তদীয় লীলার আলোচনায় ক্রমশঃ তৎপরায়ণ হইয়া তদীয় দাস্য লাভ করিয়া থাকেন। আর মুক্ত পুরুষদিগের মধ্যে জ্ঞানীসকল আনন্দদায়কজ্ঞানে তদীয় লীলার আলোচনায় ক্রমশঃ মমতা লাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন, এবং ভক্ত সকল দুস্ত্যজ জ্ঞানে তদীয় লীলার আলোচনায় উত্তরোত্তর অধিকতর আনন্দলাভে:কৃতার্থ হইয়া থাকেন। অতএব লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ কেবল মুক্ত মুমুক্ষুর আরাধ্য নহেন, পরন্তু তিনি বিষয়ীরও আরাধ্য দেবতা। তিনি কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহী, কি বনবাসী ও কি ভিক্ষু, সকলেরই আরাধ্য। তাঁহার অবতার নিখিল বিশ্বের আকর্ষক। বিশেষতঃ তাঁহার নরলীলা মধুর হইতেও সুমধুর। তিনি বাল্যলীলায় বালক্রীড়া দ্বারা সর্ব্বসত্ব মনোহর প্রকৃত বালক। তাঁহার পৌগণ্ড লীলা এবং কৈশোর লীলাও তদ্রূপ চিত্তাকর্ষক। তাঁহার সকল লীলাই মধুর, সকল লীলাই আনন্দময়। তাঁহাতে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল মাধুর্য্যই বিরাজ করে। তাঁহাতে নবজলধরের সৌন্দর্য্য, বসন্তের মাধুর্য্য, বিহঙ্গকুলের সৌন্দর্য্য ও কুসুম সমূহের সৌকোমল্য যুগপৎ বিরাজিত। তারকারাজিত সুনীল নভোমণ্ডল, প্রশান্ত গম্ভীর অপার অম্বুরাশি, চপলারাজিত অম্বুদপটল, শান্তনিঃশব্দ নিবিড় অরণ্যানী ও হিমানিমণ্ডিত শৈলশিখর তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য স্মরণ করাইয়া থাকে। তিনি স্বীয় শৈশব, সৌকুমার্য্য, বাল চাপল্য, পৌগণ্ড ক্রীড়া ও কৈশোর বিহার দ্বারা নিখিল স্থাবর জঙ্গমের আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার—ঐতিহাসিক রহস্য, উপন্যাস নহে। তাঁহার অবতার বিশ্বরঙ্গে মানবনাট্য। তিনি মনুষ্য নাট্যে বিশ্বরঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় লীলা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার অবতারের লীলা সকলও ঐতিহাসিক ঘটনা, রূপক কল্পিত নহে। রূপক কল্পনা না হইলেও, ঐ সকল ঐতিহাসিক ঘটনার অভ্যন্তরে যে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা

অবশ্য স্বীকার্য্য। ঐ সকল নিগূঢ় তত্ত্বের রহস্য উদ্ভিন্ন হইলে উহা মানবের হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন মনুষ্য নাট্যে প্রপঞ্চমধ্যে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার সহিত তদীয় পার্ষদবৃন্দেরও অবতার হইয়া থাকে। তাঁহার পার্ষদবর্গও তাঁহার ন্যায় মনুষ্য নাট্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার অবতরণের পূর্ব্বে ও পরে এই ধরাধামে অবতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার পার্ষদবর্গের অবতারে একটী ঘোরতর সুরাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হয়; কারণ তদ্দ্বেষী অসুর বর্গেরও তদীয় পার্ষদবর্গের ন্যায় ধরাধামে আবির্ভাব শ্রবণ করা যায়। পার্ষদবর্গ জ্ঞান ভক্তির প্রচার দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপনের সাক্ষাৎ সহায়, অতএব তাঁহার মিত্র পক্ষ, এবং অসুরবর্গ উক্ত কার্য্যের বাধা উৎপাদন দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপনের পরম্পরায় সহায়, অতএব তাহার অরিপক্ষ। উভয় পক্ষের যুগপৎ আবির্ভাবে সুরাসুর সংগ্রাম অনিবার্য্য, অতএব উভয়পক্ষের সংগ্রামেই মানবলীলার উপসংহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানব লীলার উপসংহার হইলেও, লীলার পরিসমাপ্তি হয় না, অপ্রকটে অনন্ত প্রকাশে দেবলীলা হইতে থাকে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণলীলা প্রভৃতি সকলই নিত্য। শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে, "যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যঃ। "একোদেবো নিত্য লীলানুরক্তোভক্তব্যাপী ভক্তহৃদন্তরাত্মা।"

ক্রমশঃ

৺শ্যামলাল গোস্বামী।

মরণ ও মরণান্তে।

—০:০—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কামলোক।

কামদেহ বা খোসা।

জীবশূন্য কামদেহই খোসা। জীব কামলোক হইতে লোকান্তরে চলিয়া যাওয়ার পর, ইহা কামলোকে থাকিতে থাকিতে বিশ্লিষ্ট হইয়া কালক্রমে লোপ পায়। ইহজীবন উন্নত ও উদার হইলে, এই খোসা অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহজীবনে বিষয়বাসনাদির উত্তেজনায় দেহস্থ অণুগুলি অবিরত

আন্দোলিত হইয়া থাকে। কামদেহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় উক্ত আন্দোলনের দাগ সমূহ তাহার অণুগুলিতে অঙ্কিত থাকে। তাহার ফলে ভবিষ্যতে এই অণুগুলি উত্তেজিত হইলেই আন্দোলনক্রিয়া আরম্ভ হয়। যাঁহারা জীবদেহ-বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বতঃ সঞ্চালনক্রিয়া (Automatic action) কাহাকে বলে, তাহা অবগত আছেন। জীবদেহ অসংখ্য কোষে নির্ম্মিত। দেহ সঞ্চালনে তাহারা যে গতিতে আন্দোলিত হয়, সেই অন্দোলন ক্রিয়া কোষ সমূহে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং কোনরূপ উত্তেজনা পাইলেই পুনঃ সঞ্চারিত ও আন্দোলিত হয়, তাহাতেই ক্রমশঃ অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। ভাবনা ও চিন্তা সহ আমাদের দেহস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির যে সকল সঞ্চালন ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা পরে আমাদের অজ্ঞাতসারে আপনা হইতেই সম্পন্ন হইতে লাগিল। আমাদের এই স্বতঃ সঞ্চালন ক্রিয়া এত প্রবল যে, কাহারও কোন নির্দ্দিষ্ট বাক্য পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ বা বিশেষ কোন অঙ্গভঙ্গি অভ্যস্থ হইয়া গেলে, শেষে তাহা চেষ্টা করিয়াও পরিত্যাগ করা যায় না। ইহাকেই সাধারণতঃ "মুদ্রাদোষ" কহে।

অভ্যাস, আসক্তি, অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি মানসিক ভাবের আন্দোলন সমূহ কামদেহে অঙ্কিত হইয়া শেষে স্বতঃ সঞ্চালন ক্রিয়া রূপে পরিণত হয়। একটা বিশেষ হস্ত সঞ্চালন ক্রিয়া অভ্যাস বশতঃ যেমন অনায়াসে পুনঃ পুনঃ সম্পন্ন হয়, ঠিক্ সেই রূপ কোন একটা ভাব বা চিন্তা কামদেহে বদ্ধমূল হইয়া গেলে, তাহা পুনঃ পুনঃ সহজেই আবৃত্তি হইতে থাকে। জীব কামদেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেও, এই স্বতঃ সঞ্চালন ক্রিয়া তাহাতে রহিয়া যায় ; কাজেই কামদেহের এই খোসাটা প্রকৃত জ্ঞানবুদ্ধি ইচ্ছা বিবর্জ্জিত ভাবের উদ্রেক করিতে পারে। প্রেতবাদীদের চক্রে অনেক সময়ই কাম দেহের এই খোসা হইতে তদ্দেহধারীর বন্ধুবান্ধবের পরিচিত বিষয় ও ভাবরাশি আসিয়া উপস্থিত হয়। স্নেহ ভালবাসার বাক্য বিন্যাস অর্থশূন্য নীতিবাক্য, গত জীবনের ঘটনাবলীর স্মৃতি ভিন্ন তদতিরিক্ত আর কিছু তাহাদের নিকট হইতে পাওয়ার যো নাই। অবস্থা বিশেষে তাহারা উৎকৃষ্টতর মানসিক শক্তির পরিচায়ক প্রত্যুত্তরাদি প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা নূতনত্ব ও জ্ঞানবুদ্ধি বিবর্জ্জিত। সময় সময় তাহাদের চক্রে উচ্চ ভাবরাশির যে আবির্ভাব না হয়, এমন নহে,

তবে তাহারা এই খোসা হইতে আইসে না। আবিষ্ট ব্যক্তির বা চক্রের অন্যান্য উপবিষ্ট ব্যক্তিদের সাধুভাবে আকৃষ্ট হইয়া কোন অমানুষিক উৎকৃষ্টতর শক্তি হইতে তাহা আগমন করে।

এই কামলৌকিক খোসা লইয়া—আমোদ প্রমোদ করা বড সোজা ব্যাপার নহে। জ্ঞান বুদ্ধি সংজ্ঞাহীন এই খোসাগুলি বাহ্য ভাবনার আন্দোলনে স্বতঃ সঞ্চারিত হইয়া সহজেই অনিষ্টকারী হইয়া উঠে ও সময় সময় উৎপাত ঘটায়।

বিভিন্ন প্রকারের ভাবরাশি অহরহঃ মানুষের মন হইতে উদ্ভূত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়া সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিতেছে। ভাবনা যেমন ভিন্ন ভিন্ন, আকারও তদনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন। চিন্তার তীব্রতার ইতর বিশেষানুসারে তাহাদের আকৃতির স্থায়ীত্বেরও ইতর বিশেষ হয়। সামান্য চিন্তা প্রসূত শক্তি ক্ষণস্থায়ী হয় কিন্তু উৎকট, ধরাবাহিক এবং দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তাজাত শক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাহারা অন্ধসংজ্ঞাবস্থায় ঠিক্ যেন ভূতের ন্যায় ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়ায়। ইংরেজিতে তাহাদিগকে এলিমেণ্টল্ (Elemental) কহে। কামলৌকিক খোসাগুলি জ্ঞান ও সংজ্ঞা শূন্য বটে, কিন্তু ভূত স্বভাব ও ভূতের আকার বিশিষ্ট। এই শক্তি সমূহের বহুল পরিমাণে সংজ্ঞা থাকে। অত্যাগ্র, দীর্ঘ স্থায়ী পাপচিন্তা প্রসূত শক্তি সমূহ বিষম সাংঘাতিক ও মারাত্মক হয়। তাহারা—কামলোকে বিচরণ করিতে করিতে যদি কথিত খোসাগুলির দেখা পায়, তবে সহজেই তাহাদিগকে অধিকার করিয়া ব'সে এবং তাহাদের দ্বারা নানারূপ কৌতুকজনক ভেল্কিবাজির কার্য্যাদি করিয়া থাকে।

প্রেতবাদীদের চক্রে কেশাকর্ষণ, চিম্‌টী কাটা, চপটাঘাত, টেবিলাদি গুরু বস্তু সজোরে দূরে নিক্ষেপ, দ্রব্য সরঞ্জামাদির একত্র স্তূপাকার করণ, বেহালা পিয়ানো প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র বাজান ইত্যাকার নানা অলৌকিক ও হাস্যজনক বাজে কাজ আহূত "আত্মা" দ্বারা সাধিত হয়। অথচ যাহার আত্মাকে এই রূপে আহ্বান করা হয়, সে জীবদ্দশায় এই সকল অভদ্রোচিত ও জঘন্য কাজে একেবারে অনভ্যস্থ ও অসমর্থ ছিল এবং কথিত বাদ্যযন্ত্রাদি বাজাইতে অনভিজ্ঞ ছিল। তাহাদের মরণের পর তাহাদের "আত্মা" দ্বারা এই সকল অদ্ভুত ক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হয়? প্রেতবাদীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা তাহার

সন্তোষজনক কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। ইহার প্রকৃত উত্তর এই, যাঁহার "আত্মা"কে আহ্বান করা হয়, তিনি কামলোকে কামদেহ পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলে পর, তাহার কামদেহের খোসা আবিষ্ট ব্যক্তির চিন্তার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যখন তাহার পিণ্ডদেহের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন তাহাকে আশ্রয় করিয়া কামলোকস্থ ভূতযোনি সমূহ খামখেয়ালির বশে যদৃচ্ছা-ক্রমে এই সকল হাস্যজনক অলৌকিক ও অভূতপূর্ব্ব ক্রীড়া কৌতুকাদি সম্পাদন করিয়া উপবিষ্ট দর্শকবৃন্দকে আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ করিয়া ফেলে। এখন এই নির্জীব খোসার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর গুহ্য নৈসর্গিক বিষয়াদির আলোচনা করা যাউক। এই খোসা আস্তে আস্তে বিশ্লিষ্ট হইতে হইতে সময়ে স্বজাতীয় উপাদানে মিশিয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। যদি আমাদের পরোলোকগত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সাক্ষাৎকার লাভের অভিলাষ থাকে, তবে কামলোকস্থ এই সকল ক্ষয়শীল নির্জীব খোসার মধ্যে তাহাদের অনুসন্ধান করিলে, তাহাদিগকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? কখনই না! তবে মৃতের মধ্যে জীবিতের দেখা পাওয়ার জন্য এইরূপ বৃথা চেষ্টা ও পণ্ডশ্রম করিয়া ফল কি?

ক্রমশঃ

শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাস।

ব্রহ্মচিন্তা।

আমাদের চিন্তাগুলি ভাবসমূহে প্রকাশ হয়। এই ভাব সমূহ সর্ব্বব্যাপী ব্যক্তভাবে অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে প্রকাশ হইতেছে। এই ভাবময়বিশিষ্ট স্বভাবই প্রকৃতি। আমরা এই ভাবময় জগৎ আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, একটি ভাব ও একটি অভাব* একটি ব্যক্ত ও একটি অব্যক্ত, একটি বিশেষ ও একটি অবিশেষ, একটি স্বভাব ও একটি অস্বভাব, একটি সৎ ও একটি অসৎ। এই ভাবময় জগতে দুইটি পৃথক্ পৃথকরূপে প্রকাশমান; যখন আমরা

* অভাব—বস্তুহীন। ন—ভাব=অভাব। যেখানে ভাব নাই।

আমাদের মনোমধ্যে চিন্তা ভাবে নিমগ্ন থাকি, তাহা দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়া আমাদের মনকে একদিকে টানিয়া লইয়া গিয়া একরূপ কার্য্য করে; তাহার ফলে দেখিতে পাই যে ভবিষ্যতে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, ও অপরটি এই ভাবে টানিয়া লইয়া গিয়া অন্য একরূপ কার্য্য করিয়া থাকে তাহার ফলে দেখিতে পাই ভবিষ্যতে মঙ্গল প্রকাশ হয়। এই মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইটি স্বতন্ত্র,—একের ফল সৎ অপরের ফল অসৎ। এইরূপে আমাদের চিন্তাকণা গুলি একটি একটি বিশেষ-রূপে পর্য্যাবলোকন করিয়া আমরা সৎ ও অসৎ চিন্তা বিচার করিতে সক্ষম হইলে, আমরা বুঝি যে সৎ চিন্তাই আমাদের ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের মঙ্গলময়। এই মঙ্গল-ময়টিকে অন্বেষণ করিয়া সৎচিন্তা কর্ম্মটি অন্তর্জগতে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া অভ্যাস করিতে সক্ষম হইলে, আর অসৎ চিন্তা আসিতে পারিবে না। এই অসৎ চিন্তা দূর করিয়া সৎ চিন্তার প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখাই যোগের প্রথম অভ্যাস। সৎ চিন্তাগুলি এক একটি সৎ কর্ম্ম। সৎ চিন্তাগুলি অভ্যাস করিতে করিতে যখন একীভূত হইয়া বহু সৎকর্ম্মগুলি থাকিবে না ও একই সৎ মনোমধ্যে সর্ব্বদা বিরাজ কবিতে অভ্যাস হইবে, তখনই বহু একীভূত হইয়া প্রকৃত সৎ লাভ হইয়া থাকে। সৎ নিত্য ও সত্য—একই অর্থবোধক। সত্যপ্রকাশ করাই জগতের মঙ্গলময় কর্ম্ম। এই কর্ম্মেই মঙ্গলময়ের লাভ হইয়া থাকে।

অসৎ কিংবা মিথ্যা প্রকাশ করিতে যাইলে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। যিনি সত্যভাবাপন্ন হইতে চেষ্টা করিবেন, তিনি সততাটি লাভ করিয়া প্রকৃত সৎ পদার্থটিতে শান্তি উপভোগ করিবেন। এই সৎই ব্রহ্ম; ইহা অদ্বিতীয়, নিরাকার, অনন্ত, অনাদি, অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী অনন্তব্যাপী—। এইরূপে ব্রহ্মটিকে বুঝিতে গেলে আমরা বুঝি কেবল একটি "শব্দ" ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই, শব্দই একীভূত,—এই শব্দ কোথা হইতে আসে? ইহা আকাশের গুণ, এই আকাশ যেমন জড়জগতে সর্ব্বব্যাপী পদার্থ, সেইরূপ অন্তর্জগতে অতি সূক্ষ্মভাবে মহাকাশও সর্ব্বব্যাপী; এবং কারণ-জগতে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিদাকাশও সর্ব্বব্যাপী, অনন্তব্যাপী নিরাকারে সর্ব্বভূতস্থ। আকাশ পদার্থটি কি—আমরা কেবল বায়ুর লয়ের স্থান আকাশ ও আকাশের গুণ শব্দ ইহা হিন্দুদার্শনিকগণমতে বুঝিতে শিখিয়াই ইহা ভিন্ন আমরা আকাশ শূন্যময় ব্যতীত আর কিছুই বুঝি না। ব্রহ্মটি বুঝিতে গিয়া দেখি যে কিছুরই

অস্তিত্ব নাই কেবলমাত্র শূন্য, ভৌতিক আকাশ, বা মহাকাশ কিংবা তদুপরি চিদাকাশ; এই চিদাকাশে সর্ব্বভূত বর্ত্তমান, ব্রহ্মে তাহাই কথিত। চিদাকাশও সর্ব্বভূতস্থ, ব্রহ্মও সর্ব্বভূতস্থ। এই নিরাকার ব্রহ্ম অসংখ্য সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিন্দু সমষ্টি, চিদাকাশও সেইরূপ অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্দু সমষ্টিতে গঠিত। চিদাকাশ অনন্ত অনাদি পুরুষের আধারক্ষেত্র; এই চিদাকাশস্থ ব্রহ্ম অক্লেদ্য, অশোচ্য, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য ইত্যাদি গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা কথিত আছে, তাহাই আত্মা বা ব্রহ্ম, ইনি অবিনাশী। কেবলমাত্র অনন্ত তেজোময়; সেই নিরাকার অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়ীকে ধারণা করা অতি দুরূহ, এইজন্যই মহাযোগী মহেশ্বর সসীম সাকার উপাসনায় মা আনন্দময়ীকে দৃঢ়রূপে মহাকাশে অঙ্কিত করিয়া দুর্গতিহারিণী দুর্গারূপিণীকে সযতনে হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক নির্ম্মাণ কায়ায় অবস্থান করিতেছেন; এই আনন্দময়ী মা ভিন্ন অন্য কিছুই আয়ত্তে আসে না। ইহাই ঐশীশক্তি। ইহাই ব্রহ্মশক্তি।

ব্রহ্ম শক্তি কথাটির ভাব এই বুঝি, ব্রহ্ম একটি স্বতন্ত্র এবং তাহারই শক্তি একটি স্বতন্ত্র; ব্রহ্ম আনন্দময়, শক্তি আনন্দময়ী। ব্রহ্ম চিদাকাশ, সর্ব্বভূতস্থ; শক্তি, শব্দ, অনন্ত; অর্থাৎ ব্রহ্ম ও শব্দ (শক্তি) সংযোগে যখন একীভূত হন, তাহাই শব্দ-ব্রহ্ম। সেই শব্দ অনন্ত, তাহার নাম প্রণব। সেই প্রণব ধ্বনিটি মন্ত্ররূপী ওঁকাররূপী সাধকের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। এই ওঁকারধ্বনি ব্রহ্মের একটি নাম মাত্র। ব্রহ্মকে আহ্বান করিতে হইলে এই ওঁকারধ্বনি* মহাকাশে অবিরাম ধ্বনিত করিয়া চিন্তা শ্রেষ্ঠ যোগীর চিন্তামণিরূপে, আনন্দময়ীরূপে প্রকাশ হইয়া স্বভাব বা প্রকৃতি নামে খ্যাত। কারণ মহাযোগীর ওঁকারধ্বনি শক্তিই প্রকৃতি †। মহাযোগীর মহাচিন্তার ভাবই প্রকৃতি বা স্বভাব। বেদান্তের পঞ্চম কোষকে যে আনন্দময় কোষ বলিয়া কথিত আছে—সেই আনন্দময় কোষের অধিষ্ঠাতা পুরুষই আনন্দময়। আনন্দময়ও ব্রহ্মের একটি নাম। আনন্দময় কোষই প্রকৃতি, আনন্দময়ী। আনন্দময়-কোষ কারণ-জগতে অবস্থিত। এই কারণ জগতের আকাশের নাম চিদাকাশ। চিৎ+আকাশ=চিদাকাশ। যে আকাশে যিনি

---

* পন্থা পত্রিকাতে মৎলিখিত মহাকাশ নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলে অবগত হইবেন।

† প্রকৃতি,—পুরুষের ভাবের প্রকাশ।

সেই চিৎ বা সৎ কিংবা আনন্দে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সচ্চিদানন্দ ও হিরণ্যগর্ভের পুরুষ। এই হিরণ্যগর্ভই আনন্দময়কোষ, ইহাকেই মূল প্রকৃতি বলা যায়।

ব্রহ্ম তত্ত্বটি বুঝিতে যাইবার পূর্ব্বে প্রকৃতি তত্ত্বটি বুঝিতে সক্ষম হইলে তবে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝা সম্ভব। যোগের সমাধিস্থল এই আনন্দময় কোষের অধিষ্ঠাতা পুরুষ,—সেই পুরুষ, কেবলমাত্র; তিনি কেবল চিদাকাশস্থ নিরালম্ব্ *। এই পর্য্যন্ত বুঝান সম্ভব কারণ এতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও এতই মহৎ যে, ইহার তাৎপর্য্য অধিক আর দ্রষ্টা সাধকের একমাত্র লক্ষ্যস্থল শান্তি; এইরূপে এই শান্তি লক্ষ্যস্থল চিত্তের উপর স্থাপন পূর্ব্বক সাধনা করিয়া গেলে শান্তির চরমসীমায় উপনীত হয়েন; এই শান্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই। যিনি শান্তি তিনিই আনন্দময়ী,—যিনি শান্ত তিনিই আনন্দময় †।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অলৌকিক ঘটনা।

—*:*—

Daily Chronicle নামক সংবাদ পত্রে একটি অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা নিম্নে যথাযথ বিবৃত হইল।

খৃষ্টানদিগের মধ্যেও সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী আছেন। যে সকল সাধু খৃষ্টান মহিলা চির ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ও সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক জগতের হিতসাধনে জীবন সমর্পণ করেন, তাঁহাদের বাসের জন্য সর্ব্বত্র পৃথক্ আগার বা মঠ আছে। ইহাকে ইংরাজীতে Convent বা Nunnery বলে। মিস্ উইলসন নামে একটি বালিকা এক মঠ-সংলগ্ন বালিকাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। বিগত শরৎ

---

* যিনি চিদাকাশকে অবলম্বন করেন ও অথচ নাই।

† আনন্দময় ব্রহ্মের একটি নাম।

লেখক।

কালে একদিন তিনি মঠকর্ত্রীর সহিত ঘরের ছবিগুলির ধূলি ঝাড়িতেছিলেন। একখানি ছবি দেওয়ালের খুব উচ্চে থাকায়, তিনি একটি কাঠের সিঁড়ির উপর উঠিয়া, উহা পরিষ্কার করিতেছিলেন, মঠকর্ত্রী নিম্নে দণ্ডায়মান ছিলেন। বালিকার নিজের মুখেই অতঃপর অবশিষ্ট ঘটনাটি বর্ণন করিব।

এই অবস্থায় হঠাৎ আমি নিজেই নিম্নে দণ্ডায়মানা এরূপ দেখিতে পাইলাম। আরও দেখিলাম যে মিস্ স্মিথ্ তথায় রহিয়াছেন। স্মিথ্ আমারই এক সহপাঠিনী ছিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। "একি! স্মিথের সন্ন্যাসিনী বেশ কেন? তবে কি স্মিথ্ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?" ইহা ভাবিতেছি এমন সময়ে দেখিলাম স্মিথ ভোজনাগারের দিকে যাইতেছেন। কোন অজ্ঞেয় শক্তির দ্বারা যেন চালিত হইয়া, আমিও স্মিথের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে কদাপি এই ভোজনাগারের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না।

যাহা হউক আমিও স্মিথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভোজনাগারে প্রবিষ্ট হইলাম। ঘরের আসবাব কোথায় কিরূপ ভাবে অবস্থিত ইহা অবলোকন করিতে করিতে আমার দৃষ্টি একটি ছবির দিকে আকৃষ্ট হইল। আমার বোধ হইল চিত্রস্থ ব্যক্তির দেহে দুইটি লাল ফিতা ঝুলিতেছে। ইহার অর্থ কি? এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইতি-মধ্যে স্মিথ্ দ্রুতপদে অগ্রসর হওয়ায় আমি বিশেষরূপে উক্ত ছবিটি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলাম না। ক্রমে আমরা ঐ গৃহ অতিক্রম করিয়া উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এবং দেখিলাম মাতুল কাপ্তেন ওল্ডহাম অভ্যস্ত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ জন্য বিমর্ষভাবে অগ্রসর হইতেছেন। আমি তাঁহাকে সেইভাবে তথায় দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম এবং অতীব প্রীতির সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বলিলাম, "মাতুল, আপনি এখানে একথা আমাকে পূর্ব্বে কেন জানান নাই? আপনাকে এখানে সাক্ষাৎ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম।" তদুত্তরে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে অত্যন্ত চমকিত হইলাম। তিনি বলিলেন, "বৎসে আমি বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়াছি।" আমি তাহাতে ভীতভাবে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আশা করি সে আঘাতটি গুরুতর হয় নাই।" কারণ তখনও আমার বিশ্বাস যে আমার মাতুল স্থূল দেহে জীবিত অবস্থাতেই তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। আমার কথার উত্তরে তিনি পুনরায়

বলিলেন, "বৎসে, তুমি এখনও জানিতে পার নাই যে, আমি কোন একটি স্ত্রীলোকের প্রণয়ে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছি। তুমি আমার মত দুর্ভাগ্যের সদ্‌গতি জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, এই আমার অনুরোধ। তদনুসারে আমি ও স্মিথ উভয়েই তাঁহার মুক্তি হেতু প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলাম এবং পূর্ব্বমত প্রার্থনা সময় কাষ্ঠমঞ্চ স্পন্দিত ও শব্দায়মান না হওয়ায় বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বিশেষ আগ্রহের সহিত মাতুল মহাশয়ের ঈদৃশী যন্ত্রণা হইতে মুক্তি জন্য প্রার্থনা করায়, বোধ হইল যেন কিয়ৎ পরিমাণে সফলকামা হইলাম। উপাসনান্তে দেখিলাম, মাতুল মহাশয় কৃতজ্ঞতাপূর্ণনয়নে ও অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লবদনে আমার প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পর মুহূর্ত্তে স্মিথের ইঙ্গিতানুসারে মাতুল মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি হইতে বিরত হইয়া পূর্ব্বমত স্মিথকে অজ্ঞাত শক্তিবলে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। এবং ক্রমে ক্রমে ছবির ঘরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এইরূপে সিঁড়ির পাদদেশে উপস্থিত হইবামাত্র ক্ষণেকের জন্য আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে পুনঃ সংজ্ঞালাভে দেখিলাম যে, আমি সেই সিঁড়ির উপর দণ্ডায়মানা ; আর শুনিলাম নিম্ন হইতে কর্ত্রী বলিতেছেন, "মুখ তোমার বিবর্ণ সম্ভবতঃ শরীর অসুস্থ বোধ করিতেছ, এখনই সিঁড়ি হইতে নামিয়া আইস এবং একটু শয়ন করিয়া বিশ্রাম নেও।" আমি তাহার আদেশ মত নামিয়া আসিয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম এবং অল্প কালের জন্য নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। শনিবার প্রাতে এই ঘটনা হয়।

আমি জাগ্রত হইবার পর কর্ত্রী আমার অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক তাঁহাকে বলিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "বৎসে বোধ হয় তুমি স্বপ্ন দেখিতেছিলে, এ ঘটনা কল্পনা মাত্র। প্রেতাত্মা কখনও এরূপ ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। এতদ্ব্যতীত খুব সম্ভব যে তোমার মাতুল মহাশয় সুস্থদেহে কুশলেই আছেন। এই সব অলীক বিষয় মুখে আনাও বড় অন্যায়।"

স্কুল বালিকাসুলভ ভয় হেতু আমিও মঠ কর্ত্রীর এই কথায় বিশেষ ভীত ও লজ্জিত হইলাম। আমার অনুমান হইল যে, অযাচিত ও অজ্ঞতাবশতঃ আমি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। কাজটি অন্যায় ধারণা হওয়ায় যাহাতে তিনি এ বিষয় নিজে কোন আলোচনা না করেন বা অপর কাহাকেও প্রকাশ না করেন, এই জন্য তাঁহাকে বিশেষ মিনতি করিলাম। তিনিও স্বীকৃত হইলেন।

পর দিবস বেলা ৪ টায় উপাসনা মন্দিরের সাঙ্কেতিক ঘণ্টা বাজিবার পূর্ব্বে জাগরিত হইয়া দেখিলাম, মাতুল মহাশয় ঘরের ভিতর উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি নির্ব্বাক, কেবলমাত্র তাঁহার মুখ ও বুকের কতকাংশ দেখিতে পাইলাম,—চেহারা অনুজ্ঞা ও উপরোধ পূর্ণ। আমি উঠিয়া ক্লিষ্ট প্রেতাত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। আমি তাঁহার ধর্ম্মকন্যা; তাঁহাব প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল সুতরাং মঠকর্ত্রীর পুনঃ পুনঃ সতর্কতা সত্বেও এই ঘটনা স্বপ্ন নহে, এরূপ ধারণা হইল। এইরূপে দুই মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে নিয়মিতরূপে মাতুল মহাশয়কে দেখিতে পাইতাম এবং ক্রমান্বয় তাঁহাব মুখের ভাবে প্রফুল্লতার বৃদ্ধি দেখিয়া, আনন্দ লাভ করিতাম।

মঠের প্রেরিত ও প্রাপ্ত সমস্ত পত্রাদিই মঠকর্ত্রী পাঠ করিতেন, এরূপ নিয়ম ছিল। মাতুল মহাশয়ের প্রথম দর্শনের পর বুধবার মাতাঠাকুরাণী মাতুল মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে এক পত্র লেখেন, তাহাতেই মঠকর্ত্রীর সন্দেহ দূর হয়।

খ্রীষ্টোৎসব নিমিত্ত অবকাশ উপলক্ষে মঠ হইতে বাটী আসিবাব পূর্ব্বে আমি পুনবায় ভোজনঘরে নীত হইয়াছিলাম। পূর্ব্বে যখন মিস্ স্মিথের সহিত সেই ঘবে গমন করি, তখন ঘরের আসবাবগুলি যে ভাবে দেখিয়াছিলাম, এখনও সেইগুলি তদবস্থায় দেখিলাম। সে সময় যে ছবিখানি আমার বিশেষ-রূপে চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল, সেখানা বিশেষ আগ্রহ সহকারে দেখিতে লাগি-লাম। দেখিলাম, ছবিখানি ঠিকভাবে আছে, তবে যাহাকে লাল ফিতা মনে করিয়াছিলাম, তাহা লাল ফিতা নয়। ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রোত-নির্গমনেব চিত্র। ছবিখানি একজন মার্টারের (যাঁহারা পরার্থে প্রাণপর্য্যন্ত ত্যাগ করেন তাঁহাদের মার্টার বলে)। সুদক্ষ চিত্রকরের নিপুণতায় ক্ষত স্থান হইতে রক্তস্রোত-নির্গমন ঠিক পরিস্ফুট হইয়াছে।

বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মাতাঠাকুরাণীর সহিত চেরিংক্রস নামক স্থানে সাক্ষাৎ হইল। মাতুল মহাশয়ের মৃত্যুসম্বন্ধে যথাযথ বলিতে তাঁহাকে পুনঃ মিনতি করিলাম এবং আমিও বলিলাম যে আপনি যে লিখিয়াছেন তিনি হঠাৎ মারা গিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ ঠিক নহে। তিনি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছেন। ইহাতে মাতাঠাকুরাণী চমকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ? কেমন করিয়া তুমি ইহা জানিলে? তোমাকে কে বলিয়াছে?" আমি তদুত্তরে

বলিলাম, "মাতুলমহাশয় নিজেই শনিবার আমাদের মঠে গিয়াছিলেন এবং কোন একটি স্ত্রীলোকের প্রণয়ে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন; একথা বলিয়াছেন।"

তখন মাতাঠাকুরাণী সমস্ত ঘটনা বলিতে লাগিলেন। মাতুল মহাশয় আমার সহিত দেখা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তিনিও তদ্রূপ বলিলেন। তিনি স্ত্রীলোকের প্রণয়লিপ্সু হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন, এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিধেয় পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে একখানা পত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাতে অন্য কোন ব্যক্তির সাক্ষীস্বরূপ স্বাক্ষর ছিল না ও তাহার মর্ম্ম এই, তিনি যে স্ত্রীলোকটির প্রণয়াকাঙ্ক্ষী তাহার প্রতিদান না পাওয়ায়, নিজ জীবন নষ্ট করিলেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তিতে তাঁহার ধর্ম্মকন্যা ভোগবতী ও দাখিলকারিণী হইবে।

তীর্থযাত্রীর পথ। *

(১)

জীবন্ত বিশ্বাসই বিশ্বাস নামের যোগ্য। ভগবানের প্রতি যাঁহার একটা প্রেম বা তীব্র অনুরাগ হইয়াছে ও তাঁহার নিকটস্থ হইবার জন্য যিনি সর্ব্বদা

---

* শ্রদ্ধাস্পদ শালিগ্রামের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। ইনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সুযোগ্য Post-Master-General ছিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি একজন উচ্চদরের সাধক ছিলেন এবং ইঁহারই প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় "রাধাস্বামী" নামে খ্যাত। ইঁহার কতকগুলি পত্র হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় "The pilgrim's path" নামে একখানি পুস্তিকা সঙ্কলন ও জনসমাজে বিতরণ করিয়াছেন। ইহাতে এরূপ অমূল্য উপদেশাবলী গ্রথিত হইয়াছে, এরূপ গভীর জ্ঞান ও উচ্চ ভক্তির কথা আছে যে, ইহা যতই প্রচারিত হয় ততই জগতের মঙ্গল, ইহা ভাবিয়া ইহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। কথায় কথায় অনুবাদ করা আমাদের সাধ্যাতীত; এমন কি ভাবার্থও যে সর্ব্বস্থানে ঠিক দিতে পারিব বোধ হয় না। তবে, সন্দেহ উপস্থিত হইলে মূলকথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উদারহৃদয় এবং পরোপচিকীর্ষু শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সানন্দে এই পুস্তিকার অনুবাদে অনুমতি দান করিয়া আমাকে (এবং পাঠকবর্গকেও) কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিলেন।

বড়ই ব্যাকুল, তাঁহারই প্রকৃত বিশ্বাস আছে বলা যায়। ভগবানের নিকটে যাইতে হইলে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে হয় না। এই দেহের মধ্যেই আমরা তদ্দিকে অগ্রসর হইতে পারি, কারণ রাস্তা ভিতরে অবস্থিত, বাহিরে নহে। অন্তশ্চক্ষুর সংযোগ-বিন্দু হইতেই তীর্থযাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে (The starting-point is at the junction of the eyes within)।

(২)

আমাদের দেহ এক একটি ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ড (সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি অংশ); সুতরাং ইহাতে ব্রহ্মাণ্ডেব যাবতীয় ভুবন-কোষ ক্ষুদ্রভাবে অবস্থিত। জীবাত্মাকে মূল উৎপত্তির (পরমাত্মার) দিকে উত্তোলিত কর। শব্দের সাহায্যে ইহা করিতে পার। এই শব্দস্রোত বা নাদ সর্ব্বত্র বিরাজিত। শব্দব্রহ্ম দ্বারাই প্রারম্ভে সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছিল; প্রচলিত সকল ধর্ম্মেই ইহার ইঙ্গিত আছে। এই শব্দস্রোতই জগতের চিৎ বা প্রাণস্রোত। ইহাব সাহায্যে যেমন জীবাত্মাকে অল্পে অল্পে পরমাত্মাব দিকে তুলিতে থাকিবে, অমনি পদে পদে অধিকতর আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান ও আনন্দলাভ কবিতে থাকিবে।

(৩)

ভগবানের অস্তিত্বে এবং অবতারে কেবল (ভাসা ভাসা) বিশ্বাস থাকিলেই, এই দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। বিশ্বাস দুই রকমের—শুনে বিশ্বাস ও দেখে বিশ্বাস। অধিকাংশ লোকেরই শুনে বিশ্বাস। ভগবান আছেন বা মাঝে মাঝে তিনি অবতীর্ণ হন ইত্যাদি বাল্যকাল হইতে শুনিয়া ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি যে একটা নির্জীব দুর্ব্বল বিশ্বাস আসে, তাহাই শুনে বিশ্বাস। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি ইহাতে তৃপ্ত না হইয়া, ধর্ম্মের অনুকূলে ও প্রতিকূলে যে সকল যুক্তি আছে, তাহা ধীরভাবে চিন্তা ও বিচার করেন এবং সাধনমার্গে প্রবেশ করিয়া নিজের পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও অনুভূতিদ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা পরের কথার (শাস্ত্রাদির) সহিত মিলাইয়া লন। এইরূপে স্বয়ং দেখিয়া,—অনুভব করিয়া যে বিশ্বাস জন্মে, তাহারই নাম দেখে বিশ্বাস।

(৪)

স্মরণ রাখিও, যে সংসারে তুমি যুগপৎ দুইটি খেলা খেলিতেছ, অর্থাৎ একদিকে পার্থিব বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে, অপরদিকে পরমপিতার প্রতি টান আছে।

কিন্তু তোমার বিষয়ানুরাগ ভগবৎপ্রেম অপেক্ষা তীব্র ও বলবান্। এইজন্য ভগবান্‌কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে চেষ্টা করিলেও, তুমি সহজে উহা পারিতেছ না। বহুকাল বিষয়কে ভালবাসাতে, বিষয়ানুরাগ তোমার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে; এই বদ্ধমূল সংস্কারগুলিকে ত্যাগ করিতে সময়ের প্রয়োজন। ক্রমাগত চেষ্টা করিতে করিতে, বিষয়ানুরাগ যেমন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকিবে, তোমার প্রেম, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

(৫)

তোমার কত জন্ম অতীত হইয়াছে এবং এই সকল জন্মে কত বাসনা, কত অভিলাষ অর্জ্জিত ও সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা তুমি অবগত নহ। পরমপিতা নিমেষের মধ্যে সমস্তই নির্ম্মূল করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ কি? তুমি মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নানাবিধ সূক্ষ্ম ও স্থূল আবরণের মধ্যে বাস করিতেছ। যদি হঠাৎ একটি আবরণকে পৃথক্ করা হয়, তুমি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িবে, সুতরাং ইহাতে তোমার উন্নতির অনিষ্ট ও ব্যাঘাতই ঘটিবে। বৃক্ষস্থিত একটি অপক্ক ফল হইতে বলপূর্ব্বক আবরণটি ছাড়াইয়া লইলে, ফলের কি সাংঘাতিক অপকার করা হয়, চিন্তা করিয়া দেখ। উহা আর বৃদ্ধি বা পরিপুষ্টি হইতে পারে কি? তোমার বিশেষরূপে উপলব্ধি করা উচিত যে, তুমি একটি নিয়মরাজ্যের মধ্যে বাস করিতেছ, এখানে কর্ম্ম ও তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী; অকারণ বা আকস্মিক কিছুই ঘটিতে পারে না। অতএব যে নিয়মের দ্বারা পৃথিবী চালিত হইতেছে, যে নিয়মের দ্বারা আমাদের দেহ ও মন শাসিত, তোমার উন্নতিও সেই নিয়মের অধীন।

(৬)

চরিত্রের পূর্ণ সংস্কার-সাধন সময়-সাপেক্ষ। তুমি বহুকাল ধরিয়া যাহা সযত্নে অর্জ্জন করিয়াছ, তাহা একেবারে দূর করা সহজ নহে। কিন্তু ভগবৎ-কৃপা তোমার সহায় হইবে এবং ইহার সাহায্যে তুমি আশাতিরিক্ত সত্বরে ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিবে।

(৭)

মধ্যে মধ্যে মন তাহার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবেই করিবে। কিন্তু যদি তুমি

ভগবৎকৃপার সহায়তা লইয়া দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধ কর, তোমার কোন অনিষ্টই হইবে না ; বরং তুমি অধিকতর বললাভ করিবে।

(৮)

তোমার নিজের স্বভাব কখনও কখনও অপর ব্যক্তিতে প্রতিবিম্বিত (সংক্রামিত) হয়। যখনই ইহা বুঝিতে পারিবে, তৎক্ষণাৎ তোমার মনের কুভাবগুলিকে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করিবে। যদি তোমার প্রকৃত দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় থাকে, ভগবৎ-কৃপা তোমার সহায় হইবে। কিন্তু কুভাব দমন করিবার জন্য যে ভগবানের নিকট কেবল প্রার্থনাই করে, বুঝিতে হইবে উহা দূর করিতে তাহার এখনও অকপট ইচ্ছা হয় নাই ; এইজন্যই কুভাবটিকে তাড়াইতে তাহার এতঃবিলম্ব হয়।

(৯)

কু-প্রভাবগুলি কিয়ৎপরিমাণে ক্ষীণ ও নিস্তেজ না হইলে, উহাদিগকে উন্মূলিত করা যায় না। অতএব মনের চঞ্চলতা ও অস্থিরতা দেখিয়া হতাশ হইও না।

(১০)

তোমার রক্ষকের সহায়তা ব্যতীত তুমি কতই দুর্ব্বল এবং সর্ব্বদা তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া "ত্রাহি ত্রাহি" শব্দে ডাকা, তোমার পক্ষে কতই প্রয়োজন—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য মাঝে মাঝে তিনি তোমার মনের ভীষণ শক্তি ও রহস্য-গুলি দেখাইয়া দেন। ইহাতে হতাশ বা ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, যিনি তোমার রক্ষক ও সহায়, তাঁহাকে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৩শভাগ } ভাদ্র, ১৩১৬ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

গীতা-তত্ত্ব।

(শুভরায়ের গীতা তত্ত্বের মর্ম্মানুবাদ)

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

পূর্ব্ববারে আমি বিশ্ব সৌরজগৎ ও মানব-উপাদানস্বরূপ চারিটি তত্ত্বের বিষয় বলিয়াছি। তারকযোগে বিশ্ববিভাগের যে নাম দেওয়া হয়, তাহারও আমি উল্লেখ করিয়াছি। ওঁরম্ বা প্রণব মানবেরও একটি চিহ্ন; ইহারই তিন মাত্রা আবার বিশ্বে মূলপ্রকৃতির তিনটি বিকারের চিহ্ন। এখানে অর্দ্ধমাত্রা কোন কারণে বাদ দেওয়া গিয়াছে। প্রকৃত সাংখ্যযোগে এই তিনটির বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মতে সকল জড়পদার্থ এই তিন তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত। এস্থলে জড় অর্থে কেবল স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ নহে। সূক্ষ্ম অপেক্ষা আরও সূক্ষ্মতর পদর্থকেও বুঝায়।

জড়বিজ্ঞান এতাবৎকাল চেষ্টার পর জগতের কতক বাহিরের অবস্থা বুঝি-

য়াছে। সমগ্র জড়সৌরজগৎ বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত এবং কালে যে বিজ্ঞান বেদান্তকারদিগের সূত্রাত্মা স্বরূপ সূক্ষ্মতর তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপরে উক্ত হইয়াছে যে, মূলপ্রকৃতির তিন প্রধান বিকার হইতে সমস্ত বাহ্য পদার্থের উৎপত্তি নির্ণয় করাই, সাংখ্য-দর্শনের উদ্দেশ্য। যখন সূক্ষ্ম জগতে কিরূপ প্রাণীর বাস তাহাই বুঝিতে পারা যায় না, তখন কারণ-জগতের কথা কিরূপে বুঝিব। বর্ত্তমান যুগের লোকের নিকট বাহ্য জগৎ ব্যতীত অন্য জগৎ এক প্রকার অস্তিত্বশূন্য; কিন্তু গুপ্ততত্ত্ববিদ্যায় সূক্ষ্মজগৎ ও সূক্ষ্মজীবের অস্তিত্ব বিষয়ে যথার্থ মত পাওয়া যায়। ভূত নামাইবার সভা ও মণ্ডলীসমূহে সূক্ষ্মজগতের অস্তিত্ব একপ্রকার প্রমাণিত হইয়াছে। পুরাণেও উল্লেখ আছে যে দেবতারা স্বর্গে বাস করেন। আবার শ্রেণী-বিভাগও দেখা যায়। সর্ব্বজাতীয় দেবতাই যে স্বর্গে (কারণ-জগতে) বাস করেন তাহা নহে, বসু, রুদ্র ও আদিত্য প্রভৃতি কতকগুলি যথার্থ দেবনামের উপযুক্ত জীবই স্বর্গে বাস করেন। যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতিরা অপেক্ষাকৃত স্থূল (সূক্ষ্ম) জগতে বাস করেন।

এই সকল সূক্ষ্ম জগতের জীবদিগকে তত্ত্ববিদ্যায় উপদেবতা বলে। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর জীবদিগকে দেবতা বলে। দেবতা অর্থে ঈশ্বর নহে। তেত্রিশ কোটি দেবতার অস্তিত্ব মানি বলিয়া যে, আমরা তেত্রিশ কোটি ঈশ্বরের উপাসনা করি, এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। মানব অপেক্ষা সূক্ষ্ম উপাধিধারী ও আধ্যাত্মিক জগৎভুক্ত বলিয়া, ইহারা দেব বলিয়া খ্যাত। নতুবা ইহারা ঈশ্বরের ন্যায় পূজ্য নহেন। একই উপাদানে গঠিত ও একই জগতে অবস্থিত জীবের পরস্পর একটা ঘনিষ্ঠতা আছে। মানবের সূক্ষ্ম শরীরের সহিত উপদেবতার ও কারণ-শরীরের সহিত দেবতার নিকট-সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকেরা জগৎকে তিন লোকে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ম ভূঃ, ২য় ভুবঃ ও ৩য় স্বঃ। আমাদের বাসভূমি এই, জড় জগৎ ভূঃ-লোক। ভুবর্লোক সূক্ষ্ম জগৎ, যাহাকে উপনিষদে অন্তরীক্ষ বলে। আমরা অন্তরীক্ষ বলিলে যাহা বুঝি, ইহা সে অন্তরীক্ষ নহে। স্বর্লোক অর্থে স্বর্গ। তত্ত্ববিদ্যায় ও বৌদ্ধগ্রন্থে ইহাকে দেববাস বলে, এই লোকেই দেবগণের বাস।

মানবের কারণশরীরেই আত্মা সম্যক পরিস্ফুট। জন্মের সময় জীব স্থূল শরীর গ্রহণ করে ও মরণান্তে তাহা নষ্ট হয়। স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীর

অধিক শক্তিমান্, সেজন্য কারণশরীর হইতে বিচ্যুত হইলেও, স্থূলশরীরের ন্যায় তত শীঘ্র নষ্ট না হইয়া কিছুকাল স্থায়ী হয়। কিন্তু কারণশরীর সূক্ষ্ম শরীর হইতে বিচ্যুত হইয়াও স্বতন্ত্র থাকিতে সক্ষম। কারণের ক্ষেত্র সূত্রাত্মা। জীব জন্মে জন্মে যে স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব-জ্ঞানলাভ করে, তাহা সূত্রে মুক্তার ন্যায় কারণ-শরীরেই গ্রথিত থাকে। স্বতন্ত্র জ্ঞান অর্থে এস্থলে স্থূল জগতে এক জন্মের কার্য্যোদ্ভূত জ্ঞানের সমষ্টি বুঝিতে হইবে।

কিন্তু সমস্ত কার্য্যের জ্ঞান অনেক সময় স্থূল শরীর ছাড়াইয়া সূক্ষ্মেই পৌঁছায় না, কারণশরীরের ত কথাই নাই। কারণশরীর যে উপাদানে গঠিত মানবের যে সমস্ত বৃত্তি তদনুরূপ সূক্ষ্মতর তাহারাই কারণশরীরে পৌঁছায়। বাস্তবিকই সামান্য নিত্য-অনুভূত-বৃত্তির স্থায়িত্ব রক্ষা তত আবশ্যকীয় নহে। মানবের উচ্চতম বৃত্তিই কারণশরীরের উপযুক্ত। গভীর সৎচিন্তা, ভক্তি, সদ্ভাব, প্রভৃতিই কারণশরীরে পৌঁছে; কিন্তু সূক্ষ্মশরীরে মানবের ইচ্ছা প্রবৃত্তি ও সাধারণ চিন্তা সমস্তই পৌঁছে। এই কারণ-শরীরেই প্রকৃতজীবরূপে জন্মে জন্মে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া উচ্চতর অস্তিত্বের বিকাশ হয়। এই কারণেই কোন কোন দর্শনে ইহাকে জীব বলিয়াছে। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে, মূলপ্রকৃতির যে বিকারকে সূক্ষ্মাত্মা বলিয়াছি, তাহার উপর দৈবীপ্রকৃতি কার্য্য করিয়া কারণশরীরের উৎপত্তি করিয়াছে। ইহা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সৃষ্টি, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, বিবর্ত্তের কারণভূত জীবন শক্তির ফল। সময়, স্থান ও environment তাহাদের কার্য্য করিতে ছাড়ে নাই। জন্মে জন্মে মানব-চৈতন্য স্বাধীন ইচ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া যতই উন্নত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কারণশরীর ক্রমে স্ফুট হইতে স্ফুটতর হয়। কারণশরীরের নির্দ্ধারণের সহিত জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ক্রমে দৃঢ়তর হইয়া পড়ে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কারণশরীর কর্ম্ম বিপাকের ফল। কর্ম্মের বিনাশ হইলে কারণশরীরেরও লোপ হয়। স্থূল দেহের বাসনা, অভাব ও ইহার ফল সূক্ষ্ম-শরীর। সেইজন্য প্রবৃত্তি ও ভাবের তীব্রতা যত অধিক হয়, মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম-শরীরের স্থায়িত্বও তত দৃঢ় হয়। এখন আমাদের বিবেচ্য মানব কি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ও কি লক্ষ্য করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই দুইটি জানিতে পারিলে যাহাতে উন্নতির পথ সহজ হয় তাহার চেষ্টা করা যায়।

মৃত্যুর পর সাধারণতঃ এইরূপ হইয়া থাকে—মৃত্যুর সময় কারণ ও সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর হইতে পৃথক হয়। এই পৃথক্ হওয়ার নাম মৃত্যু। এই মৃত্যুর সহিত স্থূল শরীরের ক্ষমতা নষ্ট হয়। সেইরূপ যখন কারণ-শরীর চলিয়া যায় তখন কারণ-শরীরের জ্যোতি না পাওয়াতে সূক্ষ্ম-শরীর কার্য্য করিতে অক্ষম হয়। কারণ-শরীর নিজেই কার্য্য করিতে সক্ষম, কিন্তু সূক্ষ্ম-শরীর সেরূপ নহে। কাবণ-শরীরের সহিত সূক্ষ্ম-শরীরের বিচ্ছেদ দ্বিতীয় মৃত্যু। এই দ্বিতীয় মৃত্যুর পর কারণ-শরীর দেববাস বা স্বর্গে যায়। পূর্ব্বজন্ম সমূহের কর্ম্ম সমষ্টির সংস্কার এই কারণ-শরীবে থাকে। আমরা স্থূল শরীরে স্থূল জগতে যেরূপ ভাবে থাকি, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরে জীবও সূক্ষ্ম ও কারণ-জগতে সেই ভাবেই থাকে। কারণ-শরীর যে কর্ম্ম-সংস্কার সঙ্গে লইয়া যায়, তাহাই জন্ম-জন্মান্তর বিধান করে।

সূক্ষ্ম-শরীরের বাসস্থান ভুবর্লোক। ইহা মৃত্যুর পর সেই লোকেই অপেক্ষা করে। স্থূল জগতে ইহার আকর্ষণ না থাকাতে ইহা সহজে এখানে ফিরে না। কারণ হইতে বিযুক্ত হইলে সূক্ষ্ম-শরীর মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত বলিয়া স্থূলের ন্যায় শীঘ্র পচিয়া কি অন্যরূপ নষ্ট হইয়া যায় না। কাজেই ইহার পার্থিব জীবনেব অপূর্ণ বাসনার তীব্র সংবেগ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। এই জন্যই আত্মহত্যাকারীদিগের কারণ-শরীর-বিযুক্ত সূক্ষ্মশরীর অপূর্ণ বাসনার প্রাবল্য হেতু ও তাহার সাফল্যের ক্ষমতার আধিক্য হেতু স্থূল জগতে ফিরিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। যদিও অনেক স্থলে প্রেত বা পিশাচ বা ভূত নামাইবার মণ্ডলীসমূহে আসে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কারণ-শরীর-বর্জ্জিত অপূর্ণ বাসনাযুক্ত সূক্ষ্ম-শরীরই এই সমস্ত ভূত আকাবে আসে।

যাহা হউক, মৃত্যুর পরে কি হয়, তাহা গীতা বুঝিবার জন্য তত প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি সমস্ত জীবন উপদেবতার উপাসনা করে, মৃত্যুর সময় সেই উপাস্য উপদেবতা তাহার সূক্ষ্ম-শরীরকে আত্মসাৎ করে। এরূপ অবস্থায় সূক্ষ্ম-শরীর স্বাধীন উপদেবতার দ্বারা ধৃত হইয়া বহুকাল স্থায়ী হয়। যদিও এই উপদেবতার কারণ-শরীর নষ্ট করিবার কোন ক্ষমতা নাই, তথাপি উপদেবতা দ্বারা চালিত হইয়া এরূপ অবস্থা প্রাপ্তি কোন প্রকারেই শ্রেয়স্কর নহে।

আর এক প্রকার উপাসনা আছে; তাহা আরও ক্ষতিজনক। কারণ-শরীরের সহিত আবাব স্বর্গের দেবের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দেবলোকেও ভাল মন্দ জীব

আছে। উপদেবতার উপাসনায় যেমন সূক্ষ্ম-শরীরকে উপদেবতা আত্মসাৎ করে, কারণ-শরীরকে আবার সেইরূপে দেবতারা আত্মসাৎ করে। দেবতার পরমায়ু উপদেবতা অপেক্ষা অনেক অধিক। সেইজন্য দেবতার উপাসনায় মুক্তির আশা আরও সুদূর। উপদেবতারা বরং সহজে ছাড়ে, দেবতা সহজে ছাড়ে না। দেবতার উপাসনা এইজন্য বড়ই ক্ষতিজনক।

দেবোপাসনায়, দেবতার স্থিতি পর্য্যন্ত উপাসকেরও স্থিতি। সেজন্য প্রলয়ের সময় দেবতার ধ্বংসের সহিত উপাসকেরও ধ্বংস হয়। দেবোপাসকের পক্ষে অমরত্ব নাই, কারণ দেব অমর নহে। এখন দেখা যাইতেছে যে, দেব, দৈত্য কাহারও উপাসনায় চিরস্থায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয় না। সেই জন্যই জগতের সর্ব্বধর্ম্মই বলিতেছে যে, ফলকামনার বশবর্ত্তী হইয়া দেবতার উপাসনা উচিত নহে, একমাত্র ঈশ্বরের উপসনাই কর্ত্তব্য। শেষোক্ত উপাসনাই মানবকে একমাত্র সত্যের পথ দেখায় এবং অমৃতাত্মা ঈশ্বরের পথে লইয়া যায়।

দৈবী প্রকৃতি জগৎকে ক্রমবিকাশিত করিয়া এই সত্যের পথে ক্রমাগত অগ্রসর করে। ঈশ্বরই দৈবী প্রকৃতির আদর্শ। এই আদর্শ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন জগৎ সমস্ত ক্রমবিকাশের চক্র ঘুরিয়া আবার ঈশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এখন আমাদের ভূমিকা একরূপ শেষ হইল, অতএব এইবার একবার গীতার প্রকৃত অংশে দৃষ্টিপাত করা যাক্।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মরণ ও মরণান্তে।

—*:*—

কামলোক।

ভূতগণ। (Elementaries)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কামলৌকিক ভূতকে ইংরেজিতে এলিমেণ্টারি (Elementary) কহে। কামলৌকিক খোসা (Shell), চিন্তাপ্রসূত অর্দ্ধসংজ্ঞাযুক্ত নির্দ্দিষ্ট অবয়ববিশিষ্ট শক্তিসমূহ (Elementals), ও ভূত সকল (Elementaries), এই তিন শ্রেণী পরস্পর বিভিন্ন। এই কথাগুলির যথেচ্ছ ব্যবহারে, এবং একটী অপরটীর প্রতি-শব্দরূপে সময় সময় ব্যবহৃত হওয়াতে, বিশেষতঃ অনেক সময় এই তিন শ্রেণীকে "ভূত" এই সাধারণ নামে অভিহিত করাতে, বড়ই গণ্ডগোল হইয়া থাকে। এ জন্য এই তিন শ্রেণীর পার্থক্য পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। কামলৌকিক খোসা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে এবং চিন্তাপ্রসূত শক্তি (Elemental) সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এই মাত্র বলা হইল। এখন ভূত কি? ইহা কুকর্ম্মনিরত পাপাসক্ত স্থূলদেহহীন মানব। পাপ কার্য্যের কশাঘাতে মরণের কিছুদিন পরে তাহারা তাহাদের উৎকৃষ্টতর অধ্যাত্মরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; এ জন্য তাহাদের অমর হওয়ার আর আশা থাকে না। অবিনশ্বর ও উৎকৃষ্টতর রূপত্রয় হইতে পৃথক হইয়া তাহারা কামদেহ ধারণে কামলোকে বিচরণ করে এবং তাহাদের পাপাশক্তির অনুরূপ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে আগমন করে। কামলোকে অবস্থানকাল সকলের সমান হয় না। কিন্তু পরিণাম সকলেরই একরূপ। কুজ্ঝটিকা রাশির ন্যায় তাহাদের একটী একটী অণু করিয়া সকল অণু বিশ্লিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ উপাদানে মিশিয়া কালে অদৃশ্য হইয়া যায়! এই হইল ভূতের পরিণাম।

আত্মাহীন।

"আত্মাহীন" কাহাকে বলে? অন্তর্মুখী মন (Lower Manas) কামের সঙ্গে জড়ীভূত হইয়া অহঙ্কারাদি অবিনশ্বর রূপত্রয় হইতে পৃথক্ হইয়া গেলেই

তাহাকে আত্মাহীন (Soulless) বলে। আত্মাহীনের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। স্থূল ও পিণ্ডদেহ বিনাশের পর তাহারা যখন কামলোকে থাকে, তখন তাহারা প্রকৃত ভূতরূপে পরিণত হয়। কামদেহ ধারণ করিয়া তাহারা অতিশয় অনিষ্টকারী ও ভয়ানক সাংঘাতিক হইয়া উঠে, এবং ইহলোকস্থ মানবের অজ্ঞানতা ও অসাবধানতা বশতঃ সুবিধা পাইলেই তাহাদের দেহ আশ্রয় করিয়া হ্রাস প্রাপ্ত স্বীয়জীবনীশক্তিকে উদ্দীপ্ত করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের মধ্যে যাহাদের জীবনীশক্তির তেজ ও বল বেশী, তাহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং যাহাদের তেজ ও বল কম, তাহারা ক্ষণস্থায়ী হয়। কিন্তু সকলেরই পরিণাম ফল এক—ধ্বংস! চির বিনাশ!!

কিন্তু বিনাশের পূর্ব্বে তাহারা নানারূপ অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। অন্তর্মুখী মনের সঙ্গে কামদেহের সংযোগ হইলেই, এই সমষ্টিকে ভূত বলে, মোটামোটি এইটুকু জানিয়া রাখিলেই চলিবে। এখন ভূতের ব্যাপার ছাড়িয়া স্বর্গলোক সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

স্বর্গলোক।

শাস্ত্রে আছে—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০॥ ৯ অঃ গীতা।

বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মপরায়ণ জনগণ যজ্ঞসকল দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমরস পান করেন এবং তদ্দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পুণ্যফল স্বরূপ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া, দিব্য সুখভোগ করিয়া থাকেন।

তেতং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্ম মনু প্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১॥ ৯ অঃ গীতা।

তাঁহারা সেই বিপুল স্বর্গসুখভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন; এইরূপে বেদত্রয়বিহিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া কামপরবশ হওয়ায়, তাঁহারা বারংবার সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন।

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢাঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ ১০ ॥

প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডঃ। মুণ্ডকোপনিষৎ॥

অজ্ঞানীলোকেরা ইষ্ট (যাগাদি কর্ম্ম) ও পূর্ত্ত (বাপীকূপ খননাদি কর্ম্ম) কে প্রধান মনে করে এবং অন্য শ্রেয়ঃ জানে না। তাহারা নিজপুণ্য কর্ম্ম লব্ধ স্বর্গের উপবিস্থানে কর্ম্মফল অনুভব করিয়া পুনরায় ইহলোকে বা ইহা অপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবেশ করে।

আমরা যাহাকে স্বর্গ বলি, তিব্বৎদেশীয় ভাষায় তাহাকে দেবকান (দেবস্থান) বা সুখাবতী বলে। স্বর্গ দেবরাজ্য। স্বর্গসম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের ধারণা বড় ভ্রান্ত। তাঁহারা বলেন, স্বর্গলোক কবি কল্পনা প্রসূত। ততোধিক বলিতে গেলে বলেন, ইহা মায়া বিজৃম্ভিত স্বপ্নাবস্থাবিশেষ,—অপ্রকৃত ও অসত্য, কেবল মায়ার কাণ্ড। মরণের পর আবার অস্তিত্ব কি? এই কথার প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে, মায়া কি, তাহা একটু বিশদভাবে বোঝা আবশ্যক। প্রকৃত জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শীর কথায় বলিতে গেলে, সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই মায়াময়। এই দৃশ্য জগৎ প্রকৃত প্রস্তাবে এক অচিন্ত্য সত্ত্বার বাহ্যাবরণ ও বাহ্যবিকাশমাত্র। প্রকৃত সৎ এক। সকল বস্তুর মূলে এই একমাত্র সৎ ওতঃ প্রোতভাবে নিহিত। যে বস্তু যে পরিমাণে কঠিন, তাহা সেই পরিমাণে সৎ হইতে দূরে অবস্থিত। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও দৃঢ়বস্তু, সৎ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে অবস্থিত। মানুষের স্থূলদেহ কঠিন ও স্পর্শযোগ্য; ইহা অপেক্ষা অধিক মায়াময় বস্তু আর কি হইতে পারে? এই দেহ অনবরত পরিবর্ত্তনশীল। এই দেহযন্ত্র অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণু গঠিত কোষ সমষ্টিমাত্র। অহরহঃ এই দেহকেন্দ্রে চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্রতম অসংখ্য জীবাণুসমূহ একত্র সম্বদ্ধ হইয়া সমষ্টিভাবে দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। তাহারা যখন আস্তে আস্তে এই দেহ

কেন্দ্র ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন অতি সূক্ষ্ম বলিয়া চক্ষুগোচর হয় না। আমাদের অলক্ষিতে ও অজ্ঞাতে অবিরত এইরূপ দেহের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। মনদ্বারা দেহতত্ত্ব জানা যায়, এজন্য মন দেহ অপেক্ষা কম মায়াময়। আমাদের ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য, চিন্তার কার্য্য ও জ্ঞানের কার্য্য মনদ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে মানসরাজ্য সত্যের অতি নিকটে। পরিদৃশ্যমান পার্থিবজগৎ সত্য হইতে বহুদূরে।

এই নশ্বর বাহ্য জগতের তুলনায় মনকে স্থায়ী ও অবিনশ্বর বলা যায়। কারণ যিনি প্রকৃত জীব, যিনি ভাবনা করেন, যিনি চিন্তা করেন, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এই তিনকালে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহাকেই সাধারণ ভাষায় মনঃ (Manas) কহে। বাহ্য বিষয় হইতে ইহা যতই দূরে থাকিবে, ততই তাহার বিনশ্বর ভাব অপসারিত হইবে। যখন স্থূলদেহ, পিণ্ডদেহ ও কামদেহ পরিত্যাগ করিয়া জীব মুক্তিলাভ করে, তখন যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বদর্শনে সক্ষম হয় এবং পূর্ব্বাপেক্ষা বহুপরিমাণে তাহার দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত ও তীক্ষ্ণ হয়। এই দেহত্রয় ধারণ কালে তাহার দর্শনশক্তি মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন থাকে। দেহনাশে এই আবরণ উন্মুক্ত হইয়া জীব প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। ইহাই তাহার স্বাভাবিক অবস্থা। সংস্কার আহরণের উদ্দেশ্যে জীবকে কিছুকালের জন্য স্থূলদেহাদি ধারণ করিয়া সংসার সাগরে ঝাঁপ দিতে হয়, নতুবা সংস্কার আহরণ হয় না। প্রবালমুক্তা আহরণকারীরা অগাধ জলধিজলে ডুব দিয়া যেমন তাহা কুড়াইয়া লয়, ঠিক্ সেইরূপ জীব অতল সংসার সমুদ্রে ডুব দিয়া বহুকষ্টে জন্মে জন্মে সংস্কার আহরণ করিয়া জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮। ১৫ শঃ অ।
শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চরসনংঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯। ১৫ অঃ।
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপিভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়ানানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০। ১৫। অঃ। গীত

যেমন বায়ু সঞ্চালন কালে পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া যায়, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রমণকালে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া লয় এবং অন্যদেহে প্রবেশকালে উক্ত ইন্দ্রিয় শক্তির সহিত মনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। ৮।

জীবাত্মা শ্রোত্র, নেত্র, ঘ্রাণ রসনা ও ত্বক্‌সহ মনকে আশ্রয় করিয়া, শব্দাদি বিষয় উপভোগ করিয়া থাকে। ৯।

উৎক্রমণশীল অথবা দেহাবস্থিত কিংবা বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত, বা গুণত্রয়শালী আত্মাকে মূঢ়গণ দেখিতে পায় না; জ্ঞাননেত্রযুক্ত মহাত্মারাই সেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ১০।

ইহলোকে জীবকে বেশি দিন থাকিতে হয় না। ইহলোক তাহার স্থায়ী বাসস্থান নহে। মাংসময় গুরু দেহভার এবং ছার পার্থিবরাজ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীব অচিরেই তাহার স্বরাজ্যে প্রস্থান করে। স্বর্গলোকই তাহার স্বরাজ্য; স্থূলদেহ ধারণে সংসারবাস তাহার পক্ষে নির্ব্বাসন বিশেষ। জনৈক মহাত্মা এই অবস্থাকে অতিবিশদভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "বেদান্তবাদীদের মতে সংজ্ঞা দুই প্রকার; এক পার্থিব, অপর অধ্যাত্ম। তন্মধ্যে শেষোক্ত সংজ্ঞাই নিসংশয় রূপে সত্য। পার্থিব জীবন সদা পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী; এইজন্য ইন্দ্রিয়াদির মায়া বই আর কিছু বলা যাইতে পারে না। অধ্যাত্ম রাজ্যই সত্য; কারণ অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন "আমি" বা "সূত্রাত্মা" এই আধ্যাত্মিক রাজ্যেই বাস করেন। এবং প্রত্যেকবার যখন জন্মধারণ করিয়া এই মর অনিত্য সংসারে আসিতে হয়, তখন তাহাকে সাময়িক ক্ষণভঙ্গুর নব নব দেহ ধারণ করিতে হয়। আত্মা, শক্তি এবং প্রকৃতি এই তিনের তত্ত্ব অনাদি অনন্ত। প্রত্যেক জন্মে এই তিনের একত্র সমাবেশে যে সাময়িক বাহ্য অবয়বের সৃষ্টি হয়, ইহাকে মায়া বই আর কি বলা যাইতে পারে? এই জন্য পারলৌকিক জীবনকে সত্য বলা হয় এবং ইহজীবনকে মায়াবিজৃম্ভিত অলীক ও কল্পনা প্রসূত বলা হয়। এই যখন হইল বিষয়, তখন প্রকৃত অবস্থাকে নিদ্রা ও মায়াময়, এবং অপ্রকৃত অবস্থাকে জাগ্রত বলা যাইতে পারে কিরূপে?"

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

৬৯। ২য়ঃ অ। গীতা।

এখন শ্রীভগবানের এই উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিলে ত?

অজ্ঞলোকের পক্ষে যাহা নিশাস্বরূপ তাহাতে জিতেন্দ্রিয়গণ জাগরিত

থাকেন, যাহাতে সর্ব্বভূত জাগরিত থাকে, তাহা আত্মতত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশাস্বরূপ।

যাহারা সংসারের কীট, পার্থিব বিষয়ের সঙ্গে মাত্র যাহাদের সম্বন্ধ, সূক্ষ্মজগৎ বা অধ্যাত্ম ভাব সম্বন্ধে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহাদের নিকট স্বর্গরাজ্য অসত্য, অপ্রকৃত, মায়াময় কল্পনাপ্রসূত ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যেহেতু, তথায় স্থূল উপাদানের এবং তৎসম্ভূত সসীমত্বের সম্পূর্ণ অভাব। তথায় মন তাহার স্বরাজ্যে বিচরণ করে। ইচ্ছা করা মাত্র অভিলষিত বিষয়ের সৃষ্টি হয়। চিন্তা করা মাত্র অভীপ্সিত বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। এই জন্যই বলা হয় যে মরণের পরই নবজীবন লাভ হয় অর্থাৎ অনিত্য ও বিনশ্বর জীবন হইতে পুনরায় নিত্য ও অবিনশ্বর জীবনে প্রত্যাগমন করা হয়।

আমেরিকার প্রেততত্ত্ববাদিগণ বলেন যে, স্থূল-দেহ মুক্ত পরলোকবাসী নরনারীগণ পরস্পর মধ্যে এবং ইহলোক বাসীদের সঙ্গে পরিণয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করে। কিন্তু ইহা প্রকৃত নহে। তত্ত্বজ্ঞ খৃষ্টানগণ ঠিক বেদান্তবাদীদের ন্যায় বলেন যে, স্বর্গরাজ্য কোনরূপ অশ্রুপাত, তপ্তশ্বাস বা পরিণয় কার্য্যাদি বর্ত্তমান নাই। সেখানে সদাত্মগণ তাহাদের পূর্ণতা সম্যক উপলব্ধি করেন। ইহুদী-ধর্ম্ম-যাজকগণ অধ্যাত্ম ভাবরাশিকে পার্থিব আকারে প্রকাশ করিতে সর্ব্বদাই প্রয়াস পান। তাহাদের মতে ইহলোকের ভোগবিলাস ও সৌন্দর্য্য বিকাশ, যথা, সমারোহে বিবাহ উৎসব, সুবর্ণমণ্ডিত রাজপথ, অমূল্য রত্নরাজি ও দীপ্তি-শালী মণিমাণিক্যখচিত সিংহাসন ও রাজমুকুট ইত্যাদি মরণের পর স্বর্গরাজ্যে লাভ হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহারই অনুসরণ করিয়া বলেন যে, এ জগতে যে পরিমাণে সুখ দুঃখ পাওয়া যায়, তাহার অনেক পরিমাণে অধিক সুখদুঃখ স্বর্গে ভোগ হইয়া থাকে। তাহারা এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহারা শেষে এই সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছেন যে, তাহাদের স্বর্গ যেন ঠিক বর্ত্তমান সিমলা শৈল, উতকামন্দ, নৈনিতাল বা দার্জ্জিলিং প্রভৃতি শ্বেতকায় রাজপুরুষদের গ্রীষ্মবাসের বিলাসভবন বিশেষ। যাবতীয় ভোগ্যবস্তু, বিলাস সামগ্রী তাহাতে বিদ্যমান। মুক্তাত্মা-স্বামী (spirit-husband), মুক্তাত্মা-স্ত্রী (spirit-wife), মুক্তাত্মা-শিশুসন্তান (spirit-infants) উক্ত শিশুদের স্কুলকলেজে যাওয়া, লেখাপড়া শিখা ও যৌবনে নবযৌবনসম্পন্না

রূপবতী ললনার পাণিগ্রহণ করিয়া দাম্পত্য সুখ উপভোগ করা ইত্যাদি সকল সুখ দুঃখের সমবায় এখন তাহাদের এই স্বর্গেও বিদ্যমান দেখা যায়; কিন্তু প্রাচ্য বৈদান্তিকদের মত তাহার বিপরীত। উচ্চ মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবসমূহকে পঙ্কিলময় পার্থিবভাবে প্রকাশ করিতে তাঁহারা একেবারে নারাজ; আশঙ্কা, পাছে তদ্দ্বারা অজ্ঞ-জন-সমাজে ভবিষ্যতে ব্যভিচার দোষ ঘটে। দেহবদ্ধ জীবকে মুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে উড়িতে দেওয়াই সতত তাঁহাদের ঐকান্তিক ও প্রাণপণ চেষ্টা।

স্বর্গলোক দূরত্ব (space) ও সময়ের অধীন হইতে হয় না। তথায় জীব ইচ্ছামত তাহাদের উৎপাদন ও উপসংহার করিতে পারে। ইহজীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহ মনে নব নব বল সঞ্চিত হইয়া বার্দ্ধক্যে যেমন তাহাদের হ্রাস হয়, স্বর্গেও তদনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু পার্থিব সুখ, দুঃখ মিশ্রিত। স্বর্গে অতুল আনন্দ ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ হয়।

জীব ঈশ্বরের অংশ।

অংশাংশীনুনভেদস্মাৎ ব্রহ্ম বহ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। ব্রহ্ম বহ্নি (flame) স্বরূপ, অসংখ্য জীবসমূহ তাহার স্ফুলিঙ্গ (sparks) স্বরূপ। "একোহম্ বহুস্যাম্। আমি এক আছি, বহু হইব।" সৃষ্টির প্রাক্কালে পরমপিতা পরমেশ্বরের এই যে ইচ্ছা, তাহা হইতেই চরাচর বিশ্বের এবং জীবের সৃষ্টি হইল। সৃষ্ট জীব মায়াময় সংসার সাগরে মগ্ন হইয়া স্ব স্বরূপ ভুলিয়া গেল। মায়ার দুর্ভেদ্য আবরণে তাহার দিব্য-দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এখন উদ্ধারের উপায় কি? সংস্কার আহরণ করিয়া মায়ামুক্ত এবং পরিণামে স্বীয় শুদ্ধ, মুক্ত, নিত্যসত্ত্বার উপলব্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মধারণ করিতে হয়। মধুমক্ষিকা মধু আহরণ করিয়া যেরূপ ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায়, ঠিক্ সেইরূপ মানব জন্মে জন্মে গুণরাশি আহরণ করিয়া মায়ামুক্ত হয়। মুক্তজীব ইচ্ছামত এই বিশ্বের যথা তথা যাতায়াত করিতে পারে। এইরূপ করিতে করিতে পরিণামে স্বীয় স্বরূপ লাভ করে; এবং পূর্ণ মানস-ধ্যানী হইয়া বলিতে সক্ষম হয়, "অহং ব্রহ্মাস্মি"। কোটি কোটি, অসংখ্য অসংখ্য জীবনের তপস্যার ফলে এই দেবদুর্লভ পদ লাভ হইয়া থাকে।

পতি, পুত্র, পিতা, ছাত্র, স্বদেশ প্রেমিক, শিল্পী, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ

খ্রীষ্টিয়ান, যে কেহ হউক, তাহাকে ইহজীবনলব্ধ পুণ্যফল স্বর্গে ভোগ করিতে হয়। যাহা আয়োজন করা হয়, তাহার অতিরিক্ত আহার করাও যায় না, জীর্ণ করিতেও পারা যায় না। যে পরিমাণ বীজ বপন করা যায়, সেই পরিমাণ শস্য মিলে। চাষকরা জমিতে চক্ষের পলকে বীজ ফেলা যায়, কিন্তু এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ফসল ফলিতে ও তাহা কাটার এবং সংগ্রহের উপযুক্ত হইতে অনেক সময় লাগে। যে জাতীয় বীজ বুনা হয়, সেই জাতীয় শস্য মিলে। ইহজীবনে যেরূপ কাজ করা যায়, স্বর্গে তদনুরূপ ফলই ভোগ করিতে হয়। ইতর বিশেষ হওয়ার যো নাই। ইহাই অলঙ্ঘ্য স্বাভাবিক নিয়ম।

স্বর্গ অপবিত্র জিনিসের বা কুবাসনার স্থান নহে। তৎসমস্ত ইহলোকে এবং কামলোকে পরিত্যাগ করিয়া তবে স্বর্গে যাইতে হয়। সঞ্চিত পুণ্য অল্প হইলে স্বর্গবাস কাল অনতিদীর্ঘ হয়, কাজেই আত্মা অধিক উন্নত হইতে পারে না, এজন্য ইহজীবনের আবশ্যকতা। এখানে সুকার্য্যের ও পুণ্যের বীজ বপন করিতে হয়; এখানেই সংস্কার আহরণ করিতে হয়। স্বর্গে এই সকল পরিপক্ক হইয়া পূর্ণতা লাভ করে। পরজীবনে জীব তাহা সঙ্গে লইয়া আইসে। সুবিধা সুযোগ পাইলেই মানসচিন্তাসমূহ তখন কার্য্যরূপে পরিণত হয়। মানস-রাজ্য চিন্তা ও ভাবের উৎপাদক। স্থূল জগতে এই সকল ভাব ও চিন্তা স্থূল কলেবর ধারণ করিয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়। আত্মা রাজমিস্ত্রি স্বরূপ, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ধ্যান মগ্ন হইয়া নমুনা ও নক্সা তৈয়ার করিতে থাকেন, করিতে করিতে শেষে বাহ্যজগতে তাহার সুরম্য হর্ম্ম্য দৃষ্টিগোচর হয়। গত জীবনে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার বলে স্বর্গবাস কালে নক্সার আদর্শ তৈয়ার হয় ও পরজীবনে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়া বাহ্য জগতে স্থূলরূপ ধারণ করে।

চিন্তা এবং ধ্যানের শক্তি অপরিসীম। এই চরাচর বিশ্ব, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার চিন্তা ও ধ্যান প্রসূত। সৃষ্টি বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ বর্ণনা আছে।

সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য কল্পাদিষু যথাপুরা।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ সর্গ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ ॥ ৪ ॥
পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গোধ্যায়তোঽপ্রতিবোধবান্।
বহিরন্তোঽপ্রকাশশ্চ সংবৃতাত্মা নগাত্মকঃ ॥ ৬ ॥

তমপ্যসাধকং মত্বা ধ্যায়তোহন্যস্ততোহভবৎ।
ঊর্দ্ধস্রোতা তৃতীয়স্তু সাত্ত্বিকোর্দ্ধমবর্ত্তত॥ ১১॥
তে সুখপ্রীতি বহুলা বহিরন্তস্ত্বনাবৃতাঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ ঊর্দ্ধস্রোতো ভবাঃস্মৃতাঃ॥ ১২॥
তুষ্টাত্মনস্তৃতীয়স্তু দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
তস্মিন্ সর্গেহভবৎ প্রীতির্নিষ্পন্নে ব্রহ্মণস্তদা॥ ১৩॥
ততোহন্যং সতদাদধ্যৌ সাধকং সর্গমুত্তমম্।
অসাধকাংস্তুতান্ জ্ঞাত্বা মুখ্যসর্গাদিসম্ভবান্॥ ১৪॥
তথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্ততঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব চাব্যক্তাদর্ব্বাক্ স্রোতস্তু সাধকম্॥ ১৫॥

৫ম অঃ। ১ম অংশ। বিষ্ণুপুরাণ।

কল্পের প্রারম্ভে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করিলেন। তাহাতে অজ্ঞান ও তমোময় সর্গ প্রাদুর্ভূত হইল। এই অসম্পূর্ণ সৃষ্টি তাঁহার মনোমত না হওয়াতে, তিনি অপর সৃষ্টি বিষয়ে ধ্যান করিলে প্রাণী সর্গের আবির্ভাব হইল। এই সৃষ্টিকেও অসম্পূর্ণ দেখিয়া তিনি আবাব ধ্যানস্থ হইলে ঊর্দ্ধবাসী সাত্ত্বিক দেবসর্গের আবির্ভাব হইল। তাহারা সুখপ্রীতি বহুল বহিরন্তঃ অনাবৃত দেবসর্গ নামে অভিহিত। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মার প্রীতি জন্মিল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে অসাধক জানিয়া অপর উত্তম সর্গ ধ্যান করিলেন। তাহাতে অব্যক্ত (মায়া) হইতে সাধক (মনুষ্য) প্রাদুর্ভূত হইল।

স্থূল বাহ্যরূপ, চিন্তা ও ধ্যানের অনুগমন করে। আগে ভাব, পরে রূপ। নামের মূল ভাব, অথবা ভাবই নাম। যাহারা ভাব রাজ্যের কোন খোঁজ খবর রাখে না, চিন্তার শক্তি, ধ্যানের প্রভাব পরিজ্ঞাত নহে, তাহারা মহাভ্রমে পতিত হইয়া স্বর্গকে কল্পনারাজ্য বলিয়া মনে করে; নিদান পক্ষে তাহার অস্তিত্ব বিশ্বাস করিলেও তাহাতে বাস করা, আর বৃথা কালহরণ করা—একই জ্ঞান করে। তাহারা এই নশ্বর জড়জগৎকেই একমাত্র সত্য, কার্য্যোপযোগী ও অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করে। আর ভ্রান্ত, মোহান্ধ জীব! প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা কি জান? এই চরাচর বিশ্বে যত কিছু কার্য্যাদি দেখিতেছ, তৎসমস্তেরই মূলে চিন্তা এবং ধ্যান। সুগভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়াই ওঙ্কারেশ্বর শব্দ-ব্রহ্মের

আবির্ভাব হইয়াছিল। যদি এ জগতের যাবতীয় কার্য্যাদির মূল একমাত্র গভীর ধ্যান হইত এবং স্থূলদেহ ধারণ কালে যদি মানব সময় সময় স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে স্বর্গলোকে গমনাগমন করিতে পারিত, তবে নিশ্চয়ই এ জগতের কার্য্যাদি এত শক্তিশূন্য হইত না। তাহা হইলে মানব আর অজ্ঞানতার দোষে শোকে তাপে বিপদে আপদে অবসন্ন হইত না। তাহা হইলে সংসার কতই সুখের স্থান হইত!

যাঁহারা জীবদ্দশায় স্বদেহত্যাগ করার ক্রম শিখিয়াছেন, তাঁহারা যখন ইচ্ছা তখন স্বর্গে গমন করতঃ তথায় বিচরণ করিয়া পুনরায় স্থূল দেহে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন। কূর্ম্ম যেমন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি প্রত্যাহার করিয়া ভিতরে লইয়া যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি বাহ্যবিষয় হইতে যিনি মনকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া ফেলিতে পারেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। তিনিই স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গাদিলোকে বিচরণ করিয়া পুনরায় স্থূলদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানিব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়েভ্যঃ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

৫৮।২। গীতা।

যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তাহার চিন্তা ও কার্য্যাদি অতিশয় তেজপূর্ণ, শক্তিশালী, শীঘ্রগামী এবং বৃথা আড়ম্বর শূন্য। মন চিন্তার আধার। স্বর্গ মানসরাজ্য। ইহা দেবগণের আবাসস্থান, পুণ্যাত্মার পুণ্য নিকেতন। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষতালাভে স্বর্গবাসের পথ প্রসারিত হয়, আত্মার প্রভূত উন্নতি সাধন হয় এবং মানবজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া পরিণামে জীবাত্মার মুক্তিলাভ ঘটে।

চার্ব্বাক মত সম্বন্ধে দু'একটি কথা।

চার্ব্বাক বাদী প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ মানেন না। তাঁহাদের নিকট অনুমান অগ্রাহ্য। কিন্তু অনুমান ব্যতীত জীবনে একপদও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সুতরাং চার্ব্বাকী, মুখে অনুমান অগ্রাহ্য করিলেও, কার্য্যতঃ তাহা পদে পদে মানিয়া লইতেছেন। তিনি শত সহস্র বার রাত্রির পর দিন, মেঘের সহচর বৃষ্টি, অগ্নির ফল উষ্ণতা, ভোজনে ক্ষুধা নিবৃত্তি, জলপানে পিপাসা শান্তি ইত্যাদি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু কে তাঁহাকে বলিল যে, ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত অক্ষুন্ন থাকিবে? তৃষ্ণার্ত্ত হইলে তিনি জলপান করেন কেন? সহস্র বার তিনি জলের তৃষ্ণা-নিবারণ-শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানে জলের যে ঐ শক্তি আছে বা ভবিষ্যতে থাকিবে, ইহা তিনি জানিলেন কিরূপে? তিনি জানেন নিশ্চয়ই, না জানিলে তিনি তৃষ্ণার উদয়ে জল পান করিবেন কেন? জলের যে ঐ গুণ এখনও আছে, ইহা ভাবিয়া লওয়াটাকি প্রত্যক্ষ না অনুমান? তিনি লক্ষবার ভূপৃষ্ঠে পদক্ষেপ করিয়া জানিয়াছেন যে উহা কঠিন, কিন্তু এখনও যে উহা কঠিন আছে বা ভবিষ্যতে থাকিবে কে বলিল? সুতরাং প্রতি পদক্ষেপে তিনি অনুমান করিতেছেন যে, উহা পূর্ব্ববৎ কঠিনই আছে, (তরল বা বাষ্পীয় পদার্থের গুণাক্রান্ত হয় নাই)। তিনি প্রস্তর ও লৌহ সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিতে যান কোন্ সাহসে? ইহাদ্বারা যে অগ্নি হইবে তিনি কিরূপে জানিলেন? আবার তণ্ডুলাদি সিদ্ধ করিবার মানসে তিনি যে উহা অগ্নির উপর স্থাপন করেন, ইহাতে তাঁহার অধিকার কি? তিনি কিরূপে জানিলেন যে, অগ্নির উত্তাপ ও দাহিকতা পূর্ব্ববৎ অক্ষুন্ন আছে? পীড়া হইলে তিনি ঔষধ সেবন করেন কেন? কে তাঁহাকে বলিল যে ঔষধে রোগ শান্তি হইবে? আত্মীয়ের কঠিন পীড়া হইলে, তিনি মৃত্যু আশঙ্কা করেন কেন? তিনি কিরূপে জানিলেন যে মানব মাত্রই মরিবে। সর্প দংশন করিতে আসিলে তিনি প্রাণভয়ে পলায়ন করেন কেন? তিনি কিরূপে জানিলেন যে সর্পের দংশন শক্তি ও বিষ আছে এবং ঐ বিষ তাঁহার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহার জীবন নাশ করিবে? ঘি খাইলে শরীরের বল ও সুখ হইবে ইহা যে

তিনি ভাবিতেছেন, (ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ বা), বলি ইহা কিসের সাহায্যে, প্রত্যক্ষ না অনুমান ? সহস্রবার তিনি ঘি খাইয়া সুখ পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতেও যে ঘৃতের ঐ শক্তি থাকিবে, তিনি কিরূপে জানিলেন ? তিনি বস্ত্র পরিধান করেন কেন ? কে বলিল উহা শীতাতপ হইতে তাঁহার দেহ-রক্ষা করিবে ? তিনি কথা কহেন কোন্ সাহসে ? তাঁহার শব্দের যে পূর্ব্ববৎ অর্থ প্রকাশিকা শক্তি আছে, ইহা তিনি বুঝিলেন কিরূপে ?

তিনি যদি বলেন, "আমি কিছুই অনুমান করি না। জলের তৃষ্ণানিবারিকা শক্তি আছে, ইহা অনুমান করিয়া যে আমি জলপানে প্রবৃত্ত হই, তাহা নহে। তবে তৃষ্ণা পাইলে পরীক্ষা করিয়া দেখি, জলের ঐ শক্তি আছে কি না"। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, পরীক্ষা কার্য্যটা স্নিগ্ধ ও সুশীতল জলের দ্বারাই করা হয় কেন ? পোয়াটাক্ ছাতু অথবা খানিকটা গলিত সীসক জিহ্বায় ঢালিয়া দিয়াও তো পরীক্ষা করিতে পারেন, তৃষ্ণা নিবারিত হয় কি না। কারণ সীসকের বা ছাতুর যে তৃষ্ণা নিবারিকা শক্তি নাই, ইহা আপনি বলিতে পারেন না, বলিলেই আপনাকে অনুমানের আশ্রয় লইতে হইল। যদি বলেন পদক্ষেপের পূর্ব্বে ভূমির কাঠিন্য অনুমান করিয়া লন না, পরীক্ষা করেন মাত্র। ভাল গৃহের ছাদ হইতে নামিবার সময় বস্তুর কাঠিন্যটাও দুই একবার পরীক্ষা না করেন কেন ? এখন শীতের দিনে গরম কাপড়ের শীত নিবারণী শক্তির পরীক্ষা না করিয়া, বরফের ঐ শক্তি আছে কি না মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করেন না কেন ? পুষ্টিকরী বা রসনাতৃপ্তিদায়িকা শক্তির পরীক্ষা যে সর্ব্বদা ঘৃত বা মিষ্টান্নের দ্বারাই সাধিত হইবে, ইহা কিরূপ কথা, মধ্যে মধ্যে কর্দ্দম, গোময়, সেঁকো ও ধুতুরাদির পরীক্ষাই বা না হয় কেন ? যদি পরীক্ষাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তৃষ্ণার সময় চাকরকে "জল আন" এই কথা না বলিয়া—"আমার গলা টিপিয়া ধর", ইহা বলিয়াও তো দেখিতে পারেন, আপনার তৃষ্ণা নিবারিত হয় কি না। কারণ "জল আন" এই শব্দটি শুনিলে চাকর আপনার অভিলষিত বস্তুটি হাজির করিবে এবং "গলা টিপ" শুনিয়া একটি অপ্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, ইহা আপনি জানিলেন কিরূপে ? অনুমানের দ্বারা নয় কি ?

অতএব হে প্রত্যক্ষবাদিন্ ! অনুমান ব্যতীত তুমি একপদও চলিতে পার না, অথচ অনুমান মানি না বলিয়া মুখে বড়াই কর। তোমার পিতামহকে তুমি

প্রত্যক্ষ কর নাই বলিতেছ। তিনি ছিলেন কি? এ প্রশ্নের তুমি কি উত্তর দিবে? যদি বল "তিনি ছিলেন"। কিরূপে জানিলে ভাই? যদি বল "ছিলেন না"। তোমার পিতার জন্ম কিরূপে হইল? তুমি বলিতেছ "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"—ভস্মীভূতদেহের পুনরাগমন হয় না। তুমি সহস্র সহস্র দেহ হয়ত দগ্ধ করিয়া দেখিয়াছ যে, তাহারা ফিরিয়া আসে না। ইহা হইতে তুমি সিদ্ধান্ত করিলে যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—সকল দেহের পক্ষেই এই নিয়মটি খাটিবে। ভাই হে, এই সিদ্ধান্তটি কি অনুমান লব্ধ নহে? এইরূপ অশনে, বসনে, গমনে, কথনে, প্রতি নিশ্বাসে, প্রতিপলকে তুমি অনুমান করিতেছ,—অনুমান ব্যতীত তোমার জীবনধারণ অসম্ভব, অথচ তুমি বলিতেছ, আমি "অনুমান মানি না।" ধন্য সত্যনিষ্ঠা! ধন্য তোমার সূক্ষ্মবুদ্ধি!

যদি বল, "এগুলিকে আমরা অনুমান বলি না; প্রকৃতির যে সকল নিয়ম আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাদের অপরিবর্ত্তনীয়তা প্রত্যক্ষের মধ্যেই গণ্য, অনুমান নহে। সুতরাং একমাত্র প্রত্যক্ষের উপরই আমরা নির্ভর করি।" ভাল এস ভাই, যে "প্রত্যক্ষের" বলে তুমি বলীয়ান্, যাহার গর্ব্বে তুমি স্ফীত, দেখা যাক্ সেই "প্রত্যক্ষ" বলিতে তুমি কি বুঝ এবং ইহার সীমাই বা কতদূর। তুমি যদি বল "চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমার যে জ্ঞান বা অনুভূতি হইবে, তাহাই আমার প্রত্যক্ষ এবং তদতিরিক্ত কিছুই আমি মানিব না"। প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে মানবমাত্রের ইন্দ্রিয়ের সীমা ঠিক একরূপ কি? তোমার চক্ষু যতটুকু দেখিতে, বা কর্ণ যতটুকু শুনিতে সক্ষম, কোন কোন ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক দেখিতে, বা শুনিতে পায় কি না? কোন কোন অসভ্যজাতির শ্রবণশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ যে তুমি যেখানে কিছুই শুনিতে পাইবে না, তাহারা সেখানে কত কি শুনিবে, হয়ত শত্রুর আগমন-বার্ত্তা তোমাকে বলিয়া দিবে। কুকুর তীব্রঘ্রাণশক্তিদ্বারা এরূপ বস্তুর সন্ধান পায়, যাহা মানবের প্রত্যক্ষবহির্ভূত। হে প্রত্যক্ষবাদিন্! এগুলি তোমার প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও, তাহাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে; সুতরাং এরূপস্থলে তুমি এগুলিকে অগ্রাহ্য করিবে, কি গ্রাহ্য করিবে? দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই যে, মানবের ইন্দ্রিয় একটি নির্দ্দিষ্ট সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ কিনা? বিজ্ঞানবলে যে ইথারের এত সংখ্যক হইতে এত সংখ্যক পর্য্যন্ত স্পন্দন, আমাদের চক্ষু গ্রহণ

করিতে সক্ষম, অথবা বায়ুর কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্পন্দনমাত্র আমাদের কর্ণকটাহে শব্দমান উৎপাদন করে, ইহাদের নীচের বা উপরের যে সকল অসংখ্য স্পন্দন আছে, তদ্দ্বারা কিরূপ আলোক, বর্ণ বা শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা জানি না। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পক্ষেও ঠিক এই নিয়ম। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের মতে মানব বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশাল প্রকৃতির একটি অতি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ অংশ মাত্র জানিতে সক্ষম। এরূপ স্থলে, ওহে চিন্তাশূন্য বাক্যবাগীশ! তোমার প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত আর কিছুই নাই বলিয়া সদম্ভে আস্ফালন করা অতিশয় ধৃষ্টতা ও চপলতার পরিচায়ক নয় কি?

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে মানবের প্রত্যক্ষানুভূতির সীমা ক্রমশঃ বাড়িতেছে কিনা? তুমি যে পরিস্রুত জল আজ পান করিতেছ, তন্মধ্যে কত শত জীবজন্তু যুদ্ধ ও ক্রীড়া করিতেছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা কে জানিত? অথবা আজও যাহারা অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করে নাই, তাহাদের ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে কি? বৃহস্পতির যে অনেকগুলি উপগ্রহ আছে বা একটি অঙ্গুরীয়ক শনিগ্রহকে বেষ্টন করিয়া আছে, দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইহা কয়জনের প্রত্যক্ষে আসিয়াছিল? কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহারা ছিল না? এক্স্‌রেজের (X' rays এর) সাহায্যে মানবচক্ষু মুদ্রিত করিয়াও বাক্সের অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় পদার্থ দেখিতে পায়। ইহা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে কি X'rays ছিল না, অথবা তৎসাহায্যে ঐরূপ দেখা অসম্ভব ছিল? আজকাল অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, মেস্‌মেরিজমের দ্বারা তন্দ্রাবিষ্ট ব্যক্তির ইন্দ্রিয়শক্তি এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, সে অনায়াসে দূরদেশের ঘটনা দর্শন ও শ্রবণ করিতে সক্ষম হয়। আবার আমেরিকায় অনেকের এরূপ শক্তি (thought reading clairvoyanee) হইয়াছে যে, তাঁহারা স্বদেশে বসিয়া বিলাতের বা ভারতের ঘটনানিচয় দেখিতে ও শুনিতে পারেন। এই সকল ব্যাপার তুমি আজ জানিতে পারিতেছ; কিন্তু তাই বলিয়া কি তুমি বলিবে যে ইহারা পূর্ব্বে আদৌ ছিল না? তোমার প্রত্যক্ষানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে কি এই সকল বস্তুর সৃষ্টি হইতে থাকে? অথবা ইহারা বরাবরই ছিল, কিন্তু তোমার প্রত্যক্ষে আইসে নাই? মানবের ইন্দ্রিয়শক্তি যে ক্রমাগত বাড়িতেছে, এবং চেষ্টা করিলে যে ইহার অভাবনীয় বিকাশ সাধন করা যায়, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ ইহা আজকালের একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। দেখ,

পাশ্চাত্য জগতের কত ব্যক্তি কয়েক বৎসব এমন কি কয়েক মাস মাত্র একটু সংযতভাবে সাধন করিয়া কত অদ্ভুতশক্তি (তোমাদের চক্ষে অদ্ভুত কিন্তু যোগীর নিকট অতি ক্ষুদ্র ও হেয়), যথা পবের মনোভাব জানা, চিন্তা চালনা, একটু ভবিষ্যৎ জানিতে পারা ইত্যাদি লাভ কবিতেছে। যদি তোমার সন্দেহ হয়, মাস কয়েক কিছু সাধন অভ্যাস করিলেই বুঝিতে পাবিবে, শক্তি বাড়ে কি না। এখন তোমাব প্রত্যক্ষ কোথা রহিল ভাই ? যে তুমি আজ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের একমাত্র দ্বার বলিয়া, তীব্র আস্ফালন করিতেছ, সেই তুমিই হয়ত দুই বৎসর কঠোর সাধনার পর একটি নূতনশক্তি (বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়) লাভ কবিয়া প্রকৃতির আবও কত নূতন রাজ্য দেখিতে পাইবে এবং তোমার তাৎকালিক প্রত্যক্ষের সহিত বর্ত্তমান প্রত্যক্ষের তুলনা করিলেই হয়ত তুমি বলিবে "পূর্ব্বে আমি পাঁচটি ছিদ্রবিশিষ্ট একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ ছিলাম এবং এই সকল ছিদ্র দিয়া জগৎ দেখিতাম, কিন্তু আজ আমি মুক্ত স্থানে বিচরণ কবিতেছি। পাঁচটি ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান হয় তদতিবিক্ত আর কিছুই নাই, ইহা মনে করা কি ভ্রম !"

ওহে ক্ষুদ্রলোচন। তোমার দৃষ্টি অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তুমি একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছ। তুমি ভাবিতেছ, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কেবল সত্য প্রত্যক্ষ কবা যায় এবং প্রত্যক্ষ কবিবার অপর কোন ইন্দ্রিয় বা শক্তি নাই। এই ভ্রমবশতঃ তুমি মনে কব যে, পরলোক সম্বন্ধে যে যাহা বলে, সমস্তই অনুমানমূলক বা কল্পনাসিদ্ধ। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক যুগে তোমার জানা উচিত যে মানবের কতকগুলি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে এবং ইহাদের বিকাশ সাধনাসাপেক্ষ। এই সূক্ষ্মেন্দ্রিয়েব সাহায্যেই ঋষি ও যোগিগণ পরলোক ও দেবতাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং কবিতেছেন। তুমি যখন অণুবীক্ষণের সাহায্যে কোন সুন্দর পুষ্পে অসংখ্য ক্ষুদ্র কীট দেখিতে পাও এবং উহাদের রূপগুণ বর্ণনা কর, তখন যদি এক নগ্নচক্ষু অশিক্ষিত বর্ব্বর (যে অণুবীক্ষণের মর্ম্ম ও শক্তি জানে না) তোমাকে উপহাস করিয়া বলে, "মহাশয়, এগুলি আপনার অনুমান বা কল্পনা, কারণ আমরা ত কিছুই দেখিতেছি না," তাহা হইলে তুমি যেরূপ তাহার অজ্ঞতা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ কর, যোগিগণ (যাঁহারা নিয়ত পরলোক প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাঁহারা), তোমাদিগকেও ঠিক সেইরূপ কৃপা-

নেত্রে অবলোকন করিয়া থাকেন। এবং পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বর্ব্বর আজ যদি সমবেত হইয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলে, "অণুবীক্ষণ যন্ত্র মিথ্যা,—পুষ্পে আবার কীট কল্পনা," তাহা হইলে যেরূপ বিজ্ঞানের সুদৃঢ় আসন তিলমাত্রও টলিবে না, সেইরূপ তোমাদের ন্যায় অসংখ্য স্থূলদর্শী মানব যদি যুগ যুগান্তর ধরিয়া একবাক্যে ঘোষণা করে যে, "সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় নাই, পরলোক কল্পনা মাত্র", তাহা হইলে পরলোকতত্ত্বের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হইবে না, কারণ ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সত্য।

এখন আপ্তবাক্য সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিব। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি যাবতীয় বস্তুর গুণাগুণ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া অবগত হইয়াছ? সেঁকো খাইলে মরিতে হইবে, স্বয়ং মরিয়া দেখিয়াছ কি? না লোকমুখে শুনিয়া বিশ্বাস কর? কৃষ্ণ সর্পের দ্বারা স্বয়ং দংশিত হইয়া তাহার বিষক্রিয়া অবগত হইয়াছ কি? পীড়িতাবস্থায় যে সকল ঔষধ সেবন কর, তাহাদের রোগনিবারণ পটুতা কি তোমার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ? না ডাক্তারের কথায় বিশ্বাস করিয়াই সেবন কর? হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের সংযোগে যে জল হয়, তাহা কি স্বয়ং পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছ, না পুস্তক পাঠে অবগত হইয়াছ? আইসল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ যে বরফের ঘরে বাস করে, ইহা কি স্বয়ং দেখিয়া আসিয়া বিশ্বাস করিতেছ, না পর্য্যটকের বৃত্তান্ত পাঠে জানিয়াছ? স্বয়ং দূরবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কি সৌরকলঙ্কের (Sunspot এর) বিষয় জানিয়াছ, অথবা লোকমুখে শুনিয়া বিশ্বাস কর? তাই বলি ভাই, একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা কর দেখি, তোমার জীবনের কয়টি মাত্র জ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং কতগুলিই বা আপ্তবাক্যলব্ধ। হয়ত দেখিবে যে শতকরা প্রায় ৯৫টি আপ্তবাক্যসিদ্ধ। এরূপ অবস্থায় কোন্ মুখে, কোন্ সাহসে বল, আমি আপ্তবাক্যকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করি না?"

যদি বল "জড় জগৎ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞান আমার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ না হইলেও, সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন, ইচ্ছা করিলে আমিও প্রত্যক্ষ করিতে পারি; কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে একথা খাটে না।" এতদুত্তরে বলি, ভাই, সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ ও অনুসন্ধান কর, বুঝিবে ঐ কথা এখানে খাটে কি না। দেখিবে শত শত ব্যক্তি পরলোক নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং একবাক্যে বলিতেছেন, "মানব, স্বয়ং প্রত্যক্ষ না

করিয়া কিছুই বিশ্বাস করিও না। অপরোক্ষানুভূতিই প্রকৃত জ্ঞান। অতএব উঠ, জাগ, যাঁহারা জানেন তাঁহাদের নিকট হইতে সাধনপ্রণালী অবগত হও। ক্ষুরের ধারের ন্যায় এ পথ অতীব দুর্গম। কিন্তু ভীত হইও না, দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হও, অচিরে সিদ্ধি তোমার করতলগত হইবে।”

কলিকাতা
৬ই সেপ্টেম্বর ১৯০৯
জন্মাষ্টমী তিথি

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

আমি।

—*:*—

মহা+ঈশ=মহেশ,—এই মহেশপুর নামক রাজত্বে আমি বাস করি। এই রাজত্বের রাজা স্বয়ং মহেশ্বর। আমি তাঁহারই রাজত্বের একটি কোণে বাস করি, আমি একজন জীব। আমার বাটীতে পাচটি ঘর আছে। নিম্নে একটি লম্বা হল, সেইটি আমার দোকান ঘর, তাহার উপরি ভাগে দুইটি গৃহ ঠিক পাশাপাশি রক্ষিত আছে। একটিতে আমি থাকি, অপরটিতে আমার স্ত্রী থাকেন। এই গৃহদ্বয়েরও উপরিভাগে ঠিক পাশাপাশি দুইটি গৃহ অবস্থিত; তাহার একটিতে আমার পিতামাতা অবস্থান করিতেছেন। অপরটি ঠাকুর ঘর রূপে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সে স্থানে শিবদুর্গা থাকেন আমাদের বিশ্বাস। বাটীটি ত্রিতল, উপরে ছাদ, অনন্ত ছাদ, উপরে অনন্ত আকাশ, নিম্নে অনন্ত সমুদ্র। এই পর্য্যন্ত আমাদের জানা আছে। আমি একজন দোকানদার, আমি যতক্ষণ দোকানে থাকি, ততক্ষণ খরিদ্দার লইয়া হৈ চৈ করি; যখন আমি দোকান পরিত্যাগ করিয়া অন্দরে আমার নিজ গৃহে যাই, তখন একটু নিশ্চিন্ত হইয়া শুই; আমার গৃহের পার্শ্বে যে আমার স্ত্রীর গৃহ, এই গৃহদ্বয় মধ্যে একটি দ্বার আছে সেই দ্বার খোলাই থাকে, গৃহটি একই মনে হয়। আমি গৃহটিতে যখন থাকি, আমার স্ত্রী তখন আমার গৃহে আসিয়া আমাকে নিজ গৃহে লইয়া যান এবং আমরা উভয়ে কথোপকথনে ব্যস্ত হইয়া যেন উভয়ে আর পৃথক থাকি

না। উভয়ে যেন একীভূত হইয়া যাই। এইরূপে আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া প্রত্যহই তিনবার করিয়া সমস্ত গৃহগুলি পর্য্যটন করিয়া থাকি। ত্রিতলে পিতামাতার গৃহে গমন করিয়া, তাঁহাদের প্রণাম করতঃ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া, পার্শ্বে দেবগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক ভগবান ভগবতীর ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া যেন একীভূত হইয়া পুনশ্চ ছাদে গিয়া বসি। সেখানে একটি বেশ বসিবার স্থান।

একটি বেশ কোমল পদ্মাসন। সেই পদ্মাসনটি কি?—একটি বেশ বসিবার স্থান—সেই স্থানে বসিলে এই রাজত্বটি সমগ্র দৃষ্ট হয়। আমি সেই খানে উপবেশন করিয়া সমগ্র রাজত্বটি দেখিতে নিযুক্ত রহিলাম। আমি কি দেখিতেছি! আমি ছাদের উপর একাকী! উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ—কি অপূর্ব্ব! প্রকৃতি যেন—কি বুঝান যায় না—বুঝাইবার বা বলিবার শক্তি নাই। কি পূর্ণচন্দ্র? না সৌর জ্যোতিঃ? উঁ হুঁ—কি বলিব—জানি না; ইহা এক অপূর্ব্ব মহা জ্যোতির্ম্ময় স্থান! কি দেখিতেছি? সৃষ্টি—জীব—পৃথিবী, অনন্ত সমুদ্র।—কি শুনিতেছি—নাদধ্বনি, সমুদ্র গর্জ্জন, দিগন্তব্যাপী ওঁ শব্দ। কিন্তু বড়ই মধুর! বড়ই তৃপ্তি, শান্তিময়! এ শান্তি কি—কি বলে বুঝাইব? বুঝাইবার নহে, বলিয়া প্রকাশ করা যায় না।

অদূরে একটি গীতধ্বনি শুনিতেছি:—

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

ভক্তি সাগরে আনন্দ উদ্দেশে মন প্রাণ দাও ভাসিয়ে।
বিজ্ঞান পবনে হেলিয়ে দুলিয়ে, স্থূল তত্ত্ব সব নাশিয়ে॥
মন অবিরাম যাঁহারে চায়, প্রাণ সহ স'পিয়ো তাঁরে,
আনন্দ পীযূষ পানে রহ দিবা নিশি।
ভক্তি নীরে করিয়ে স্নান, আনন্দে গাহগো প্রণবেরই গান,
প্রণবেরই মালা গাঁথিয়া আত্মাকে সাজাও গো
আনন্দে হাসিয়ে হাসিয়ে॥

গীতটি বড়ই মধুর শুনিলাম। গীতটি শুনিতে শুনিতে সমুদ্র প্রতি নিরীক্ষণ করিলাম, দেখি সমুদ্রে কি ভাসিতেছে। দেখি আমি,—পদ্মাসনে বসিয়া অনন্ত

সাগরে ভাসিতেছি। তবে আমি সর্ব্বভূতস্থ? দেখি আমার স্ত্রী, তাঁহার নাম প্রাণময়ী। তিনি ও আমি একই। আবার দেখি সমুদ্রটি যেন আমার মা, ইহার নাম ভক্তিদেবী। আবার দেখি সমুদ্রের তুফান অজস্রভাবে হইতেছে; পবন সাঁই সাঁই রবে উত্থিত হইতেছে; এই কি প্রকৃতির লীলা? এই পবনদেব বিজ্ঞানদেব ইনিই আমার পিতৃদেব ও গুরুদেব। আবার দেখি সব লয় হইয়া গেল, কেবলমাত্র আমাদের ঠাকুর ঘরে শিবদুর্গা,—একজন প্রণবানন্দ আত্মা অপরটি আনন্দময়ী মা।

আনন্দময়ী মা কেমন প্রণবরূপী কুণ্ডলাকারে মালার ন্যায় আত্মাপতির গলাধারণপূর্ব্বক হাস্য করিতেছেন! কি হাসি! বড়ই মধুর! কি শান্তি!

আমি তখন দিব্যচক্ষে দেখিলাম যে আমি কি। বেদান্তের কথা মিলাইলাম। দেখিলাম, বেদান্তের পঞ্চকোষ। ১, অন্নময়কোষ, ২, মনময়কোষ, ৩, প্রাণময়কোষ, ৪, বিজ্ঞানময়কোষ, ৫, আনন্দময়কোষ। আত্মা অবিনশ্বর।

অন্নময়কোষ আমার দোকানগৃহ, বহির্মুখী মন আমি। মনময়কোষ আমার নিজগৃহ, অন্তর্মুখী মন আমি। প্রাণময়কোষ আমার স্ত্রীর গৃহ, প্রাণময়ী আমার স্ত্রী।* বিজ্ঞানময় কোষ আমার পিতামাতার গৃহ, বিজ্ঞানদেব আমার গুরুদেব, ভক্তিদেবী আমার গুরুপত্নী। ইঁহারা উভয়েই এক সঙ্গেই থাকেন, যেখানে বিজ্ঞান অর্থাৎ যেখানে জ্ঞানের আলোচনা সেইখানে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব এবং যেখানে ভক্তি, সেখানে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই গুরু ও গুরুপত্নী আমাদের পিতামাতারূপে চালিত করিয়া শিবদুর্গার সন্নিকটে আনিয়া দেন।

এই দুর্গতিহারিণী দুর্গা আমাদের মা আনন্দময়ী, শিব আমাদের আত্মারূপে পুরুষ। ইনি আনন্দময়কোষের অধিষ্ঠাতাপুরুষ অর্থাৎ এই আনন্দময়কোষেই তিনি মিশে আছেন। তিনি সৎ। এই সৎ+আনন্দ=সদানন্দভাবে অবস্থিত। সেই জন্য এই আনন্দময় কোষই আমাদের ঠাকুর ঘর। আর আমি (আত্মা) যখন সেই ছাদের উপর এ সকল বিষয় দেখিতেছি, তখন আমি সকলের সহিত মিশিয়া এক হইয়া কেবল সর্ব্বভূতস্থ হইয়া শব্দে আমি, আকাশে আমি, পবনে

* মন যখন অন্তর্মুখী হয় প্রাণ তখন মনে লয় হইয়া যায়।

আমি, জলে আমি, স্থলে আমি, পথে আমি, দোকানে আমি, গৃহে আমি, সমুদ্রে আমি; আমিময় জগৎ, জগৎময় আমি, এই ব্রাহ্মত্বময় আমি। তখন আমি বিশ্বময়। তখন আমার এই ক্ষুদ্র আমি এই মহত্ত্বে লয় হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য এই ব্রাহ্মত্বময় আমি দেখিতেছি; সুতরাং আমি দ্রষ্টা। একোমেবাদ্বিতীয়ং।

এক পাগল।

প্রশ্নোত্তরী।

গুরু। তোমার কুশল ত?

শিষ্য। আমার আবার কুশল কি গুরুদেব? তিন পুত্রকে উপযুক্ত করিয়া, লক্ষ্মীরূপিণী রূপবতী বালিকার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, শ্মশানে ফেলিয়া আসিয়াছি! আমার আবার কুশল? গুরুদেব, আমার বধূগণকে একবার দেখিলে কে না সন্তপ্ত হইয়া থাকিতে পারে? আজ চারি বৎসর বিধবা হইয়াছি এবং প্রতি বৎসর একটী করিয়া সন্তান বিসর্জ্জন দিয়া আসিতেছি, আমার আবার কুশল কি গুরো?

গুরু। পতি নাশই বল বা পুত্র নাশই বল, সমস্তই পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে হইয়া থাকে; পূর্ব্ব জন্মে যে মহাঋণ করিয়া আসিয়াছ, তাহার পরিশোধ হইতেছে, তবে তাহাতে আবার দুঃখ কেন?

শিষ্য। অতি শৈশবে পিতা মাতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছি; তাহার পর এই শোকের পর শোক আসিতেছে, তাহার দহনে হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছে, ইহাতেও কি কর্ম্মের শেষ নাই? এত কি ঋণ করিয়া আসিয়াছি, যাহা পরিশোধ হইবার নহে? এ দুঃখের কি অবধি নাই? কবে আমি পূর্ব্ব কর্ম্মের ঋণ হইতে মুক্ত হইব?

গুরু। মানবের সঞ্চিত কর্ম্ম অনেক, তাহার জন্ম জন্মের ঋণ বিস্তর। তাহার এক ঘণ্টার কর্ম্মেরই সংখ্যা করা যায় না; সেইরূপ সে প্রতি দিনে, প্রতি মাসে, প্রতি বৎসরে, প্রতি জন্মে কত কর্ম্মই করিয়া আসিয়াছে, তাহার ফল তাহাকে

অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ মানবের কর্ম্মের ঋণ অসীম মনে হইলেও, তাহা অসীম নহে, তাহার শেষ আছে। কর্ম্ম পাশ হইতে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে মানবের যাহা কিছু সাধনা। সকলেই শোকে ও তাপে অভিভূত হইয়া ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলে, "দেব আমায় কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত কর, আমার মহাপাপের শাস্তি কর"; কিন্তু বাস্তবিক কয়জন কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার যথার্থ প্রয়াসী? দুঃখে অভিভূত-মানব এই প্রার্থনা করিতেছে, পর মুহূর্ত্তে আবার সেই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, নূতন কর্ম্মের বীজ সঞ্চয় করিতেছে। হয়ত বহু কষ্টে বাগানের মধ্য হইতে আগাছার একটী শিকড় উৎপাটিত করিতেছে, কিন্তু অসাবধানে সেই শিকড় উৎপাটন করিতে গিয়া, তাহার অঞ্চলস্থ আগাছার সব বীজ গুলি ছড়াইয়া দিতেছে। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে যে কার্য্য করি, যে চিন্তা মানসে স্থান দিই, তাহা ভগবানের উদ্দেশে করিতে পারিলে আর নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় হয় না। কিন্তু বাস্তবিকই আমরা তাহাই করিয়া থাকি? আমরা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রতি কর্ম্মে, প্রতি চিন্তায়, আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া ভাবি। যে কার্য্যে আমার তৃপ্তি, ভাবি সেই কার্য্য ঠিক, যাহাতে আমার স্বার্থ নাই, তাহা আমরা করিতে প্রস্তুত নহি। কিসে আমার সুখ,—আমার পুত্র,—আমার পরিজন,—এই চিন্তাই আমাদিগকে অহরহ ঘেরিয়া রহিয়াছে। এইরূপে কি কর্ম্মের শেষ হয়? ভগবানের চরণে সম্পূর্ণরূপ আত্ম নিবেদন করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। কেহ হয়ত কাহারও প্রতি পূর্ব্ব জন্মে অসৎ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছিল বলিয়া, তাহার প্রতিশোধ প্রদানের নিমিত্ত হয়ত সে অপরাধীর পুত্র বা নিকট আত্মীয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবদ্দশায় তাহার বহু কষ্টের কারণ হইয়া, অবশেষে যদৃচ্ছাক্রমে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া তাহাকে শোকে সন্তপ্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মানব এত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও কি এই সমস্ত শিখিতে পারে? এই মুহূর্ত্তে সে তাহার মৃত আত্মীয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছে পরক্ষণেই অপরের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছে যে, পরজন্মে তাহাকে আবার সেই জন্য নূতন শোক বহন করিতে হইবে।

শিষ্য। গুরুদেব মায়ামোহে আমি একান্ত অভিভূত,—আমি নিতান্ত অসহায়, যদি অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইলে আমাকে বুঝাইয়া দিন যে,

পিতামাতা পুত্র কন্যা প্রভৃতি সংসারের বিবধ সম্বন্ধ কোন সাধারণ কারণে সংগঠিত হয়। আপনিত এইমাত্র বলিলেন, যে মানব পূর্ব্ব জন্মে যে নির্দ্দয় আচরণ পাইয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইতে এই জন্মে পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করে এবং নানা রূপ অসৎ আচরণের দ্বারা পিতামাতাকে উত্তপ্ত করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। তবে কি আমাদিগের আত্মীয়েরা সকলেই পূর্ব্বজন্মের আমাদিগের কর্ম্মের ফলে জন্মগ্রহণ করে?

গুরু। এই সংসারতত্ত্ব অতিশয় গুহ্য। বাস্তবিক সংসারে তোমার বৈরাগ্যের উন্মেষ হইতেছে দেখিয়া, আমি তাহার বিষয় তোমায় বলিতেছি। পূর্ব্বে, জ্ঞান-বিজ্ঞানবতী পতিব্রতা সুমনা এই মহার্ঘ ও উদার উপদেশ তাঁহার চিন্তাকুল, দুঃখভারাক্রান্ত স্বামী সোমশর্ম্মাকে দান করিয়াছিলেন। এই বিষয় পদ্মপুরাণের ভূমি খণ্ডের অন্তর্গত। ঋণ গ্রহণ, ন্যস্তাপহার, বৈরতাচরণ ও প্রিয়ানুষ্ঠান এই চতুর্ব্বিধ কারণে পিতামাতা স্বজন বান্ধব সংগঠিত হইয়া থাকে।

শিষ্য। গুরুদেব ন্যস্তাপহার কাহাকে বলে এবং কিরূপে তাহা হইতে পর-জন্মে আত্মীয় হইয়া জন্মগ্রহণ করে?

গুরু। যে ব্যক্তির ন্যস্ত বা গচ্ছিত ধন অপহৃত হয়, সেই ন্যাস-স্বামী ন্যাসাপ-হারীর গুণবান্ ও রূপবান্ পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, দিন দিন বহু ভক্তি ও স্নেহ প্রদর্শন দ্বারা সেই স্থাপ্যধন-অপহারকের প্রীতি ও অনুরাগ আকর্ষণ করে। পরে তাহার বহুমূল্য দ্রব্যসকল সম্ভোগ করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে। তাহার জনক জননী যে "হা পুত্র, হা পুত্র" বলিয়া রোদন করে, তাহার প্রতি কর্ণপাতও করে না; পরন্তু, এইভাবে "ইনি পূর্ব্ব জন্মে নিতান্ত নির্দ্দয় ও নির্ম্মম হইয়া, দস্যুর মত আমার স্থাপ্যধন অপহরণ করিয়াছিলেন এবং সেই দ্রব্য অপহরণের দারুণ দুঃখের অতিমাত্রেই আমার মৃত্যু হইয়াছিল। আমি তাহার প্রতিশোধ প্রদানের জন্য পুত্র রূপে এই গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।"

শিষ্য। ঋণ গ্রহণে কিরূপ পুত্র জন্মগ্রহণ করে?

গুরু। যদি কেহ কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা পরিশোধ করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই ঋণদাতা পরজন্মে ঋণকর্ত্তার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ পুত্র স্বভাবতঃ দুর্ব্বৃত্ত ও ক্রূর প্রকৃতির হইয়া থাকে।

সে জনক জননীর প্রতি কথনও দয়া বা মমতা প্রকাশ করে না, কথন কাহারও গুণ দর্শন করিতে পারে না, এবং সর্ব্বদাই সকলের দোষ গ্রহণে তৎপর হইয়া বিনাপরাধে আত্মীয়গণকে তাড়না ও প্রহার করিয়া থাকে। পরিবারদিগকে বঞ্চনা করিয়া আপনি ইচ্ছামত সুখ সম্ভোগ ও স্বার্থ সাধনে তৎপর হয়। কথন বা গৃহ হইতে বল পূর্ব্বক দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া পরিবারবর্গকে নানা প্রকাব ক্লেশ দেয়।

মৃত পিতামাতার উদ্দেশে কথনও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। যাঁহার বীর্য্যে সমুদ্ভূত, যাঁহাব রক্তে বর্দ্ধিত ও যাঁহার যত্নে প্রতি-পালিত সেই জনক জননীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করে না। তাহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন, সে স্বয়ং সমুদ্ভূত হইয়াছে।

শিষ্য। রিপুপুত্র কাহাকে বলে ?

গুরু। যে ব্যক্তি যাহার বৈরসাধনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে, সেই কৃত বৈর-ব্যক্তি বৈর কর্ত্তার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল হইতেই তাহার বৈরবুদ্ধি উপজাত হয়। কথনও পিতামাতার প্রতি স্নেহ বা মমতা প্রকাশ করে না। তাঁহাদিগকে যথাসময়ে শয়ন ভোজন করিতে দেয় না। কিছুমাত্র ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিলেও, পিতা মাতাকে আহাব করিতে দেখিলে তাঁহাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়। এই রূপ শত্রুতা করিতে করিতে যথন তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ হয়, তথন সে স্নেহময় জনক জননীকে অগাধ-শোকসিন্ধুনীবে নিক্ষেপ করিয়া মর্ত্তধাম পরিত্যাগ করে।

শিষ্য। প্রিয় পুত্র কাহাকে বলে ?

গুরু। প্রিয় পুত্র জাতমাত্র পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে থাকে ; তাঁহাদিগকে কথন বিরক্ত করে না ; অবাধ্য হইয়া তাঁহাদিগের মনঃপীড়া সমুৎপাদন করে না। কি শৈশব, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের সেবা করে। জনক জননীর উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেতলোকে সুখ-বসতি প্রদান করিয়া থাকে। ইহারাই যথার্থ প্রিয়পুত্র। নিতান্ত পুণ্যবান ও ভাগ্যশালী ব্যক্তিরাই এইরূপ প্রিয় পুত্রের পিতা মাতা হইয়া থাকে। বিশেষ সুকর্ম্ম ও পুণ্যকার্য্য

করিলে, মানবের প্রতি নিস্বার্থভাবে প্রেম ও স্নেহ প্রদর্শন করিলে তবে এইরূপ পুত্র পরজন্মে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিষ্য। এইরূপে সকলেই কি স্বস্ব কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া পিতা, পুত্র, প্রভু, ভৃত্য প্রভৃতি সম্বন্ধবন্ধনে সম্বদ্ধ হওত সংসারে অবতরণ করে? পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সংসারের বিবিধ সম্বন্ধ কেবল কি পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ কারণেই সংঘটিত হয়?

গুরু। কেহ কেহ উদাসীন পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। এরূপ পুত্র সংসারের সকল সম্বন্ধেই নির্লিপ্ত। তাহার কখনও কোন বিষয়ে স্পৃহা বা অভিলাষ নাই। কিছুতেই বিরক্তি বা সন্তুষ্টি নাই। এরূপ পুত্র কখনও কাহারও ইষ্ট বা অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয় না। কাহারও প্রতি তাহার আত্মীয় বা বিদ্বেষভাব নাই। সে কিছুতেই সুখ বা দুঃখ অনুভব করে না, কাহাকেও তাড়না বা প্রহার করে না। তাহা হইতে পিতা মাতার, আত্মীয় স্বজনের কখন কোন ক্ষতি বৃদ্ধি বা প্রিয়াপ্রিয় সাধিত হয় না। সে নির্ম্মম, নির্দ্বন্দ্ব ও নির্লিপ্ত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

এখন তুমি সর্ব্বপ্রকার পুত্রের স্বভাব ও স্বরূপ শ্রবণ করিলে। জগতের জীবমাত্রেই কর্ম্মের বশে কিরূপে নিত্য আসা যাওয়া করিতেছে দেখিলে। নীতি-বেদিগণ এই কারণে সংসার সম্বন্ধে বীতরাগ হইয়া, বৈরাগ্য-যোগ অবলম্বন করিতে পদে পদে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া পুত্রচিন্তা ত্যাগ কর।   ক্রমশঃ—

তীর্থযাত্রীর পথ

বা

(মহাত্মা শালিগ্রামের উপদেশ)

(১১)

পরম পিতা তাঁহার সন্তানগণের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের জন্য সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছেন এবং আমাদের প্রকৃত কল্যাণ কিসে হয়, একমাত্র তিনিই জানেন। মানব সঙ্কীর্ণ ও কলুষিত চিত্তবৃত্তি দ্বারা কিরূপে তাঁহার রহস্য

ভেদ করিতে সক্ষম হইবে। অতএব তিনি যাহাই করেন সমস্তই আমা-দের মঙ্গলের জন্য—এই বিশ্বাসটি যেন দৃঢ় ও অটুট থাকে।

(১২)

মনটা যে অতিশয় বলবান এবং সাধন ভজনের পথে ইহা যে সাধ্যমত ব্যাঘাত উৎপাদন করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের করুণাময় পিতা সর্ব্বশক্তিমান্; তাঁহারই কৃপায় এই প্রবল শত্রুকে আমরা একদিন পরা-জয় করিবই করিব। যখনই মন বিদ্রোহ করিবে, তখনই ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া, ইহাকে দমন করিতে চেষ্টা করিবে। প্রেম ও ভক্তিভরে তাঁহার দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারিবে, তোমার মনের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

(১৩)

মনের নাশ কি? মনের স্রোতকে নিম্নদিকে যাইতে না দিয়া উচ্চদিকে লইয়া যাওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ইহার গতি ফিরাইয়া দেওয়াকেই মনের নাশ বলে। এইরূপ করিলে কেবল যে শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে; পরন্তু ইন্দ্রিয়গুলিরও জীবনীশক্তি এমন কি বীজ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। যখন মন এবং তাহার সৈন্য সামন্তকে বাহ্য-জগৎরূপ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে টানিয়া লওয়া হয় এবং তাহারা পরস্পরের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিতে না পারে, তখন ঔদাসীন্য ও নিদ্রালুতা স্বতঃই পলায়ন করে।

(১৪)

এরূপ উপায় অবলম্বন কর যেন তোমার মনের স্রোত (চিত্তবৃত্তি) ধীরে ধীরে নিম্নদিক্ (পশুভাব) হইতে উচ্চদিকে (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাবের দিকে) ফিরিতে পারে। তুমি পার্থিব ও ইন্দ্রিয় সুখে নিমগ্ন আছ, সুতরাং তোমার মন, ইন্দ্রিয়গণ (চক্ষু কর্ণাদি) এবং রিপুগণকে (কাম ক্রোধাদিকে) সহচররূপে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় বলবান্ হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় তোমার এরূপ শক্তি নাই যে, ইহার কবল হইতে তুমি নিষ্কৃতি পাও অথবা ইহার বিনাশ সাধন কর। এই জন্যই, যিনি মনের বিনাশ সাধন (অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ) করিয়াছেন, অথবা যিনি মনোরাজ্যের অতীত কোন উচ্চতম প্রদেশ হইতে লোক শিক্ষার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় কার্য্যের দ্বারা (কথা দ্বারা নহে)

মানবকে দেখাইতেছেন, কিরূপে জড়দেহ ধারণ করিয়াও ইন্দ্রিয় বা রিপুগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইয়া নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকারভাবে জীবনযাপন করা যায়,— এরূপ কোন মহাত্মার শরণাগত হওয়া তোমার একান্ত প্রয়োজন। ঈদৃশ মহাপুরুষের নাম গুরু। এবং শাস্ত্র বলেন মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে দমন করিবার জন্য গুরুসহবাস করা চাই।

(১৫)

যিনি জড়বিজ্ঞান বা শিল্পের জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে তত্তৎ বিষয়ের কোন শিক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আত্মজ্ঞান বা ভগবৎজ্ঞান সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এবিষয়ে সিদ্ধ কোন ব্যক্তির নিকট শিখিতে হয়। ইনি যদি পূর্ণ শিক্ষক না হয়েন, ছাত্রশিক্ষক (monitor) হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু যাঁহার এ বিষয়ে ব্যবহারিক (practical) জ্ঞান নাই, তাঁহার দ্বারা কোন উপকার হইবে না। এরূপ সিদ্ধ ব্যক্তিকে আমরা এই পৃথিবীতে চালক বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু স্বয়ং ভগবানই আমাদের প্রকৃত গুরু; এবং সদ্‌গুরু ও পরমপিতা বোধে তাঁহারই শরণাগত হওয়া এবং তাঁহাকেই পূজা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

(১৬)

দর্শন, অধ্যয়ন, বা অধ্যাপনা অনেক সময় ভগবৎ প্রেমের বিষম অন্তরায় হয়,—হয়ত প্রেম আদৌ আসিতে দেয় না অথবা উদীয়মান প্রেমটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে,—এবং তাঁহার অস্তিত্ব ও তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে নানারূপ সংশয় উৎপাদন করিয়া, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে কণ্টক স্বরূপ হইয়া থাকে।

(১৭)

তোমাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন মনের কুতর্কদ্বারা ভগবানে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়। তুমি এখানে একটি পথিক মাত্র এবং তুমি পৃথিবীর জীব, মাটির মানুষ নহ, ইহা বিস্মৃত হইও না। তুমি সত্য পুরুষের একটি অংশু বা কিরণ (ray) স্বরূপ এবং দিবি পদই (অর্থাৎ অধ্যাত্মরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ প্রদেশ) তোমার প্রকৃত বাসস্থান।

(১৮)

তুমি নিরন্তর সমাধিসুখ ভোগ করিতে একান্ত ইচ্ছা করিলেও, সর্ব্বদা উহা তোমার ভাগ্যে ঘটে না। ইহার কারণ এই যে, যদি সর্ব্বদা উহা ঘটিত, তাহা হইলে তুমি নিজের উপর কর্ত্তৃত্ব হারাইয়া স্বর্গীয় আনন্দে এরূপ বিভোর থাকিতে যে, উপাসনা কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য করা তোমার পক্ষে কঠিন হইত। এইজন্য, সর্ব্বদা জাগরূক পিতা তোমার ঐ বাসনা পূর্ণ করেন না। কিন্তু ইহাতে হতাশ হইও না। দৃঢ়ভাবে উপাসনা করিয়া যাও এবং অন্তঃকরণ হইতে ক্রমশঃ সমস্ত ময়লা বিদূরিত কর যেন ভগবৎ প্রেম ব্যতীত ইহাতে অন্য কিছুই না থাকে। এরূপ করিলে, কোন না কোন সময়ে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। ইতিমধ্যে, উপাসনার সময় তুমি অধিকতর আনন্দ পাইতে থাকিবে; ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে, গন্তব্য স্থানের দিকে তুমি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছ এবং এই চিন্তা তোমাকে সুখ ও সন্তোষ দান করিবে।

(১৯)

ভগবৎ করুণার সীমা নাই, অন্ত নাই এবং সকল জীবের উপর ইহা তুল্যরূপে বর্ষিত হইতেছে; প্রভেদ এই যে সকল জীব ইহা তুল্যরূপে গ্রহণ ও উপভোগ করিতে সমর্থ নহে। তোমার জানা উচিত যে, অনেক সময় তুমি ভগবানের নিকট এরূপ বস্তু প্রার্থনা কর, যাহা রাখিবার বা ভোগ করিবার শক্তি তোমার এখনও জন্মে নাই,—যাহার সহিত তোমার বর্ত্তমান অবস্থার সামঞ্জস্য নাই।

(২০)

তোমার কল্যাণের প্রতি সর্ব্বদাই সেই পরম কারুণিকের দৃষ্টি আছে এবং তোমার ভাল করিবার একটি সুযোগও তিনি ছাড়েন না। কিন্তু বহুকাল তুমি তাঁহাকে ও তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া অসংখ্য জন্মের নানা পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়াছ; নানা দেহ ধারণ করিয়া সেই সেই দেহের বিশেষ বিশেষ ভাব ও বাসনাদির সহিত একটা সম্পর্ক বা অনুরাগ স্থাপন করিয়াছ। এইরূপে দীর্ঘকাল নিম্ন জগতে বাস করিয়া তুমি যে সকল আবর্জ্জনা জড় করিয়াছ, তোমার অন্তঃকরণ হইতে সেগুলিকে ঝাঁটাইয়া ফেলিতে সময়ের প্রয়োজন। অতএব সফলতালাভ সম্বন্ধে হতাশ হইও না। তোমার

সম্মুখীন পথ ধরিয়া যতশীঘ্র পার চলিতে থাক, একদিন না একদিন পরিশ্রমের ফল লাভ করিবে, তাঁহার সমধিক কৃপা পাইয়া ধন্য হইবে।

(২১)

মধ্যে মধ্যে ঐহিক বিপদ আসিবে এবং তোমার বোধ হইবে যেন উহা পারত্রিক উন্নতির অনিষ্ট সাধন করিতেছে। কিন্তু এরূপ অমঙ্গলের আশঙ্কা সাধন করা নিষ্প্রয়োজন। তুমি কালের (অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের) এবং মায়ার রাজ্যে বসবাস করিতেছ; সুতরাং এই দুই রাজাকে মাঝে মাঝে তোমার কিছু কর দিতে হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, এই করের জন্ম তোমার নিজ সম্পত্তি (অর্থাৎ প্রেম ও ভক্তি) হইতে এক কপর্দ্দকও দিতে হয় না; পরন্তু ইহাদিগের সম্পত্তি হইতেই ইহাদিগকে কর প্রদান কর। ইহাকেই বলে "বিষস্য বিষমৌষধং"। যে ভবরোগে তুমি ভুগিতেছে, সেই রোগের যন্ত্রণা দ্বারাই ঐ পীড়ার শান্তি হইবে।

(২২)

তোমরা মন ও চিন্তার উপর সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, যেন পার্থিব বাসনা-গুলির অতিবৃদ্ধি না ঘটে। পরম পিতার প্রতি প্রেম উদ্দীপিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে যত্ন ও চেষ্টা কব। ইহা কবিলে তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপা লাভ করিবে এবং সেই কৃপা-বলে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উত্তোলিত হইবে।

(২৩)

স্মরণ রাখিও যে প্রেম ও ভক্তি হঠাৎ খুব বাড়িয়া উঠিলে, কর্ম্মের প্রতি মনোযোগ কমিয়া যাইবে! তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা যুক্তিসিদ্ধ না হইতেও পারে। পরম পিতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তোমার উন্নতি লক্ষ্য করিতেছেন। নিশ্চিত জানিও যে প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে, তুমি কিছু না কিছু অগ্রসর হইতেছ, কিন্তু গন্তব্য স্থানটি এতদূরে, যে একটি বিশাল চক্রের গতির ন্যায়, তোমার পরিবর্ত্তন সহজে অনুভূত হয় না। ছয় মাস উপাসনা করিবার পর তোমার মনের যেরূপ অবস্থা হইবে তাহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে, তুমি নিশ্চয়ই একটু উন্নতি বুঝিতে পারিবে। তোমাকে যুগপৎ দুইটি কার্য্য (ঐহিক ও পারমার্থিক) করিতে হইতেছে বলিয়া উন্নতি এত ধীরে ধীরে

ঘটিতেছে; কিন্তু ইহা যে নিশ্চিত ও বাস্তব (sure and substantial) তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(২৪)

পরম পিতা তাঁহার সকল সন্তানগুলিকেই সর্ব্বদা আগ্রহ ও যত্ন সহকারে লক্ষ্য করিতেছেন এবং যাহার যে পরিমিত স্বর্গসুখ (সমাধিজনিত আনন্দ) লাভ করা কল্যাণকর মনে করেন, তাহাকে ঠিক সেই পরিমিত দান করেন। এই অন্তরানন্দের সর্ব্বদা প্রতীক্ষা করিবে এবং ইহা পাইবার জন্য প্রার্থনা করিবে। কিন্তু যখন ইহা অনুভূত না হইবে, তখনও চেষ্টা শিথিল করিও না; কারণ কখন্ ইহা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং কখন্ কর্ত্তব্য নহে, তাহা একমাত্র তিনিই জানেন।

(২৫)

তুমি ইচ্ছা করিবামাত্র যদি উচ্চতর লোকগুলি (ভুবঃ স্ব ইত্যাদি) দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির ব্যাঘাত হইত এবং সাংসারিক কর্ত্তব্য পালনে তুমি কতকটা অপটু হইয়া পড়িতে। পরমপিতা তাঁহার কারুণ্য বশতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনানুসারে সমস্তই নিয়মিত করিতেছেন (অর্থাৎ যাহার যখন যতটুকু প্রয়োজন, তাহাকে তখন ততটুকু দান করিতেছেন)। স্থির জানিও যে কৃপা পাইবার সময় আসিলে তিনি উহা দান করিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবেন না।

(২৬)

প্রত্যেক ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অবস্থা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। যিনি যে অবস্থায় স্থাপিত হইয়াছেন, সেই অবস্থাই তাঁহার (উন্নতির) পক্ষে ঠিক উপযোগী। অতএব করুণাময় পিতা তাঁহার সন্তানদিগকে যে কঠোর শারীরিক যন্ত্রণা দেন, ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বিপুল আধ্যাত্মিক কল্যাণই ইহার ফল। কৃপাময় আমাদিগকে ধৈর্য্য এবং যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে দান করেন।

(২৭)

দেহ অসুস্থ হইলে তুমি যথা-নিয়মে উপাসনা কার্য্য করিতে পারিবে না। এই সময়ে তোমার মনটি মাঝে মাঝে ভগবানের দিকে লইয়া যাইবে। এইরূপ করিলে তুমি অনেকটা শান্তি ও হৃদয়ের বল প্রাপ্ত হইবে। একবারে

অধিকক্ষণ যদি ভগবৎ-চিন্তা করিতে না পার, অন্ততঃ ১৫ বা ২০ মিনিট মনটি তৎপ্রতি স্থির রাখিবে; এবং দিবা রাত্রির মধ্যে যতবার সুবিধা হয়, ততবার ঐরূপ করিবে। এই প্রকারে তাঁহাকে স্মরণ করিলে দেখিবে, তাঁহার করুণা তোমাকে ত্যাগ করিবে না, বরং সর্ব্বদা সকল বিষয়ে তোমাকে রক্ষা করিবে।

(২৮)

যখন শরীর অতিশয় দুর্ব্বল থাকিবে, তখন দীর্ঘকাল উপাসনা করিবার প্রয়োজন নাই। উপাসনা করিতে কবিতে যেমন ক্লান্তি বোধ করিবে, অমনি উহা ত্যাগ করিবে। যদি মনের খুব বিক্ষেপ বা চঞ্চলতা না আসে, তাহা হইলে এ অবস্থায় ১৫ মিনিট হইতে ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিতে পার। ইহাতে তোমাব শরীব অসুস্থ না হইয়া বরং ক্রমশঃ সুস্থ হইবে।

(২৯)

যিনি সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার অধিক অর্থ না থাকাই মঙ্গল; অনিবার্য্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা থাকিলেই যথেষ্ট। অধিক অর্থ আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা না করিয়া বরং পার্থিব সুখ সম্ভোগ ও আমোদ প্রমোদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত করে। ইহাতে, ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে যে সকল উপকার পাওয়া যায়, তাহা আর তত স্পৃহনীয় মনে হয় না।

ক্রমশঃ

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

অলৌকিক ঘটনা।

বালীগ্রামের কোন একটি গৃহস্থ-বাটীর বধূকে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনায় জড়িত করিয়াছে। বধূর বয়স ১৪ চৌদ্দ বৎসর। কয়েক দিবস যাবৎ তাহার গৃহের মধ্যে অপর একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক প্রবেশ করে। সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া বধূর বেশ শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হইয়াছিল; তজ্জন্য বধূটি উক্ত স্ত্রীলোকটিকে প্রণাম করিবার জন্য যেমন পদধূলা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবে, অমনি স্ত্রীলোকটি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। এইরূপ কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার এক দিবস উক্ত

স্ত্রীলোকটি তাহার সমীপে আগমন করিল এবং বলিল "দেখ! আমার পদধূলা লইয়া তোমার কি হইবে? আমাকে পদধূলা লইয়া প্রণাম করিবার কোন আবশ্যক নাই. যদি তাহা করিতে যাও, তাহা হইলে আমি পলায়ন করিব"। এই বলিয়া তাহাকে একটি সিন্দুর চুপড়ি, আলতা, খানিকটা সিন্দুর প্রভৃতি দিল, এবং পূজার নৈবেদ্যযুক্ত কিছু জলযোগ তাহাকে দিল। তদ্দর্শনে তাহার শাশুড়ী, স্বামী প্রভৃতি সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও সেই পূজা সমাপ্তি প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। একথা সকলেই জানেন।

এক দিবস সেই বধূর গৃহে স্ত্রীলোকটি ও বধূ উভয়ে বসিয়া কথোপকথন করিতেছে—কি কথা তাহা কিছু জানা নাই—এমন সময় তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী সেই গৃহসমীপস্থ দ্বার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তদ্দর্শনে সেই স্ত্রীলোক বধূকে দ্বার বন্ধ করিবাব জন্য আদেশ করে। বধূ যেমন উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতে যাইবে অমনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, সেই স্ত্রীলোক গৃহে নাই, অন্তর্দ্ধান হইয়া গিয়াছে। এই রূপ সেই স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে বধূকে অনেক ঘটনায় পতিত হইতে হইয়াছিল; তজ্জন্য তাহার স্বামী তাহাকে বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য ৺কাশীধামে লইয়া যান। সে স্থানে গিয়াও কোনই পরিবর্ত্তন নাই; সে স্থানেও সেইরূপ স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক অনেক ঘটনা ঘটিতে লাগিল, তখন কাশী হইতে অন্যান্য দেশে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য ঘুরিলেন; তখনও অনেক উপদ্রব হইতে লাগিল। কিছুতেই কোন ফল হইল না; তাহা দেখিয়া অগত্যা পুনশ্চ বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নানারূপ পূজাদি করতঃ এক্ষণে মাসখানেক ঐ সকল ঘটনা বন্ধ আছে। এই ঘটনাটি অনেক মাননীয় গ্রামবাসিগণের নিকট শ্রবণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমার নাম ধাম প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আর একটি ঘটনা।

বহুদিনের কথা প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে বালী গ্রাম নিবাসী জনৈক ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ বাতশ্লেষ্ম জ্বরাক্রান্ত হইয়া তিন দিবস বেহুঁষ অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই সবিস্তারে আমরা প্রকাশ করিতেছি। বহুদিনের কথা

হইলেও—আজও অনুসন্ধানে জানিতেছি অনেকেই এ কথা স্বীকার করিতেছেন এবং যাহাদের নিকট তিনি এ ঘটনা বলিয়া ছিলেন তাহাদেরই মধ্যে একজনের নিকট হইতে শ্রবণ করিলাম এবং বুঝিতেছি ঘটনাটি সম্পূর্ণই সত্য এবং অনেকেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক্ষণে জীবিত নাই। নিম্নলিখিত ঘটনাটির দুই বৎসর পরে স্থূল দেহ ত্যাগ করেন।

এক্ষণে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নামটি আমরা বলিতে পারি। শরচ্চন্দ্র ভট্টা-চার্য্য ইঁহার নাম। শরচ্চন্দ্র সেই অজ্ঞানাবস্থায় যেন একটি চারি পায়ার উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন দেখিলেন এবং চাবিজন যমদূত সদৃশ ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহাতে তাঁহার ভয় হইল কিন্তু কি করিবেন কোনই উপায় নাই, তিনি তখন নিঃসহায়। বাহকগণ তাঁহাকে বহন করিতে করিতে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে চলিল।

প্রথম বাহক—দেখ হে! আমরা ভ্রমক্রমে ইহাকে লইয়া যাইতেছি। ইহাকে লইয়া যাইবার আদেশ ত আমবা পাই নাই।

দ্বিতীয় বাহক—কৈ দেখি, তাইত! এত সে নয়! আমাদের সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে, চল চল এইখানে ফেলিয়া চলিয়া যাই।

সকলে—তাইত একেবারে সব ভুল, গোড়ায় গলদ, তাইত আমাদের মেহনতই সার হলো কেবল।

এই বলিয়া তাহারা সকলেই সেইখানে একটি উচ্চ স্থানে (টিপিতে) ফেলিয়া পলায়ন করিল। তখন সেই রোগী "উঃ" শব্দ পূর্ব্বক জ্ঞান লাভ করিল। রোগীর পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ, যাহারা তাহার সেবায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা স্পষ্ট "উঃ" শব্দ তীব্রস্বরে শুনিয়া আশা-অনুকূল রূপ আনন্দ সহকারে তাহাকে প্রশ্ন করে "যে কি কষ্ট হচ্ছে!" সে পুনশ্চ ধীরে ধীরে "উঃ" শব্দ পূর্ব্বক চক্ষু উন্মীলন করিল। তদ্দর্শনে তাহাকে একটু গরম দুগ্ধ সেবন করিতে দেওয়া হইল; তখন সে ধীরে ধীরে উক্ত ঘটনাটি বলিল এবং জানাইল যে তাহার কটিদেশে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে ও অতিশয় বেদনা হইয়াছে। এইরূপে তিনি কিছু দিন বেদনাযুক্ত হইয়া উত্থানশক্তি রহিত হইয়া অসুস্থতা ভোগ করিয়া পুনশ্চ ক্রমশঃ সে যাত্রা আরোগ্য লাভ করিলেন। তাঁহার এই কটিদেশের বেদনার কারণ ও তিনি পরে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সেই উচ্চ স্থানে যখন নিক্ষেপ করিয়াছিল,

তাহাতেই তাঁহার কোমরে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁহাকে যেখানে নিক্ষেপ করিয়া যায় সে স্থানে এক্ষণে বেলুড় রেল ষ্টেশন্ হইয়াছে, সে সময় ষ্টেশন্ ছিল না। এই ঘটনাটির দুই বৎসর পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া ইহজীবন ত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মহাজনের মহিমা।

"মজহরে উল অজায় বাৎ" The source of wonder, এই কথাটি একটি মহামন্ত্র। ইহা দ্বারা ভূত, প্রেত, পিশাচাদি ছাড়ান যায়। ইহার সাধনে বাঁঝা (বন্ধ্যা) গর্ভবতী হয়। ইহা বিষনাশক; বৃশ্চিক দংশনে (১) বা কুকুর কামড়াইলে বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা কোন কোন পীড়াও ভাল করা যাইতে পারে। (২) ইহা জনসাধারণ প্রদত্ত মহাত্মা মুর্ত্তজা আলির একটি গুণবাচক নাম বা উপাধিমাত্র। লোকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে তাঁহাকে এই নামে ডাকিত। তাঁহার মহিমা জানিতে পারিলে, বা তাঁহার কোন করামাৎ কর্ত্তৃত miracles দেখিয়া শুনিয়াও এই উপাধি প্রযুক্ত হইত।

একদিন তাঁহার মাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র! তোমাকে লোকে 'মজহরে উল আজায়বাৎ' বলে কেন?" মহাত্মা আলি মাতার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "মা! আমি তোমাকে তোমার জীবনের কোন একটি 'অজীব' (আশ্চর্য্য) বৃত্তান্ত আমাকে শুনাইতে অনুরোধ করিতেছি।" ইহা শুনিয়া তাঁহার জননী মৃদু হাসিয়া কহিলেন "আমার জীবনে কখন তেমন বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই; তবে একবার মাত্র একটি অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়াছি, তাহা বলিতেছি শুন।

যখন আমার বয়স সাত বৎসর, তখন আমি একদিন আমার সমবয়স্ক

---

(১) বিছা কামড়ানির কষ্ট আমি ইহার দ্বারা নিজে ভাল করিয়াছি।

(২) ইহাতে যদি কাহারও অবিশ্বাস হয়, তাহা হইলে তিনি একটি শিরঃপীড়া রোগী আমার নিকট আনিবেন।

বালিকাদিগের সঙ্গে আমাদের কিল্লাব মাঠে (১) খেলা করিতেছিলাম। হঠাৎ সখীদিগকে প্রাণপণে পলাইতে দেখিয়া, কি হইল বলিয়া, আমি এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলাম। কি সর্ব্বনাশ! দেখিতে পাইলাম, একটি শেরব্ঘর (প্রকাণ্ডকায় বাঘ) আমাদের দিকেই আসিতেছে। তাহা দেখিয়া আমি বজ্রাহতের ন্যায় আড়ষ্ট ও অবাক্ হইয়া গেলাম। ইতিমধ্যে ভাগ্যক্রমে দেখিতে পাইলাম, আর একদিক হইতে একজন সৈনিক পুরুষ আসিয়া আমার নিকটে দাঁড়াইলেন। তখন সেই বাঘটি তাঁহার কাছে আসিয়া কুক্কুরের ন্যায় লেজ নাড়িতে ও পা চাটিতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যদিও বর্ম্ম দ্বারা আবৃত ছিল, তথাপি বাঘটি তাঁহাকে চিনিত; কারণ তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া সে যে দিক হইতে আসিয়াছিল, আ'ার সেই দিকেই চলিয়া গেল। আমি তখনও নীরব। ইত্যবসরে সেই বীরপুরুষ মৃদুস্বরে কহিলেন "মা। আর তোমার কোন ভয় নাই; এখন তুমি আনন্দের সহিত বাটীতে ফিরিয়া যাইতে পার।" সৈনিকের মধুর আশ্বাস-বাণী শুনিয়া আমি গলিয়া গেলাম। তখন আমার কান্না পাইল; কিন্তু কাঁদিলাম না। আমার গলায় একছড়া মূল্যবান্ মতির মালা ছিল। এই মালা আমার পিতাকে কোন বিখ্যাত য়িহুদি বণিক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত মালার সহিত একটি সোণার মাদুলী গাঁথা ছিল এবং তাহাতে একটি রক্ষা-কবচ আঁটা ছিল। ইহা আমার মাতা কোন সিদ্ধ পুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই তবর্রুকের (Relics) আশ্চর্য্য গুণ। ইহা যাহার নিকট থাকে, তাহার কোন অভাব হয় না। তাহার সকল মুস্কিল আসান হয় অর্থাৎ সকল বিপদ হইতে তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন। আমি ভাবিলাম, এ মালা আমার কাছে থাকিয়া কি হইবে? ইহা এই পরম উপকারী অদ্ভুত সৈনিকেরই উপযুক্ত; কারণ আমি তাঁহার আচরণে পুলকিত হইয়াছিলাম এবং কি জানি, তখন আমার মন কি জানি তাঁহার প্রতি স্বর্গীয় বাৎসল্য ভাবে বিভোর হইয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই মালা ছড়াটি আমার গলা হইতে বাহির করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "বাহাদুর! ইহা আমি

---

(১) মহাত্মার জননী একজন বিখ্যাত আরব্য সর্দ্দারের কন্যা ছিলেন।

তোমাকে বখ্‌সিস্ করিতেছি (উপহার দিতেছি)।" তিনি কহিলেন "বহুত আচ্ছা।"

মাতার নিকট এই গল্প শুনিয়া মহাত্মা মুর্ত্তজা আলি তাঁহার জামার পকেট হইতে এক ছড়া মতির হার সোনার মাদুলীর সহিত বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিলেন "মা! এটা কি?"

মহাপুরুষের জননী তখন সেই হার দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং কাতর কণ্ঠে গদ্‌গদ স্বরে বিস্মিত ভাবে কহিতে লাগিলেন "পুত্র। কি যাদুকরী? এ কি লীলা? এ মায়া যে আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এ যে সেই হার! তুমি পাইলে কোথায়? এ যে সেই তবর্রুক্ (Relic তাবিজ), যাহা আমার মাতা বহুকাল ব্যবহার করিয়াছিলেন; যাহা আমি প্রায় সাত বৎসর ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা আজ যুগ-যুগান্তরের পর তোমাব হাতে দেখিতেছি! কি আশ্চর্য্য!"

পুণ্যশীলা জননীর ব্যগ্রতা দেখিয়া মহাত্মা একটু হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "মা! *আশ্চর্য্য কিছুই নাই। তোমার পুণ্য-প্রতাপে সকলই সম্ভব।* আমার নানীকে (মাতামহীকে) যে সিদ্ধ-পুরুষ রক্ষা-কবচ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সিদ্ধ পুরুষই আমি। যে বিখ্যাত য়িহুদি-সওদাগর নানাকে (তোমার পিতাকে) এই মূল্যবান্ মালা নজর (present) করিয়াছিলেন, সেই সওদাগরই আমি। যে বর্ম্মাচ্ছাদিত সৈনিক পুরুষ সেই ভীমাকার বাঘের হাত হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সৈনিক পুরুষই আমি। তুমি আমাবই অজ্ঞাত ও অলৌকিক ভালবাসা ও উপচিকীর্ষায় বিহ্বল হইয়া এই হার-ছড়াটি আমাকেই অর্পণ করিরাছিলে। এখন তোমার পুত্রও সেই আমি। এখন মা! বল দেখি, লোকে আমায় 'মজহরে উল অজায় বাৎ' বলে কেন?" এই বলিয়া মহাত্মা সেই মাদুলীর আবরণ মোচন করিলেন। তাহা হইতে একখণ্ড ভূর্জ্জপত্র সদৃশ বল্কল বাহির হইল। সেই বল্কলের উপর রক্তাক্ষরে লেখা আছে— "ইয়া মজ্‌হরুল অজায় বাৎ" (হে আশ্চর্য্য সকলের উৎপত্তি স্থান)।

শ্রীনিরঞ্জন মিশ্র রিন্দ।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৩শ ভাগ } আশ্বিন, ১৩১৬ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

মরণ ও মরণান্তে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—:*:—

স্বর্গবাসী।

জীবাত্মা যখন সর্ব্বতোভাবে কামোপাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করে, তখন তাহাকে স্বর্গবাসী বলা হয়। ইহলোক হইতে কামলোকে যাওয়ার সময় জীবের প্রথম মৃত্যু ঘটে। পরে কামলোক হইতে স্বর্গে যাওয়া কালে তাহার সংজ্ঞা লোপ হয়, ইহাকে দ্বিতীয় মৃত্যু বলে। দ্বিতীয় মৃত্যু অতিক্রম কবিয়া স্বর্গেব দ্বার স্বরূপ চন্দ্রলোক (পিতৃলোক) দিয়া তবে স্বর্গে যাইতে হয়। স্বর্গে গেলে পৃথিবীব সঙ্গে যে সম্বন্ধ থাকে, তাহা রহিত হয়। তখন জীবের পুনর্জ্জন্ম লাভ হয়। ইহ জীবনের ঘটনাবলী তাহার স্মৃতি পথা-

রূঢ় হইলেও, তথা হইতে ইহলোকে প্রত্যাগমন করা অসম্ভব। পুনরায় দেহ ধারণ করার সময় উপস্থিত হইলে, পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া কালপূর্ণ হইলে মানব ভূমিষ্ঠ হয়। স্বর্গলোকেও মায়ার হাত এড়াইবার যো [illegible] মায়াবশে 'আমি,' 'তুমি' ইত্যাকার পৃথকত্বের ভাব মনে জাগরূক থাকে। জীব মায়ামুক্ত হইলে বিশ্বজনিন ভ্রাতৃভাব তাহার মনে উদয় হয়। তখন "জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীব গণৈঃসহ"। সকল জীবের সঙ্গে তখন তাহার সখ্য ভাব (ভ্রাতৃভাব) স্থাপিত হয়। গত অসংখ্য জীবনের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া কোন্ জীবনে কাহার সঙ্গে তাহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়। নাট্যশালার অভিনেতাগণ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক সাজিয়া ভিন্ন ভিন্ন, পালা গান করে। পালা-শেষ হইলে, বহুদিন পরেও তাহা স্মরণ করিতে পারে। ঠিক সেইরূপ মন হইতে মোহের আবরণ সরিয়া গেলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনে যাহার সঙ্গে যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা অবিকল স্মৃতিপথারূঢ় হয়। তখন মানব-জীবনের গূঢ় রহস্য অবগত হওয়া যায়। তখন অপর মানবকে আধ্যাত্মিক ভাবে স্বীয় ভ্রাতা বলিয়া স্থায়ী জ্ঞান উপলব্ধি হয়। তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের পার্থিব সম্বন্ধের প্রতি আর তত আকর্ষণ থাকে না।

স্বর্গে যায় কে ? অবশ্য সুখ দুঃখ ভোগী জীবই স্বর্গে গমন করে। কিন্তু সেই জীবকে অতি সুন্দর, অতি মনোরম, অতি বিশুদ্ধ, অতি পবিত্র হইয়া তবে স্বর্গে যাইতে হয়। জীবের অপকৃষ্ট ও নশ্বর রূপ চতুষ্টয়ের ধ্বংসসাধন ঘটিয়াছে, আছে কেবল উৎকৃষ্ট রূপদ্বয়—মনঃ ও বুদ্ধি। তাহাদের সমষ্টিতে রূপাতীত, গুণাতীত আত্মা-অনুস্যূত থাকিলে জীবের যে অনুপম অবস্থান্তর ঘটে, সেই অবস্থায় জীব স্বর্গ গমন করে। ইহা জীবের পুনর্জন্ম ; কারণ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে পর নবজাত শিশু যেমন সংসারের পাপ তাপের সংস্পর্শে না আসাতে অতি নিরীহ ও পবিত্র থাকে, সেইরূপ স্বর্গ গমন কালে মানবের অপবিত্র রূপাদি খসিয়া পড়িয়া কেবল বিশুদ্ধ ও সৌম্য রূপাদি বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, ইহাকে পুনর্জন্ম বলে। তখন তাহার পাপরাশি দূরে সরিয়া পড়ে ; ইহলোকে পুনরায় জন্ম ধারণ কালে তাহারা আবার জীবে প্রবেশ লাভ করে। কাজেই সৎক্রিয়া, সদালাপ ও সুচিন্তা-প্রসূত পুণ্যরাশির ফল ভোগই কেবল স্বর্গে হইয়া থাকে। সুকাজের সুফল, কুকাজের কুফল, ইহা অবশ্যম্ভাবী। এই

বিধি নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার যো নাই। পাপ-সমুদ্রের অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া যাহার উদ্ধারের আর উপায় থাকে না, সেই নিতান্ত নরদেহধারী পশু ব্যতীত সকলের ভাগ্যেই ন্যূনাধিক স্বর্গ সুখভোগ হইয়া থাকে।

ইহ সংসারে প্রাণাধিক প্রিয়তম আত্মীয় কুটুম্বদের সঙ্গে এক জীবনে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা চিরস্থায়ী হয় না বলিয়া, কাহারও কাহারও মনে বিষাদের ও ক্ষোভের ভাব উপস্থিত হয়। কিন্তু বিষয়টীর প্রতি একটু ধীর ভাবে অনুধাবন ও আলোচনা করা যাউক। স্নেহময়ী জননী নবজাত শিশুটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে যখন তাহার চন্দ্রাননের সুধাপান করিতে থাকেন, তখন তাহার মনে যে কি অপূর্ব্ব সুখোদয় হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সন্তানের প্রতি মাতার এই অপরিসীম সুখকে পূর্ণ সুখ এবং এই স্নেহভরা সম্বন্ধকে পূর্ণ সম্বন্ধ বলিয়া বোধ হয়। তখন যদি করুণাময়ী জননীর কোমল ক্রোড় শূন্য করিয়া করাল কাল শিশুটীকে হরণ করে, তবে তাহাকে সেই সুকোমল নধর কান্তি শিশু সন্তানরূপে পুনরায় পাইয়া অঙ্কে ধারণ করিতেই মায়ের মন সতত আকুল হইবে। কিন্তু যখন সেই সন্তান শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে, তখন মাতা পুত্রের সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন পূর্ব্বের ন্যায় সেই সন্তানের প্রতি লালন পালনের জন্য আর মাকে সতত ব্যস্ত থাকিতে হয় না; সন্তানের আর "মা, মা," বলিয়া কেবল মায়ের অঞ্চল ধরিয়া থাকিতে হয় না। তখন মাতা পুত্রের মধ্যে অকৃত্রিম ও প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়। পরস্পর পরস্পরকে উপদেশাদি দিয়া, সুচারুরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। আবার যখন মা বার্দ্ধক্যে উপনীত হন, তখন সেই ছেলে যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়া অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সংসারী হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাহাদের সম্বন্ধ উল্‌টিয়া যায়, অর্থাৎ ঠিক্ পূর্ব্বাবস্থার বিপরীত হয়। তখন ছেলে লালন-পালন কর্ত্তা, মা—সেই ছেলে কর্ত্তৃক লালিতা-পালিতা হওয়ার যোগ্যা। সেবা শুশ্রূষার জন্য তখন মাকে পুত্রের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হয়। পুত্রও সযত্নে তাঁহাকে সেবা শুশ্রূষা করে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, শৈশবেই এই ছেলের মৃত্যু ঘটিলে কি পরস্পরের বন্ধন এত পূর্ণ, এত প্রগাঢ় হইত? শৈশবে ত একটী মাত্র বন্ধন ছিল। শেষ বয়সে পরস্পর মধ্যে নানারূপ বিশেষ বিশেষ বন্ধন সংস্থাপিত হইল। এই সকল বিভিন্ন বন্ধন কি সেই

একটী মাত্র বন্ধন অপেক্ষা বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট ও সুখকর নহে? জীব সম্বন্ধেও এইরূপ। তাহারা নানা জীবনে পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধে সংবদ্ধ থাকিতে পারে, পরিণামে সেই বিশ্বজনিন ভ্রাতৃভাবে পরস্পর পরস্পরকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মানব জীবন সার্থক করে। তখন যদি তাহারা গত জীবনের প্রতি দৃকৃপাত করেন, তবে কি দেখিতে পান? না, মানবজাতিতে পরস্পর মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ, যে সকল বন্ধন সংস্থাপিত হইতে পারে, তাহাদের কোনটা ও তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট নাই; স্নেহ ভালবাসা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতার যত কিছু সম্বন্ধ হইয়া জীবকে পূর্ণ মানুষ করে, তাহার সব সম্বন্ধই সেই সেই জীবনে পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া দেখিতে পান। পরিণামের এই অপূর্ব্ব সম্মিলন, এই পূর্ণ একত্ব কি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ এবং সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় নহে? আমার বিবেচনায়, এইরূপ বিভিন্ন জীবনের বিবিধ প্রকারের অভিজ্ঞতা দ্বারা মানবের পরস্পর বন্ধন অতি দৃঢ়ই হয়, কখন দুর্ব্বল হইতেই পারে না। অসংখ্য জীবন ধরিয়া দুইজনে পরস্পর একই বন্ধনে আবদ্ধ থাকা কখনই বৈচিত্র্যময় মানব জীবনের পক্ষে শ্রেয়স্কর ও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন জীবনে বিভিন্ন সম্বন্ধে বিভিন্ন বন্ধনে বহুবিধ অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা উৎপাদন করিয়া মানব জীবনকে পূর্ণ করিয়া তোলে। যাহারা এই ভাবের বিরোধী, তাহাদের বিষণ্ণ হওয়ার দরকার নাই। কারণ তাহাদের প্রাণ-প্রতিম সুহৃদকে এক জীবনে যে ভাবে দেখিয়াছেন, যদি সেই ভাবে পুনরায় দেখিতে চান, তবে যে পর্য্যন্ত এই বাসনা তাহাদের মনে জাগরূক থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত তিনি সেই প্রিয় সুহৃদের দর্শন সুখের উপভোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন না। স্বর্গে তাহা অবশ্যই ঘটিবে। কিন্তু তাহারা যে সুখে পরিতৃপ্ত হন ও যাহা চরম বলিয়া মনে করেন, তাহাতে অপর সকলই যে তদনুরূপ তৃপ্তিলাভ করিবে তাহা যেন তাহারা কখনও মনে করেন না, এবং তাহারা এখন যে আনন্দকে পূর্ণানন্দ এবং যে সুখকে একমাত্র বাঞ্ছনীয় সুখ বলিয়া মনে করেন, তাহা যে ভাবী জীবনের লক্ষ লক্ষ বৎসরে অনন্ত কাল ব্যাপিয়া সমভাবে একই রূপ আনন্দ ও সুখ প্রদান করিবে, তাহা যেন ভ্রমেও মনে করেন না।

প্রকৃতির নিয়মে স্বর্গলোকে মানবের বিশুদ্ধ বাসনাসমূহ পূর্ণ হয় ও তাহাতে

তাহারা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করে। তখন মানব বুঝিতে পারে যে, তাহার কোন সুচিন্তাই পণ্ড হয় নাই।

প্রকৃত সুখ কি এবং পরিণামে ভবিষ্যৎ গর্ভে কি সুখ নিহিত আছে, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমানে বাদ বিসংবাদ পরিত্যাগ করিয়া এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরাবিদ্যা মতে স্বর্গবাসী তথায় তাহার প্রিয়জন কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকে, তখন তাহার পবিত্র স্নেহ মমতার উৎস উচ্ছলিয়া উঠে। মানস রাজ্যেই শোক-মোহ-মুক্ত জীবে-জীবে পরস্পর সম্মিলন ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ হয়। ইহ জীবনে তাহা ঘটে না। কাজেই ঐহিক কার্য্যকলাপ যদি স্বর্গবাসীর স্মরণ পথারূঢ় থাকিত, তবে ইহ জীবনের অশুভকারী সুখ দুঃখে অভিভূত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন বিমল আনন্দ উপভোগের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইত। কিন্তু করুণাময় ভগবানের কৃপা বিধানে ও অলঙ্ঘ্য নিয়মে স্বর্গবাস কালে জীব ইহ জীবনের সুখ দুঃখ একেবারে বিস্মৃত হইয়া অতুল আনন্দ রসে বিভোর থাকে।

অন্ধ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ী খ্রীষ্টানদের মতে, মৃত্যু বিচ্ছেদের হেতু এবং যে পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পরলোক গমন না করে, সেই পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। আবার অন্য সম্প্রদায়ের মতে জীব মরণের পর শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে। তত্ত্ববেত্তা পরাবিদ্যা বলেন যে, মৃত্যু মানবের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তবে মরণে, কি পৃথক হয়? একজন অপরকে ভালবাসে। তাহাদের অপকৃষ্ট স্থূল রূপ সম্বন্ধেই বলা হয় যে, মরণ প্রণয়ী যুগলের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। ইহ সংসারে ভোগ বাসনায় পরিবেষ্টিত থাকায়; তাহাদের প্রভাবে অন্ধ হইয়া যায়, কাজেই যাহারা পরলোক গমন করে, তাহাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইল বলিয়া তাহারা মনে করে, কিন্তু স্বর্গবাসীর মনে এইরূপ দৃঢ় এবং পূর্ণ ধারণা জন্মে যে, মৃত্যু বলিয়া কোন কিছু যেন বিদ্যমান নাই, কারণ যে সকল নশ্বর স্থূল উপাদানের উপর মৃত্যুর অধিকার আছে, তৎসমস্তকেই সে পেছনে রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছে। কাজেই তাহার উন্মুক্ত চক্ষুতে তাহার প্রিয়জন দৃষ্টি পথের বাহিরে নহে। যে আবরণে বিচ্ছেদের অধ্যাস হয়, তাহা ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে স্বর্গলোকে তাহার মানস-চক্ষু উন্মীলিত থাকে। পরা-

বিদ্যার এই মত বড়ই সমীচীন, বড়ই উদার, বড়ই আশাপ্রদ ও শান্তিদায়ক। ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে, আত্মায় আত্মায় পরস্পরে স্থায়ী প্রণয় ও মিলন অবশ্যম্ভাবী। পরস্পর মধ্যে এইরূপ স্থায়ী ও অবিনশ্বর ভালবাসা এক জীবনে কিরূপে, কোথা হইতে আসিতে পারে? জন্মে জন্মে এক জীবের সঙ্গে অপর জীবের নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এক এক জীবনের অভিজ্ঞতা ও সংস্কার তাহার আত্মায় নিহিত থাকে, কাজেই পর জীবনে এক আত্মীয়কে অপর আত্মীয় স্বতঃই এত ভালবাসে ও স্নেহ-মমতা করে! আত্মায় আত্মায় বিচ্ছেদ নাই, কিন্তু দেহ ধারণ করিলে মায়ার আবরণে পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ হইল বলিয়া অনুমান করা হয়।

স্বর্গবাস কালে প্রিয়জনকে যে স্বর্গবাসী অতি নিকটে দেখিতে পায়, ইহা কি কল্পনা প্রসূত? কখনই নহে। ইহা প্রকৃত। কারণ প্রকৃত ও বিশুদ্ধ ভালবাসার মূল অনন্ত অচ্যুতানন্দে অবস্থিত। ইহা সামান্য ও অসীম মানব হৃদয়ের কল্পনা প্রসূত বা ভালবাসা সম্ভূত নহে। প্রকৃত ভালবাসা স্বর্গীয় জিনিস। আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধ প্রেম অবিনশ্বর। যাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আধ্যাত্মিক প্রণয়ে আবদ্ধ ছিল, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, তাহারা কর্ম্মবশে পুনরায় এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবে। ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে, যাহাদিগকে আমরা এ জীবনে প্রাণসম ভালবাসি, স্বতঃই যাহাদের প্রতি আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, তাহারা নিশ্চয়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনেও আমাদের প্রিয় সুহৃদ ও অকৃত্রিম স্নেহভাজন ছিল, এবং স্বর্গবাস কালে আমরা তাহাদের সংসর্গে আনন্দ রসে বিভোর ছিলাম। পুনরায় জন্মধারণ করিয়া স্বতঃই তাহাদের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হই। তাহাতে পূর্ব্ববন্ধন এত সুদৃঢ় অথচ মনোরম হয়। জন্মে জন্মে এইরূপ হইতে হইতে পরিণামে সকল মোহ পাশ ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় মানব পূর্ণত্ব লাভ করে। তখন সেই পূর্ণ মানবগণ একে অন্যের পাশাপাশি দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বজনিন ভ্রাতৃভাবে পরস্পর পরস্পরকে প্রেম, প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া জীবন সার্থক করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুদর্শন দাস।

গীতা-রহস্য।

—*:*—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণ, অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই অবতারবাদ হিন্দু-দর্শনের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। অবতার-বাদ উত্তমরূপে না বুঝিলে নানাবিধ ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা।

কৃষ্ণকে জগতে একমাত্র সগুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের অবতার বলা হয়। এই মত-বাদীরা সগুণ ব্রহ্মের মানব আকৃতি বা প্রকৃতি ধারণ বা গ্রহণ করা কিরূপে সম্ভবপর, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন না। কিন্তু কৃষ্ণ-অবতারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মোটের উপর অবতারবাদেরই কি করিয়া মীমাংসা করা যাইতে পারে? এই মতটি ভিত্তিশূন্য বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বর কেবলই এক মাত্র সগুণ ব্রহ্ম নহেন। পরব্রহ্ম এক অনন্ত অদ্বিতীয় ও নিরংশ। তাঁহার অবতার স্বরূপে বিকাশ কোনরূপেই সম্ভব নহে। পরব্রহ্ম যদিও এক প্রকারে সমস্ত জগতের অস্তিত্বের ভিত্তিসত্বা বা আধারস্বরূপে প্রকাশিত, তথাপি যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরব্রহ্ম ঈশ্বররূপে বিকাশিত না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাতে স্বগুণভাব পৌঁছিতেই পারে না। যদি অবতার সম্ভব হয়, পরব্রহ্মের অবতার হইতে পারে না; ঈশ্বরের অবতার হইবে। কিন্তু অবতারই বা কি? আমার মতে প্রত্যেক মুক্ত আত্মাই ঈশ্বরে মিলিত হয়। হয় ঈশ্বর আসিয়া আত্মার সহিত মিলিত হন, নয় আত্মা উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া ঈশ্বরে মিলিত হয়। মুক্ত পুরুষের আত্মা মৃত্যুর পর ঈশ্বরে মিলিত হয়, ইহাই সেই আত্মার পক্ষে শেষ মৃত্যু।

কতকগুলি বিশেষস্থলে ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া জীবন্মুক্ত আত্মার সহিত সম্মিলিত হন, কিন্তু সেরূপ ব্যাপার কিছু বিরল। এরূপ স্থলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির আত্মা ঈশ্বরের বিম্ব না হইয়া নিজেই ঈশ্বরের স্বরূপ। বাস্তবিকই জগতে এরূপ অবস্থার লোক জন্মিয়াছে। বৌদ্ধদিগের মতে বুদ্ধ মৃত্যুর ২০ বৎসর

পূর্ব্বেই ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া, পরে নির্ব্বাণ অবস্থা প্রাপ্ত হন। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন যে, ঈশ্বর শরীর ধারণ করিয়া খৃষ্টরূপে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও সকল খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবধান করেন না, তথাপি অনেকে স্বীকার করেন যে, যীশু নামক ব্যক্তির মধ্যে যখন ঈশ্বর প্রবিষ্ট হন, তাহার পরেই খৃষ্ট অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতে ও পরিত্রাতারূপে গণ্য হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বাইবেল অপেক্ষা অধিক না জানিলে আমরা ঠিক বলিতে পারি না যে, খৃষ্টের পক্ষে ঈশ্বরের সহিত এইরূপ মিলন কোন বিশেষ কারণে ঘটিয়াছিল, কি প্রত্যেক মহাত্মা বা মহর্ষির জীবন্মুক্তির সময়ই এইরূপ হইয়া থাকে। কৃষ্ণ সম্বন্ধে সেইরূপ বলা যাইতে পারে। মহাবিষ্ণু একজন দেবতা এবং ঈশ্বরের প্রতীক। অনেক হিন্দু ইহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহা হইতে যেন অনুমান করা না হয় যে, বিশ্বে কেবল একমাত্র ঈশ্বর আছেন বা ঈশ্বরের কেবল এক অবস্থাই সম্ভব। এখানে আমরা কেবল ঈশ্বরের এই মহাবিষ্ণু স্বরূপই বিবেচনা করিব।

রাম কৃষ্ণ এবং পরশুরাম প্রভৃতি মানব অবতার সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত আছে। কতকগুলি বৈষ্ণব বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার স্বীকার করেন না। যাহা হউক সে মত লইয়া বিশেষ গোলযোগের আবশ্যকতা নাই। পরশুরামের অবতার সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রকারের মতভেদ লক্ষিত হয়। মাধ্বেরা পরশুরামের ভয়ানক কার্য্য সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে মহাবিষ্ণুর দ্বারা আবিষ্ট বলেন। যাহা হউক সকল গোলযোগ বাদ দিলেও আমরা রাম ও কৃষ্ণের সম্বন্ধে নিশ্চিত।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ বৎসর আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে ধাবিত হইবার পর, ঈশ্বর অগ্রসর হইয়া সেই উন্নতির পথে তাঁহার আত্মার সহিত মিলিত হন। এই মতে ঈশ্বর কৃষ্ণের রূপে অবতীর্ণ হন নাই, কৃষ্ণই ঈশ্বররূপে উন্নীত হইয়াছেন। কোন মহাত্মা জীবন্মুক্ত হইলে তাঁহার আত্মা ঈশ্বরে সংযুক্ত হয়। ঈশ্বরও আবার কোন মানবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া স্বতঃই জগতের হিতসাধনে কোন আত্মার সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করেন।

এরূপ অবস্থায় আমরা দুই মতই সমর্থন করিতে পারি। কিন্তু ইহার মধ্যে

একটি গোলযোগ আছে। যদি আমরা জীবন্মুক্ত পুরুষকে অবতার বলি, তাহা হইলে শুক, বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা এমন কি সকল জীবন্মুক্ত মহর্ষিকেই অবতার বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক এই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষ সাধারণতঃ অবতার আখ্যায় আখ্যাত হন না। যদিও ভাগবতে কতকগুলি জীবন্মুক্তপুরুষ অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মহাবিষ্ণুর দশ অবতারের ন্যায় না বলিয়া, কতকটা মহাবিষ্ণুব প্রকাশ বলা হইয়াছে অর্থাৎ প্রকৃত অবতাব বলা হয় নাই। আমার মতে কৃষ্ণ ও রাম ব্যক্তিগত উন্নতির ফলে অবতার বলিয়া কথিত হন নাই; ঈশ্বর তাঁহাদের আত্মার সহিত মিলিত হইয়া কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন; পরীক্ষার দ্বারা এই মত প্রমাণিত হইতে পারে। এইজন্য কৃষ্ণের প্রতি আমাদেব ভক্তি কমা উচিত নয়, কারণ মনুষ্যাত্মা যথার্থ কৃষ্ণ নহে, ঈশ্বরই যথার্থ কৃষ্ণ। ইহাতে ভক্তির আরও বৃদ্ধিই হয়। এস্থলে একটি মাত্র প্রাণীর উপকারের জন্য নহে, সমগ্র মানব জাতির জন্যই ঈশ্বরের নরাকারে অবতরণ।

মহাভারতে দুইটি বড়ই কূট অংশ আছে, যাহা প্রথমোক্ত অবতারবাদীদিগের পক্ষে মীমাংসা করা বড়ই দুরূহ। মানিয়া লওয়া যাক যে, রাম স্বয়ং ঈশ্বর মানবাকারে মানবাত্মার সহিত যুক্ত ঈশ্বর নহেন। মৃত্যুর পর ঈশ্বর ব্যতীত আর জীবের অবশিষ্ট থাকা উচিত নহে। কিন্তু মহাভারতে লোকপাল সভা বর্ণনা করিবার সময় নারদ যমলোকে দাশরথি রামকে দেখিয়াছেন, বলিতেছেন। প্রয়োজন সাধনের পর এই বিশিষ্ট মায়াবেশ অর্থাৎ রামের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রয়োজন সাধনের পর রাম বিগ্রহ পরিত্যাগ করিলে, আর রামের কিছু অবশিষ্ট থাকা উচিত নহে। রামায়ণে লিখিত আছে যে, রামের মৃত্যুব পর ঈশ্বব (মহাবিষ্ণু) নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন। যম একজন দেবতা। যমলোকও দেববাস অপেক্ষা দূর নহে। তথাপি মহাভারতে লিখিত আছে যে, দাশরথি রাম অন্য রাজাদিগেব সহিত এরূপ নিম্ন লোকে অবস্থিতি করিতেছেন। এ বিষয়টি কিছু দুরূহ বটে, কিন্তু ইহার মীমাংসার আমার মতের সহিত বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। রাম অপরের ন্যায় মনুষ্য। তাঁহার পূর্ব্বেও অনেক জন্ম হইয়াছিল এবং রাম অবতারের পর আরও জন্ম হইতে পারে। রাম অবতারে (যদিও কার্য্য সকল রূপক মাত্র) রামের

আত্মা ঈশ্বর হইয়া যায় নাই, জীবন্মুক্ত রামও সমস্ত কার্য্য করেন নাই। স্বয়ং ঈশ্বরই (অর্থাৎ মহাবিষ্ণুই) সেই সময়ের জন্য রামের আত্মায় মিলিত হইয়া রামের ভিতর দিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ পক্ষেও ঐরূপ গোলযোগ :আছে। মহাভারতে মৌষল পর্ব্বে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ মৃত্যুর পর স্বর্গে (দেববাসে) গমন করেন ও তথায় দেবগণ কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হন। সেখান হইতে নারায়ণ স্বধামে গমন করেন; কিন্তু কৃষ্ণ স্বর্গেই অবস্থিতি করেন। এমন কি পরে লিখিত আছে যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইয়া কৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন। ইহার সুমীমাংসা কি? নারায়ণের কৃষ্ণের ভিতর দিয়া নিজের ক্ষমতা ব্যক্ত করা ব্যতীত এ বিষয়ের কোন উত্তম মীমাংসা নাই। আমরা রাম ও কৃষ্ণকে একই ঈশ্বরের অবতার বলিতে পারি। এই ঈশ্বর মহাবিষ্ণু কে? এবং কি জন্যই বা তিনি মানবের উন্নতি লক্ষ্য করিয়া অবতীর্ণ হন, তাহাই এখন বিচার্য্য।

এ বিষয়ে আমি অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না, কারণ দীক্ষার সময় ভিন্ন এ রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পাবে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এই কল্পে মানবের বিবর্ত্তনের প্রারম্ভেই যে ধ্যান বোহান সপ্তমন্বন্তর ব্যাপিয়া মানবের উন্নতির সহায়তা করিতে প্রকাশিত হন, ইনিই সেই মহাবিষ্ণু।

ইহাও সম্ভব যে, এই ঈশ্বর কোন পূর্ব্বকল্পের মহাত্মা বা জীবন্মুক্তের আত্মার সহিত যুক্ত ছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে বিভিন্ন যত মহাত্মার সহিত ঈশ্বর যুক্ত ছিলেন, তাহা আমাদের বিবেচ্য নহে; তবে গীতা বুঝিবার জন্য ইনি যে ঈশ্বর ইহাই আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ সমাপ্ত।

বেদান্ত ভাগ।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নাহি রহে যার লোকালোক
কেমনে শস্তিব সে লোক
স্মৃতি প্রণোদিত ভাষ—
লোকালোক পরিবেদনা ॥ ৪০ ।
লোকালোক নিরবধি
কল্পনা সম্ভূত যদি
জনমে বিস্ময় চিতে
কেন তার প্রাপণ কামনা ॥ ৪১ ।
জানি স্মৃতি হিতৈষিণী
জানি কর্ম্ম বিধায়িনী
জ্ঞান বিরোধিনী কিন্তু,
করিলে হায়, বিবেচনা ॥ ৪২ ।
তাই স্মৃতি সম্মানে লিখি
বৈদিকী আর পৌরাণিকী
তত্ত্ব সামঞ্জস্য কথা
করি ভাবের উদ্দীপনা ॥ ৪৩।
অপ্রসঙ্গ প্রসঙ্গেতে
অঙ্গ রোপ অনঙ্গেতে
মত দুষ্ট জেনে শুনে
লক্ষ্য করি হিতৈষণা ॥ ৪৪।
যে কল্পনায় কর্ম্মকাণ্ড
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড

হয় সূচিত, অন্যথা নয়,
যমলোকের কল্পনা ॥ ৪৫ ।
এই যমলোক যমের সদন,
এই লোকে জীব করে গমন,
দেহান্তে নবীন দেহ
প্রাপ্ত হয় সবাসনা ॥ ৪৬ ।
এই লোকে কর অবধান,
করে সদা অবস্থান,
"সাধ্য সিদ্ধ দ্বাদশাধিক
এক ত্রিংশৎ পিতৃগণা ॥" ৪৭ ।
পুরাণে করেছি শ্রবণ,
শেষের দিন অতি ভীষণ,
ধর্ম্মরাজ কর্ম্ম বিচার
করে যার গতি গহনা ॥ ৪৮ ।
কৃতীর কর্ম্ম ব্রতীর ব্রত
তপস্বীর তপঃ প্রধানতঃ
যোগীর যাগ, ত্যাগীর ত্যাগ,
দেখে তার এই গুণপনা ॥ ৪৯ ।
জীব চিত্র শমন রাখে,
কল্পান্ত ব্যাপিয়া থাকে,
গুণাভাসে রূপ প্রকাশে
স্থিরাকাশে তার যোজনা ॥ ৫০ ।
সে চিত্র বিচিত্র অতি,
যে দেখে বিভ্রান্ত মতি,
স্থিতপ্রজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ
করে তার আলোচনা ॥ ৫১ ।
করে না যম চিত্র কাহার
কর্ম্মগুণে জীবের আকার

স্বমূর্ত্তি কুমূর্ত্তি যত
কর্ম্মেরই স্বভাব রচনা ॥ ৫২।
কর্ম্মগুণ অনুসারে
পায় দেহ রূপ প্রতিবারে—
এইরূপ রূপ ভাণ্ডারে
সঞ্চিত চির বুঝ না ॥ ৫৩।
এইরূপে জীব সমুদায়
কানন-কুসুম প্রায়
স্ফুটিত লুণ্ঠিত আবার
অঙ্কুরিত হায় দেখ না ॥ ৫৪।
এইরূপে জীব পুনঃ পুনঃ
হয়ে নব সুপ্রসূন
পশিতেছে ভাবোদ্যানে
করিতেছে আনাগণা ॥ ৫৫।
নাই কিছু নূতন জগতে,
হয় না কিছু কোন মতে,
পুরা সৃষ্টি নবচ্ছদে
উদিত কর ধারণা ॥ ৫৬।
কে আছে বা হয় কার জ্ঞান
জাতিস্মরা আয়ুষ্মান
বর্ণিবে পুরাণ কথা
অজ্ঞান-ধ্বান্ত-নাশ না ॥ ৫৭।
পুরাণ পুরুষ যারা
পুরাণ প্রথিত তারা
মহাজন নামে খ্যাত
মহাজন তদন্য না ॥ ৫৮।

নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ নভাব বিদ্যতেঽসতঃ
উভয়োরপি দৃষ্টান্তঃ স্তনয়ো তত্ত্বদর্শিভিঃ।

ইহারাই সাধু নামে,
হয় কথিত ধরা ধামে,
কালেতে প্রবুদ্ধ হয়ে,
দেয় আভাস হয় চেতনা ॥ ৫৯
অন্যথা অজ্ঞানে জীব,
নাহি জানি শিবাশিব,
আসে যায় অন্ধকারে
আসা যাওয়া সার ভাব না ॥ ৬০।
কেন আসে যায় বা কেন,
কার উঠে না চিন্তা হেন,
গৃহ মেধীর গৃহ চিন্তা,
সর্ব্বচিন্তাহর বুঝ না ॥ ৬১।
এই চিন্তা হৃদয়ে ধরে,
ভাবকের হৃদয় বিদরে,
বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞানে,
করে তার অনুধাবনা ॥ ৬২।
নতুবা যে অন্ধকার,
চিরকাল সেই আঁধার,
তথ্য না পায় জ্ঞান-পিপাসু,
সাধুসঙ্গ সুলভ্য না ॥ ৬৩।
তত্ত্বকথা তত্ত্বজ্ঞানী,
প্রকাশ করে স্বল্প জানি,
এ বড় খেদ শাস্ত্র ভেদ,
বলিবারে সমর্থনা ॥ ৬৪।
শাস্ত্রাতীত বাক্য সাধুর
যে বুঝে তার পক্ষে মধুর।
অন্যলোকে লাঠি বাজে
বলে শাস্ত্রাবমাননা ॥ ৬৫।

শাস্ত্র হয় অতি রঞ্জিত
করিয়াছে.বিমোহিত
অজ্ঞানী অধর্ম্ম জনে
সংখ্যা কে করে গণনা ॥ ৬৬।
তথ্য নিরূপণে কাহার
নাই সামর্থ্য‚ করি বিচার
ঘনান্ধবিশ্বাসে কাটায়
আয়ুষ্কাল প্রতিজনা ॥ ৬৭।
যে আলোকে শাস্ত্র লেখা,
এ জড় জগৎ যায় যে দেখা
সে আলোক সামান্যালোক
নিয়ন্তার যথা প্রেরণা ॥ ৬৮।
মরি কি বিস্ময়কর
এই আলোকই নিরন্তর
খেলিতেছে খেলাইছে
কেউ করে না বিবেচনা ॥ ৬৯।
চাও যদি অজড় দেখিতে
ব্রহ্মরূপ সর্ব্ব ভিতে
সামান্যাতিরিক্ত আলোক
হয় যাতে কর সাধনা ॥ ৭০।

শেষের সেদিন।

ব্রহ্মাণ্ডপতির বিশাল সাম্রাজ্য মধ্যে অনন্ত সুখে বিচরণ করিয়া মানব, থাকিয়া থাকিয়া চমকিত হইতেছে, যেন কে কোন সীমান্তে দাঁড়াইয়া তর্জ্জনী সঙ্কেতে শাসনা করিতেছে,—তাই সুখে ডুবুডুবু, আনন্দে ভরপুর হৃদয়, সেই তাড়নে ম্লান হইয়া কেমন একটুকু হইয়া পড়িতেছে। সেই অব্যক্ত অস্ফুট শাসনা-সঙ্কেত—শেষের সেদিন। মানুষ, ঐ নাম মনে পড়িলে, ভয়ে শিহরিয়া উঠে, আত্মহারা হইয়া পড়ে, এত সুখময় সংসার বিষবৎ অনুমান করে। তাহার ভবিষ্যোন্নতি, পুরুষাকার, রাজা হইবার বাসনা, কোথায় চলিয়া যায়; জীব যেন একেবারে দিশাহারা হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়। মানব সমাজের আদি হইতে অনুসন্ধান কর, কোন ইতিবৃত্ত উহার অতীত সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষম হইবে না। সংসার জ্ঞান প্রাপ্ত বালক হইতে বিষয় বিরাগী যোগী পর্য্যন্ত মানব সমবায় ঐ মহাভয়ে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত। তাই জীবন্মুক্ত মহর্ষি শুকদেবও কাতরকণ্ঠে ডাকিয়াছেন,—

"ওমিতিজ্ঞানমাত্রেণ রাগাজীর্ণেন জির্জ্জিতঃ।
কালনিদ্রাং প্রপন্নোঽস্মিত্রাহিমাং মধুসূদন॥" (১)
"বাচয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রণমামি তবাগ্রতঃ।
জরামরণ ভীতোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন॥" (১১)

বালক যেমন ভয় পাইলে স্নেহময়ী জননীর অভয় আশ্রয়লাভে শান্তি বোধ করে, দয়াল পিতার সান্নিধ্যলাভে অন্তরে ভরসা উপলব্ধি করে, তাহার সকল অশান্তি ভীতি যেমন এককালে ঘুচিয়া যায়,—তেমনিই মানুষ, শেষের সেদিনে একটিবার প্রাণ ভরিয়া জগজ্জননীকে ডাকিতে পারিলে,—বিপদহারী ত্রাতা মধুসূদন বলিতে পারিলে, সকল বিপদ হইতে চিরমুক্তি লাভ করে। সেই ঘোর দুর্গমে,—শেষের সেদিনে, শান্তিপ্রদ একমাত্র মহৌষধ,—ভগবানের নাম কীর্ত্তন। অঙ্গ অবশ হইতেছে, প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়,—জিহ্বা জড়ভাবাপন্ন,—জীবনদীপ সম্ভবই নির্ব্বাপিত হইবে,—বড়ই দুর্দ্দিন, আর রক্ষা নাই,—তখন কর্ণ

পাতিয়া শক্তিভরা মায়ের নাম একবার শুনিতে পাইলে যেন মানুষের সকল জ্বালা চরম-যন্ত্রণা, চিরদিনের মত জুড়াইয়া যায়। জন্মগ্রহণ করিলেই জীবে সেই দুর্দ্দিন আসিবেই আসিবে। অনিশ্চয়তাময় জীবনান্ধকার মধ্যে সেই ধ্রুবতার হাত এড়াইবার কাহারও উপায় নাই। হরিনাম সুধা পান করিতে না পারিলে,—মাতৃনামামৃত শান্ত্যৌষধি সেবনে প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে না পারিলে, সে বিপদে কাহারও রক্ষা নাই। পিতা মাতা, সুত দারা প্রভৃতি হিতান্বেষী বন্ধু, ব্যথার ব্যথী যেই কেন থাকুন না, কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই ব্যথা হইতে রক্ষা করেন। যখন কেবল একমাত্র ভগবানের নাম ভিন্ন—সে দিনের উপায় নাই, তখন সময় থাকিতে ব্যথা না পাইতে কেন তাঁহাকে ডাকি না? মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, তাঁহাকে যে নামেই ডাক,—সেই নামে, সেইরূপে তিনি ডাকের মত ডাক শুনিলে—তোমার ডাকের উত্তর,—ডাকের সাড়া দিবেনই দিবেন। অমন দয়াবতী এ জগতে আর কি খুঁজিয়া মিলে? অমন বিপদবারণ শান্তিদাতা বন্ধু কি আর কেহ কোথায়ও আছে? যাচিয়া প্রেম বিলায় যে, এমনই বন্ধু,—এমনই হিতাকাঙ্ক্ষী সখা কি, আর কেহ আছে? ভক্তিভরে প্রাণমন এক করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারিলে আর ভয় থাকে না। মনে প্রাণে এক না করিলে তাঁহাকে পাইবে না,—আমিত্ব ভুলিয়া তাঁহার হইলে তবে তিনি দেখা দেন,—সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে ডাকিতে না পারিলে, তিনি তোমার হইবেন না—তাই দয়ার ঠাকুর দয়া করিয়া অর্জ্জুনের উপদেশ ছলে, জগতের জীবকে ডাকিয়াছেন,—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(গীতা ১৮ শ অঃ ৬৬ শ্লোক)

সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ একমাত্র আত্মার শরণাপন্ন হও,—আপনাতে আপনি থাক, তবেই ভগবৎ হরিদর্শন হইবে,—শেষের সেদিনের ভয় ঘুচিয়া যাইবে। এ বড় কঠিন কথা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট থাকিও না,—চেষ্টাভ্যাসে সদ্‌গুরু সাহায্যে এইভাব মিলিবে। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মানব, এই চেষ্টা করিলে অমরত্ব লাভ করিতে পারে। ভক্তিমান্ না হইলে কাহারও মায়ের আশ্রয়,—ভগবদ্ প্রেমলাভ ঘটিবে না। অসার

তর্ক যুক্তি দূরে লোষ্ট্রবৎ ফেলিয়া দিয়া—নীরস বিজ্ঞান দর্শনের পদে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া,—ভক্তিভরে হরিবোল বলিতে শিখিলে, মা আসিয়া ক্রোড়ে লইয়া থাকেন। শেষের সেই বিভীষিকাময় দুর্দিনে যেমনই মানুষ অভিভূত হয়,—তেমনই আরোগ্যের নিদান ভবব্যাধির জীবনসঞ্চারী একমাত্র মহৌষধ—মায়ের নামোচ্চারণে, শ্রবণে অপার শান্তি বোধ করে। যখন মানুষের শেষ দিন আসিবে,—তখন কত ডাক্তার বৈদ্য, কত আত্মীয় স্বজন, কত হিত-কামী বন্ধু আসিবেন,—যথারীতি ঔষধ পথ্য, উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা চলিতে লাগিবে,—স্নেহময়ী জননীর আশ্বাস বাণী, সময়ে সময়ে ভুলাইতে লাগিবে,—অর্দ্ধভাগিনী সহধর্ম্মিণীর তপ্ত অশ্রুবিন্দু, অবিরল ধারে পদতল প্লাবিত করিবে,—আজীবন সঞ্চিত পাপপুণ্যের আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসাদ যুগপৎ হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিবে, “আমি যাই, যাই, আর রক্ষা নাই, বড় নিদারুণ জ্বালায় শরীর দগ্ধ হইতেছে, —প্রাণ যেন চরমার হইতেছে” শুষ্ককণ্ঠে কেবল এই কথামাত্র ফুটিবে,—কিছুতেই শান্তি মিলিবে না,—তখনই মানুষ আত্মহারা হইয়া ভব-ভয় হারিণী,—সর্ব্বাপদ নিবারিণী চিরশান্তিময়ী মাকে যাই ডাকিবে, অমনি জগজ্জননী বাহু প্রসারণ করিয়া ডাকিবেন—আয় বাছা কোলে আয়,—এই যে আমি—আসিয়াছি—আর তোমার ভয় কি? সেই অমৃত নিস্যন্দিনী মধুরা ধ্বনি অপর কেহ শুনিতে পাইবে না,—সেই জগন্মোহিনী, হৃদয়ভরা মায়ের রূপ, সাধক ব্যতীত আর কেহ দেখিতে পাইবে না। অমনই ভক্ত সন্তান, সকল জ্বালা ভুলিয়া হাসিতে হাসিতে বিপদবারিণীর অভয়ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া, সকল অশান্তি, ভীতি হইতে চিরদিনের তরে মুক্তিলাভ করিবে। মায়ের সন্তানের মত সন্তান হইতে পারিলে শেষ দিনের বিভীষিকাতঙ্ক ঘুচিয়া যায় সত্য বটে, কিন্তু মায়ের চরণে, প্রাণমনে আমিত্ব অহঙ্কারের বলিদান না করিলে তন্ময় হইয়া চিদঘন স্বরূপিণীর আপনার না হইতে পারিলে,—তত্ত্বৎশক্তি লাভের আশা বৃথা, বিড়ম্বনা মাত্র। ভক্তিপ্রবণ অন্তরে,—অসার সংসার-মায়া দূরে পরিহার করতঃ বিশ্বাস মূলে তাঁহাকে যাই ডাকিবে,—অমনি তোমার জন্ম মৃত্যু জরাদিবন্ধন সকলই ঘুচিয়া যাইবে। শেষের সেদিন মৃত্যু আসিয়া তোমাকে পরজীবনের উন্নতিপথে প্রধাবিত করতঃ তোমার অপকার ব্যতীত মহোপকারই সাধনে সাহায্য করিবে। ভাবিয়া দেখিলে মৃত্যু মানুষের শত্রু নহে,—পরম

বন্ধু,—ক্রমোন্নতি মার্গের শরণি,—ভগবল্লাভের সোপান। ডাকিতে না জান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর,—তিনিই দয়া করিয়া তোমায় ডাকিতে শিখাইবেন। মাতৃগর্ভ হইতে জড়পিণ্ড ভূমিষ্ঠ হইয়া, যাঁহার করুণাবলে মানবত্ব লাভ করিয়াছ, তাঁহারই দয়ায়, চেষ্টা করিলে তুমি অমরত্ব লাভ করিবেই করিবে। ইহা নিশ্চয়, অভ্রান্ত সত্য। স্থূল দেহের নিপাত ঔপাধিক মৃত্যু ভিন্ন কিছুই নহে। এক মাতৃগর্ভ হইতে পাঁচটি সন্তান জন্মে, কিন্তু সকলে কিছু মায়ের আদুরে, আবদারে ছেলে হয় না। যে আদুরে ছেলে, সে অহোরহঃ মায়ের কোলে কোলে থাকে, কখনই মায়ের কাছ ছাড়া হয় না। মায়ের আদরে ছেলে হইতে না পারিলে, ভবব্যাধির ঔষধ মিলিবে না,—শেষের সেই দুর্দ্দিনের মহাভীতি অশান্তি ঘুচিবে না। যখন, যে অবস্থায় থাক না কেন, তাঁহার নাম না ভুলিলে, তুমি মায়ের আবদারে ছেলে হইতে পারিবে। ভক্তি না থাকে, নয়ন মুদিয়া রোগীর নিম্ব ভোজনের ন্যায় তাঁহাকে ডাক,—অপার করুণাময়ী তিনি, দয়া করিয়া নামের মহিমাগুণে আপনিই ভক্তি আনিয়া দিবেন। কালে তুমি, তাঁহারই কৃপায় বিশ্বব্যাপী প্রেমলাভে ভক্ত সাধক নামে পরিচিত হইবে। ধ্রুব, প্রহ্লাদাদি সাধকভক্ত, এক দিনেই কিছু, সেই মহতী পদবী ধারণে সমক্ষ হয়েন নাই। ঐকান্তিকী ভক্তি-সাধন বলে, বালক ধ্রুবের জন্য পৃথক এক লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভক্তের নাম উজ্জ্বল করিতে, ভক্তির জ্বলন্ত ছবি—ধ্রুবলোক নামকরণে প্রেমিক ভক্তকে অক্ষয় অমর করিয়া রাখিয়াছেন। মৃত্যুর পরেও ধ্রুব অমর হইয়া আছে। দয়ার নিধি দয়া করিয়া ভক্তিমাহাত্ম্য বর্দ্ধনে বিষ্ণুলোকের ঊর্দ্ধে, ধ্রুবলোকের সৃষ্টি করিয়া, স্বধাম ভক্তের ভক্তিডোরে ধ্রুব আবদ্ধ রহিয়াছেন। ইহজীবনে ভগবানের নাম কীর্ত্তনে যতদূর অগ্রসর হইবে,—সেই উন্নতি হইতে তোমাকে পশ্চাদ্পদ হইতে হইবে না। স্থূলদেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে, ভাবিও না, তোমার সকলই ঘুচিয়া যাইবে। কর্ম্মফল ভোগাবসানে, পরজন্মে আবার ক্রিয়া আরম্ভ করিলে, তোমার অভ্যস্ত আয়ত্বাধীন পূর্ব্ব ক্রিয়া বীজ স্বতঃই অঙ্কুরিত হইয়া, কালে, তাঁহারই ইচ্ছায়, মুকুল কুসুম ফল পল্লবে পল্লবিত মহাদ্রুম, কল্পতরুরূপে শীতল ছায়া প্রদানে তোমাকে অনন্ত শান্তি প্রদান করিবেই করিবে। তাঁহাকে পাইবার জন্য, যাহা তুমি করিবে, তাহা তোমায় পর জগতে সাহায্য করিবে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ তাঁহাদিগের

পূর্ব্ব জীবনের উন্নতি ফলে বালক জীবনে বৃদ্ধেরও দুষ্প্রাপ্য পূর্ণকাম লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তি নিষ্ঠামূলে ক্রিয়া করিতে অভ্যাস কর; কিন্তু সাবধান, কোনও কামনা যেন তোমার মনে স্থান না পায়। কামনা বর্জ্জিত না হইলে, ঘোর আমিত্বরূপ অজ্ঞানান্ধকার পাশচ্ছেদ ঘটিবে না। মাটি না হইলে খাঁটি হইতে পারিবে না।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসিযৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

(গীতা ৯ম অঃ ২৭ শ্লোক)

এই অভ্রান্ত মহাবাক্য গান করিতে করিতে কর্ম্মপথে চলিয়া যাও, কোনও বাধা বিপত্তি সম্মুখে উপস্থিত হইবে না। কর্ম্মের ফল,যাহা হউক না কেন,অন্তরে অন্তরে কর্ত্তাকেই অর্পণ করিবে। লাভালাভ, ভালমন্দ, ফলাফল কিছুই তোমাতে আশ্রয় করিবে না। এ দোকানের বেচাকেনায় তুমি দোকানীর দাস মাত্র। ছায়াবাজীর পুতুল খেলার মত, কেবলই নাচিতে হইবে,—যেমন ভাবে নাচাইবে তেমনই নাচিবে। এই শিক্ষা পাকা হওয়া চাই, নতুবা মুখে কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত বলিলে চলিবে কি? ভোগকালে তবে স্বাদগ্রাহ ঘটে কেন? মনে মুখে এক করিয়া আত্মাভিমানের খোসা খুলিয়া ছায়াবাজীর পুতুল সাজিলে তবে ঘোর আমিত্বের হাত হইতে নিস্তার মিলিবে। সর্ব্ব শাস্ত্রেই, এই, একই মত বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত। কলিকলুষনাশন, তাই দয়া করিয়া তন্ত্রে উপদেশ করিয়াছেন,—

"নাহং কর্ত্তা কারয়িতা বা নচ কার্য্যং
নাহং ভোক্তা ভোজয়িতা বা নচ ভোজ্যং
নাহং দুঃখং দুখয়িতা বা নচ দুঃখী
সোঽহং প্রত্যক্ষচিৎ স্বরূপোঽহমাত্মা।"

ভিতর দিয়া দর্শন করিলে, এই উভয় মহামন্ত্রেই জীবন্ত ব্রহ্মপাদনজ্ঞান পরিস্ফুট হইবে। এই নিত্য সত্য, নীতিরূপেও, আমাদের দৈনন্দিন সাংসারিক কার্য্যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংযোজিত রহিয়াছে। আমরা একটু চেষ্টা করিলে, ইহা মনে জ্ঞানে বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। অনক্ষর ইতর শ্রেণী বা স্ত্রী সমাজে বহুদিন হইতে এই তত্ত্ব রূপান্তরে গীত হইতেছে। "টিয়ে খায়, বাবুইতে খায়, মেইর

মাথার সার।" এই সামান্য কপোল চল ভাষা গ্রথিত অক্ষর কয়টি যে কত মহামূল্য মাণিক্যের মালা তাহা সামান্য লেখনী চালনে পরিস্ফুট হইবার নহে। তাই বলি,—আয় ভাই সাধক! যদি সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে চিরশান্তি লাভ ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে,—যদি, বারে বারে গভীর সংসারাবর্ত্তে ঘূর্ণনে শ্রান্তিবোধ জন্মিয়া থাকে, যদি, গর্ত্তবাস দুঃখ হইতে চির পরিত্রাণ চেষ্টা জন্মিয়া থাকে, যদি সংসার মরু পর্য্যটনে উদ্ধার পিপাসার উদ্রেক হইয়া থাকে, তবে আয় ভাই! কাহারও প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অনন্ত শান্তিময়ী অভয়দাত্রী বিশ্বজননী মেইর মাথা সার করি। তা হ'লে ভাই! আমাদের, শেষের সেদিনের ভয় ঘুচিয়া যাইবে। শান্তি-পন্থার অনুসন্ধান মিলিবে। শান্তি! শান্তি!

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য।

প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার আদর্শ।

আজি কালি সভ্যতা লইয়া শিক্ষিত সমাজে বড়ই গোলযোগ বাধিয়াছে। সভ্যতার অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্ব সকল বুঝিতে পারুন বা না পারুন 'সভ্যতা' সভ্যতা' করিয়া নব্য সম্প্রদায় এক তুমুল চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। অথচ সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ কি কোন্ উপাদানে উহা গঠিত, উহার ভিত্তি ও সঞ্জীবনী-শক্তির কেন্দ্রস্থল কোথায় এবং মানব-হৃদয়ের কোন্ উদারভাবে উহা অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে, তৎসমুদয় হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রায় কাহাকেও তাদৃশ যত্নবান্ হইতে দেখা যায় না। যাহা হউক, এই বিজ্ঞানালোক প্রভাসিত সভ্যতার যুগে—এই সভ্য জাতি সমূহের আমূল আলোড়নের দিনে, আমি সেই প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার উন্নত, মহানাদর্শ পাঠক সমীপে উপস্থাপিত করিব এবং সেই আদর্শ, কিরূপ সমুজ্জ্বল, মাধুর্য্যময় এবং জীবনের সুখ ও মঙ্গলপ্রদ, তাহা বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইব।

এক্ষণে সভ্যতা শব্দের বৈয়াকরণিক অর্থ যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু চিত্তবৃত্তির সর্ব্বোত্তম বিকাশ এবং শারীরিক, মানসিক

ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধের সামঞ্জস্যীভূত সমুন্নতিই যদি উহার প্রকৃত সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, প্রাচীন হিন্দুজাতি, সভ্যতার উচ্চতম সোপানে সমাসীন হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে বাকল সাহেবের অভিমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বিধেয়,—তিনি বলেন, "যে জাতি যে পরিমাণে বাহ্য প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে, সেই জাতি সেই পরিমাণে সভ্য-পদবীতে উন্নীত হইয়াছে।" এই হিসাবে তাঁহার মতে হিন্দু, অসভ্য জাতি। তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে "আর্য্যজাতি ভীতচিত্তে প্রকৃতির চরণে ভক্তিভরে প্রণত হইয়াছিল এবং বশ্যতা স্বীকার করিয়া, নানাবিধ স্তুতি-গানে তাঁহার আরাধনা করিত।" বাকল সাহেবের এই মত কতদূর সঙ্গত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইতিহাস, ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দু জাতির জয় ঘোষণা করিতেছে। যে জাতি বৈদিক যুগেও অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া বিশাল বারিধি-হৃদয়ে লহরী লইয়া ক্রীড়া করিত; যে জাতি অনন্ত সাগর-বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া বালি, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে আপনাদিগের ঔপনিবেশিকতার পরিচয় দিয়াছিল; যে জাতি গগনপথে অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী লইয়া বিচরণ করিত; যে জাতি ভারত মহাসাগরের কলকলায়মান তরঙ্গরাজি মথিত-উৎক্ষিপ্ত করিয়া সিংহলে স্বীয় বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়াছিল এবং যে জাতি প্রাকৃতিক শক্তিকে অতিক্রম করিবার জন্য—তাহার অতীত হইবার জন্য যোগাবলম্বন করিয়া প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত হইয়াছিল, সে জাতি সম্বন্ধে একথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। সত্য বটে, বেদাদি গ্রন্থে বাহ্য-প্রকৃতির স্তুতি-ব্যঞ্জক কবিতা বহুল দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দু জাতির অসভ্যতা তাহার কারণ নহে। তাহার অন্যবিধ কারণ আছে। সে সকলের আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে এই বিশ্বজনীন্ সভ্যতার সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল অবগত হইতে চেষ্টা করা যাউক। প্রথমতঃ—ইহার মূলভিত্তি কি, তাহা দেখিতে হইবে। একটু চিন্তা করিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইউরোপীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। স্বার্থে উহার প্রতিষ্ঠা এবং স্বার্থেই উহা পরিস্ফুট ও সম্বর্দ্ধিত। যতদিন এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ, একটা জাতীয় জীবনকে শাসিত করিয়া একই পথে লইয়া যায়, ততদিনই উহা উদ্দামগতিতে চলিয়া থাকে। যখনই এই স্বার্থের অভাব ঘটিতে দেখা যায়, তখনই উহার বিনাশ অনিবার্য্য হয়। কিন্তু

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা সেরূপ নহে। উহা সনাতন ও অমর। জীবনীশক্তি বিনষ্ট না হইলে উহার ধ্বংস নাই। সেই জীবনীশক্তি ধর্ম্ম। ধর্ম্মে উহা সংগঠিত এবং ধর্ম্মে উহা অনুস্যূত। একমাত্র ধর্ম্মই কেবল সমগ্র জাতীয় জীবনকে শাসিত করে বলিয়া প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা, কখনও পাশ্চাত্য-সভ্যতা সুলভ সমর-প্রিয়তা, বাহ্যাড়ম্বর, অশান্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতিতে বিত্রাসিত হয় নাই। হিন্দু সমাজের প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্ম মিশ্রিত বলিয়া হিন্দু সংসার একরূপ পবিত্র ও শান্তিময়। তাই রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণ ও পাণ্ডবদিগের ভ্রাতৃপ্রেম এবং সাবিত্রী ও জানকীর পাতিব্রত্য জগতে অতুলনীয়। সেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত রোম ও গ্রীক্ সভ্যতা ধরণী পৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় আর্য্য সভ্যতা ধর্ম্মবলে বলীয়সী বলিয়া, জগতে আজিও স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় সভ্যতার মধ্যে একটী বিশেষ প্রভেদ এই যে—প্রথমটী প্রবৃত্তিমূলক—অপরটী নিবৃত্তি-মার্গানুসারিণী। একদিকে ইউরোপ, ভোগের তীব্র-আকাঙ্ক্ষায় মরীচিকা-বিমূঢ় মৃগের ন্যায় অশান্ত চিত্তে এই সংসার-মরুতে বিচরণ করিতেছে, অন্যদিকে ভারতবর্ষ বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছে,—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

এরূপ অমৃতময়ী মহাবাণী আর কখনও পরিশ্রুত হয় নাই। প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা বুঝিয়াছিলেন, ভোগে, জীবনকে কখন সুখময় করিতে পারে না তাহাতে কেবল আকাঙ্ক্ষা মাত্র জাগাইয়া তুলে এবং সেই আকাঙ্ক্ষার প্রবল-তাড়নে মনুষ্য-জীবন ঘোরতর অশান্তিময় হইয়া উঠে। সেই নিমিত্ত তাঁহারা ভোগ বিলাসের অন্তরালে সংযতভাবে এই নিবৃত্তিযোগ অভ্যস্ত করিয়াছিলেন এবং একাধারে ভোগ ও বৈরাগ্যের সামঞ্জস্য রাখিয়া এক মহামহিমময়ী সভ্যতার সৃষ্টি করিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে তাহাতে বাঁধিয়াছিলেন। ক্রমে সেই সভ্যতা পরিমার্জ্জিত, পরিশোধিত এবং সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যময় জগদীশ্বরের চরণ সন্নিধানে প্রস্ফুটিত হইয়া অনন্ত শোভা বিস্তার করিয়াছিল। ইউরোপ আজিও ইহার অনুকরণ করিয়া ধন্য হইতে পারে—এই মহাপাদপের শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া ভোগ-কলুষিত—বাসনা-প্রপীড়িত চিত্তের শান্তিবিধান করিয়া পরিতৃপ্ত

হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, বৈদেশিক সভ্যতার একটানা স্রোতে সকল ভাসিয়া যাইতেছে; হিন্দুজাতির ঐহিক সুখপ্রিয়তা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। তৃতীয়তঃ—ইউরোপীয় সভ্যতা ভোগাসক্ত সুতরাংই কর্ম্মমূলক। কর্ম্মের কঠোর সংঘর্ষে পাশ্চাত্য সমাজ আলোড়িত; জলযান, ব্যোমযান, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির বিপুলাড়ম্বরে উদ্‌ভ্রান্ত এবং সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী, স্বায়ত্বশাসন, প্রজাতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র প্রভৃতির দারুণ নিষ্পেষণে নিপীড়িত ও উচ্ছৃঙ্খল। সংপ্রতি কর্ম্মের সহিত জ্ঞানেরও কিঞ্চিৎ সংযোগ ঘটিয়া থাকিলেও, প্রধানতঃ উহা কর্ম্মমূলক। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা কেবল মাত্র জ্ঞান, কর্ম্ম অথবা ভক্তিমূলক নহে। উহা ত্রিবিধের সামঞ্জসীভূত সমন্বয়—জাহ্নবী-যমুনা সরস্বতীর অপূর্ব্ব সমাবেশ; অনন্ত-মধুর—অনন্ত সুষমাময়।

ইহাই হিন্দু সভ্যতার সারভাগ। সমাজের মঙ্গল কামনায় নিবৃত্তি মার্গাবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির যথোচিত সাধনা দ্বারা ধর্ম্মময় জীবন পরিচালিত করাই প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার আদর্শ। এই উচ্চাদর্শে জীবন সুগঠিত হইলে শারীরিক ও মানসিক কোমল বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহাই মনুষ্যত্ব; মনুষ্যত্বের সর্ব্বোন্নত বিকাশই সভ্যতা। আর্য্য সভ্যতার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার সর্ব্বত্রই একনিষ্ঠ ভাব এবং সেই একনিষ্ঠা ঈশ্বর মুখী। অনেকে এই একনিষ্ঠ ভাবকে দোষাবহ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই একনিষ্ঠা থাকাতেই প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা এইরূপ পবিত্রতা বিধায়িনী ও শুভকরী হইয়াছে। এবং এই একনিষ্ঠা প্রভাবেই উহা এখনও সঞ্জীবিত রহিয়াছে। একনিষ্ঠতাই উহার প্রাণ—একমুখিতাই উহার কেন্দ্রস্থল। এক্ষণে ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় এই উভয়বিধ সভ্যতার আলোচনা করিয়া উহাদের মূলগত পার্থক্য বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছি। একটী প্রাবৃট্‌তরঙ্গিণী—সতত উচ্ছ্বাসময়ী, আবর্ত্তময়ী এবং আবিলতাময়ী। উহা খরতর বেগে মানব-সমাজ প্লাবিত করে—মনের বিকৃতি জন্মাইয়া একটা কর্দ্দমময়ী ভোগাকাঙ্ক্ষা রাখিয়া যায়; কখনও হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ স্পর্শ করিতে পারে না। অপরটী শরত্তটিনী—নিয়ত প্রসন্ন-সলিলা ও ধীরগামিনী, উহা অনন্ত মধুরিমায় ফুটিয়া উঠিয়া মনুষ্য হৃদয়ে একটী অননুভূত-পূর্ব্ব মধুময় ভাব জড়াইয়া রাখে। একটী অসংবদ্ধ ও উচ্ছৃঙ্খল; অপরটী শান্ত,

সংযত এবং মধুর। একটী ভোগ; অপরটী সন্ন্যাস। একটী বিলাস; অপরটী প্রীতি। একটী আধিভৌতিক; অপরটী আধ্যাত্মিক। একটী মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর জ্যোতিঃ—সমস্ত আলোকিত করে, চক্ষু ঝলসিয়া দেয়; অপরটী বাল-তপনের স্নিগ্ধ কিরণ—মনোরম অথচ জ্যোতির্ম্ময়। একটী প্রবৃত্তির অনল জ্বালাইয়া দিয়া বিশ্বসংসার পুড়াইয়া ফেলে; অপরটী নিবৃত্তির সুধাবৃষ্টি করিয়া জীবন পবিত্র করে। একটী কোকিলের কুহুরব—স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলে; অপরটী বীণার মোহন ঝঙ্কার—হৃদয়ে শান্তিরস ঢালিয়া দেয়। তাই প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতা সম্পূর্ণ, পরিণত এবং মঙ্গলময়। সভ্যতার এই মহিমোজ্জ্বল পূর্ণ আদর্শ, সভ্যতা-জননী ভারত ভূমিতে আবার কবে ফিরিয়া আসিবে? কবে বাহ্য-সম্পৎ-প্রিয়তা ও ভোগাসক্তি, ঋষি-নিষেবিত ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত হইবে?

শ্রীঅমূল্য রতন ভট্টাচার্য্য।

সৃষ্টি-তত্ত্ব।

সৃষ্টি শব্দের অর্থ প্রকাশ। যাহাকে উৎপত্তি নামে অভিহিত করা হয়, তাহার অর্থ প্রকাশ ভিন্ন, অভূত-ভাব অর্থাৎ যাহা ছিল না তাহার উৎপত্তি বলা যায় না। কারণ, যাহা নাই তাহা চির দিনই নাই, আর যাহা আছে তাহার বিনাশও নাই। এই জন্য উৎপত্তি শব্দের অর্থ প্রকাশ। এ প্রকাশ সর্ব্বদাই সকল পদার্থে সমভাবে রহিয়াছে। এস্থলে যদি কাহারও মনে এরূপ আপত্তি উপস্থিত হয় যে, প্রকাশ যদি সর্ব্বদাই থাকে, তবে উৎপত্তির পূর্ব্বেও ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? তদুত্তরে,বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করের প্রদর্শিত যুক্তির অনুসরণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, ঘটের পূর্ব্বাবস্থা মৃত্তিকাপিণ্ড। ঐ পিণ্ড আকারই ঘট-প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। দণ্ড প্রভৃতি কারণ নিয়োজিত হইলে, ঐ আকারের পরিবর্ত্তন হইয়া, ঘটের আকার স্পষ্ট দর্শন-গোচর হইয়া থাকে। এই প্রকাশ শব্দটীর তাৎপর্য্য অতি গভীর। ঘটের প্রকাশ হইল বলিলে, ঘট জ্ঞান গোচর হইল ইহাই বোধ হয়। তাহা হইলে, ঘটের প্রকাশ বলিলে, ঘটের জ্ঞান বুঝায়; সুতরাং প্রকাশ শব্দের অর্থ জ্ঞান। "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানকেই

ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্ব শব্দে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতেছে। তাহা হইলে,ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণই সৃষ্টিতত্ত্ব নিরূপণের প্রকৃত অর্থ। এই তত্ত্ব নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয় ; অথবা মানব বুদ্ধির নিতান্ত অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; তথাপি শাস্ত্রকারগণের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া, মানব-বুদ্ধি যতটুকু বুঝিতে সমর্থ হয়, ততটুকুই মঙ্গলপ্রদ বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত ; ইহাই এই প্রবন্ধ প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য। উল্লিখিত প্রকাশ বা ব্রহ্মকে একমেবাদ্বিতীয়ং ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রমাণিত করা হইয়াছে, অথচ প্রকাশ্য না থাকিলে, প্রকাশও অবলম্বনশূন্য হইয়া থাকে না। অথবা যাহা দ্বারা কোনও বস্তু প্রকাশ্য হয় না, তাহা প্রকাশ বলিয়াও গণ্য হয় না ; সুতরাং ঘট পট প্রভৃতি পদার্থই এই প্রকাশের প্রকাশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

সেই প্রকাশ্য অনন্ত কিন্তু প্রকাশ এক। এক সূর্য্য হইতে যে সকল পদার্থের প্রকাশ হইতেছে, তাহারাই পরস্পর ভিন্ন ; কিন্তু তাহাদের প্রকাশ ভিন্ন নয়। এক প্রকাশ সর্ব্বদা সমভাবে থাকিয়া, সকলকেই প্রকাশ্যরূপে দেখাইতেছে। আবার যখন প্রকাশ্যের অভাব হয়, তখন প্রকাশও অপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থান করে। এইরূপ স্বরূপাবস্থিত প্রকাশই এক অদ্বিতীয় বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হয়। সেই এক ভিন্ন বাস্তবিক পদার্থান্তর নাই। বেদান্তে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ প্রতিপাদনে সাধারণতঃ দুই প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিয়া, জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সত্তা তিন প্রকার,—পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। যাহা প্রকৃত সত্য, তাহার সত্তা পারমার্থিক। সেরূপ সত্তা কেবল ব্রহ্মের। আর যাহা প্রকৃত সত্য নয় অথচ ব্যবহারে সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তাহার সত্তা ব্যবহারিক। জগতের এইরূপ সত্তা। এবং যাহার যাবৎ প্রতিভাস অর্থাৎ যতকাল জ্ঞান হয়, ততকাল মাত্র সত্তা, তাহার প্রাতিভাসিক সত্তা। রজ্জুসর্পে এইরূপ সত্তা আছে। জগতের এই ব্যবহারিক সত্তাও প্রাতিভাসিক সত্তার ন্যায় চিরস্থির নয়। যেমন যতকাল রজ্জুজ্ঞান না হয় তত কাল পর্য্যন্ত সর্পজ্ঞান থাকে এবং রজ্জুজ্ঞান হইলে সর্পজ্ঞান দূরীভূত হয়, সেইরূপ যত দিন পর্য্যন্ত অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন জীব নিজের স্বাভাবিক সচ্চিদানন্দ

ব্রহ্মরূপ বুঝিতে না পারে, ততদিনই জগতের জ্ঞান হয়, ততদিনই জগৎ লইয়া সে নানা ব্যবহার করে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সে সমস্তই ব্রহ্মে লীন হইয়া যায় এবং এক ব্রহ্ম ভিন্ন সে আর কিছুই দেখে না। রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান হয়, তাহা যেমন রজ্জু ভিন্ন কিছুই নয়, একমাত্র রজ্জুই তাহার কারণ, সেইরূপ ব্রহ্মে অধ্যস্ত জগতের ব্রহ্মই কারণ। যেটি যাহা নয়, তাহাকে সেইরূপ মনে করাকেই অধ্যাস বলে। অধ্যাসের নামান্তর বিবর্ত্ত। এই জগৎ ব্রহ্মেই অধ্যস্ত; এজন্য সকলই ব্রহ্মের বিবর্ত্ত এবং মায়ার পরিণাম। সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া হইতেই জড়জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, মায়াই ইহার উপাদান কারণ। এই মায়াও সত্য পদার্থ নয়; ইহাও ব্রহ্মে অধ্যস্ত; এজন্য মায়ার পরিণাম জগৎকেও অধ্যস্ত বলা যায়; সুতরাং এক মায়াই প্রকৃত অধ্যস্ত, কার্য্য-কারণের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে তাহা হইতেই ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে স্থূলতর, স্থূলতম এইরূপে উৎপন্ন। এই মায়ার অধ্যাসের কারণ কি এই প্রশ্নের উত্তর বড়ই দুর্বোধ্য। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, মায়া অনাদিকাল হইতেই ব্রহ্মে অধ্যস্ত। এই মায়া প্রসূত সংসারও সুতরাং অনাদি। মায়া নিজে অনির্ব্বচনীয় তাহার অধ্যাসের কারণও অনির্ব্বচনীয়।

অধ্যস্ত পদার্থ মাত্রেই মিথ্যা, মায়াও মিথ্যা। অতএব এক ব্রহ্মই অদ্বিতীয় সৎপদার্থ। অথবা ঐ মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন দাহকালেই প্রকাশ পায়, অন্য সময়ে তাহা অগ্নিতেই বিলীন হইয়া থাকে, তখন এক অগ্নিই প্রকাশ পায়, সেইরূপ যখন মায়া শক্তিরও পরিণাম হয় না, তখন তাহাকেও পৃথক্ বলিয়া অনুভব হয় না। প্রলয়কালে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ ঐ শক্তিতে লীন হইলে, শক্তিও ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে; পুনর্ব্বার সৃষ্টি সময়ে ইচ্ছাময় ভগবানের অলৌকিক ইচ্ছায় পৃথকরূপে নিজে প্রকাশ পাইয়া, নিজের দেহে লীন পদার্থ সমূহকে ক্রমে প্রকাশ করে। এইরূপ ক্রম-বিকাশকেই সৃষ্টি বলে। তাহা হইলে, দেখা যাইতেছে যে এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নয়। কেবল শক্তির প্রকাশ হইলেই তাহাকে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। শক্তির এইরূপ প্রকাশকেই প্রকারান্তরে অধ্যাস বলিয়া বলা হইয়াছে। এই প্রকাশ বা অধ্যাস অন্য কোনও কারণ হইতে হইয়াছে বলিয়া স্থির করা যায় না; এজন্য ইহাকে অনির্ব্বচনীয় এবং কতদিন হইতে হইয়াছে তাহারও নিশ্চয়তা নাই; এইহেতু অনাদি বলিয়া শাস্ত্র-

প্রণেতৃগণ স্থির করিয়াছেন। এই মায়া ব্রহ্মের এক অংশে কল্পিত হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন, "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ;—অর্থাৎ আমি এক অংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি। এই কল্পিত অংশ মায়া সম্বন্ধ বশতঃই কিঞ্চিৎ মলিনের ন্যায় হইয়াছে। অবিদ্যাকল্পিত জীব যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়া কথঞ্চিৎ মলিনতামুক্ত হইলে, এই মায়া সংস্পৃষ্ট অংশের মহিমাই কিছু বুঝিতে সক্ষম হয়। আর যখন সম্পূর্ণ ভাবে মলিনতামুক্ত হইয়া, স্বচ্ছভাব অবলম্বন করে, তখন অসীম স্বচ্ছ অংশের সহিত অভিন্ন হইয়া, সকল প্রকার জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে, ইহাই জীবের স্বরূপাবস্থান। ব্রহ্মের এই অংশ নিতান্তই দুর্বোধ। ইহাই বাক্য ও মনের নিতান্ত অগম্য। তথায় আলোক আঁধার কিছুই নাই। সে ভাব অতি গূঢ়, স্থির, গম্ভীর, অপার, অসীম। সে চিরস্তিমিত সৌম্য ভাব মানব-চিত্তপটে প্রতিফলিত হইবার অযোগ্য। এই অদ্বৈত ব্রহ্মই জীবনের চরম লক্ষ্য। এই অদ্বৈত প্রতিপাদনই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শাস্ত্রকারগণ পৃথক্ পৃথক মত অবলম্বন করিয়া, নানারূপে কারণ নিরূপণ করিলেও লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসারে দেখা যায় যে, অনেকগুলি কার্য্যের একটীই কারণ হইয়া থাকে। এক কারণই বহুকার্য্য রূপে অবস্থান করে। একটী বীজ হইতে বৃক্ষ, তাহা হইতে বহুসংখ্যক বীজ ও তাহা হইতে আবার প্রভূত বৃক্ষ, ক্রমে তাহা হইতেই অনন্ত বীজ ও বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ অনন্ত জগতেরও একটীই মূল কারণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এই প্রকাশরূপ ব্রহ্মের তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপনিরূপণ করাই সৃষ্টিতত্ত্ব শব্দের অর্থ। এই স্বরূপনিরূপণও সৃষ্ট পদার্থের স্বরূপনিরূপণের অধীন। দ্বৈত নিষেধ না হইলে, অদ্বৈত প্রতিপাদন হয় না; সুতরাং জগৎরূপ কার্য্যের পৃথক্ সত্তা নাই; তাহা কেবল, কারণ ব্রহ্মেরই স্বরূপ; এইটী প্রতিপাদিত হইলে, অদ্বৈত জ্ঞান হইতে আর অপেক্ষা থাকে না। সেই জন্য সৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ কি এইটীই আলোচ্য বিষয় বলিয়া, দেখা যাউক জগতের স্বরূপ কি?

ঘটের স্বরূপ কি? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, ঘটাকারে পরিণত মৃত্তিকাই ঘটের স্বরূপ,—ঘট তাহার অবস্থা-বিশেষ। এই প্রত্যক্ষ জগতেরও যাহা স্বরূপ ইহাও তাহারই অবস্থা-বিশেষ মাত্র। একজাতীয় যত পদার্থ আছে তাহাদের স্বরূপ এক ভিন্ন দুই নয়। পার্থিব পদার্থ মাত্রেরই স্বরূপ একমাত্র পৃথিবী। এইরূপ জগতের স্বরূপ নিশ্চয় করিতে হইলেও প্রথমতঃ জড় ও চেতন এই দুই

ভাগে বিভক্ত পদার্থের মধ্যে ত্রিগুণাত্মক জড় পদার্থ সমূহের ত্রিগুণ প্রকৃতিকেই কারণ বলিয়া স্থির করা যায়। এই প্রকৃতি পূর্ব্বোক্ত মায়া শক্তি। এই শক্তি শক্তিমান্ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়; ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। অতএব দেখা যায় যে, সমস্ত জগতের এক চৈতন্যই স্বরূপ। তাহা হইতেই জড় জগতেই প্রকাশ সুতরাং চৈতন্যই জগতের মূল কারণ। ইহাকেই শাস্ত্রে আত্মা ও ব্রহ্মশব্দে অভিহিত করা হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র কারণ। শ্রুতি বলিতেছেন—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়,"—সেই আত্মাকে জানিয়াই মুক্তিলাভ করা যায়; মুক্তির আর দ্বিতীয় পথ নাই। কোনও সম্প্রদায় ভক্তিকেই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া থাকেন। পরে এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিব। সাঙ্খ্য দর্শনে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে, এবং বেদান্তে, ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দ প্রাপ্তিকে মুক্তি বলিয়াছেন। এইরূপ মতভেদের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে,বোধ হয় যে, গুরুভারপীড়িতঘর্ম্মাক্তকলেবর পরিশ্রান্ত পথিক নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া,মস্তক হইতে ভার নামাইয়া সুখী হইলাম বলিয়া মনে করে, বাস্তবিক তাহার কেবল ভার বহনের দুঃখই নিবৃত্ত হয়, কিছুই সুখের উদয় হয় না, সেই দুঃখনিবৃত্তিকেই সুখ বলিয়া মনে করে; দুঃখময় সংসারের জীবও সেইরূপ—সংসার দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই সুখী হইব মনে করিয়া, মুক্তি লাভের জন্য ধাবিত হয়। সাঙ্খ্য প্রণেতা কপিল এইরূপ যুক্তির অনুসরণ করিয়া, কেবল দুঃখ নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়াছেন। বৈদান্তিকেরা এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন যে, যাহাতে আয় ও ব্যয় তুল্য, সেরূপ ব্যবসায়ে যেমন বণিকের প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ যাহাতে সুখও নাই দুঃখও নাই, সেরূপ মুক্তিলাভের জন্য কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। আনন্দ অর্থাৎ সুখই লোকের বাঞ্ছনীয়, কেবল দুঃখ নিবৃত্তি কেহই চায় না। ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দও অপার অনন্ত, তাহার সীমা নাই, ক্ষয় নাই এবং সেই আনন্দ পাইলেই দুঃখেরও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। অতএব ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিই মুক্তি। সুতরাং মুক্তি যে সকলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয়, তাহাতে সন্দেহ কি? বিষয় সুখ সবই ক্ষণস্থায়ী; ব্রহ্মানন্দের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। এই সাঙ্খ্য ও বেদান্ত মত আপাততঃ ভিন্ন হইলেও বস্তুত ইহাদিগের কোনও ভেদ

নাই। সাঙ্খ্যসারে সাঙ্খ্যভাষ্য-প্রণেতা বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন "সুখং দুঃখ-সুখাত্যয়ঃ,"—সুখ ও দুঃখ এই উভয়ের নিবৃত্তিকেই প্রকৃত সুখ বলে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুখ বলিয়া অনুভব করিতে হইলে তাহার বিপরীত দুঃখও থাকা আবশ্যক, তাহা না হইলে সুখ বলিয়া অনুভব করা যায় না। অন্ধকার না থাকিলে, আলোকের মহিমা বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং বৈষয়িক সুখ দুঃখ আপেক্ষিক তুলনার বস্তুরই আর কিছুই নয়। অতএব যে অবস্থায় দুঃখের অত্যন্ত অভাব হয়, তাহাতে সুখও অনুভূত হয় না। এইরূপ সুখও দুঃখের অত্যন্ত অভাবকেই শাস্ত্রে সুখ বলিয়া বলা হইয়াছে, এবং ইহাই প্রকৃত সুখ। অন্য সুখ দুঃখজড়িত বলিয়া প্রকৃত সুখ নয়, তাহাও দুঃখ মধ্যে গণ্য। বেদান্ত গ্রন্থ পঞ্চদশীতে একটি শ্লোক আছে সেইটী উদ্ধার করিয়া, উভয় মতের ঐক্য দেখাইব। শ্লোকটী এই "অভানে ন পরং প্রেম ভানেন বিষয়স্পৃহা। অতো ভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ"। অর্থাৎ আত্মা সকলেরই প্রিয়, কিন্তু পরমানন্দ-রূপ আত্মাকে জানিতে না পারিলে, তাহাতে পরম প্রেম হয় না এবং পরমানন্দ জ্ঞান হইলেও বিষয় কামনা থাকে না। অতএব আত্মজ্ঞান হইলেও আত্মা যে পরমানন্দস্বরূপ, ইহা কেহই বুঝিতে পারে না। অতএব মুক্তি হইলে, ব্রহ্মের স্বরূপ আনন্দ কেহই অনুভব করিতে পারে না। কেবল তন্ময় হইয়া থাকে। সুতরাং সে আনন্দ পাইবার জিনিষ, ভোগের জিনিষ নহে এবং সেই আনন্দ প্রাপ্তিতে দুঃখেরও অবসান হইয়া থাকে। তাহা হইলে বেদান্ত মতেও মুক্তিতে সুখ বা দুঃখ নাই ইহাই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিতে সমস্ত ভয়েরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাও মুক্তির জন্য আগ্রহের দ্বিতীয় কারণ। উপনিষদের বহুস্থানেই ব্রহ্মকে ভয়শূন্য বলা হইয়াছে "যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ং,"—ভয় নিজেই যাহা হইতে ভয় পায়। সেই অভয় বস্তু লাভ করিতে পারিলে সমস্ত ভয় নিবৃত্তি হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? এই ভয়নিবৃত্তিও "এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" এইরূপ অভেদ জ্ঞান হইতেই হয়। ভেদ বুদ্ধি থাকিলে হয় না। শ্রুতি বলিতেছেন "য এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয় ভবতি",—যে ব্যক্তি আত্মাতে অল্পমাত্রও ভেদ দৃষ্টি করে তাহার ভয় হয় অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্মমরণাদি সংসার দুঃখ হইতে সে সর্ব্বদাই ভীত হয়। এই অদ্বৈত তত্ত্ব অতি দুরূহ, সহজে বোধগম্য হইবার নহে; তাই, অজ্ঞান-

তিমিরাচ্ছন্ন মানবকে সেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব উপদেশ দিবার জন্যই আর্য্য ঋষিগণ উপনিষদ্ প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া সৃষ্টি প্রকরণ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। কেন না, কোনও একটী বৃক্ষের ছায়া দেখিয়া, তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলে, যেমন ক্রমে তাহার মূল দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ছায়া জগৎ দেখিয়া তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে করিতে, ক্রমে সেই সর্ব্বকারণের কারণ ব্রহ্মরূপ মূলেরই অবগতি হইয়া থাকে। কার্য্য মাত্রেরই এক একটী মূল বা কারণ আছে। এই জগৎ ও কার্য্য; সুতরাং ইহারও কোনও না কোন মূল নিশ্চয়ই আছে। যত কিছু পদার্থ আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, সে সকলই এক অলৌকিক কার্য্যকারণ সূত্রে গ্রথিত। কোনও একটী পদার্থ দেখিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমতঃ তাহার স্থূল অবয়বকেই কারণ বলিয়া বোধ হয়। ঐ সমুদয় অবয়বও সূক্ষ্ম অবয়ব হইতে উৎপন্ন। ক্রমে ঐ সূক্ষ্ম অবয়ব ও সূক্ষ্মতর হইতে তাহাও সূক্ষ্মতম হইতে উৎপন্ন এইরূপে পরমাণু পর্য্যন্ত সেই সেই কার্য্যের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আরও একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, সে সমস্তই জ্ঞানের প্রতিভাস বা কল্পিত রূপ বলিয়া বোধ হইতে পারে। দূরবর্ত্তী মরুভূমিস্থিত সূর্য্য কিরণে যে জল দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক তাহা জল নয়, তাহা কেবল জ্ঞানমাত্র। শুক্তিরজতের অপূর্ব্ব চাক্‌চিক্য দর্শনে, স্বপ্ন পদার্থের অনুপম সৌন্দর্য্য অবলোকনে, কার না মন ধাবিত ও মুগ্ধ হয়! কিন্তু ঐ সকল পদার্থ জ্ঞানের কল্পিতরূপ ভিন্ন কিছুই নয়। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডও জ্ঞানের অপূর্ব্ব ক্রমবিকাশ মাত্র। "একমেবাদ্বিতীয়ং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন",— এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন, তাহা ছাড়া আর কোনও নানা পদার্থ নাই,— এই শ্রুতি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

অমুক বস্তু হইতে ইহা ভিন্ন এইরূপ বলিলে আমরা যে ভেদ পদার্থের অনুভব করি ঐ ভেদ ত্রিবিধ স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়। শাখা পল্লব প্রভৃতি হইতে বৃক্ষে যে ভেদ তাহাকে স্বগত; বৃক্ষ ভিন্ন প্রস্তরাদি হইতে বৃক্ষে যে ভেদ তাহাকে বিজাতীয়; এবং এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে যে ভেদ তাহাকে স্বজাতীয় ভেদ বলে। ব্রহ্মে উল্লিখিত তিনপ্রকার ভেদই নাই; ইহাই, এক, এব ও অদ্বিতীয় এই তিনটি পদদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। অবয়ব হইতে অবয়বীর ভেদকে স্বগত ভেদ বলে। ব্রহ্মের অবয়ব নাই সুতরাং তাঁহার স্বগত ভেদ

থাকা অসম্ভব। দ্বিতীয় ব্রহ্ম নাই বলিয়া স্বজাতীয় ভেদও নাই এবং ব্রহ্ম ভিন্ন সত্য পদার্থ নাই বলিয়া বিজাতীয় ভেদও তাহাতে নাই। এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অধ্যস্ত জগতের নিমিত্তও উপাদান কারণ। মাকড়শা হইতে যে সূত্র বহির্গত হয়, ঐ সূত্রের মাকড়শাই যেমন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, জগতের কারণ ব্রহ্মও সেইরূপ। মাকড়শার দেহ হইতেই সূত্র বাহির হয়, চৈতন্য কেবল তাহার সাহায্যকারী। যদি তাহার চৈতন্য ও দেহ এই দুইটিকে এক বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে মাকড়শা সূত্রের উপাদান কারণ হয় এবং তাহার আত্মাকে মাত্র মাকড়শা বলিলে সে নিমিত্ত কারণ হয়।

জগৎ মায়া হইতে উৎপন্ন। ঐ মায়াই ব্রহ্মের শরীর; ইহা হইতে উৎপন্ন জগতের ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ব্রহ্ম চৈতন্যজ্ঞানশক্তি ও মায়া ক্রিয়াশক্তি। এই দুই শক্তি মিলিত হইয়াই সমস্ত কার্য্য করে। একাকী কোনও কার্য্য করিতেপারে না। সাঙ্খ্যে বলিয়াছেন "পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ,"—পঙ্গু ও অন্ধ যেমন প্রত্যেকে পৃথক্ হইয়া কোনও স্থানে করিতে পারে না, কিন্তু অন্ধের স্কন্ধে পঙ্গু আরোহণ করিয়া পরস্পরের সাহায্যে উভয়েই গমন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ দুইজনে একত্র গমন মিলিত হইলে সৃষ্টি কবিতে সমর্থ হয়। সাঙ্খ্য মতে পুরুষ চেতন নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় এবং প্রকৃতি জড় ও ক্রিয়াশক্তি যুক্ত। সুতরাং স্বপ্রধান হইয়া কেহই কার্য্য করিতে সমর্থ নয়। সৃষ্টি কার্য্যে এই প্রকৃতিই প্রধান; কিন্তু পুরুষের নিকটে না থাকিয়া কার্য্য কবিতে পারে না বলিয়াই পুরুষেব সন্নিধান মাত্র তাহার প্রয়োজনীয়। তান্ত্রিকেরা এই প্রকৃতিকে আবও একটু উচ্চ স্তবে স্থান দিয়া পুরুষকেই জড় বলিয়াছেন। শক্তি হইতেই সমস্ত কার্য্য হয়, চৈতন্য তাহা হইতেই সমুদ্ভূত এইরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যকৃত আনন্দলহরী স্তবের প্রথমার্দ্ধ এই—"শিবঃ শক্ত্যাযুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং নচেদেবং দেবো নখলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।" শিব শক্তি যুক্ত হইলে সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন এবং শক্তি বিহীন হইলে তাঁহার নড়িবারও সামর্থ্য থাকে না। ইহার অন্য একটী অর্থ আছে; তাহাও ঐরূপ তাৎপর্য্যেরই প্রকাশক। শিব অর্থে ব্যঞ্জন বর্ণ ও শক্তি অর্থে স্বরবর্ণ। ব্যঞ্জন বর্ণ যেমন স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হয় না, সেইরূপ শক্তি হীন চৈতন্যও কিছু করা দূরে থাক নিজেও

প্রকাশিত হইতে পারেন না। এই জন্যই তন্ত্রের মহাকাল শব এবং শক্তি অনন্ত শক্তিধারিণী। শক্তি শব্দে ইকার বুঝায়, সেই ইকার যুক্ত থাকিলেই শিব এবং ইকার বিহীন হইলেই শিব ও শব হইয়া থাকেন; অর্থাৎ শিব ও নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়া কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন না, অথচ শিব শব্দে ইকার না থাকিলে শবই হইয়া থাকে।

পরাবিদ্যা-সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য।

"To investigate unexplained Laws of Nature and Powers latent in Man."

নিসর্গের অমীমাংসিত বা গুপ্ত নিয়ম সমূহের তথ্যানুসন্ধান এবং মানবের অস্ফুরিত গুহ্যশক্তিসমূহের সম্যক্‌সন্ধান করতঃ প্রকাশ করণ। আমরা সচরাচর চতুর্দ্দিকে কতই অলৌকিক ও অদ্ভুত ঘটনাবলি দেখিতে পাই যাহার মূলকারণ অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইতে পারি না, সেই সকল ঘটনার কারণ বিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা মীমাংসা করা এবং মানবে গুপ্ত ও অবিকাশিতভাবে কতই গুহ্যশক্তি বর্ত্তমান আছে তাহাও ঐরূপে অবগত হওয়াই এই তৃতীয় উদ্দেশ্য।

এই বিশাল বিশ্ব অনন্ত অত্যাশ্চর্য্য ও অতীব গুহ্য বিষয়ে পরিপূর্ণ—মানব আমরা এই বিশ্ববাসী—আমাদের মধ্যে অনেকানেক অতি সুবিজ্ঞ ব্যক্তিও কত দিকে কত ঘটনা দেখিয়া, চমকিত হইয়া, ক্ষুদ্র অবোধ বালকের অবস্থাপন্ন হইয়া পড়েন—এই সকলের কারণ কিছুই বুঝিতে সক্ষম হয়েন না। আমাদিগের চারিধারে কতই শক্তির খেলা হইতেছে যাহা আমাদের বোধের অগম্য। তড়িৎ, ঘূর্ণিবাত, অগ্ন্যুৎপাত বা অগ্ন্যুদ্গিরণ প্রভৃতির নানাবিধ বিকাশ সতত আমাদিগকে মুগ্ধ করে। যে ক্রিয়াসমূহের সন্নিপাতে গ্রাম, নগরী, দেশসমূহ সময়ে সময়ে ধ্বংস হইতেছে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহার মূলকারণ অন্বেষণে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। তাঁহারা প্রভূত যত্নসহকারে ঐ ক্রিয়া সমূহের তথ্যানুসন্ধানে তৎপর হইয়া স্থিরভাবে দেখিতেছেন ও ধীরে ধীরে এক একটীর যথা-

সাধ্য মীমাংসা করিতেছেন। যথার্থ বিজ্ঞানবিদের নিকট কোন পদার্থই হেয় নহে; তিনি গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া একটী ক্ষুদ্র পতঙ্গের পাখা ইত্যাদিব নির্ম্মাণ-কৌশল অবলোকন করেন এবং দৃশ্যের অগোচর প্রায় অণুসমূহের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কার্য্যেও লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট আমরা একটী সত্য শিক্ষা করিতেছি। এই জগৎ কতকগুলি নৈসর্গিক নিযমেব অধীন,—কোনই সামান্য বা মহৎ কার্য্য হঠাৎ আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু সকলই তাহাদের স্বস্ব অপবিবর্ত্তনীয়, দৃঢ়-সংস্থাপিত নিয়মানুসারে চালিত হইয়া আসিতেছে।

তথাপি পদার্থবিজ্ঞাবিৎ, রসায়নবিদ্যাবিৎ, জীববিজ্ঞানবিৎ এবং অন্যান্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এক্ষণে কেবল জগতের ও জীবলোকের প্রান্তসীমায় পর্য্যটন করিতেছেন। সময়ে সময়ে তাঁহাবা স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন যে যদিও তাঁহারা বহু অন্বেষণে কার্য্য (Effect) স্থির করিতেছেন, কিন্তু কারণ (Cause) অনুসন্ধানকালে মুগ্ধ হইয়া পড়েন,—নিম্নে, পশ্চাতে, অন্তরালে তাঁহাবা কোন গুহ্য শক্তির ক্রিয়া অনুভব কবিতেছেন মাত্র, কিন্তু তাহাব কোন মীমাংসা কবিতে পারেন না। পরাবিদ্যাসমিতি সংস্থাপনেব একতম উদ্দেশ্য এই গুহ্যকাবণ (Hidden cause) নির্ণয় ও যে স্থলে পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি নিস্তব্ধ, সেই সূক্ষ্ম স্থূলাতীত কারণ নির্ণয়ও প্রকাশকরণ।

এস্থলে অনেকে বলিতে পাবেন যে যাঁহারা বহুকাল বিজ্ঞানমার্গে সঞ্চরণ কবিয়া, উপযুক্ত শিক্ষাদিলাভ কবিয়া, যে কার্য্য সাধনে অসমর্থ হইয়াছেন, বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তি বা রমণীদ্বারা কিরূপে সেই গুরুতর কার্য্য সাধিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পাবে যে, অনুসন্ধানেব অপর একটী ভিন্ন উপায় অবলম্বনে উহা সম্পাদিত হওয়া সম্ভব। মনে করুন কোন এক অতিদূরদেশবর্ত্তী বৃহৎ লোক-সমাজ ইংরাজদিগের সভ্যতা, রীতি, নীতি ও শাসনপ্রণালী জানিতে ইচ্ছুক হইয়া জনৈক দূত ইংলণ্ড দেশে প্রেরণ করিলেন। ঐ দূত ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া ডোভার (Dover) নগবে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। পরে ঐ দেশের দক্ষিণ সীমায় Folkestone Eastbourne ও Portsmouth নগর সমূহের মধ্য দিয়া পদব্রজে গমন করতঃ Cornwalএ উপনীত হইলেন, পরে উত্তরাভিমুখ হইয়া চলিতে চলিতে

Cumberlandএ পঁহুছিলেন, ও তৎপরে বক্রগতিতে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া পূর্ব্বকূল ধরিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে পুনরায় Dover বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই দীর্ঘকালব্যাপী দূরভ্রমণে তিনি ইংলণ্ড ও ইংরাজজাতি সম্বন্ধে অনেক অবগত হইলেন, এবং স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া দেশীয় সকলকে অপরিচিত ইংরাজ সম্বন্ধে নানাবিধ আশ্চর্য্য ও মনোহর গল্প করিতে লাগিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে তিনি মুগ্ধ ও নিস্তব্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি ইংলণ্ড পর্য্যটন কালে দেখিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডবাসী সকলেই একজনকে তাঁহাদের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতেন ও তাঁহকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। সেই রাজা নিজের দেশের মধ্যস্থলে লণ্ডন নামক এক মহা নগরে থাকিতেন এবং প্রজাবর্গের কিছু অভাব তাঁহাকে জানাইলে তিনি সেই অভাব পূরণ করিতেন। কিন্তু উক্তরূপ সর্ব্বপ্রকার আবেদন পার্লিয়ামেণ্ট (Parliament) নামে মহাসভার সভ্যগণকর্ত্তৃক প্রথমে অনুমোদিত হইয়া, তৎপরে রাজসমীপে উপস্থিত হইত এবং দেশের প্রচলিত স্মৃতি-বিধিসমূহ উক্ত মহাসভাদ্বারাই নির্ব্বাচিত হইত—দেশের সকল প্রজাই সেই বিধিসমূহের অধীন—উক্ত বিধি বিরুদ্ধ কিছুই কাহারও করিবার ক্ষমতা ছিল না। আমাদের পরিব্রাজক মহাশয়ের এই সকল সম্বন্ধে অতি অস্পষ্টজ্ঞান জন্মিয়াছিল মাত্র—শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি কিছুই উত্তমরূপে জানিতে পারেন নাই। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার জনৈক ভ্রাতা ইংলণ্ড দেখিতে আসিয়া Dover বন্দর হইতে দেশের চারিপার্শ্বে ভ্রমণ করতঃ বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া, একেবারে সরলপথে রেলগাড়িতে আরোহণানন্তর লণ্ডন নগরে উপনীত হইলেন। তথায় যাইয়া তিনি অবিলম্বে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে আদ্যোপান্ত শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে সমস্ত শিখিয়া লইলেন—ক্রমশঃ অপর অপর লোকের সহিত পরিচয় হওয়াতে সাহিত্য ও অন্যান্য বিদ্যাসম্বন্ধে বিবিধ সংবাদ ও তথ্য গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সামান্য দৃষ্টান্তদ্বারা আপনারা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিতেছেন আমাদের বিভিন্ন উপায় বলিবার তাৎপর্য্য কি, এবং বিভিন্ন উপায় বা পথদ্বারা কিরূপে বিভিন্ন ফল লাভ করা যায়—যে ব্যক্তি সমস্ত বিষয়ের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার অনুসন্ধান কিরূপ অধিকতর ফলপ্রদ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তটী সর্ব্বাংশ সুন্দর না হইলেও ইহাদ্বারা আমাদের যথেষ্ট কাজ হইবে। সাধারণ পদার্থ-

বিজ্ঞানবিৎ ও তৎসদৃশ অপরাপর অনেক বৈজ্ঞানিকগণের অনুসন্ধানের সহিত গুপ্তবিদ্যার অধিকারিগণের অনুসন্ধানের প্রভেদ প্রদর্শন করাই এখানে আমার অভিপ্রায়। একের দৃষ্টি কেবলমাত্র স্থূল বহির্জগতে, অপরের দৃষ্টি স্থূল বাহ্যজগতে এবং সূক্ষ্ম অন্তর্জগতে—উভয়স্থানে। প্রথমোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ স্থূল, বহির্জগতের ঘটনা সমূহ যত্নসহকারে সন্দর্শন করিতেছেন ও তাহাদের কার্য্য (Effects) সমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া পরস্পর তুলনাদ্বারা তাহাদের পরস্পরের ঐক্য ও পার্থক্য নির্ণয় করিয়া—তাহাদের সমস্তই কার্য্য (Effect) লইয়া এবং তাহাদের পরিদৃশ্যমানস্থূল কারণ লইয়া চলিতেছেন। কোন এক বিশেষ পদার্থ অপর কোন এক বিশেষ পদার্থের সহিত সংযোগে কোন একটী বিশেষ ক্রিয়া উৎপাদন করে। এই সম্বন্ধে এই নিয়মের কোন স্থলে কোন ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই—সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঐ একই নিয়মে ঐ ক্রিয়া হইতে থাকিবে। এইরূপে স্থূলকার্য্য ও স্থূলকারণমাত্র তাঁহারেদ অবলম্বন। স্থূলাতীত সূক্ষ্ম কারণে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহাদের ক্ষমতা নাই। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী গুপ্তবিদ্যাবিৎ স্থূলাতীত কারণ অনুসন্ধানতৎপর হয়েন ও তাহা সূক্ষ্মরূপে উচ্চস্তর হইতে বুঝিতে চেষ্টা করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অনুসন্ধান যে যে স্থলে কিয়ৎ পরিমাণ অগ্রসর হইয়া আর হইতে পারিল না, পরাবিদ্যাবিৎ তাহার শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে সমর্থ। তিনি পুরাতন প্রাচ্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও উপযুক্ত গুরুর উপদেশদ্বারা অবগত আছেন যে একই মহাশক্তি সমস্ত কার্য্যেরই (Effects) মূল কারণ—সেই আদি শক্তিরই বিবিধ রূপান্তর মাত্র, বিবিধস্তরে বিবিধপ্রকারে বিভিন্ন কার্য্য উৎপাদন করিতেছে। এই স্থূল জগতে আমাদিগের চতুর্দ্দিকে প্রস্তরে, বৃক্ষে, জান্তব ও মানবরাজ্যে সেই একই পরমা শক্তির বিবিধরূপান্তরের ক্রিয়া হইতেছে। তাঁহার ভিতরেও সেই শক্তি খেলিতেছে এবং সেই শক্তিই তাঁহাকে নানাদিকে পরিচালিত করিতেছে। তিনি যতই এই স্থানে পরাবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, উহার চর্চ্চা করিতেছেন ও যত্নপূর্ব্বক কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ততই তিনি অনুভব করিতেছেন যে তাঁহাতে কোন এক বিশেষ শক্তির বিকাশ হইতেছে যাহা অপরে নাই বা অদ্যাপি স্ফূরিত হয় নাই। তিনি যে সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয় দেখিতেছেন অপরে সেই সকল দেখিতে পাইতেছে না, তিনি যাহা শ্রবণ করিতেছেন অপরে তাহা শ্রবণ

করিতেছে না। এইরূপে অপর এক বৃহত্তর জগতের অস্তিত্ব তিনি ক্রমে অনুভব করিতেছেন—যে জগতের অনুভূতি আমাদের স্থূল পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়ভূত নহে।

আমরা পুরাকালের শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা অবগত আছি যে, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশে বহুসংখ্যক সিদ্ধমানব, যোগী, ঋষি, অবলীলাক্রমে স্থূলাতীত ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহারদ্বারা স্বভাবের নিয়ম সমুদয় পর্য্যালোচনা করিতেন। অদ্য বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপে আলোচনা করিতেছেন সেইরূপ আলোচনা পূর্ব্বে যোগী ঋষিরাও করিতেন, কিন্তু সে সমস্ত আলোচনা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিতর হইতে হইত। আমাদের প্রত্যগাত্মা সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়রাজ্যে সন্নিবিষ্ট "গুহাহিত" সেই মহান্ বিভু—যাঁহা হইতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে সমস্ত অবস্থিতি করিতেছে, এবং পরে যাঁহাতে সমস্ত লয় হইবে। আমরা যতই তাঁহাকে আমাদের হৃদয়াকাশে অনুভব করিতে সক্ষম হইব, ততই বহির্জগতে তিনি কিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জগদ্ধারণ করিয়া আছেন, তাহা বুঝিতে সক্ষম হইব। এখানে আর একটী বক্তব্য আছে। অদ্য বিবিধ বিজ্ঞানবিৎ, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ সূক্ষ্ম ও শক্তিসম্পন্ন সুন্দর সুন্দর যন্ত্রাদির সাহায্যে স্থূলদৃষ্টির বহির্ভূত অতিসূক্ষ্ম পদার্থ সকল এবং নভোমণ্ডলে অতি দূরস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদি অবলোকন করতঃ তাঁহাদের অনুসন্ধান চালাইতেছেন। কিন্তু পুরাকালে বৈজ্ঞানিকগণ স্থূলাতীত কোন সূক্ষ্ম পদার্থ দর্শন বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ রহস্য জানিতে হইলে, প্রথমে গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের অন্তরস্থ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়গণের বিকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত উপদেশ গ্রহণ করত রীতিমত সাধনা অভ্যাস করিতেন। তৎপরে ক্রমশঃ তাহাদের ভিতরের গুহ্য শক্তি সকলের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইলে, তাঁহারা উক্তরূপ আবিষ্কারে ব্রতী হইতেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রাচ্য পুরাতন বৈজ্ঞানিকগণের কোন অতীব সূক্ষ্মস্থূলাতীত বস্তুদর্শন, শব্দ শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্যে বাহ্য কোন যন্ত্রাদির সাহায্যের প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা তাঁহাদের দেহরূপ যন্ত্রকে সুকৌশল দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও শুদ্ধ করতঃ তদ্দ্বারা সমস্ত ক্রিয়া সাধন করিতেন—তাঁহাদের সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারা সকলই সাধিত হইত। আপনাদের নিকট এ সমস্ত আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইবে না, কারণ আপনারা বিলক্ষণ

অবগত আছেন যে এই স্থূলদেহ আমাদের আত্মার সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলতম উপাধি-মাত্র—ইহার ভিতর ওতপ্রোতভাবে আরও ছয়টী ক্রমে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম উপাধি নিহিত আছে। আমরা কেবলমাত্র স্থূল জগতে বাস করিতেছি এরূপ কেহ মনে করিবেন না। আমরা একই কালে সপ্ত জগতে সপ্তকোষাবৃত হইয়া বাস করিতেছি—সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমাদের জ্ঞান সাধারণতঃ তিনটী কিম্বা চারিটী স্থানে মাত্র কার্য্যশীল দেখিতে পাওয়া যায়—অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষে মাত্র আপাততঃ জীবচৈতন্যের কার্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল-মাত্র অন্নময় কোষে স্থূল শরীরে আমরা সাধারণতঃ Self-conscious—(এসম্বন্ধে নিম্নে কিঞ্চিৎ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে)। আমাদের প্রত্যেকেরই দেহে সপ্ত স্তরেরই উপাদান বিদ্যমান আছে। এক একটী স্তরের অণুদ্বারা এক একটী স্বতন্ত্র কোষ নির্ম্মিত, সুতরাং সেই সপ্ত শরীরে সজ্ঞানে পৃথকরূপে বাস করিবার এবং যে যে স্তরের অণুদ্বারা উক্ত পৃথক্ পৃথক্ কোষগুলি নির্ম্মিত সেই সেই জগৎ গুলিকে বিশেষ রূপে জানিবার ক্ষমতাও আমাদিগের আছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই আপাততঃ সুপ্তভাবে অবস্থিত—যথাসময়ে জাগরিত নিশ্চিতই হইবে এবং আমরা সকলেই জ্ঞান পূর্ব্বক (being self-conscious in all those worlds) যদৃচ্ছাক্রমে সকল শরীরেই বিচরণ করিতে পারিব। সর্ব্বনিম্নস্থ এই স্থূল জগতের ঘটনাবলি—কার্য্যসমূহ—যতদূর পারা যায়, বুঝিতে চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, ইহা আমাদের সর্ব্বশেষের বাহিরাবরণ মাত্র। ইহা কেবল কার্য্য জগৎ এবং যতদিন ভিতরের গুহ্য শক্তি সমূহ বিকাশিত করিতে সম্যক্ সক্ষম না হই, ততদিন পর্য্যন্ত এই ঘটনাগুলির পূর্ণ মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইব, এবং যে আত্মা সদাই সমভাবে আমাদের ভিতরে ও বাহিরে বর্ত্তমান থাকিয়া সমগ্র জগৎকে পোষণ করিতেছেন, তাঁহার কার্য্য সকলও স্পষ্টতঃ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ স্থূল জগতের বিবিধ ঘটনাবলির কারণ অনুসন্ধানেপ্সু হইয়া অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়েন—স্থূল ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়ার অন্তঃসীমায় পদে পদে তাঁহাদের গতিরোধ হইয়া যায়। এই ইন্দ্রিয়গণের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য নানাবিধ সুকৌশল ও

অতি আশ্চর্য্য যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়া স্থূল চক্ষু কর্ণের ক্রিয়ার অসাধারণ প্রসার হইয়াছে। তথাপি এই সমস্ত অদ্ভুত সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্য সত্ত্বেও শীঘ্র বা অপেক্ষাকৃত সামান্যকাল বিলম্বে তাঁহারা প্রায় এমত স্থলে উপনীত হয়েন যে তথা হইতে আর পাদমপি অগ্রে গমন করিতে পারেন না। তাহার কারণ অপর কিছুই নহে—তাঁহাদের দেহযন্ত্রটীকে সম্যক পরিমার্জ্জিত করিয়া স্থূলাতীত সূক্ষ্ম জগতের অণুসকলের স্পন্দনে প্রতিস্পন্দিত করিবার উপযুক্ত করিতে পারেন নাই। অথবা স্থূল উপকরণাদিদ্বারা এরূপ ক্ষমতাশীল কোন যন্ত্র অদ্যাপি নির্ম্মিত হয় নাই যদ্দ্বারা উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পাবে। অনুসন্ধানেপ্সু তথায় নিস্তব্ধ, কারণ তিনি তথায় তাঁহার জগতের প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়াছেন। আমাদের প্রত্যেকের জগৎ আমাদের স্পন্দনক্ষমতাপেক্ষী—অর্থাৎ আমরা যে পরিমাণে সূক্ষ্ম স্পন্দন সমূহ অনুভব করিতে পারিব এবং তৎপ্রতিস্পন্দন সঞ্চালন করিতে সক্ষম হইব, সেই পরিমাণানুযায়ী আমাদের জগৎ প্রসারিত হইয়া থাকে। এই স্থূল জগতেই দেখুন, আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় শ্রবণেন্দ্রিয় পরিস্ফুট হইয়াছে, সুতরাং Jelly Fish প্রভৃতির ন্যায় যাহাদের ঐ ইন্দ্রিয়সমূহ অদ্যাপি স্ফুরিত হয় নাই তাদের অপেক্ষা আমাদের জগৎ কত বৃহত্তর। আমরা যে সকল সুখানুভব করিতেছি অপর অনেক জীব তাহাতে অদ্যাপি বঞ্চিত।

এক্ষণে অনেকে কহিতেছেন যে, এতাবত্তা-অজ্ঞাত এরূপ অনেক শক্তি মানবে নিহিত আছে যাহা বিকাশিত হইলে, নৈসর্গিক নিয়ম সমুদায় অন্য উপায়ে সুচারুরূপে অবগত হওয়া যায় এবং প্রচলিত প্রথা অনুসারে অনুসন্ধান অপেক্ষা উহা অধিকতর ফলপ্রদ হইবে। এই সকল গুপ্ত বা সুপ্ত শক্তিকে Psychic সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় শক্তি কহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গোঁসাই।

হৃদয়-আসনে এসহে।

(কীর্ত্তনের সুর)

শত শশিকর
সম তাপ হর
নদীয়া নাগর, এসহে।
হৃদি তমোহর
প্রভাত ভাস্কর
নব যোগিবর, এসহে॥
শ্রীমুখ কমল
বলে "হরিবল"
প্রেম প্রবাহ ঢালিয়া হে।
নয়ন যুগল
ভাসে অবিরল।
হৃদয় যেন গলিয়া হে॥
এস দয়াময়
পেতেছি হৃদয়
চরণ রাখিবে বলিয়া হে।
এস ভাবাবেশে
আত্মহারা বেশে
ভাব তরঙ্গ তুলিয়া হে॥
(এস) হেম কলেবর
গৌরাঙ্গ সুন্দর
নিত্যানন্দ সনে এসহে।
এস প্রাণধন
পতিত পাবন
হৃদয় আসনে এসহে॥

শ্রীবিজয় কেশব মিত্র, বি, এল,

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৩শ ভাগ } কার্ত্তিক, ১৩১৬ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

সাধনপথের পরীক্ষা।

বিস্তীর্ণ উপবন। সন্ধ্যা-সমাগমে ভগবান মরীচিমালী পশ্চিমগগনে ডুবু ডুবু হইয়াছেন। তিমির রাশি আস্তে আস্তে সেই বনরাজির বৃক্ষলতায় প্রবেশ লাভ করিতেছে। বিচিত্রবর্ণের বিহগকুলের কূজন নামিয়া আসিতেছে। কোকিলের কুহুধ্বনি এবং বুলবুলের মধুর তান আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। বিজন বন গভীর নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে। কোন কোন পাখী স্বীয় সঙ্গিনীর আগমন প্রতীক্ষায় কাতরকণ্ঠে কুলায়ে বসিয়া অস্ফুটধ্বনিতে মাঝে মাঝে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

সেই তাল-তমাল-সুশোভিত মনোহর বনরাজির সানুদেশে বহুদূরব্যাপী,

অসংখ্য শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ উন্নত মস্তকে অতীতের সাক্ষি-স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে; তাহার পাদদেশে পুণ্যপ্রেমের আধার ভগবান বুদ্ধদেব যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন। ধ্যান-স্তিমিত-লোচন, স্থির পদ্মাসন, জানুপ্রদেশে স্থাপিত হস্তদ্বয়, সমুন্নত শিরোগ্রীবা! মহাযোগীর মহাধ্যাননিমগ্ন শ্রীমূর্ত্তি যেন নির্ব্বাত-নিষ্কম্প প্রশান্ত মহাসাগরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। সেই বনবীথিকা মাঝে নিস্তব্ধতা এত গভীর ভাব ধারণ করিয়াছে যে, তাহাতে প্রবেশলাভ করা মাত্র মনে এক অপূর্ব্ব ভক্তি রসের সঞ্চার হয়, কি এক গুহ্য আকস্মিক মঙ্গলের প্রত্যাশায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া যায়। অধিক কি, যদি কোন অবিশ্বাসী নাস্তিকও ঘটনাক্রমে তাহার পার্শ্ব দিয়া গমন করে, তবে তাহার এমন সাধ্য নাই যে, প্রগাঢ় ভক্তিভরে সেই প্রেমাধার মহাযোগীর পদপ্রান্তে প্রণাম না করিয়া স্থির থাকিতে পারে! পবিত্রতা ও মধুরতার জ্বলন্ত অবতার! করুণার অনন্ত আকর! সেই সৌম্য মূর্ত্তি সন্দর্শনে অতি বড় পাষাণ-হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়, হিংস্র বন্য পশুগণ যুগপৎ ভয় ও ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া, তাঁহার পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করে।

তখন একটী কুরঙ্গী সেই মহাযোগীর পরিচ্ছদের ছায়ায় বসিয়া, তাহার নবজাত শাবককে স্তন্য পান করাইতেছিল। হঠাৎ কি যেন এক আকস্মিক শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। বহু দূরে অস্ফুট মর্ম্মর শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ক্রমশঃ সেই শব্দ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল! প্রথমতঃ অস্পষ্ট মনুষ্যকণ্ঠস্বর, তাহার পর দ্রুতবিক্ষিপ্ত পদশব্দ কর্ণগোচর হইল, পরিশেষে ক্ষুদ্র একটী সৈন্যদল দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বহুমূল্য রত্নরাজি-খচিত মনোহর বেশভূষাধারী রূপলাবণ্যময় এক সুন্দর যুবক সেই সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে আসিতেছিলেন।

তাহার সঙ্গীদিগকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিরস্ত করিয়া, তিনি একা আস্তে আস্তে ভগবান বুদ্ধদেবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিকটে আসিয়াই তিনি প্রগাঢ় ভক্তিভরে সেই শ্রীমূর্ত্তির পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক গাত্রোত্থান করিয়া, অবনতমস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া অনতিদূরে নীরবে, দণ্ডায়মান রহিলেন।

ভগবান বুদ্ধদেব পূর্ব্ববৎ নীরব নিস্তব্ধ। কিন্তু সেই যুবকের প্রতি তিনি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে করুণার আভা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইল।

যুবক মস্তক উন্নত করিয়া মৃদুভাবে বলিতে লাগিলেন। "ভগবন্! আমি ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিতেছি, অনুকম্পা বিতরণে এই অকিঞ্চনের অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি বহুদূর দেশ হইতে আসিয়াছি। আমি কঞ্চব রাজার পুত্র, আমার নাম জেতা। আমি আমার পিতার রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। আমি কৃপা ভিখারী হইয়া আজ ভবদীয় সকাশে উপস্থিত হইয়াছি। ভগবন্। ভবদীয় যশের গৌরবকাহিনী আমার কর্ণগোচর হওয়ার পর হইতে আমি বিশ্রামশান্তিসুখে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রতি আমি আসক্তিশূন্য হইয়াছি। বন্ধুবর্গের অকৃত্রিম ভালবাসায়, প্রিয়তমা প্রণয়িনীগণের সাদরসম্ভাষণে আমার মনে আর সুখ উপজাত হইতেছে না। আমি উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনলাভে অভিলাষী হইয়াছি। কৃপাপূর্ব্বক আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। আমি আপনার একান্ত ভক্ত, আমাকে নিরাশ করিবেন না।"

এই বলিয়া যুবক ভূমিতে পড়িয়া পুনঃ প্রণাম করিলেন।

ভগবান বুদ্ধদেব যুবরাজের প্রতি শান্ত মৃদু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু একটী কথাও বলিলেন না। তিনি প্রশান্তচিত্তে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

যুবরাজ পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—

"ভগবন্! কৃপা পূর্ব্বক আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি সঙ্গত বোধ করিতেছেন না? ভগবন্! আমি কি ভবদীয় শিষ্যরূপে গ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য নহি? আমি কি এই গৌরব লাভে বঞ্চিত হইব?

প্রভো! বাল্যকাল হইতে আমি অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া সৎপথে বিচরণ করিয়াছি, যথানিয়মে পুণ্যকার্য্য ও ধর্ম্মালোচনা করিয়াছি, সর্ব্বদাই শাস্ত্রোক্ত বিধিবিধান অনুসরণ করিয়াছি, দেশাচার এবং নীতিধর্ম্ম কখনই লঙ্ঘন করি নাই, সাধ্যানুসারে ধর্ম্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছি। ইহাতেও ভবদীয় কৃপাকর্ষণে অসমর্থ হইলাম? আপনার শিষ্য হওয়ার পক্ষে এই সকল কি প্রচুর নহে? আমি কি আপনার শিষ্য হইতে পারিব না?"

"না," এইমাত্র উত্তর হইল।

"ভগবন্! অবনত মস্তকে আমি আপনার আদেশ পালন করিব।

এই মহৎ অধিকার লাভ করিতে হইলে আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিতে আজ্ঞা হউক।”

“অনুসন্ধান কর, তবেই পাইবে।”

“পাইব! কি পাইব?” যুবরাজ উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। গৌতম বুদ্ধ এই কথার কোন উত্তর না দেওয়াতে যুবরাজ পুনবায় বলিতে লাগিলেন:—

“তাহাই হউক। আমি অনুসন্ধান করিব। বুঝিলাম, ইহাও এক পরীক্ষা। আপনি কি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন?”

“হাঁ, বুঝত তাহাই।”

“কখন পুনরায় এখানে আসিব?”

“বর্ষা ঋতুর পর সপ্তচন্দ্রের অবসানে পুনবায় এখানে আসিও।”

জেতা মস্তকাবনত করিলেন। আব কথাটীমাত্র ব্যয় না করিয়া, তিনি সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। এই অবস্থায় বহুক্ষণ থাকিয়া, পরে আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করিলেন এবং নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট সৈন্যদলও রজনীর অন্ধকারে মিশিয়া দৃষ্টি শক্তির বাহিরে গেল। তাহাদের পদধ্বনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যখন আর শ্রুতিগোচর হইল না, তখন সেই সরল-প্রাণা হরিণী উপাধান স্বরূপ বুদ্ধদেবের জানুর উপর মস্তক রাখিয়া, তাহার শাবকের পার্শ্বে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

ভগবান বুদ্ধদেব পুনরায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

*   *   *   *

বর্ষা ঋতুর পর সপ্তচন্দ্রের (সপ্ত পূর্ণচন্দ্রের) অবসান হইয়াছে। সেই বন-বীথিকার উপকণ্ঠে, সেই অশ্বত্থতরু-মূলে ভগবান বুদ্ধদেব যোগাসনে সমাসীন।

সন্ধ্যা সমাগমে সূর্য্যদেব অস্তমিত হওয়াতে পশ্চিম গগন রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। আসন্ন ঝঞ্ঝাবাতের দূত স্বরূপ বড বড কাল মেঘ আকাশের গায়ে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কষ্টকর উষ্ণবায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

সেই বিশাল বনভূমিতে কি এক অভূত পূর্ব্ব বিষাদের ছায়া পতিত হইল।

বন্য পশুগণ আশ্রয় লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত-চিত্তে দৌড়িয়া আসিয়া সেই মঙ্গলালয় মহাত্মার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তরুশাখায় পাখীকুল নীড়ে বসিয়া আকুল প্রাণে কলরব করিয়া উঠিল। উপস্থিত বিপদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, এক বলিষ্ঠ চিতাবাঘ লেজ নাড়িয়া তাঁহার পদ প্রান্তে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া খেলা করিতে লাগিল।

আকাশে ঘনঘটা আরম্ভ হইল। গভীর মেঘ গর্জ্জনে বনভূমি প্রকম্পিত হইল। প্রবল বেগে ঝঞ্ঝাবাত বহিতে লাগিল। অশনি-সম্পাতের উচ্চ নিনাদে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইল। তাহাতে কাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মুষল ধারায় জল পড়াতে বনভূমি প্লাবিত হইল। কিন্তু সেই অশ্বত্থ তরুটী কেবল অক্ষত রহিল। ঝড় তুফান অশনি প্রভৃতি কিছুই সেই বৃক্ষটিকে স্পর্শ মাত্র করিল না। একটীমাত্র জল ফোঁটাও ভগবান বুদ্ধদেবের দেহে পতিত হইল না।

ঝঞ্ঝাবাতের তুমুল নিনাদে চারিদিক মুখরিত। পশু পক্ষীর কোলাহল ধ্বনিতে বনভূমি কম্পিত। কিন্তু হইলে কি হয়, স্থিরপ্রতিজ্ঞের গতি কি এই সব নৈসর্গিক উৎপাতে রোধ করিতে পারে? সন্ধ্যা-সমাগমে যুবরাজ জেতা আসিয়া মহাত্মা বুদ্ধদেবের চরণে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া বলিতে লাগিলেন :--

"ভগবন্! আমি উৎকণ্ঠিত-চিত্তে এতদিন যে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা এখন উপস্থিত। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন পুনঃ আসিয়াছে, পুনঃ গিয়াছে। এইরূপ চক্রবৎ দিবারাত্রির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমি যে শুভক্ষণের আশায় অধীর ছিলাম, তাহা এখন উপস্থিত হইয়াছে। ভগবন্! আপনি আমাকে যে পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি বলিয়া আমি মনে করি। আমি এত কাল কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক উপবাসাদি দ্বারা সর্ব্ববিধ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছি। কামিনীকাঞ্চন-স্পৃহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষে ধ্যান নিরত থাকিয়া এতকাল সংযম অভ্যাস করিয়াছি। আপনি কি আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন না?"

"না!" জলদ-গম্ভীর স্বরে এই উত্তর হইল।

এই নির্ঘাত উত্তর যুবরাজের অন্তঃকরণে শেলসম বিদ্ধ হইল। তিনি মর্ম্ম যাতনায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পরিধেয় বস্নাঞ্চল চক্ষে দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, উষ্ণ অশ্রুপাত তাঁহার বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ শোকাভিভূত হইয়া তিনি বহুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তৎপরে বাষ্পাকুল লোচনে, গদ্‌গদ-বচনে মৃদুভাবে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

"মহাত্মন্! অনুকম্পা-পুরঃসর এ দাসে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক। শরণাগত ভৃত্যকে এরূপভাবে প্রত্যাখ্যান করার কারণ কি?"

এই প্রশ্নে প্রভুর যোগাসন টলিল। যুবরাজ জেতাকে দেখিয়া সেই যুবা চিতাবাঘ এতকাল ঘোঁ ঘোঁ করিতেছিল। ভগবান্ বুদ্ধদেব তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিলেন। বজ্রের নির্ঘোষ থামিয়া গিয়াছে, প্রবল ঝড়ের প্রকোপ প্রশমিত হইয়াছে, পবনদেব কর্ণকুহর দ্বারা সেই মহাত্মার বাক্যসুধা পান করিবার জন্যই যেন স্থিরভাব ধারণ করিয়াছেন।

"বৎস! বহির্জগতে যে সকল পরীক্ষা প্রচলিত আছে, লোক-সমাজ যাহাকে ধর্ম্মজীবনের পরীক্ষা বলিয়া সাধারণতঃ গ্রহণ করিয়া থাকে, তোমার জন্য সে পরীক্ষা নহে। স্ত্রী পুত্র, বিষয় বিভব, আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিবার জন্য তোমাকে বলি নাই, উপবাসাদি দ্বারা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতেও তোমাকে আদেশ করি নাই। আমি যে পরীক্ষার কথা বলিতেছি, বিন্দুমাত্র আপত্তি না করিয়া অম্লানবদনে নিজকে যে পরীক্ষায় ফেলিয়াছ, তাহা তোমার পূর্ব্ব কর্ম্মার্জ্জিত, তাহা তোমার স্বীয় স্বভাবজাত। সেই সকলের মধ্যে তুমি একটী পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে পার নাই। তুমি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে থাক, তুমি শিষ্য হওয়ার এখনও উপযুক্ত হও নাই"

এই কথায় যুবরাজ নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার গণ্ডস্থল রক্তিমাকার ধারণ করিল। তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন :—

"ভগবন্! যে সব পরীক্ষার কথা বলিলেন ও যাহাতে আমি উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই, তাহা কি কৃপাপূর্ব্বক স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে আমাকে বলিবেন? ইহা প্রকাশে যদিও আমার লজ্জা শতগুণে বৃদ্ধি হইতে পারে বটে, তথাপি জ্ঞানালোকলাভের জন্য আমি তাহা জানিতে ব্যস্ত হইয়াছি।

ভগবান বুদ্ধদেব বলিলেন, "যদি জানিতে চাও ত মনোযোগপূর্ব্বক শুন।"

"তোমার প্রথম পরীক্ষা ছিল মিথ্যাপবাদ সম্বন্ধে। বৎস! তুমি জান, তোমাদেরই রাজধানীতে, তোমার পিতার বিচারালয়ে তোমার বিরুদ্ধে এক অমূলক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত হইল। যে অপরাধ ভ্রমেও তোমার মনে স্থান পায় নাই, এমন অপরাধে তুমি অভিযুক্ত হইলে। কিন্তু ধীরভাবে সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া, এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন, কালে জনসাধারণ তাহা জানিতে পারিয়া গত সন্দেহ হওয়ার অপেক্ষা না করিয়া, অথবা তোমার উপর এই অভাবনীয় অপবাদ উঠাতে তুমি যে সমাজে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইয়াছ, তাহাতে তোমার অবশ্যদেয় পূর্ব্বঋণ পরিশোধ হইল বলিয়া মনে না করিয়া তুমি আত্মসমর্থনে ও স্বীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণে ব্যতিব্যস্ত হইলে। এমন কি, তাহার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য তুমি বদ্ধপরিকর হইলে। ইহাই ছিল তোমার প্রথম পরীক্ষা। কিন্তু ইহাতে তুমি উত্তীর্ণ হইতে পার নাই।"

এই কথা শুনিয়া জেতার মুখ ম্লান হইল।

"অভিযোগ সত্য হইলে অবাধে তাহা সহ্য করিতে পারিতাম। আমি নিশ্চয় জানিতাম, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

"সত্য বটে, যিনি সৎ ও ধার্ম্মিক, তাহার পক্ষে আত্মসমর্থন ও নির্দ্দোষিতা প্রমাণের প্রয়াস পাওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু যে দুর্গম সাধনমার্গে প্রবেশ লাভের প্রয়াসী, যে আমার শিষ্য হওয়ার অভিলাষী তাহাকে আত্মসমর্থনে বাক্যটিমাত্র ব্যয় না করিয়া ধৈর্য্যসহ অম্লান বদনে অবিচার অপবাদ সহ্য করিতে হইবে। যশো-গৌরব-প্রতিভাত উজ্জ্বল কিরীটই হউক বা নিন্দাবাদের ভারি বোঝাই হউক, তুল্যরূপে অব্যাকুল-চিত্তে তাহা বহন করিতে হইবে। স্তুতি নিন্দা, মানাপমানকে সমান জ্ঞান করিতে হইবে। এইরূপ করিলে সাধন পথের শিষ্যত্ব গ্রহণে অধিকার জন্মে।"

জেতা মস্তকাবনত করিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—

"আত্মানুরাগ তোমার দ্বিতীয় পরীক্ষার বিষয় ছিল। অত্যধিক ভালবাসা সম্বন্ধে স্বার্থপরতাই তোমার অন্তরায় ও পতনের কারণ হইল। তোমার বন্ধু যচসকে তুমি প্রাণের অধিক ভালবাসিতে। ঘটনাক্রমে তোমার পিতার রাজধানীতে একজন অভ্যাগত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার কোন এক

কার্য্যোদ্ধারের জন্য যচসের দরকার হইল। সে ক্রমশঃ যচসের মন অধিকার করিয়া বসিল। তোমার ও যচসের সুদৃঢ় প্রণয়বন্ধন ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হইল। ধীর ভাবে তুমি তাহা সহ্য না করিয়া, তোমার হৃদয়-নিহিত প্রণয়রূপ আগাছা সমূলে উৎপাটন না করিয়া, তুমি দারুণ ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠিলে। তোমার ভালবাসা যচসের সুখের জন্য না হইয়া তোমার স্বীয় সুখসাধন মানসে তাহাকে ভাল বাসিতে গিয়া ভল্লিকের প্রণয় পণ্ড করার জন্য তুমি প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলে। তোমার হৃদয়-কন্দর হইতে তাহার প্রতি অবিরত বিদ্বেষ স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

জেতা বলিলেন, "আমি বেশ জানি, যচসের প্রতি ভল্লিকের প্রণয় স্বার্থ প্রণোদিত। যচসকে সাবধান করা, ভল্লিকের সব জাল ছিন্ন করিয়া আমার বন্ধুকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করা কি আমার উচিত ছিল না ?"

"বৎস! তুমি কি মনে কর ভল্লিকের স্বার্থপ্রণোদিত ভালবাসা কালে নিঃস্বার্থ ও নির্ম্মলভাব ধারণ করিতে পারিত না ? সময়ে কি ইহা পবিত্র সরল প্রণয়ে পরিণত হইতে পারিত না ? প্রণয় ভালবাসার ভাব মনে পোষণ করিতে সৎ ও ধার্ম্মিক লোকের কোন বাধা না থাকিতে পারে, তিনি আত্মমর্য্যাদা, আত্মসম্মান বজায় রাখিতে যত্নপর হইতে পারেন, কিন্তু যিনি দুরারোহ সাধনমার্গে পদার্পণ করিয়া আমার শিষ্যত্ব-লাভে প্রয়াসী, তাঁহার মন হইতে অশেষ ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে, তাহার হৃদয় হইতে ঈর্ষা ও আত্মম্ভরিতার মূল নিঃশেষে উৎপাটন করিতে হইবে ; এমন কি, তাহার অনুরক্ত বন্ধু যদি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাহার অনিষ্ট সাধনে তৎপর হয়, তাহাও তাহাকে অকাতরে সহ্য করিতে হইবে।"

"যুবরাজ! তোমার পিতার অতুল বিভব, অপরিসীম ভোগবিলাসের সামগ্রী, প্রচুর যশোগৌরবের অভিমান ইত্যাদি কিছুই তোমাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু ইহাতে তোমার বিশেষ কিছু কৃতিত্ব বা পৌরুষ নাই। প্রকৃত ত্যাগস্বীকারের কালে, জলন্ত পরীক্ষার সময় তোমার সাহস ভগ্ন হইল! প্রকৃত ত্যাগের, প্রকৃত প্রেমের রুধিরসিক্ত বসন পরিধান করার সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন তুমি ভয়বিজড়িতভাবে পশ্চাতে সরিয়া পড়িলে। এই ত্যাগের বশে, এই প্রেমের টানে অযাচিতভাবে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়, এমন

কি, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হয়! কিন্তু কৈ বৎস! তুমি সেই পরীক্ষায় জয়লাভ করিতে পারিলে কৈ? নিয়তি বশে তোমার সমক্ষে সেই পরীক্ষা উপস্থিত হইল, কিন্তু ভাগ্যদোষে তুমি তাহাতে পরাভূত হইলে।"

জেতা এই কথা শুনিয়া নিতান্ত অপ্রতিভের ন্যায় মস্তক নত করিলেন এবং ইতি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিঃশব্দভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে মহাত্মার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"ভগবন্! স্পষ্ট করিয়া বলুন। তাহাতে আমি পুনঃ অপমান ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে পারি, কিন্তু ক্ষতি নাই, আপনি সত্বর আমার মনের ক্ষোভ দূর করুন। রজনীর গাঢ় অন্ধকার অপেক্ষা আমার হৃদয় গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। কৃপা বিতরণে তাহা দূর করুন।"

মহাত্মা বুদ্ধদেব বলিলেন :—

"রাজকুমার। প্রণয়ের অভাব বশতঃ তুমি তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার নাই। নন্দা নাম্নিকা তোমার জনৈক স্ত্রী একদা এক গুরুতর অপরাধ করায়, তুমি তাহাকে রাজবাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছ। তাহার তরুণ বয়স বা অপরিপক্ক বুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তোমার মনে একটু দয়ার সঞ্চারও হইল না।"

"ভগবন্! এ সম্বন্ধে আমি যাহা করিয়াছি, তাহার ব্যতিক্রম করা যায় কিরূপে? চঞ্চলস্বভাবা একটা কুলটা রমণীকে কাছে রাখিয়া আমার স্বীয় সম্ভ্রম ও রাজবাটীর মর্য্যাদা নষ্ট করা কি আমার পক্ষে সঙ্গত হইত? এই কু-কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে কি আমি সমাজের ও দেশের নিকট নীতিধর্ম্ম ভঙ্গ দোষে দোষী হইতাম না? আমার পবিত্র কুলে কি কলঙ্ক আরোপ হইত না? ইহাতে কি আমার আদর্শ পবিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষা হইত?"

"যুবরাজ! আমাকে কি একই কথার পুনরুক্তি করিতে হইবে? বিষয়ী লোক যদি সৎ এবং ধার্ম্মিক বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়, তবে তাহারা নিজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যত্নপরায়ণ হইতে পারে। সে বিচার করিতে পারে, দণ্ডবিধান করিতে পারে, তাহার নিকট হইতে দোষীকে তাড়াইয়া দিতে পারে। কিন্তু সাধু লোক বিচার করেন না, তিনি তত্ত্ব জানিয়া ক্ষমা করেন। ছিদ্রান্বেষণ, দোষানুসন্ধান করা

অপেক্ষা কোন কারণে দোষ মার্জ্জনা করার উপায় আছে কিনা তিনি তাহা খুঁজেন। সাগরবক্ষের বারিবিন্দু সমূহ অপেক্ষা তাহার প্রশান্ত ও কোমল হৃদয়ে তাহার ভ্রাতা ভগ্নী, আত্মীয়স্বজনের প্রতি দয়া ও করুণার কণা অনেক অধিক।"

"বৎস। পবিত্রতা ধর্ম্ম নহে। ইহা পাপ হইতে বিরত থাকা মাত্র। ইহাতে সাধুগণ বিশেষ কোন গুণপণা দেখেন না। পবিত্র জীবনও হয়ত সাধন পথে বাধা জন্মাইতে পারে, কারণ ইহা যদি দয়া ও করুণার রসে সিক্ত না হয়, তবে অনেক সময় ইহা লোককে অহঙ্কারী ও কঠিন-হৃদয় করিয়া তোলে। তখন ইহা পবিত্রতার ছায়ারূপে পর্য্যবসিত হয়। বৎস! ভ্রমণকালে কখনও কি সূর্য্যাস্তের সময় গিরিরাজ হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছ? ধবল তুষারাবৃত সেই গিরিশৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেন সমস্তই প্রবল হিমে জড়সড় ও মৃতবৎ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে যখন পশ্চিমগগণের সান্ধ্যরক্তিমাভা প্রতিফলিত হয়, তখন সেই অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে কি মন আনন্দরসে আপ্লুত না হইয়া থাকিতে পারে? পবিত্রতাও এইরূপ। অন্তরে ভালবাসা ও করুণা না থাকিলে পবিত্রতা নিতান্ত নীরস ও ঠাণ্ডা তুষার-বৎ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রেমমাখা পবিত্রতা অতি উপাদেয় দেবদুর্ল্লভ জিনিস। যে হৃদয়ে তাহা বিরাজিত, সেই হৃদয়ে অনন্ত পুণ্যস্রোতঃ নিত্য প্রবাহিত থাকে।"

জেতার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তদুত্তরে কথাটী মাত্র না কহিয়া তিনি ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপে থাকিয়া শেষে বাষ্পাকুল লোচনে, রুদ্ধকণ্ঠে, গদ্ গদ্ স্বরে বলিতে লাগিলেন :—

"ভগবন্! আমাকে আর একবার অনুগ্রহ না করিলে আপনার সম্মুখ হইতে যাইতে পারিতেছি না। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আর এক বার চেষ্টা করিয়া দেখিব এবং পুনরায় আসিয়া আপনার বিচারপ্রার্থী হইব। আমার কর্ত্তব্য আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি।"

"সম্মত আছি" বলিয়া ভগবান বুদ্ধদেব স্মিতমুখে ধরাবলুণ্ঠিত যুবকের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। আহা! তাঁহার সেই দৃষ্টিতে এত কোমলতা এবং হাস্যে এত মধুরতা ফুটিয়া উঠিল যে, তখন যেন তাহার ছটায় সমগ্র বনভূমি উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিল! তাহাতে বিহগকুল নিশাবসানে সুখময়ী উষার আগমন ভাবিয়া উল্লাসে কলরব ধ্বনিতে মাঙ্গলিক প্রভাত-সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিল।

দীপরাজি প্রজ্জ্বলিত হইল, তাহার আলোকে সেই ক্ষুদ্র সৈন্যদল পথ ধরিয়া আস্তে আস্তে চলিতে চলিতে রজনীর গভীর তিমিরে ডুবিয়া অদৃশ্য হইল। যুবরাজ মন্থর গতিতে তাহাদের অনুসরণ করিলেন। উপবনের প্রান্তদেশ ছাড়াইতে না ছাড়াইতেই রজনী প্রভাত হইল। রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিবার জন্য কবেণুকুল তাহাদের প্রভুর জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। ভগবান বুদ্ধদেব সেই প্রশান্ত বনবিথীকায়, সেই প্রকাণ্ড অশ্বত্থ তরুমূলে পুনরায় গম্ভীর ধ্যান নিমগ্ন হইলেন।

* * * * * *

কঞ্চম্ব দেশে প্রত্যাগমন করা মাত্র জেতা, তাহার পিতার গুরুতর রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ কঞ্চম্বরাজ হঠাৎ অসুস্থ হওয়াতে রাজকার্য্য পরিচালনে অসমর্থ হইলেন। বিবেক বুদ্ধির অধীনে থাকিয়া তিনি সুচারুরূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ন্যায়বান ও দয়াশীল শাসনকর্ত্তা বলিয়া যুবরাজের যশ অচিরকাল মধ্যেই দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে যচস্‌ ও তাহার বন্ধু ভল্লিককে অজস্রভাবে মান সম্ভ্রমে সম্মানিত করিলেন। তাহাদের বাসের জন্য পরস্পরে সংলগ্ন, মনোহর পুষ্পোদ্যান ও স্বচ্ছ বারিপূর্ণ সরোবর সমন্বিত রাজভবন তুল্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইটী বসতবাড়ী প্রদান করিলেন। তাহার পরিত্যক্ত স্ত্রী নন্দার অনুসন্ধান করাইয়া তাহাকে পুনঃ রাজ বাটীতে আনয়ন করিলেন। যুবরাজের এই কার্য্যে রাজধানীতে অত্যন্ত অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পাইল। তাঁহার পিতার পুরাতন কর্ম্মচারীগণ তাহাতে ঘোর প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার চরিত্রে নানা দোষারোপ করিতে লাগিল। সকলেই যুবরাজের কার্য্যকলাপে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং প্রতিকূল আলোচনা স্রোত ক্রমশঃই খর হইতে খরতর হইতে লাগিল। প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য তিনি ন্যায্য ও হিতকর সংস্কার সমূহের বিধান করিলেন এবং তৎসমুদয় প্রচারের জন্য মন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন। কিন্তু মন্ত্রিগণ তাহাতে নিতান্ত প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল এবং এই সকল সংস্কার কার্য্যে পরিণত করা দূরে থাকুক, স্বেচ্ছাচারী ও

যথেচ্ছচারী বলিয়া তাহারা ভিতরে ভিতরে যুবরাজের অযথা নিন্দা রটনা করিতে লাগিল।

এই সকল গুপ্ত আক্রমণে জেতা অচল অটল রহিলেন। সুগন্ধি গোলাপের সুঘ্রাণকে যেরূপ আগ্রহ সহ সমাদর করিয়া থাকেন ঠিক সেইরূপ, তাহার তীক্ষ্ণ কণ্টকের আঁচড়কেও তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু হইলে কি হয়? যুবরাজের বিরুদ্ধে অবিলম্বেই ভীষণ ষড়যন্ত্ররূপ এক প্রবল অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। যুবরাজের দুরাকাঙ্ক্ষী কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত হইবার প্রত্যাশায় গোপনে গোপনে যোগদান করিয়া সেই অগ্নিতে ইন্ধন প্রয়োগ ও ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে লাগিল, রাজ্য মধ্যে প্রজা-হিতকর নানা শুভানুষ্ঠানের প্রচলন করা সত্ত্বেও জেতা যথেচ্ছাচারী, এবং তাহার কার্য্যে রাজ্য অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ দুরভিসন্ধি মূলক এক মিথ্যা জনরব দেশময় রাষ্ট্র করা হইল। আরও প্রচার করা হইল যে, এক ভিক্ষু সন্ন্যাসীর নাম কঞ্চম্ব দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে,যুবরাজ মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় সেই সন্ন্যাসীর বশীভূত হইয়া অন্ধভাবে তাহার দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন। এবং আবহমান কাল হইতে দেশে যে সকল আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, আইন কানুন চলিয়া আসিতেছে, তাহা উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে এক নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিবার জন্য তাহার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে। একদা জেতা তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের জনরব শুনিতে পাইলেন। এমন কি, তিনি ইহাও শুনিলেন যে তাহার প্রাণ সংহারই এই ষড়যন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি তাহাতে ভীত বা উদ্বিগ্ন না হইয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে সতর্ক হইতে বলিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই বন্ধুগণের বিশেষ উদ্‌যোগে সেই ষড়যন্ত্র শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল,এবং শাণিত কৃপাণ হস্তে যুবরাজকে হত্যা করিতে উদ্যত সেই হত্যাকারী ধৃত হইল। তাহার নাম অরদ, সে জাতিতে ক্ষত্রিয়। এইরূপে হঠাৎ ধরা পড়ায় ভয়ে ও ক্রোধে তাহার মুখমণ্ডল বিশুষ্ক, এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। এই অবস্থায়ই তাহাকে যুবরাজের সাক্ষাতে আনয়ন করা হইল। অত্যধিক ধৈর্য্যসহকারে যুবরাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অরদ! কেন তুমি আমাকে বধ করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছ?"

"আমি আপনাকে রাজ্যের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করি, এইজন্য আপনাকে বধ

করিতে মনস্থ করিয়াছি। আপনি আমাদের পুরুষ-পরম্পরা-গত আচার পদ্ধতির বিরোধী। আপনি দেশের সুপ্রথা ও সুনিয়মগুলি উঠাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে এমন কতকগুলি সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিতে চান, যাহা রাজ্যের ও প্রজাবর্গের সমূহ অমঙ্গলকর এবং অনিষ্টজনক বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।"

"এই হত্যাকারী অন্ধবিশ্বাসী, তাই নিরপরাধী। এই ভাবিয়া জেতা তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি তাঁহার ভৃত্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, এই ব্যক্তি আমাকে বধ করিবার জন্য আক্রমণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য মহৎ। রক্ষিগণ! কে আছ, এখনই তাহার বন্ধন মুক্ত কর।"

রক্ষিগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন করিল।

"একা অরদকে আমার কাছে রাখিয়া তোমরা সকলে এখান হইতে প্রস্থান কর," জেতা দৃঢ়স্বরে এই আদেশ করাতে তাহার বন্ধু ও ভৃত্যবর্গ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও তথা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু যাইতে যাইতে তাহারা ক্ষণে ক্ষণে ফিরিয়া চাহিতে লাগিল। রাজপুত্রের অসম সাহস দেখিয়া তাহারা সন্ত্রাসিত হইল। অরদ যুবরাজের সম্মুখে যোড়করে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্পর্দ্ধা সহ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহার এই অবজ্ঞা সূচক ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জেতা নিকটে গিয়া বাহু যুগল তাহার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন, এবং তাহার চক্ষুর উপর স্বীয় স্থির দৃষ্টি অবস্থাপিত করিলেন। সেই দৃষ্টিতে কোনরূপ ঘৃণা, দম্ভ বা দয়ার ভাব প্রকাশ পাইল না। ইহা কেবল নিঃশব্দ ও সুদীর্ঘ প্রশ্ন ব্যঞ্জক স্থির দৃষ্টি। তাহার প্রভু কি বলেন নাই যে "সাধকের চক্ষু দোষান্বেষণে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। দোষানুসন্ধান করা অপেক্ষা দোষের হেতু কি, ও কোন কারণে তাহা মার্জ্জনা করা যায় কিনা তিনি তাহারই অনুসন্ধানে তৎপর হইবেন।" জেতা গতজীবনের কারণানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাহার মনে এক অভূতপূর্ব্ব নূতন ভাবের উদয় হইল।

তিনি যাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন, হঠাৎ যেন তাঁহার জ্যোতিঃ জেতার মনোমধ্যে প্রবেশ লাভ করিল, এবং তাঁহার আভায় জেতার হৃদয় দেশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি চর্ম্ম চক্ষু ব্যতীত অন্য চক্ষুদ্বারা দেখিতে

পাইয়া উপস্থিত বিষয়ের গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিলেন। তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এইরূপে রাজকুমার সেই যোদ্ধার গত জীবন অবলোকন করিলেন। তাহাদের উভয়ের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনী কিরূপে একই কর্ম্মসূত্রে গাঁথা, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। অবিদ্যা ও অজ্ঞতার বিবিধ কারণ এবং তৎসম্ভূত নানা দোষ সেই সেই জীবনে দেখিতে পাইলেন। বাসনার ফল স্বরূপ কিরূপে মনে নব নব ভোগেচ্ছার আবির্ভাব হইয়াছে ও তাহা হইতে কিরূপে বহুবিধ ক্লেশোৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও তিনি অবগত হইলেন। তৎপরে হঠাৎ যেন অরদের মূর্ত্তি তাহার হৃদয়-পট হইতে অন্তর্হিত হইল এবং জগতের মানবজাতি সমষ্টির চিত্র যেন তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। এই চিত্র কি ভয়াবহ! কি হৃদয় বিদারক! সমগ্র মানব-জাতির এ অপূর্ব্ব চিত্রে জেতা কি দেখিলেন? তিনি দেখিলেন, হতভাগ্য মানব জাতি অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া আছে। তাহারা অবিদ্যাবশে নানা কুকার্য্যে রত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অসংখ্য দুর্ব্বল নরনারী স্বীয় স্বীয় পাপের ফল স্বরূপ বিবিধ ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতেছে। এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিয়া জেতার মন দারুণ শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল।

তিনি এই আকস্মিক শোক-সন্তাপে উন্মত্ত প্রায় হইয়া গেলেন, এমন সময় হঠাৎ তাহার মনে করুণ রসের সঞ্চার হইল। পাপতাপগ্রস্ত সমগ্র মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিতে, তাহাদিগকে তাহার কম্পিত বক্ষে ধারণ করিতে তাহার প্রবল ইচ্ছা হইল। তাহাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে, নিজের পবিত্রতা প্রদানে তাহাদের পাপতাপ দূর করিতে, তাহাদিগকে পবিত্র করিতে, ভালবাসা ও প্রেম-দ্বারা তাহাদিগকে সতেজ ও সঞ্জীবিত করিতে, এমন কি, স্বীয় প্রাণপাত করিয়াও তাহাদিগকে উন্নতিমার্গ সোপানের একধাপ উপরে উঠাইবার জন্য রাজকুমারের মনে একাগ্র অভিলাষ জন্মিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাহার স্বাভাবিক সংজ্ঞা পুনরায় ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণ যেন তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, হঠাৎ জাগরিত হইলেন বলিয়া বোধ হইল। তাহার এই সব ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া সেই যোদ্ধা বিমূঢ়ের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে সম্বোধন করিয়া জেতা গদ্‌গদ্ স্বরে বলিতে লাগিলেন :—

"ভ্রাতঃ!—কারণ, আমি তোমাকে ভ্রাতা ভিন্ন আর কিছু জানি না,—আমি তোমাকে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করি, তাই বলি ভ্রাতঃ। এস, আমার বাহুযুগলের মধ্যে এস, আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে ধারণ করিব। তুমি আমার যশঃগৌরবের ভাগী হও, আমি তোমার কলঙ্কের ভাগী হইতেছি।"

রাজকুমার জেতা অরদের সঙ্গে একা অনেকক্ষণ নির্জ্জনে থাকায় প্রহরিগণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। তাহারা বিপদাশঙ্কা করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখে, অরদ রাজকুমারের স্কন্ধের উপর মস্তক রাখিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, আর রাজকুমারের মুখমণ্ডল হর্ষে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

* * * * *

দিবাকর কিরণ দীপ্ত সেই নির্জ্জন বন-বিথীকায় ভগবান বুদ্ধদেব গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁহার সেই প্রিয় অশ্বত্থ তরুর শীতল ছায়ায় স্থির পদ্মাসনে তিনি উপবিষ্ট আছেন, তিনি জানেন, কখনই যুবরাজের বাক্যের স্খলন হইবে না। তাই, তিনি সারারাত্রি তাহার অপেক্ষা করিয়াছেন। প্রথমতঃ উষার ক্ষীণালোক আস্তে আস্তে নয়ন পথে পতিত হইল। তৎপর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উদ্ভাসিত করিয়া প্রভাতের শুভাগমন হইল। নব সূর্য্যের রক্তিমাভ কিরণজাল সম্পাতে তরুশাখা, লতা পাতা সমুদায় অনুরঞ্জিত ও দশদিক আলোকিত হইল। প্রকৃতিদেবী যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করত মৃদু মধুর হাসিতে বিশ্বরাজ্যকে উল্লাসিত করিয়া তুলিলেন। মস্তকোপরি অশ্বত্থ তরুর শাখায় বসিয়া ছোট ছোট পাখীগণ মধুর স্বরে সেই মহাত্মার স্তুতি গান আরম্ভ করিল। সেই কোমলস্বভাবা স্নেহময়ী কুরঙ্গী তাহার ছোট শাবকটীকে বুদ্ধদেবের নিকটে লইয়া আসিল। তরক্ষু এবং যুবা চিতাবাঘ সকল সুহৃদজ্ঞানে নির্ভয়ে সেই মহা পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ঘ্রাণ লইতে এবং পদলেহন করিতে লাগিল। বস্তুতঃ প্রকৃতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই বন বিথীকার প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইল।

এমন সময় অদূরে অল্প অল্প পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ভগবান বুদ্ধদেব চক্ষু উন্মীলন করিলেন। দেখিলেন জেতা সম্মুখে দণ্ডায়মান! এবার তিনি সঙ্গীদিগকে ফেলিয়া একা ভিক্ষুকের বেশে আসিয়াছেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সম্মুখে প্রগাঢ় ভক্তিভরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হওয়ায়

তিনি যখন অতি কষ্টে ভূমি হইতে উত্থান করিলেন, তখন ভগবান বুদ্ধদেব আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য যুবরাজের দিকে হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া দয়াপূর্ণ অতি কোমল স্বরে বলিলেন :—

"শিষ্য জেতা, এস বৎস। তোমার মঙ্গল হউক।"

সদ্‌গুরুর সঙ্গে আদর্শশিষ্যের সম্মিলন।

আহা! কি অপূর্ব্ব শোভা। কি মনোহর দৃশ্য! দেখিলে চক্ষু শীতল হয়, মনপ্রাণ মোহিত হয়!

জেতা ভগবান বুদ্ধদেবের পদ প্রান্তে বসিয়া একাগ্রমনে তন্ময়ভাবে তাঁহার শ্রীমুখ নিসৃত পবিত্র শব্দ—সুধা পান করিতেছেন।

সুগন্ধবাহী প্রাভাতিক মলয় সমীরণ মৃদু মৃদু বহিয়া তাঁহাদের ভ্রূযুগল চুম্বন করিতেছে। এমন সুশীতল ও সুস্নিগ্ধ অনিল বুঝি আর কখনও প্রবাহিত হয় নাই। ডালে বসিয়া সুকণ্ঠি পাখিকুল মধুর স্বরে কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে! এমন মনোহর গান বুঝি আর তাহারা কখনও গায় নাই! সেই সুরম্য বনবিথীকায় সুগভীর শান্ত ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। হায়! এমন নিগূঢ়, শান্তি, এমন গুরু গম্ভীর নিস্তব্ধতা বুঝি আর কখনও সেই বনে অনুভূত হয় নাই। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ॥

শ্রীসুদর্শন দাস,

গুরুশিষ্য সংবাদ।

(জ্ঞান ও ভক্তি।)

শিষ্য। জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে আপনার নিকট কিছু শুনিয়াছি। আজ ভক্তি-সাধন সম্বন্ধে আমার ন্যায় নিম্নাধিকারীর উপযোগী যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ দিন। আচ্ছা, আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,--জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ—এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টি সোজা ?

গুরু। বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন প্রকৃতির উপর উহা নির্ভর করে, কাহারো পক্ষে জ্ঞানমার্গ সোজা, কাহারো বা ভক্তিমার্গ সোজা। তবে, মোটামুটি, অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিমার্গই সহজ। ইহা স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন। গীতার একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তিনি কখনো জ্ঞান ভাল, কখনো ভক্তি ভাল এরূপ বলাতে অর্জ্জুনের মনে সংশয় আসিল,--এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ। তাই দ্বাদশ অধ্যায়ের গোড়াতে তিনি ঐ প্রশ্নই করিয়াছেন। এতদুত্তরে ভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন, জ্ঞানমার্গে বড় কষ্ট, ভক্তিমার্গে বড় মজা। কারণ, "আমি স্বয়ং আমার ভক্তকে সংসার-সাগর হইতে অচিরে উদ্ধার করি।" ভক্ত শিরোমণি নারদও তাঁহার সূত্রে বলিয়াছেন "অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ"—অর্থাৎ অন্য পথ অপেক্ষা ভক্তিপথেই ভগবান্ সুলভ বা সহজলভ্য।

(জীবন্তবিশ্বাস।)

শিষ্য। আপনার কথাগুলি শুনিয়া আমার ভক্তিপিপাসা আরও বাড়িয়া উঠিল। অতএব কৃপা করিয়া ভক্তি কাহাকে বলে এবং কিরূপেই বা উহা লাভ করা যায় বলিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। বৎস, এ সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব ? তবে পূজ্যপাদ শাণ্ডিল্য, নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহারই একটু আভাস দিতেছি শ্রবণ কর। আচ্ছা, তোমার মাঠাকুরাণী আছেন এবং তিনি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন ইহা তুমি বিশ্বাস কর তো ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। কারণ নিত্যই তাঁহাকে দেখিতেছি এবং তাঁহার স্নেহ অনুভব করিতেছি।

গুরু। বেশ। তিনি দিনরাত কেবল তোমার চিন্তাতেই মগ্ন,—কিসে তুমি সুস্থ থাকিবে, কিসে তোমার ভাল হইবে, নিজের চিন্তা ভুলিয়া সর্ব্বদা উহাই ভাবেন, তোমার মলিন মুখ দেখিলে তাঁহার বুক ফাটিয়া যায়, তুমি শত অপরাধ করিয়াও যদি তাঁর নিকট গিয়া কাতরকণ্ঠে একবার "মা" বলিয়া ডাক, তিনি আর থাকিতে পারেন না, সব ভুলিয়া তাড়াতাড়ি তোমাকে কোলে তুলিয়া লন,—ইহাও বিশ্বাস কর তো?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ। এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে।

গুরু। ইহারই নাম জীবন্ত বিশ্বাস। আচ্ছা, ভগবানে এইরূপ বিশ্বাস আছে কি? এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একজন প্রভু আছেন যাঁহার অসীম স্নেহ, অপার করুণা, যিনি কীটানুকীট হইতে মনুপ্রজাপতি পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবকে স্বীয় বিশাল ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, তোমার গর্ভধারিণী অপেক্ষা কোটি গুণ স্নেহে নিয়ত পালন করিতেছেন, যিনি অসংখ্য প্রকারে নিয়ত তোমার কল্যাণবিধান করিতেছেন, যিনি অতি মহৎ হইলেও অতি তুচ্ছ জীবের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করেন, যিনি কিছুই প্রতিদান চান না, কেবল অজস্র কৃপা-বিতরণেই যাঁহার আনন্দ, যিনি তোমাদিগকে এতই ভালবাসেন যে তাঁহার অপ্রাকৃত সুখরাজ্য ছাড়িয়া কতই ক্লেশ স্বীকার করতঃ মাঝে মাঝে নররূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং প্রতিপদক্ষেপে ক্ষুদ্র বালুকাকণা পর্য্যন্ত ধন্য ও পবিত্র করিয়া যান,—জিজ্ঞাসা করি এরূপ ভগবানে তোমার জীবন্ত বিশ্বাস আছে কি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। ভগবানে বিশ্বাস আছে বৈ কি।

গুরু। আমার প্রশ্নটি তুমি বোধ হয় বুঝিতে পার নাই। এই তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া আছ, আমাকে দেখিতেছ, কথা শুনিতেছ, মর্ম্মের কথা জানাইতেছ। প্রতি পলকে, প্রতি নিশ্বাসে, তোমার বিশ্বাস আছে যে আমি আছি, কথা শুনিতেছি এবং তোমার মনোবেদনা দূর করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। ইহা যেরূপ বিশ্বাস কর, ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস ভগবানে আছে কি? এক অনন্ত প্রেমময়, অসীম শক্তিময় পুরুষ নিয়ত তোমার আশে পাশে ভিতরে বাহিরে

বিরাজমান, তিনি তোমার প্রত্যেক কথা শুনিতেছেন, প্রত্যেক কার্য্য দেখিতেছেন, তিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইলেও প্রত্যেক জীব কাতর হইয়া তাঁহাকে ডাকিলে, চক্ষুজল মুছাইতে তিনি আসিবেনই আসিবেন; তাঁহার এমনি করুণা যে তাঁহাকে যিনি যে ভাবে দেখিতে চান তিনি সেই ভাবেই দেখা দেন,—তিনি জ্ঞানীর নিকট অনন্ত ব্রহ্মরূপে, যোগীর নিকট সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মারূপে এবং ভক্তের নিকট দেহধারী মানবরূপে প্রকাশিত হন, ইহা ধ্রুব সত্য। যেমন বায়ু ঘরে বাহিরে আছে সেইরূপ তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা রহিয়াছেন—এরূপ জীবন্ত বিশ্বাস আছে কি?

শিষ্য। এতক্ষণ পরে আপনার কথা বুঝিয়াছি। আজ্ঞে না, ওরূপ বিশ্বাস নাই। কিরূপে থাকিবে? আপনাকে নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, সুতরাং আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কখনো তিলার্দ্ধ সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু ভগবানকে তো প্রত্যক্ষ করি নাই. কাজেই জীবন্ত বিশ্বাস নাই।

গুরু। ঠিক বলিয়াছ। প্রত্যক্ষের দ্বারাই জীবন্ত বিশ্বাস আইসে। আবার এই জীবন্ত বিশ্বাস না আসিলে প্রকৃত ভক্তির উদ্রেক হয় না।

শিষ্য। তবে আমাদের ভক্তিলাভের কোন উপায় নাই?

(বিশ্বাস লাভের উপায়।)

গুরু। বৎস, হতাশ হইও না। ভগবানে বিশ্বাস আনিবার তিনটি উপায় আছে,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু উহা বড়ই দুর্লভ ও বহু ভাগ্যের ফল! শাস্ত্রে আছে,

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্চ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বকর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

অর্থাৎ তাঁহাকে একবার দেখিলে একটি সম্পূর্ণ নূতন জীবনের সূত্রপাত হয়, সংশয়ের লেশমাত্র থাকে না, প্রাক্তন কর্ম্মগুলি সব খসিয়া যায়। কিন্তু সাধারণ মানব এরূপ ভাগ্যবান নহেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে অনুমান ও আপ্তবাক্যের আশ্রয় লইতে হয়। যেমন ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান, যেমন ঘট দেখিয়া কুম্ভকারের অনুমান, সেইরূপ এই জগৎ দেখিয়া ভগবানের অনুমান অপরিহার্য্য। যোগবিদ্যা (occult science) বা জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে মানব এই জগৎ

যতই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবেন, ততই ইহার সৃষ্টি কৌশল, রচনা পারিপাট্য, শৃঙ্খলা ও পদার্থমাত্রের সার্থকতা (adaptability) দেখিয়া বিমোহিত হইবেন, ততই এক অনন্ত শক্তি, অসীম জ্ঞান ও অপার করুণার পরিচয় পাইতে থাকিবেন। এইরূপ ক্রমশঃ সেই প্রেমময় পরম পুরুষের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস আসিবে।

শিষ্য। কিন্তু জড় বিজ্ঞানের অনুশীলনে আজকাল ঈশ্বরে বিশ্বাস না আসিয়া বরং ঠিক বিপরীতই ঘটিতেছে। ইহার কারণ কি?

গুরু। উহা অল্প বিদ্যার ফল। এ সম্বন্ধে তোমাদের পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেকন কি বলিয়া গিয়াছেন স্মরণ আছে তো? তিনি বলেন,—"অল্পবিদ্যা মানবকে নাস্তিকতা অভিমুখে লইয়া যায় বটে, কিন্তু গভীর জ্ঞান হইলে ভগবানে বিশ্বাস পুনঃরায় ফিরিয়া আইসে।" সে যাক্। এখন আপ্তবাক্যের বিষয় বলি শুন। যে সকল মুনি, ঋষি ও মহাপুরুষগণ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের বাক্যই আপ্তবাক্য। তাঁহারা বলেন, "আমরা ভগবানকে দেখিয়াছি, তিনি এইরূপ।" এই কথা শুনিয়া ভগবানের প্রতি অনেকের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। ইহা কিরূপ, জান? যে প্রদেশে তুমি যাইতে পারনা সেইস্থান হইতে যদি কেহ ফিরিয়া আসিয়া গল্প করেন, 'আমি এইরূপ অদ্ভুত বস্তু দেখিয়া আসিয়াছি" এবং যদি ঐ ব্যক্তির সামর্থ্য ও সত্যবাদিতার উপর তোমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে উক্ত গল্প খুব বিস্ময়জনক হইলেও যেমন তুমি বিশ্বাস কর, ইহাও ঠিক সেইরূপ।

শিষ্য। বুঝিলাম যে অনুমান এবং আপ্তবাক্যের দ্বারাও ভগবানে বিশ্বাস আসিতে পারে। কিন্তু এই বিশ্বাস কি প্রত্যক্ষলব্ধ বিশ্বাসের ন্যায় জীবন্ত হয়?

গুরু। তা হয় না বটে, কিন্তু তথাপি উহা এরূপ সুদৃঢ় হইতে পারে যে তদুপরি ভক্তিগৃহ অনায়াসে নির্ম্মাণ করা যায়।

(বিশ্বাস ও ভক্তির প্রভেদ।)

শিষ্য। আপনার কথা হইতে বোধ হইতেছে যে, বিশ্বাস ও ভক্তি দুইটি পৃথক্ জিনিষ। আমার ধারণা ছিল যে দুইই এক। ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কি বুঝাইয়া দিন।

গুরু। মনে কর তুমি কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর মুখে শুনিলে যে, এই গ্রামে একটি নূতন লোক আসিয়াছেন, অথবা তাঁহাকে একদিন পথে যাইতে স্বয়ং দেখিলে। ইহাতে ঐ ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার যে জ্ঞান জন্মিল উহাই বিশ্বাস। অতঃপর তুমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলে যে তিনি বড়ই উদার, সরল, মিষ্টভাষী, বদান্য, সত্যবাদী ও দয়ালু। বিপুল ধনশালী হইয়াও অতি দীন ও দরিদ্রভাবে থাকেন এবং গভীর রাত্রে গ্রামস্থ প্রত্যেক দরিদ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে বলেন, "আপনার কষ্টের কথা শুনিয়া আমি বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। যৎকিঞ্চিৎ আনিয়াছি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন। আপনারা সুখে থাকিলেই আমি সুখী হইব।" এই বলিয়া সহস্র স্বর্ণমুদ্রা তথায় রাখিয়া যান। ইহা শুনিয়া তৎপ্রতি তোমার যে একটা ভালবাসা আইসে, তাঁহার পদপ্রান্তে তোমার হৃদয় যে লুটাইতে চায়, তাঁহার পদধূলি পাইলে তুমি যে আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে কর,—সেই প্রেম, সেই ভালবাসাই ভক্তি।

শিষ্য। তাহা হইলে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সংশয়হীন জ্ঞান তাহাই বিশ্বাস এবং উহার গুণরাজি শ্রবণে তৎপ্রতি হৃদয়ের যে প্রবল আকর্ষণ তাহাই ভক্তি। ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়?

গুরু। হাঁ, ঠিক বলিয়াছ। তবেই বুঝিলে অগ্রে বিশ্বাস, পরে ভক্তি, বিশ্বাস ব্যতীত ভক্তি আসিতে পারে না। যদি কেহ বলিয়া যান এই স্থান খনন করিলে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পাইবে, তাহা হইলে সুবর্ণমুদ্রার গুণরাজি সম্যক্ জানিলেও যদি ঐ ব্যক্তির কথায় তোমার বিশ্বাস না হয়, তুমি কি খননে প্রবৃত্ত হও? আকাশ কুসুমের মনোহারিণী বর্ণনা শুনিয়া কোন্ ব্যক্তির চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়?

শিষ্য। বিশ্বাস না আসিলে ভক্তি হয় না বুঝিলাম। কিন্তু বিশ্বাস আসিলেই কি সর্ব্বত্র ভক্তি আইসে? বিশ্বাস আছে অথচ ভক্তি নাই এরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক মনে হয়। আপনি এইমাত্র যে ধনবান্ প্রেমিকের উল্লেখ করিলেন, তাঁহার পরদুঃখে অশ্রুমোচন ও নিঃস্বার্থ পরোপকার দেখিয়া কয়জন ব্যক্তির হৃদয় গলিয়া যায়? গৌরাঙ্গদেব পরের দুঃখে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, কিন্তু কয়জন তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিয়া পদপ্রান্তে লুটিয়াছিল? মহাপুরুষের কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে দেখিয়াও যাহাদের প্রেমভক্তি না আইসে তাহাদের উপায় কি?

(ভক্তিলাভের উপায়।)

গুরু। উপায় আছে। তাঁহাদিগকে ভক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কৃপালু মহাপুরুষগণ জীবহিতার্থে বাহ্যসাধন গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। নিগূঢ় সাধন প্রণালী কেবল গুরুমুখগম্য। আমি এই বাহ্য সাধন গুলির কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। নারদ ভক্তি সূত্রে ভক্তিলাভের এই কয়টি উপায় কথিত হইয়াছে—(১) কুসঙ্গ ত্যাগ (২) স্ত্রী, ধনী, ও নাস্তিকের আলোচনা ত্যাগ, (৩) অভিমান ও দম্ভ ত্যাগ (৪) শুষ্ক তর্ক ত্যাগ, (৫) কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, (কর্ম্মত্যাগ নহে) (৬) মহৎ কৃপা, (৭) নিরন্তর ভজন অর্থাৎ নিয়ত ভগবৎ কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, (৮) বিবিক্ত সেবা অর্থাৎ নির্জ্জনে বাস, (৯) বিষয় ত্যাগ, (১০) বিষয়াশক্তি ত্যাগ। শ্রীযুক্ত রামানুজ স্বামীও কয়েকটি উপায় বলিয়াছেন যথা,—(১) অখাদ্য ত্যাগ, (২) বিষয় চিন্তা ত্যাগ, (৩) ভগবৎ চিন্তা, (৪) জীবহিত, (৫) পবিত্রতা, সত্য, ক্ষমা ও দয়া, (৬) সাধুসঙ্গ, (৭) সৎগ্রন্থ পাঠ অর্থাৎ সাধু ও ভক্তদিগের চরিত্র শ্রবণ। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব চতুঃষষ্টি উপায় দিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি,—(১) গুরু-পাদাশ্রয়, (২) সাধুসঙ্গ, (৩) পরনিন্দা ত্যাগ, (৪) অন্যদেব ও অন্য শাস্ত্রের নিন্দা ত্যাগ, (৫) গ্রাম্যবার্ত্তা ত্যাগ, (৬) ভক্তি বিরোধী গ্রন্থের অনুশীলন ত্যাগ, (৭) নাম গুণাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, (৮) স্তব, জপ ও পূজাদি, (৯) প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রহণ না করা, (১০) ভগবৎ প্রীত্যর্থে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক চেষ্টা ইত্যাদি।

শিষ্য। আপনি অনেকগুলি উপায় একবারে বলিয়া গেলেন, সুতরাং আমার কোনটিরই ভাল ধারণা হইল না। মাদৃশ ব্যক্তির কি কি করা কর্ত্তব্য তাহা একটু বুঝাইয়া বলুন।

(কুসঙ্গ ও কুচিন্তা ত্যাগ।)

গুরু। দেখ, প্রেম একটি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, প্রত্যেক জীবের অন্তরে প্রেম আছে, থাকিতেই হইবে, কারণ স্বয়ং ভগবান প্রেম স্বরূপ এবং তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে বিরাজিত রহিয়াছেন। তবে এই নিত্যসিদ্ধ বস্তুর সর্ব্বত্র বিকাশ কেন হয় না ইহাই বিবেচ্য। একখণ্ড হীরক যদি এইস্থানে থাকে এবং

তাহার উপর ধূলি, মাটী, কুটা, পাতা পড়িয়া উহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, তাহা হইলে উহার স্বাভাবক জ্যোতির প্রকাশ হয় কি? ইহাও ঠিক সেইরূপ। ক্রোধ, লোভ, অভিমান, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি আবর্জ্জনা গুলো আমাদের প্রেম-হীরককে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কোন রূপে এ গুলোকে ঝাঁটাইয়া ফেলিতে পারিলেই প্রেমের জ্যোতিঃ বাহির হইবে। তাই প্রথমে আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে যেন, কাম ক্রোধ গুলো কোনরূপ ইন্ধন না পায়। এখন উক্ত মহাপুরুষগণের কথিত উপায় গুলিকে দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে;—১ম নিষেধ-সূচক, ২য় বিধিসূচক। নিষেধ-সূচক গুলি প্রথমে অবলম্বনীয়, তৎপরে বিধি সূচক।

শিষ্য। আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। দুই একটী উদাহরণ দিন।

গুরু। এই মনে কর যুবতী দেখিলে বা তাহার আলোচনা করিলে যদি কামের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে যদবধি না সকল রমণীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিতে পারিবে, তদবধি যুবতীকে দেখিবে না, বা তৎসম্বন্ধে গ্রন্থাদি পাঠ বা আলোচনা করিবে না? এইরূপ করিলে তোমার কাম প্রবৃত্তি ইন্ধন পাইবে না অর্থাৎ উদ্রেক হইবার অবসর পাইবে না। কিছুকাল এইরূপ অভ্যাস করিলে ঐ প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, অভিমানাদির পক্ষেও ঠিক এই নিয়ম। এইজন্যই দেখ উক্ত মহাপুরুষত্রয় কু-সঙ্গ ত্যাগ, পরনিন্দা ত্যাগ, স্ত্রী, ধনী ও নাস্তিকের সংসর্গ ও আলোচনা ত্যাগ এবং বিষয় চিন্তা ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। দুষ্ট ও বিষয়াসক্ত লোকের নিকট সর্ব্বদাই অশ্লীল কথা, পরনিন্দা, বা ধন, মান, ও ঐশ্বর্য্যাদির কথা শুনিতে পাইবে। এবং যতই উহা শুনিবে ততই তোমার মনে কাম, ক্রোধ, লোভ, গর্ব্ব ও রাগ দ্বেষাদি জাগরিত হইতে থাকিবে, সুতরাং তোমার প্রেম-হীরকও ততই ঢাকা পড়িবে। এই জন্যই ভক্তিকামীর পক্ষে সর্ব্বাগ্রে কুসঙ্গ, কুচিন্তা ও কু-কথা ত্যাগের ব্যবস্থা।

শিষ্য। তা বুঝিলাম বটে, কিন্তু মানুষ সব ত্যাগ করিয়া কিরূপে থাকিবে? একটা অবলম্বন তো চাই।

(সাধুসঙ্গ।)

গুরু। হাঁ ঠিক বলিয়াছ। মন কখনো শূন্য থাকিতে পারে না। একটি বস্তুকে তাড়াইলেই তাহার স্থানে আর কোন বস্তুকে বসাইতে হয়। এই জন্যই

বিধিসূচক উপদেশের ব্যবস্থা। মানুষ যদি কুসঙ্গ ছাড়ে, তবে কাহার সঙ্গ করিবে? একটা সঙ্গ তো চাই, কারণ সঙ্গ লিপ্সা তাহার স্বাভাবিক। এই হেতু বলিয়াছেন, সে সাধুসঙ্গ করিবে।

শিষ্য। সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে? কিরূপ ব্যক্তিকে সাধু বলা যায়?

গুরু। যাঁহারা সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, দয়ালু, পরহিত ব্রত প্রেমিক ও ভগবদ্ভক্ত, যাঁহারা বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া তৎস্থানে ভগবানকে স্থাপন করিয়াছেন, যাঁহারা জীবের গুণ ব্যতীত দোষ দেখিতে পান না, যাঁহাদের আত্ম পর ভেদ তিরোহিত হইয়াছে, সকলেই ভগবানের সন্তান বা ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তি, এই জ্ঞানে যিনি জগতের সেবায় জীবন অর্পণ করিয়াছেন, যাঁহার শত্রু নাই সকলেই মিত্র, যিনি সুখদুঃখযাপন ভগবানের দান বলিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট হন, যাঁহারা অপর কর্ত্তৃক প্রহৃত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াও স্নেহ ভরে তাহাকে কোলে লইয়া তাহার মঙ্গল চেষ্টা করেন, (যেমন নিতাই মাধাইকে রামানুজ পুরোহিতকে) তাঁহারাই সাধু।

শিষ্য। আপনি যে সকল গুণের উল্লেখ করিলেন, একাধারে উহা নিতান্ত দুর্লভ। বাস্তবিক ওরূপ মানুষ তো দেখা যায় না।

গুরু। এইজন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন সাধুসঙ্গ বড়ই দুর্লভ এবং বহুভাগ্যের ফল। কিন্তু বৎস, সকল গুণ গুলি পূর্ণমাত্রায় না থাকিলেও, যাঁহাতে ইহার কতকগুলি কিয়ৎ পরিমাণে আছে তিনিও সাধু।

শিষ্য। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিও যদি না পাওয়া যায়, তখন উপায় কি? কাহার সঙ্গ করিব?

(সৎ গ্রন্থ।)

গুরু। সৎ গ্রন্থের সহবাস করিবে। সাধু ও মহাপুরুষদিগের জীবনী পাঠ করিবে। ইহাতেও সাধুসঙ্গের আংশিক ফললাভ হইবে।

শিষ্য। আপনি কৃপা করিয়া যদি কতকগুলি মহাপুরুষের নাম করেন, আমি তাঁহাদের জীবনী সংগ্রহ করি।

গুরু। কত নাম করিব, তবে আপাততঃ যে গুলি মনে হইতেছে বলি। ব্যাস, বাল্মীকি, শুকদেব, ভৃগু, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, নারদ,

জনক, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাত্মার বৃত্তান্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থে পাইবে। এতদ্ভিন্ন মহম্মদ, যীশু খ্রীষ্ট, জন, পল প্রভৃতি খ্রীষ্টান সাধু, বুদ্ধদেব, অশোক, রামানুজ, রামানন্দ, নানক, কবীর, গৌরাঙ্গদেব, নিত্যানন্দ এবং তাঁহাদের অনুচরগণ (যথা হরিদাস, পুণ্ডরীক, রূপ, সনাতন প্রভৃতি) এবং আধুনিক মহাপুরুষগণ যথা—কেশব সেন, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, পরম হংসদেব, রাম প্রসাদ, কমলা কান্ত, সর্ব্ববিদ্যা ঠাকুর প্রভৃতির জীবন চরিত পাঠেও বিশেষ উপকার লাভ করিবে। ভক্তমাল গ্রন্থে আরও অনেক সাধু মহাত্মার বিবরণ পাইবে।

শিষ্য। আমার মনে একটি সংশয় উপস্থিত হইতেছে। যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন উহা নিবেদন করি।

গুরু। বৎস, আমার নিকট তোমার কোন সঙ্কোচের কারণ নাই। তুমি সরল ভাবে অতি অসঙ্গত প্রশ্ন করিলেও আমি সানন্দে উত্তর দিব।

(অপূর্ণ আদর্শ ও পূর্ণ আদর্শ)

শিষ্য। আপনি যে সকল ব্যক্তির নাম করিলেন ইঁহারা মহাপুরুষ হইলেও মানুষ ছিলেন সুতরাং অপূর্ণতা দোষে দুষ্ট। এই সকল অপূর্ণ মানবকে আদর্শ না করিয়া পূর্ণ ভগবানকে আদর্শ করা ভাল নয় কি ?

গুরু। যে বালক কখনও সমুদ্র বা পর্ব্বত দেখে নাই তাহাকে যদি বলা হয় "সমুদ্র একটা বিশ হাজার মাইল ব্যাপী প্রকাণ্ড জলাশয় যাহার চারি দিক ধূ ধূ করিতেছে আর হিমালয় পর্ব্বত (২৯০০০) উনত্রিশ হাজার ফুট উচ্চ এক প্রকাণ্ড পাথরের ঢিবি" তাহা হইলে সে সমুদ্র বা পর্ব্বতের কোন ধারণাই করিতে পারে না। সমুদ্র বুঝাইতে হইলে তাহাকে প্রথমে একটি পুষ্করিণী দেখাইতে হয়, তৎপরে কোন নদী, তৎপরে (যদি পাওয়া যায়) কোন হ্রদ দেখাইয়া বলিতে হয় "এই যে প্রকাণ্ড জলাশয় দেখিতেছ, সমুদ্র ইহা অপেক্ষা অনেক বড়।" এবং পর্ব্বতের উচ্চতা বুঝাইতে হইলে, তাহাকে কোন চারিতালা গৃহের ছাদে বা কলিকাতার মনুমেণ্টের উপর তুলিয়া বলিতে হয় এইরূপ কুড়িটা মনুমেণ্ট উপর উপর বসাইলে যত উচ্চ।" অনেক পর্ব্বত তত উচ্চ। সেইরূপ "ভগবান নিরাকার চৈতন্য, তাঁহার অনন্ত শক্তি, অনন্তপ্রেম ইচ্ছা

শুনিয়া ভগবানের কোন ধারণাই হয় না ; কারণ অসীমের ধারণা করা সীমা-বিশিষ্ট জীবের পক্ষে অসম্ভব। এই জন্যই মহাপুরুষদিগের আশ্রয় লইতে হয়, তাঁহাদের বিপুল শক্তি ও জগদ্ব্যাপী প্রেমের ধারণা প্রথমে করিতে হয়। তৎপরে ভাবিতে হয় "অহো, যে প্রেম রাজপুত্র বুদ্ধদেবকে সন্ন্যাসী করিয়াছিল। যে করুণা ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুকে ঘাতকদিগের কল্যাণের জন্য কাঁদাইয়াছিল, যে শক্তি দ্বারা গৌরাঙ্গদেব স্পর্শমাত্র কুষ্ঠীকে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত করিয়াছিলেন, সেই বিপুল প্রেম, অপার করুণা, অসামান্য শক্তি, শ্রীভগবানের কোটি অংশের এক অংশও নহে। যে শক্তির এক কণামাত্রের এতই প্রভাব, এতই জ্যোতিঃ, সেই পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ প্রেম, না জানি কতই গভীর, বিরাট, অনন্ত।" এইরূপে অপূর্ণ হইতে পূর্ণকে, শান্ত হইতে অনন্তকে ধরিবার চেষ্টা করিতে হয়।

শিষ্য। বুঝিয়াছি। আপনি কৃপা না করিলে আমার এই সংশয় থাকিয়া যাইত। তাহা হইলে সাধু মহাপুরুষগণ প্রত্যেকেই ভগবানের এক একটি অংশ ?

(সমস্তই ভগবানের অংশ)

গুরু। কেবল সাধু মহাত্মাগণ কেন, জীবমাত্রই ভগবানের অংশ (মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ)। তাই বা বলি কেন ? এই সমস্ত বিশ্বই ভগবানের অংশ, প্রত্যেক অণু পরমাণু পর্য্যন্ত ভগবানের অংশ। শ্রুতিতে আছে "তাঁহার এক পাদ (অংশ) এই বিশ্ব এবং তিন পাদ অমৃত।"

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই ভগবান্, ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই নাই, ইহা কিরূপে ধারণা করিব ?

গুরু। ধারণা করা বড়ই কঠিন। তবে দু'একটা উদাহরণ দ্বারা আমরা কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারি। শাস্ত্র বলেন মাকড়শা যেমন নিজের ভিতর হইতে উপাদান বাহির করিয়া নিজের শক্তিতে জাল রচনা করে, ভগবান সেইরূপ নিজের ভিতর হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ (matter and spirit) বাহির করিয়া এই বিশ্ব রচনা করেন। মনে কর যখন এই প্রকৃতি ও পুরুষ, জড় ও চৈতন্য, ভগবানে একীভূত বা মিলিত হইয়া আছে, তখন প্রলয়াবস্থা অর্থাৎ বিশ্বাদি কিছুই নাই, তিনিই একক। সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তিনি এই প্রকৃতি ও পুরুষ

প্রসব করেন। তখন প্রকৃতি দেহ বা উপাধিস্বরূপ হন এবং পুরুষ বা চৈতন্ত আত্মা স্বরূপে ঐ উপাধিতে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর প্রকৃতি অসংখ্য অংশে ও অসংখ্য প্রকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া স্থূল, সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র, বৃহৎ প্রভৃতি অসংখ্য উপাধি দান করে এবং পুরুষ এই অসংখ্য উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইলে অসংখ্য জীব ও অসংখ্য ভূত উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। একটি উপমা দ্বারা বুঝাইয়া দিন।

(সৌরজগতের উৎপত্তি।)

গুরু। আচ্ছা, তুমি তো বিজ্ঞান পড়িয়াছ? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সৌর জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা নির্ণয় করিয়াছেন মনে আছে তো? তাঁহারা বলেন, অনন্ত শূন্যে (যেখানে পূর্ব্বে কিছুই ছিল না) দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড তেজোমণ্ডল আবির্ভূত হয়। ইহার নাম নীহারিকা (Nebula)। ইহা যে কি বস্তু ঠিক জানা যায় না, তবে তাঁহারা অনুমান করেন যে এক অসীম তেজোরাশি সৌরজগতের যাবতীয় উপাদান বা মূল ভূতগুলিকে, সূক্ষ্মাকারে বাষ্পাকারে ধারণ করিয়া এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়। কালসহকারে এই ঘূর্ণায়মান প্রকাণ্ড বাষ্পরাশি তাপ বিকীরণ করতঃ যেমন সঙ্কুচিত হইতে থাকে, অমনি ইহা হইতে এক একটি অংশ বিচ্যুত হইয়া গ্রহরূপে পরিণত হয় এবং ইহা স্বয়ং সূর্য্যরূপে কেন্দ্র স্থানে অবস্থান করে। সৌরজগতের গ্রহ, উপগ্রহ, জল, বায়ু, প্রস্তর বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ এই নীহারিকা হইতে উৎপন্ন এবং প্রত্যেক পদার্থে নীহারিকার দুইটি অংশই বর্ত্তমান-বাষ্পীয় অংশটি জড় আবরণরূপে এবং তেজ অংশটি উহার শক্তি বা প্রাণরূপে অবস্থিত।

শিষ্য। একটু চিন্তা করিয়া দেখি। যেমন চিনি, লবণ, কেরোসিন তৈল ইত্যাদি। প্রত্যেক পদার্থে দুইটি অংশই আছে। চিনির পরমাণু সমষ্টিই চিনির জড়াংশ, এবং উহার মিষ্টতা, শুভ্রতা, কঠিনতাদি উহার শক্তি অংশ। কেরোসিন তৈলের পরমাণু সমষ্টিই জড়াংশ এবং তরলতা, দাহ্যতা, তীব্রগন্ধ প্রভৃতি শক্তি অংশ। বৃক্ষের পরমাণু সমষ্টিই জড়াংশ এবং বৃদ্ধিশীলতা, রসাকর্ষণ, ফলপুষ্প প্রসবপটুতা প্রভৃতি শক্তি-অংশ। ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়?

গুরু। হাঁ ঐরূপই বটে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিও। আবরণের (উপাধির) তারতম্যানুসারে, শক্তি বিকাশের তারতম্য ঘটিতেছে। একই শক্তি বা তেজ জলরূপে উপাধিতে তরলতা, প্রস্তর উপাধিতে কঠিনতা, মধু উপাধিতে মিষ্টতা, মরীচ উপাধিতে কটুতা, নিম্ব উপাধিতে তিক্ততা, ইথার উপাধিতে আলোক তাপ ও তড়িৎ এবং জীব-দেহরূপ উপাধিতে গমন পটুতা, পরিপাক শক্তি, রক্ত সঞ্চালন পটুতা প্রভৃতি উৎপাদন করিতেছে।

শিষ্য। এই পর্য্যন্ত ঠিক বুঝিলাম (১) নীহারিকার জড় অংশ ও শক্তি অংশ (matter and force) হইতে সৌরজগতের যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন (২) প্রত্যেক পদার্থে এই জড়াংশ ও শক্তি অংশ আছে, (৩) বিভিন্ন উপাধিতে এই শক্তি বিভিন্নরূপে বিকাশ পাইয়াছে।

গুরু। আর একটি বিষয় বুঝিয়াছ—নীহারিকা একটি শূন্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছে অর্থাৎ যে বস্তু হইতে উহার আবির্ভাব তাহা অজ্ঞাত। বেশ। এখন মনে কর এই অজ্ঞাত বস্তুটির নাম ভগবান (স্বরূপে অবস্থিত) এবং নীহারিকাটি তাঁহার প্রকট রূপ (manifestation)। ইহার নাম ঈশ্বর (Logos)। নীহারিকার জড়াংশের নাম প্রকৃতি এবং শক্ত্যাংশের নাম চৈতন্য। আচ্ছা, এখন বল দেখি এই উপমা হইতে বিশ্ব রহস্য কি বুঝিলে।

শিষ্য। (১) অপ্রকট ভগবান হইতে যুগপৎ দুইটি বস্তুর আবির্ভাব হয় প্রকৃতি ও পুরুষ। (২) এই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগই ভগবানের বিরাট প্রকট রূপ বা ঈশ্বর। (৩) এই প্রকৃতি পুরুষ হইতেই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন (৪) প্রত্যেক পদার্থেই প্রকৃতির ও পুরুষের অংশ আছে। (৫) প্রকৃতি নানারূপে বিকার প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি উৎপাদন করিয়াছে। (৬) পুরুষ বা চৈতন্য একরূপ হইলেও উপাধির বিভিন্নতা হেতু বিভিন্নরূপে প্রকাশ পান।

গুরু। বেশ। তোমার উৎসাহ ও মনোনিবেশ দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম আচ্ছা, সমস্তই ভগবান, ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নাই ইহা এখন বুঝিলে কি?

শিষ্য। আজ্ঞে, এই বুঝিলাম যে জগতের প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক জীব

প্রকৃতি পুরুষের অংশ, আর এই প্রকৃতি পুরুষ ভগবানের অংশ; অতএ। প্রত্যেক পদার্থই ভগবানের অংশ। মানব ভগবানের অংশ, মহাপুরুষ ও ভগবানের অংশ; অথচ ইঁহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইহার কারণ কি

(জীবের মধ্যে প্রভেদ কেন ?)

গুরু। ইহার উত্তর তুমি নিজেই তো এখন দিতে পার। এইমাত্র বলিলে উপাধির বিভিন্নতা হেতু পুরুষ বা আত্মা বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন। দেখ, পুরুষ বা সচ্চিদানন্দময় আত্মা প্রত্যেক পদার্থে বিরাজিত, তিনি প্রস্তরে আছেন, বৃক্ষে আছেন, পশু পক্ষীতে আছেন, মানুষে আছেন, মহাপুরুষে আছেন; কিন্তু এই উপাধি বা আধার গুলি একরূপ নহে। প্রস্তর সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল আধার, এইজন্য ইহাতে আত্মার বিকাশ খুব কম। বৃক্ষাদি আধার তদপেক্ষা বিশুদ্ধ বলিয়া, আত্মা ইহাতে সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত। সেইরূপ বৃক্ষ অপেক্ষা পশু পক্ষী পশুপক্ষী অপেক্ষা মানব এবং মানব অপেক্ষা মহাপুরুষের আধার অধিকতর সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ বলিয়া, আত্মা ও ক্রমশঃ অধিকতর অভিব্যক্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোনও জীবেই ইহার পূর্ণ বিকাশ নাই,—পূর্ণ বিকাশ একমাত্র ঈশ্বরে।

শিষ্য। দু'একটা উপমা দিয়া বিষয়টী আরও স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। দেখ, উপমার যেমন গুণ আছে, তেমনি দোষও আছে। ইহাদ্বারা মোটামুটি ধারণাটা অধিকতর স্পষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহার সকল অংশ প্রকৃত বিষয়ের সকল অংশের সহিত মিলে না। যাহা হউক, মনে কর আত্মা একটি মহা সমুদ্র। এই সচ্চিদানন্দ সাগরে যদি ঘটি, বাটি, হাঁড়ি, তোলো, মালসা, জালা, শিশি বোতল প্রভৃতি ডুবানো থাকে, তাহা হইলে যে বস্তুর যতটুকু আয়তন তাহা ততটুকুই জল ধারণ করিতে পারে। আবার মনে কর সূর্য্যের আলোকে তুমি খানিকটা গোময়, একখানি সাদা কাগজ, এক খানি থালা, এক খানি দর্পণ এবং এক খণ্ড হীরক পাশা পাশি রাখিলে। সূর্য্য তুল্যরূপে সকল বস্তুকেই আলোক দান করিতেছেন বটে, কিন্তু হীরক যতটা তেজ ধারণ করিবে, গোময় তাহা পারে কি ? সেইরূপ আত্মা সর্ব্বজীবে বিরাজ করিলেও যাঁহার যেরূপ উপাধি তিনি সেইরূপ ধারণ করিতে পারেন।

(ভগবান্ ও ঈশ্বর)

শিষ্য। আপনি 'ভগবান' ও 'ঈশ্বর' দুইটি শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। এই দুইই কি এক, না ইহাঁদেব মধ্যে প্রভেদ আছে !

গুরু। দুইই এক বটেন, কিন্তু অবস্থার কিছু প্রভেদ আছে। যখন তিনি স্বরূপাবস্থায় অসীম ও অপ্রকট থাকেন তখন তিনি 'ভগবান এবং সসীম ও প্রকট হইলে 'ঈশ্বর'। এই দুই অবস্থার কোনটিরই আমরা ধারণা করিতে পারিনা, তবে একটা উদাহরণ দ্বারা ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। মনে কর কোন একটি বস্তু বা বিষয় ধ্যান করিতে করিতে তুমি উহাতে এরূপ তন্ময় ও একাগ্র হইয়া গিয়াছ যে তোমার বাহ্য জ্ঞান আদৌ নাই, তোমার চক্ষু কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, কর্ণ কিছুই শুনিতে পাইতেছেনা মন ও কিছুই চিন্তা করিতেছে না, কেবল ঐ বস্তুটিতে তন্ময় হইয়া এক গভীর অনির্ব্বচনীয় আনন্দে নিমগ্ন আছে। তখন তোমার অবস্থা এরূপ যে হয়ত কত পিপীলিকা কামড়াইয়াছে, তুমি অনুভব কর নাই, কত লোকে উচ্চস্বরে ডাকিয়াছে তুমি শুনিতে পাও নাই, এক বিপুল আনন্দে ডুবিয়া আছ। ক্রমশঃ তোমার চৈতন্য হইল, তোমার মনে হইল। "আমি অমুক, আমার পিতা আছে, মাতা আছে, বন্ধু আছে", তোমার চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যাদি দেখিতে পাইলে এবং স্মরণ হইল তোমাকে এই এই কার্য্য তখন করিতে হইবে। এই ভাবিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে। তোমার এই প্রথমাবস্থাটি কতকটা ভগবানের স্বরূপাবস্থার তুল্য এবং দ্বিতীয় অবস্থা ঈশ্বরাবস্থার কতকটা অনুরূপ। স্বরূপাবস্থায় তিনি কেবল অসীম আনন্দে ডুবিয়া আছেন, ঈশ্বরাবস্থায় তিনি জাগ্রত হইয়া প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তখন তাঁহার স্মরণ হইতেছে 'আমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ এবং জগৎ ও জীব সৃষ্টি ও পালন করা আমার কার্য্য।" ইহা কিরূপ জান ? রাজা যখন অন্দরমহলে অন্তরঙ্গগণের সহিত বিহার করেন ও সেই আনন্দে ডুবিয়া থাকেন তখন তিনি ভগবান এবং যখন বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সিংহাসনে চড়িয়া প্রজাপালন কার্য্যে মন দেন তখন তিনি ঈশ্বর। যেমন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা আর দ্বারকা লীলা। বুঝিলে কি ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, কতকটা বুঝিয়াছি। চিন্তা করিয়া দেখি। যদি কোন সন্দেহ হয় পরে জিজ্ঞাসা করিব।

গুরু। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। এই যে রাজার উদাহরণ দিলাম, উহা সর্ব্বাংশে ভগবানের সহিত মিলে না। রাজা যখন অন্তঃপুরে থাকেন, তৎকালে তিনি বহির্ব্বাটীতে থাকেন না, এবং যৎকালে বহির্ব্বাটীতে থাকেন তখন অন্তঃপুরে বিরাজ করেন না। অর্থাৎ এককালে তিনি উভয় স্থানে বিরাজ করিতে পারেন না। কিন্তু ভগবৎ সম্বন্ধে এটি খাটে না। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে তিনি যুগপৎ অপ্রকট ও প্রকট থাকেন, এককালে দুই কার্য্যই করিতে পারেন। এটি স্মরণ রাখিও।

(জীবসৃষ্টি)

শিষ্য। তিনি ঈশ্বররূপে প্রকট হইয়া প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করিলেন অতঃপর সৃষ্টিকার্য্য কিরূপে সাধিত হইল সংক্ষেপে একটু আভাস দিন।

গুরু। পুরাণাদিতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাইবে। আমি দু'একটি মাত্র কথা বলিব। কুম্ভকার যেমন নিদ্রাভঙ্গের পর প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকা স্তূপ দেখিয়া ঐ মৃত্তিকাকে প্রথমে গঠনোপযোগী করিয়া লন, ঈশ্বর ও সেইরূপ প্রকৃতিকে নিজ শক্তি দ্বারা ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি এয়োবিংশতি তত্ত্বে পরিবর্ত্তিত করিয়া লন। ইহারই নাম ভূতসৃষ্টি বা ক্ষেত্র সৃষ্টি। অতঃপর তিনি দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়া যথাস্থানে স্থাপিত করেন এবং প্রত্যেকের উপর এক একটি সৃষ্টিকার্য্যের ভার দেন। ইহাই দেবসৃষ্টি। ইহার পর দেবগণ তাঁহার আদেশানুসারে অন্যান্য জীব সৃষ্টি করিতে থাকেন।

শিষ্য। তাহা হইলে, দেবগণ ও জীবসৃষ্টি করিতে সমর্থ?

গুরু। হাঁ। কিন্তু তাঁহারা কেবল উপাধি বা জড়াংশের সৃষ্টি করিতে পারেন, চিদংশ বা আত্মা স্বয়ং ঈশ্বরই দান করেন।

শিষ্য। এই চিদংশটি কিরূপ?

গুরু। ইহা ভগবান বা ঈশ্বরেরই স্বরূপ; তবে ঈশ্বর বৃহৎ, এটি ক্ষুদ্র। মনে কর ঈশ্বর একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড এবং এক একটি চিদংশ এক একটি

স্ফুলিঙ্গ। ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র, চিদংশ একটি ক্ষুদ্র জলকণা। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ, জীব বা চিদংশ সচ্চিদানন্দের একটি পরমাণু। যেমন একটি স্ফুলিঙ্গ যেরূপ আধারে স্থাপিত হয় তদনুরূপ শক্তি বিস্তার করে, একটি ক্ষুদ্র তৃণে ঈষৎ অগ্নি, কাষ্ঠে বৃহত্তর অগ্নি এবং সমগ্র অরণ্যে প্রচণ্ড দাবানল উৎপাদন করিয়া থাকে, ঠিক সেইরূপে এই চিদংশ যাদৃশ উপাধিতে বাস করেন, চৈতন্য বা সচ্চিদানন্দময়ত্ব ও তাদৃশ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। একথা সূর্য্যের ও সমুদ্রের উপমা দিয়া পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি।

(ভগবান বিশ্বরূপী)

শিষ্য। আপনার কৃপায় একটি নূতন আলোক আমার অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। এতদিন মনে করিতাম ঈশ্বর নিরাকার এবং একটি পৃথক্ রাজ্যে বাস করিয়া এই জগদাদি সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। আজ বুঝিলাম তিনি নিরাকার হইলেও সাকার, অরূপ হইয়াও বহুরূপী এবং তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিরাজমান।

গুরু। হাঁ বৎস। ভগবান্ স্বরূপতঃ কীদৃশ কেহই জানে না, জানিতে পারে না। কিন্তু এই সমগ্র বিশ্বই তাঁহার বিরাট মূর্ত্তি; এবং অণু পরমাণু হইতে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, জল, স্থল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি জগতের প্রত্যেক পদার্থই তাঁহার এক একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। তিনি এক ও অখণ্ডভাবে অসংখ্য মূর্ত্তিতে বিরাজিত। তিনিই সূর্য্যরূপে তাপালোক, চন্দ্ররূপে জ্যোৎস্না, পৃথিবীরূপে আশ্রয়, মেঘরূপে বৃষ্টি, বৃক্ষরূপে ফলছায়া, নদীরূপে বারি এবং পুষ্পরূপে সৌরভ দান করিতেছেন। তিনিই মিত্ররূপে আমাদের বিবিধ কল্যাণসাধন করিতেছেন, তিনিই আবার শত্রুরূপে আমাদিগকে দৃঢ়, সহিষ্ণু ও বলবান্ করিয়া তুলিতেছেন। ঐ যে জননী অনাহারে অনিদ্রায় পীড়িত সন্তানকে বুকে রাখিয়া জীবনের সকল সুখ হাস্যমুখে বিসর্জ্জন করিতেছেন, সেই অপার্থিব স্নেহ ও করুণা কোথা হইতে আসিল জান কি? উহা সেই অনন্ত করুণার একটী ক্ষুদ্র কণামাত্র। একটি পরমাণু। যে নিউটনের ধীশক্তি, নেপোলিয়নের সমর-পটুতা, প্লেটোর জ্ঞান, রাফেলের চিত্র বিদ্যা, সেক্সপীয়রের প্রতিভা জগৎকে বিমোহিত করিয়াছিল, উহা সেই অনন্তশক্তির ছায়ার ছায়া মাত্র। চন্দ্রমা

শোভিত নীল আকাশ, উত্তালতরঙ্গযুক্ত বিশাল বারিধি, অভ্রভেদী গিরিরাজি, শ্যামল শস্যপূর্ণ সুবিস্তৃত প্রান্তর, ফলপুষ্পনিষেবিত কলকণ্ঠ বিহঙ্গম-ঝঙ্কৃত বিচিত্র বনভূমি প্রভৃতি জগতে যত কিছু সৌন্দর্য্য আছে, তৎসমুদায়ই সেই পরম সুন্দরের একটিমাত্র কটাক্ষ।

শিষ্য। জগতের সমস্তই ভগবান্—ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তি, ইহা কি সকল দেশে সকল ধর্ম্মেই স্বীকৃত হইয়াছে?

গুরু। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য, সকল দেশেই সত্য। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই সত্যটি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু খুব উচ্চ অধিকারী ভিন্ন সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতেন না; নিম্নাধিকারীকে নিগূঢ় রহস্য বলা এবং শূকরের গলায় মুক্তামালা দেওয়া তুল্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে (সম্ভবতঃ উচ্চাধিকারীর সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া) ঋষিগণ এই সত্যটি যেরূপ স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, জগতের কুত্রাপি সেরূপ হয় নাই। ইহা প্রথমে বেদে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বজ্রগম্ভীর মন্ত্রে নির্ঘোষিত হয়। অতঃপর হিন্দুর দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, কাব্যে, পুরাণে ইতিহাসে, ধর্ম্মশাস্ত্রে, নীতিশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই ইহা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারাই হিন্দুর জপ, তপ, পূজা, হোম, অর্চ্চনা, রাজনীতি, সমাজনীতি এমন কি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পর্য্যন্ত অনুপ্রাণিত। "সব ব্রহ্ম" এই ভাবটি হিন্দুর এরূপ অস্থি মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, আজকাল কবি গান গাহিয়া বলেন,—

"যে দিন তোমার জগৎ নিরখি,
হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি,
সেদিন আমার নয়নে হয়েছে
তোমারি নয়নপাত।"

এবং ভক্ত স্তব পাঠ করেন,—

"প্রফুল্ল-পদ্মেষু সরোবরেষু
তারা-বিচিত্রেষু নভস্তলেষু।
মাতুঃ স্তনে কারুণিকস্য চিত্তে
গোবিন্দ পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্॥"

(ব্রহ্মজ্ঞানী)

শিষ্য। আপনি যে জপ, তপ, পূজা, অর্চ্চনার কথা উল্লেখ করিলেন, উহার প্রয়োজন কি? সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন করিলে তো শোক তাপ কিছুই থাকে না। ইহা কি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাব নহে?

গুরু। হাঁ বৎস! ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা বড়ই কঠিন, বহু সাধনার ফল, একান্ত ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ। ইহারই নাম ব্রহ্মসদ্ভাব বা ব্রহ্মজ্ঞান। জপ, তপ, পূজা, হোম, যোগ, যাগ প্রভৃতি যাবতীয় সাধন প্রণালীর চরম লক্ষ্যই এই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান কথার কথা নহে; জ্ঞানের ও ভক্তির চরম অবস্থাতে উপনীত না হইলে ইহা লাভ করা যায় না। যাঁহার শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, গমনে, উপবেশনে, আহারে, বিহারে, প্রতিকর্ম্মে, প্রতিচিন্তায়, প্রতিনিশ্বাস প্রশ্বাসে, "সমস্তই ভগবান্" এই বিশ্বাস, এই জ্ঞান অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকে, তাঁহারই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে। এরূপ হইলে, তাঁহার নিকট দ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ ভগবদ্‌ব্যতীত আর কিছুই প্রতিভাত হইবে না, সুতরাং ভাল মন্দ, শুচি অশুচি, সুন্দর কুৎসিত, উচ্চ নীচ, উত্তম অধম, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ ইত্যাদি দ্বন্দ্বজ্ঞান তাঁহার একেবারেই তিরোহিত হইয়া যাইবে, তাঁহার নিকট সমস্তই ভাল, সমস্তই সুন্দর, সমস্তই পবিত্র, কারণ ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তি। তাঁহার নিকট চন্দন বিষ্ঠা সমান, শত্রু মিত্র সমান, স্তুতি নিন্দা সমান, শীত গ্রীষ্ম সমান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমান, পাপ পুণ্য সমান। তাঁহার নিকট জাতিভেদ নাই, নাম রূপের ভেদ নাই, কারণ সকল বস্তুই এক,—ব্রহ্ম। তাঁহার আত্মপর নাই; স্থাবর জঙ্গম সমস্তই তাঁহার পরম আত্মীয়, বড়ই আদরের ধন, তাহাদের জন্য তিনি দেহপাত করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত; কারণ, যে ভগবান্ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু, তাহারাই সেই ভগবান্, ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তি। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী অগ্নিতে দগ্ধ হন না, অস্ত্রে ছিন্ন হন না, জলে মগ্ন হন না, পাষাণে চূর্ণ হন না, কারণ তাঁহার নিকট অগ্নি, অস্ত্র, জল বা পাষাণ নাই, সবই তাঁহার "প্রিয়তমের" মূর্ত্তি।

শিষ্য। আপনি যে বর্ণনা দিলেন, তাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থাটি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে, বোধ হয়, বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হয়।

(প্রহ্লাদ চরিত)

গুরু। ভাল, প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত শুনিয়াছ তো? একটু মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখ প্রহ্লাদ কি বস্তু ছিলেন। বিষ্ণুদ্বেষী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু রাজনীতি শিখিতে প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে পাঠাইলেন। কিন্তু রাজনীতি পড়িতে পড়িতে প্রাক্তনসাধনাবলে এবং ভগবৎকৃপায় বালক প্রহ্লাদের ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুরিত হইল। সুতরাং তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইলে, যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন; "বৎস, কি শিখিয়াছ তাহার সারাংশ বল।" প্রহ্লাদ বলিলেন, "যিনি অনাদি, অনন্ত, অক্ষয় ও সর্ব্ব কারণের কারণ, সেই বিষ্ণুকেই নমস্কার করি।" ইহাতেই দৈত্যরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া "রে দুর্ম্মতে তোর বিষ্ণু আবার কে?" ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, বালক স্থির ধীর ভাবে উত্তর করিলেন,—

"যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ।"

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই বিশ্ব এবং যিনিই এই বিশ্ব তিনিই বিষ্ণু। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ দুই-ই তিনি, অর্থাৎ সমস্তই তিনি, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহাই প্রহ্লাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস। এই বিশ্বাস পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকে আরও কত সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে শুন,—

দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষি-বৃক্ষ-সরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিব স্থিতম্ ॥
এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ বিষ্ণুর্যতোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্ ॥

ইহার অর্থ বুঝিলে তো? পশুপক্ষী মানবাদি সমস্তই অনন্ত বিষ্ণুর এক একটি রূপ বা মূর্ত্তি, কিন্তু ইহাদিগকে পৃথক্ বস্তু বলিয়া বোধ হয়, (অর্থাৎ বস্তুতঃ ইহারা পৃথক্ নহে)। যাঁহার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি স্থাবর, জঙ্গম সকল পদার্থকেই আত্মবৎ দর্শন করিবেন, কারণ এক বিষ্ণুই বিশ্বের যাবতীয় রূপ ধারণ করিয়া আছেন।

শিষ্য। কিন্তু ইহা যদি প্রহ্লাদের কেবল মুখের কথাই হয়? প্রতিকার্য্যে, প্রতি চিন্তায়, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে যে এই জ্ঞান অটুট ছিল, তাহার প্রমাণ কি?

গুরু। সেই প্রমাণই দিতেছি শ্রবণ কর। অতঃপর প্রহ্লাদ কিছুতে বিষ্ণুনাম ত্যাগ করিলেন না দেখিয়া, দৈত্যরাজ তাঁহাকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ঘাতকগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলে প্রহ্লাদ বলিলেন,—

"বিষ্ণুঃ শস্ত্রেষু যুষ্মাকং ময়ি চাসৌ যথা স্থিতঃ।
দৈতেয়াস্তেন সত্যেন মাক্রামন্ত্বায়ুধানি মে॥"

"তোমাদের অস্ত্রে বিষ্ণু, আমাতেও বিষ্ণু। ইহা সত্য। অতএব অস্ত্রের দ্বারা আমার কোন হানি হইবে না।" বাস্তবিকই প্রহ্লাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। অতঃপর হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে নানা উপায়ে মারিতে চেষ্টা করেন, অগ্নি, অভিচার, মত্ত হস্তী, পাষাণ প্রভৃতি সমস্তই একে একে ব্যর্থ হইল। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য কর। প্রথম—প্রহ্লাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস কিরূপ দৃঢ় ও অটল দেখ। "অগ্নি আমার প্রিয়তম বিষ্ণুর একটি মূর্ত্তি, অস্ত্র আর একটি মূর্ত্তি, মত্ত হস্তী দয়াল হরির তৃতীয় মূর্ত্তি। অতএব ইহাদের দ্বারা কখনই আমার অনিষ্ট হইবে না, হইতে পারে না।" এই বিশ্বাস এতই প্রবল যে তাঁহার কিছুমাত্র ভয় নাই, সংশয় নাই। তাঁহার শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, শত্রু মিত্র, বা আত্ম পর ভেদ জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, সবই তাঁহার মিত্র, সবই আপনার, কারণ সবই বিষ্ণু। যখন তাঁহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইল, তিনি বলিলেন,— 'পিতঃ আমার অঙ্গ দগ্ধ হওয়া দূরে থাক্, বোধ হইতেছে, যেন আমি পদ্ম পত্রে শয়ন করিয়া আছি।"

শিষ্য। তাঁহার শীতোষ্ণ সমজ্ঞান ছিল বুঝিলাম। কিন্তু শত্রু-মিত্র বা আত্ম-পর ভেদ ছিল না, তাহার প্রমাণ কি?

গুরু। বৎস, বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদ-চরিত্রটি ভাল করিয়া পাঠ করিও। সকল প্রমাণই পাইবে। আচ্ছা, আমি দু'একটি প্রমাণ দিতেছি। গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত প্রহ্লাদকে দৈত্যরাজ বলিলেন,—"তুমি রাজার ছেলে। রাজা হইয়া শত্রুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে? মিত্রের সহিতই বা কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য সংক্ষেপে বল।" প্রহ্লাদ বলিলেন, -"গুরু আমাকে সামদানাদি সব শিখাইয়াছেন বটে, কিন্তু পিতঃ, সাধ্যাভাবে সাধনের প্রয়োজন কি? যখন মিত্রামিত্র কিছুই নাই, তখন ঐ উপায় গুলির কি আবশ্যক?

ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ ॥

আপনাতে, আমাতে,—সর্ব্বত্রই তো বিষ্ণু দেখিতেছি। অতএব শত্রু মিত্র পৃথক্ কোথায়?" কুপিত রাজা পুরোহিতগণকে বলিলেন—"অন্য উপায়ে ইহাকে বিনাশ করিতে পারিলাম না। আপনারা মারণ মন্ত্র দ্বারা ইহার বধ-সাধন করুন।" পুরোহিতগণ মন্ত্রবলে ভীষণ কৃত্যার সৃষ্টি করিলেন। এই সকল কৃত্যা (পিশাচাদিবৎ প্রচণ্ড মারক শক্তি) প্রহ্লাদের কোন অনিষ্ট করিতে না পারিয়া পুরোহিত দিগেরই প্রাণসংহার করিতে লাগিল। কৃপাবতার প্রহ্লাদ আর থাকিতে পারিলেন না; তিনি কাঁদিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন—"প্রভো যদি আমি জীবনে কাহাকেও হিংসা না করিয়া থাকি, যদি আমি প্রাণিমাত্রকে আত্মতুল্য ভাল বাসিয়া থাকি, যদি আমার শত্রু-মিত্র জ্ঞান না থাকে তবে সেই পুণ্যবলে, হে করুণাময়, এই পুরোহিতগণকে জীবন দান করুন। ইঁহাদের দুঃখে আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। আমি যত কিছু পুণ্য করিয়াছি সব লইয়া ইঁহাদিগকে বাঁচাইয়া দিন এই প্রার্থনা।" ইহা বলিবামাত্র পুরোহিতগণ পুনর্জীবিত হইলেন।

শিষ্য। ধন্য প্রহ্লাদ! ধন্য ক্ষমা, ধন্য প্রেম!! ধন্য তোমার সর্ব্বভূতে বিষ্ণুদর্শন!!! আর বলিতে হইবে না; বুঝিয়াছি প্রহ্লাদ একটি সামান্য মানব ছিলেন না। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। প্রহ্লাদের দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইল না, অস্ত্রে ছিন্ন হইল না। ইহা কিরূপে বুঝিব? ভগবান্ যে সকল প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক নিয়ম (Physical and chemical lows) স্থাপন করিয়াছেন, ভক্তের অনুরোধে তাহা ভঙ্গ করেন না কি?

(প্রাকৃতিক নিয়ম।)

গুরু। ভগবানের রাজ্যে নিয়ম ভঙ্গ নাই, সমস্তই নিয়মাধীন। অগ্নিতে দেহ দগ্ধ হওয়া যেরূপ প্রকৃতির নিয়ম, দেহ দগ্ধ না হওয়াও প্রকৃতির আর এক নিয়ম। প্রথম নিয়মটি সকলে জানেন, দ্বিতীয়টি সকলে জানেন না, এইমাত্র প্রভেদ।

শিষ্য। আপনার কথা কিছুই বুঝিলাম না।

গুরু। বুঝিবে কিরূপে? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পড়িয়া তোমরা যে "সব জান্তা" হইয়াছ। দেখ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একটা মহৎ ভ্রম এই যে, অভিমান বশতঃ সে মনে করে, প্রকৃতির সকল নিয়মই সে অবগত হইয়াছে। প্রকৃতির যে সকল সূক্ষ্ম রাজ্য আছে তাহার নিয়ম জানা দূরে থাক্, তাহার অস্তিত্ব অবধি স্বীকার করে না, কেবল স্থূলতম রাজ্যের বহিবংশটি জানিয়া সে আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করে। অসভ্য মানব যৎকালে "বস্তুমাত্র ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়" ইহাই স্বভাবের একমাত্র নিয়ম বলিয়া জানিত, তৎকালে যদি স্পেন্‌সার সাহেব হঠাৎ একদিন তাহাদের মধ্যে গিয়া এক ব্যোমযানে চড়িয়া শূন্যমার্গে উঠিতেন, তাহা হইলে "স্বভাবের নিয়ম ভঙ্গ হইল" বলিয়া তাহারা হয়ত তোমার ন্যায় বিস্মিত হইত। কাচের বাক্সে কোন বস্তু থাকিলে আমরা উহা দেখিতে পাই, কারণ আলোক রেখা স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া গতায়াত করিতে পারে ইহাই স্বভাবের নিয়ম। এখন যদি এক ব্যক্তি "রনজেনরের" সাহায্যে তোমার আবদ্ধ লৌহসিন্দুকের যাবতীয় পদার্থ দেখিতে পায়, সে কি প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিল না? তোমার অজ্ঞাত আর একটি নিয়মের সাহায্যেই ঐরূপ করিতে সমর্থ হইল? চিঠি পত্রাদির দ্বারাই বিদেশীয় বন্ধুর সহিত আলাপ করা যায়, ইহাই স্বভাবের নিয়ম। ভাল, আজকাল আমেরিকায় যে শত শত ব্যক্তি কেবল ইচ্ছা শক্তি দ্বারা স্বীয় মনোভাব দূরস্থ বন্ধুর চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে, ইহাতে কি প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ হইতেছে? না একটি নূতন নিয়মের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে?

(Miracle বা অতি প্রাকৃত ঘটনা।)

শিষ্য। তাহা হইলে আপনি বলিতেছেন যে প্রকৃতির এরূপ অনেক নিয়ম আছে, যাহা সাধারণ মানবের অজ্ঞাত; এবং আমরা যাহাকে Miracle বা অতি-প্রাকৃত ঘটনা বলি, তাহা এই সকল নিয়মানুসারেই ঘটিয়া থাকে। যতদিন নিয়মগুলি অজ্ঞাত থাকে, ততদিন মানব ঐরূপ ঘটনাকে miracle বলে, কিন্তু নিয়মগুলি জানিতে পারিলে, আর তাহাকে miracle বলে না,—তাহা প্রাকৃতিক ঘটনা রূপে গণ্য হয়। ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়?

গুরু। হাঁ, তাই বটে।

শিষ্য। কৃপা করিয়া একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হয়।

গুরু। এক ব্যক্তি যদি একখণ্ড তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করে, আমরা উহাকে miacle বলি; কারণ, ঐ ধাতু গুলিকে আমরা এক একটি মূল পদার্থ (Elements) বলিয়া জানি। এখন মনে কর এক ব্যক্তি উহাদিগকে ইথারে পরিণত করিয়া দেখাইলেন যে উহারা যৌগক পদার্থ। তিনি দেখাইলেন যে ইথারের হয়ত ১০টি পরমাণু (atomes) মিলিত হইয়া যে অণু (molecule) উৎপাদিত হয়, উহাই স্বর্ণের একটি অণু এবং ৭টি পরমাণুর মিলনে উৎপন্ন যে অণু তাহাই তাম্রের এক একটি অণু এবং তাম্রকে ইথারে পরিণত করিয়া পরমাণু গুলিকে দশটি দশটি করিয়া সংযোজিত করা যাইতে পারে। আমরা যে মুহূর্ত্তে প্রকৃতির এই নিয়মটি বুঝিব এবং পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিব, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাম্রকে স্বর্ণ করা আমাদের নিকট miracle থাকিবে না। আর একটা উদাহরণ দিতেছি। মনে কর তুমি দেখিলে একব্যক্তি বিনাবলম্বনে শূন্যে উঠিতেছেন। তুমি নিশ্চয়ই উহাকে miracle বলিবে। কিন্তু তিনি যদি বুঝাইয়া বলেন—"দেখ, ইহাতে অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত কিছুই নাই। প্রাকৃতিক নিয়ম বশেই ইহা ঘটে। সকল বস্তুর উপর বায়ুর যেমন একটা চাপ আছে, তেমনি ইথারেরও খুব বেশী চাপ আছে। তোমাদের ব্যারোমিটার যন্ত্রে ভিতরকার বায়ু নিষ্কাসিত হইলে, পার্শ্বস্থ বায়ুর চাপে পারদ যেরূপ উপরে উঠে, আমার উপরকার ইথার কতকটা সরাইয়া ফেলিলেই আমার দেহও ঠিক সেইরূপে পার্শ্বস্থ ইথারের চাপে আকাশে উঠিতে থাকে।" ইহা বলিয়া দু'একটি পরীক্ষা দ্বারা তিনি যদি নিয়মটি তোমাকে বুঝাইয়া দেন, অথবা ইথার সরাইবার প্রণালী শিখাইয়া দেন, তাহা হইলে তখন তুমি আর এটাকে miracle বলিবে কি?

শিষ্য। তাহা হইলে, অণিমা লঘিমা প্রভৃতি যে অষ্ট সিদ্ধির কথা শাস্ত্রে দেখা যায় তাহা অসম্ভব নয়। সমস্তই প্রকৃতির নিয়মে ঘটিতে পারে এবং সে নিয়মগুলি হয়ত সাধারণের জানা নাই। আচ্ছা, অগ্নিতে দেহ দগ্ধ না হওয়া অথবা স্পর্শমাত্র কঠিন রোগ আরাম করা ইত্যাদি (যাহা প্রহ্লাদ, যীশুখৃষ্ট, গৌরাঙ্গ প্রভৃতির সম্বন্ধে শুনা যায়) বর্ত্তমান যুগে ঘটে কি?

গুরু। ঘটে বৈ কি। তুমি জগতের কয়টা সংবাদ রাখ? আর যে সকল

যোগী ও মহাপুরুষের এই সব শক্তি আছে, তাঁহারা অতি প্রচ্ছন্নভাবেই থাকেন, সাধারণের নিকট ঢাক বাজাইয়া বেড়ান্ না। সে যাহা হউক, মুনি ঋষি অপেক্ষা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের কথায় তোমাদের সমধিক আস্থা আছে বলিয়া তাঁহাদেরই দু'একটি পরীক্ষা বলিতেছি শুন। আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় মেস্‌মেরিজমের খুব ধুম পড়িয়াছে বোধ হয় জান। ডেলবিয়ফ্ (Delbœuf) একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি এবং এই কার্য্যে বেশ দক্ষ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি একটি স্ত্রীলোককে তন্দ্রাবিষ্ট (mesmerised) করিয়া বলিলেন—"তোমার দুইটি বাহুই আমি অগ্নিতে দগ্ধ করিব। দক্ষিণ বাহু পুড়িবে না, বাম হাত পুড়িবে।" এই বলিয়া এক রক্তবর্ণ লৌহ দ্বারা তাঁহার দুই হাত স্পর্শ করিলেন। স্ত্রীলোকটির বাম হাত পুড়িয়া ভয়ানক ফোস্কা ও ক্ষত হইল, ডাইন্ হাতে কিছুই হইল না। পরদিন তাঁহাকে আবার তন্দ্রাবিষ্ট করিয়া ডেলবিয়ফ্ বলিলেন—"তোমার যন্ত্রণা থাকিবে না, আহত স্থান শুকাইয়া যাইবে।" কি আশ্চর্য্য। সেই মুহূর্ত্ত হইতে জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইল এবং ঘাও শীঘ্র শুষ্ক হইয়া গেল। আর একদিন ডেলবিয়ফ দেখিলেন, এক বৃদ্ধ স্নায়ুশূলের বিষম যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেছেন; নানাবিধ ডাক্তারী চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই। তিনি বৃদ্ধের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"আপনার যন্ত্রণা কখনই থাকিবে না, এই মুহূর্ত্ত হইতেই উপশম হইবে।" যাহা বলিলেন তাহাই হইল। বৃদ্ধ জীবন পাইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। এই গুলিতো বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণের লিপিবদ্ধ ঘটনা! ডেলবিয়ফের একটি ইচ্ছায় যদি স্ত্রীলোকের অঙ্গ দগ্ধ না হয়, একটি কথায় যদি বৃদ্ধ কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হন, তাহা হইলে ভক্তশ্রেষ্ঠ যোগিশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের পক্ষে কি তাহা অসম্ভব? না ঈশ্বরাবিষ্ট যীশু বা গৌরাঙ্গ ঐরূপ করিতে অসমর্থ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৩শভাগ } অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

হর-গৌরী

[শঙ্কর-কৃত]

[শুক্লবেলাবলি—কাওয়ালি]

১

আধ বিলেপন কস্তুরী চন্দন, ভস্ম-বিমণ্ডিত আধা।
এক শ্রবণমূল কুন্তল দোদুল, উহ ফণীকুন্তল বাঁধা ॥
জয় জয় শঙ্করি! শম্ভো!

২

আধ উরস পর মন্দার ফুল থর, আধই কর্পর দোলা।
আধ অঙ্গ পর স্বর্গীয় অম্বর, আধ দিগম্বর ভোলা ॥
জয় জয় শঙ্করি! শম্ভো!

৩

একহি কন কন নূপুর কঙ্কণ, ভুজঙ্গ-মঞ্জীর আরা।
আধ অঙ্গ মরি! সুবর্ণ-মাধুরী! আধই ফণাঙ্গভারা॥
জয় জয় শঙ্করি! শম্ভো!

৪

এক নয়ন জনু লোলনালোৎপল, উহ ফুটপঙ্কজলালা।
তৃতীয় নয়ন দুঁহু মিশ্রণে এক ভঁগি ঢারত জলজ্বল জ্বালা॥
জয় জয় শঙ্করি! শম্ভো!

৫

একহি জগমাহ বিপদশরণালয়, ধ্বংস বিতাণ্ডব আরা।
একহি দরশন মদন-স্বজন, উহ ফুল-ধনু-নাশ-ব্যাপারা॥
জয় জয় শঙ্করি! শম্ভো!

৬

আধ কলেবর চম্পক-গৌরব, আধই কর্পূর-চূর্ণ।
আধ শিরোরুহ কবরী-বিমণ্ডিত, আধ জটাপরিপূর্ণ॥
জয় জয় শঙ্করি! শম্ভো!

৭

একর কুন্তল জলধর শ্যামল, ভস্মজটাধর আরে।
জগজ্জননী এক, ভুবন-জনক উহ, প্রকৃতি পুরুষ মূলাধারে॥
জয় জয় শঙ্করি! শম্ভো!

৮

এহি সদাশিব পঞ্চক ভূষণ, উহ সদা শিবা-পরিভূষা।
এহি শবান্বিতা প্রকৃতি শকতিময়ী, উহ শিবা-মিলন-বিলাসা॥
জয় জয় শঙ্করি! শম্ভো!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

চিত্রগুপ্ত।

গীত।

ভৈরবী—একতালা।

(চরম সময় হও মা উদয়...ইত্যাদি সুরের মত)।

গুপ্তভাবে চিত্র হই, মন অন্তরালে।
মহাকাশে রূপ ধরি, চিত্রগুপ্ত বোলে॥
কর্ম্মচিত্র দ্যাখে নর, সূক্ষ্মদৃষ্টি হলে।
সজীব সাকার হয়, কর্ম্মশক্তি বলে॥
চিত্র সূত্র বহে যেন, নিজ কর্ম্মজালে।
কর্ম্মচিত্র দ্যাখে সে যে, এজগত ভুলে॥
জীবগণ বুঝে শেষে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
মৃত্যুকালে ভোগে সে যে, তার কর্ম্মফলে॥

চাঃ মুঃ।

যাহা গুপ্তভাবে চিত্রিত হইয়া যায় তাহাই চিত্রগুপ্ত। এই চিত্রগুপ্ত আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মই অতি গুপ্তভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেছে। কোথায় রাখিতেছে তাহাই আমরা সন্ধান করিব। আমরা যাত্রা, থিয়েটার, কথকের কথা ও নানা রূপ গল্পাদি শুনিয়া থাকি এবং এই চিত্রগুপ্তের বিষয় একটা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি যে তাহার একটি বৃহদাকারের খাতা এবং দপ্তর আছে, যাহাতে সে জগতের যাবতীয় জীবেরই প্রতি দিনকৃত কর্ম্ম গুলির হিসাব রাখিতেছে। অনেকের বিশ্বাস যে তিনি একটি মনুষ্যদেহধারী, পক্ককেশধারী বৃদ্ধ, চাপকান পরিধান করিয়া নাসিকাগ্রে একটি চসমা ধারণ পূর্ব্বক এবং কর্ণে একটি কলম স্থাপনপূর্ব্বক সম্মুখস্থ একটি বৃহৎ প্রকারের দপ্তর ও একখানি খাতা খুলিয়া বসিয়া রহিয়াছেন এবং যখন যাহার যমপুরী যাইবার সময় উপস্থিত হইতেছে তাহাকে তখন আনয়নের হুকুমজারী করিতেছেন (যেন হাকিমের সেরেস্তাদার), তৎক্ষণাৎ যমদূতগণ আদেশ পালন করিতেছে। তা যাহা হউক, যাহার যেরূপ

বিশ্বাস থাকে থাকুক, তাহাতে আমরা কিছুই আপত্তি করি না। তবে আমরা যেটুকু বুঝিতেছি তাহাই বলিব।

আমরা পন্থা পত্রিকায় 'মহাকাশ' নামক একটি প্রবন্ধে একবার বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি, যে মহাকাশে আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মগুলি এক একটি রূপ কোন না কোন রূপে ধারণ করিয়া থাকে এবং সেই সকল রূপ আমাদের কৃত-কর্ম্মের ব্যয়িত শক্তি গুলিই (energy) ঐ সকল রূপের প্রাণ স্বরূপ হইয়া থাকে, এবং সেজন্য সেই সজীব রূপগুলি আমরা আমাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা দেখিতে সমর্থ হই যখন আমরা দিনের কর্ম্ম রাত্রিতে স্বপ্ন দেখি তখন কি এই স্থূল চক্ষে দেখিয়া থাকি? তাহা যেরূপ সম্ভব নহে, কারণ নিদ্রাকালে স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি সমস্তই নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করে, তখনও আমরা স্বপ্নে সেইরূপই কর্ম্ম করিয়া থাকি এ সকল কি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম নহে? তবে আমরা বুঝিতেছি যে সূক্ষ্মেন্দ্রিয় গুলি দ্বারা ও আমাদের জাগ্রত কর্ম্মগুলিকে নিদ্রাবস্থাতে স্বপ্ন দর্শনপূর্ব্বক সেই একেইভাবে ব্যবহার করিতেছি। তা'হলে আমরা স্বপ্নটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারাই দেখিয়া থাকি। যখন স্বপ্ন দেখিতেছি তখন একটা সূক্ষ্ম রূপই দেখিতেছি এবং সেই সূক্ষ্মরূপ সজীব না হইলে আমাদের সম্মুখে আসিতে পারে না। আমরা কর্ম্ম করিলেই সেই কর্ম্ম মহাকাশে অতি গুপ্তভাবে চিত্রিত হইয়াই রূপ সৃষ্টি হইবে এবং সেই রূপ সজীব হইয়া আমাদের সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সম্মুখে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এইরূপে আমাদের প্রতি কর্ম্ম, এমন কি প্রতি চিন্তা কণাগুলি পর্য্যন্ত এক একটি সজীব রূপ ধারণ করিয়া আমাদের জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের অলক্ষিতভাবে ঠিক পরাম্পর অতি গুপ্তভাবে চিত্রিত হইয়া সেই মহাকাশেই স্থায়ী হইয়া যায়। তজ্জন্য আমরা মধ্যে মধ্যে কখনও কখনও পূর্ব্বকৃত একটি একটি দৃশ্য সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া থাকি। ইহা বরাবরই স্থায়িরূপে বিরাজ করিতেছে। এইজন্যই এই মহাকাশস্থ চিত্রিত চিত্রসমূহই (অর্থাৎ মহাকাশই) আমাদের চিত্রগুপ্তের খাতা (Record of the Chitragupta) বলা যায়। এই স্থলেই চিত্রগুপ্ত বিরাজ করিতেছে। এই চিত্রগুপ্তকে আমাদের মৃত্যুকালের ঠিক পূর্ব্ব সময়টুকু—যে সময়টিতে আমাদের শ্বাস হয় বলিয়া কথিত আছে, সেই সময়টিতে মানব একাগ্রচিত্তে তাহার রূপটি দেখিয়া থাকে, তখন বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া একেবারে নিজ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মগুলির একটি একটি সজীব

রূপ একটির পর একটি আসিয়া (যেমন Byscope বায়স্কোপএর চিত্রগুলি একটির পর একটি দ্রুত দৃশ্যগুলি আমাদের দৃষ্ট হইয়া থাকে) ঠিক সেইরূপ ভাবেই মানবের শ্বাসের সময় একটির পরে একটি চিত্র ক্রমানুক্রমে আসিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। সেই অবস্থাতে মানব ঐ সকল রূপ দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া বাহ্যজ্ঞান লোপ হইয়া যায়। এবং নিজের পূর্ব্বকৃত সৎ ও অসৎ, কর্ম্ম গুলির রূপ দেখিতে দেখিতে সৎ কর্ম্মের ফলানুযায়ী সুখ শান্তি ও অসৎ কর্ম্ম-ফলানুযায়ী দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে এইখানে অনেকটা ফল ভোগ ভুগিয়া যান। শেষ চিত্রটি দর্শন হইলে দেহ হইতে প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া যায়। এইজন্য আমাদের সর্ব্বদা সৎ কর্ম্ম ও সৎ চিন্তায় দিন অতিবাহিত করা আবশ্যক। কারণ মৃত্যুর পূর্ব্বকালীন ঠিক শেষ চিত্রটি যখন মানব দেখেন তখন তাঁহার মুখভাবটি সেই দৃশ্যানুযায়ী বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন মানবের মুখভঙ্গিতে অনুমান হয়, যে তিনি কিরূপ প্রকৃতিধারী ছিলেন, কারণ আমাদের মনের ভাব অনেক সময়েই মুখ ভঙ্গিতে (Face expression) প্রকাশ পায়।

এই মুখভঙ্গি দর্শনে মানবের প্রকৃতি বুঝা যায়। মৃত্যুকালে সেইটী স্পষ্টই লক্ষিত হইয়া থাকে। এ সকল কেবল চিত্রগুপ্তের কারণ। আসুন এই চিত্র গুপ্তের চিত্রগুলিকে যেন সচ্চিত্র দেখিয়া পরম প্রীতিভাবে সুন্দর মুখভঙ্গি লইয়া দেহত্যাগ করিতে সমর্থ হই।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সচ্চিদানন্দ।

ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বলা হয়।

সচ্চিদানন্দরূপায় শাস্ত্রের একটী ব্রহ্মবিষয়ক সুপরিচিত বিশেষণ। ভাগবতে ভগবানকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলা হইয়াছে।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।

সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটী শব্দের সমাস করিয়া সচ্চিদানন্দ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই সমাস বাক্য প্রাচীনতর উপনিষদে দেখা যায় না। নৃসিংহ তাপনীয় উপনিষদে প্রথম আমরা এই সমস্ত পদটীর সাক্ষাৎ পাই।

সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম।

(নৃ পূর্ব্ব ১।৬)

নৃসিংহ উত্তর তাপনীয়তেও (৪।৬।৭) এবং রামপূর্ব্ব তাপনীয় (৯২) ও রাম উত্তর তাপনীয় (২ ৪।৫) উপনিষদেও সচ্চিদানন্দ পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই যুক্ত পদটীর প্রাচীন উপনিষদে প্রয়োগ না থাকিলেও স্বতন্ত্রভাবে সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের পরিচয় স্থলে প্রযুক্ত দেখা যায়। যথা :—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

[তৈ ২।১।১]

বিজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম।

[বৃ ৩।৯।২৮]

বিজ্ঞানং ব্রহ্ম।

[তৈ ২।৫।১]

আনন্দ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানৎ।

[তৈ ৩।৬।১]

এইরূপ দেখা যায় যে বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মের এই তিনটী ভাব স্বতন্ত্র করিয়া উপাসনার উপদেশ আছে।

সত্যম্ ইত্যেনদ্ উপাসীত।

আনন্দ ইত্যেনদ্ উপাসীত।

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং আনন্দং ব্রহ্ম। সর্ব্বোপনিষৎ সার। এবং সর্ব্বোপনিষদে এই সমস্ত ভাব সংগ্রহ করিয়া এইরূপে ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। সদেব সৌম্য ইদমগ্রআসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং।

[ছা ৬।২।১]

অনেকেই বিবেচনা করেন যে সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটী বিশেষণ দ্বারা শ্রুতি নির্গুণ ব্রহ্মকেই বিশেষিত করিয়াছেন। পরব্রহ্মকে যদি সৎ স্বরূপ, চিৎ

All three definitions of Brahma as being thought or bliss are in essence only negative Being is the negative of all empircal being, thought the negation of all objective being, bliss the negation of all being that arises in the mutual relation of knowing subject and known object. [Desussres p 147]

স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ বলিতে পারা যায়, তবে আর তিনি নির্ব্বিশেষ অবাঙ্-মনসগোচর হইলেন কিসে? তবে আর তাঁহার পরিচয় স্থলে শ্রুতি নেতি নেতি বলিয়া কেন ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে আপাত দৃষ্টিতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ সবিশেষ বাচক মনে হইলেও বস্তুতঃ ইহারা নেতিরই প্রতিরূপ। অভাব সূচক মাত্র। পরব্রহ্মকে সৎ বলিলে এইমাত্র বুঝায় যে তিনি ব্যবহারিক সত্তার অতীত। তাঁহাকে চিৎ বলিলে এই বুঝায় যে তিনি নির্ব্বিষয়। এবং আনন্দ বলিলে এই বুঝায় যে তিনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধের বহির্ভূত। এ মতের সমীচীনতাব বিষয় সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে ব্রহ্ম সৎও নহেন অসৎও নহেন, চিৎও নহেন, অচিৎও নহেন, আনন্দও নহেন নিরানন্দও নহেন।*

ব্রহ্ম যে সৎও নহেন, অসৎও নহেন, এবিষয় শাস্ত্রে অনেক স্থলে স্পষ্ট উপদেশ দৃষ্ট হয়।

সদসৎ বরেণ্যং [মুণ্ড ২।২।১]
সদসৎ অমৃতঞ্চ যৎ। [প্রশ্ন ২।৫]
ন সৎ নচাসৎ শিব এব কেবলঃ। [শ্বেত ৪।১৮]
অনাদিসৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্ নাসৎ উচ্যতে।
[গীতা]

সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে। [যোগবাশিষ্ঠ]

অর্থাৎ ব্রহ্ম সৎ নহেন অসৎ নহেন। তিনি শত সদসতের পর। অথবা তিনি সৎও বটেন অসৎও বটেন।

নাসদ্ আসীদ্ তদানীম্ নোসদ্ আসীদ তদানীম্।
[ঋগ্বেদ ১০।১২৯।১]

অর্থাৎ আদিতে অসৎও ছিলেন না সৎও ছিলেন না। আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে যে অগ্রে অসৎ ছিলেন, তাঁহা হইতে সৎ হইলেন।

* এবিষয়ে আমি অন্যত্র সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। সেইজন্য এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

অসদেবেদং অগ্র আসীদ্ তৎসদ্ আসীদ্।

[ছা ৩।১৯।১]

অসদ্ বা ইদমগ্র আসীদ্ ততো বৈ সৎ অজায়ত। [তৈত্তি ২।৭]

তবে আর পরব্রহ্মকে কিরূপে সৎ এই বিশেষণে বিশেষিত করা যায় * এইরূপ পরব্রহ্মকে চিৎ অথচ জড় বলা হইয়াছে।

কশ্চেত নোঽপি পাষাণঃ। [যোগবাশিষ্ঠ]

এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্ম চিৎও নহেন অচিৎও নহেন। এইরূপ পরব্রহ্মকে সুখ ও দুঃখের অতীত বলা হইয়াছে।

পবং ব্রহ্ম নির্দ্দুঃখং অসুখঞ্চ যৎ।

(মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০।২২)

সেই জন্য উপনিষদ একস্থলে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

আনন্দং নন্দনাতীতম্।

অর্থাৎ ব্রহ্ম আনন্দ বটেন কিন্তু তিনি সুখাতীত। ইহা হইতে মনে হয় যে সচ্চিদানন্দ সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ মহেশ্বরেরই স্বরূপ বাচক।

ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ স্থলে প্রথমেই তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলা হইয়াছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদ্ একমেব অদ্বিতীয়ম্। (ছা ৬।২।১)

উপনিষদে ব্রহ্মের একটী প্রচলিত নাম "সত্যম্।"

তস্য বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্ ইতি। (ছা ৮।৪।৪)

সেই ব্রহ্মের নাম সত্য।

* এই সম্পর্কে শত পদ ব্রাহ্মণ ৬।১।১।১ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।২।৯।১ দ্রষ্টব্য। ম্যাডাম্ ব্লাভাস্কি এ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থ Book of Dzyran stanga, হইতে নিম্নোক্ত বাক্য গুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

To be out-breathed by that which is and yet is now verse 6.

The visible and invisible rested in Etcarnal non being—the one being verse 7.

* এই সত্য শব্দের নিরুক্ত Itymology ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, কৌতূহলী পাঠক ৫।৫।১, ছা ৮।৩।৫, এবং কৌ ১।৬ দেখিবেন।

যো বৈতং মহৎ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি জয়তি ইমান্ লোকান্।
(বৃ ৫।৪।১)

যিনি সেই মহান্ যক্ষ প্রথমজকে সত্য ব্রহ্ম বলিয়া জানেন তিনি এই সকল লোক জয় করেন।

তৎ সত্যম্ স আত্মা তৎ ত্বমসি। (ছা ৬)

তিনি সত্য, তিনি আত্মা, তিনিই তুমি।

তিনিই যখন একমাত্র সত্তা, চরম পরমার্থ সেই জন্য তাঁহাকে "সত্যস্য সত্যম্ বলা হয়। এটী তাঁহার রহস্য নাম। (উপনিষদ)

তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যম্ (বৃ ২।১।২০) (বৃ ২।৩।৬)

ব্রহ্মকে সৎ বলিলে কি বুঝায়? তাঁহার সত্তাতেই জগতের সত্তা। তিনি আছেন বলিয়াই জগৎ আছে। অথচ জগতের সত্তা যেমন ভঙ্গুর, ক্ষর, পরিণামী বিকারশীল, তিনি সেরূপ নহেন। তিনি অক্ষর, অজর, অমর। তাঁহার ক্ষয়, বৃদ্ধি নাই। উৎপত্তি, বিনাশ নাই। অপচয়, উপচয় নাই। তিনি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে, সকল অবস্থায় একরূপে বিদ্যমান আছেন। তাঁহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন।

মাসাব্দ যুগঃ কল্পেষু গতা গম্যেষ্ব নেকধা নোদেতি নাস্তমায়াতি সম্বিদেশা স্বয়ং প্রভা।

অর্থাৎ মাস, বৎসর যুগ মন্বন্তর কল্প কোন কালেই তিনি ছিলেন না এরূপ নহেন।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ। ব্রহ্মকে জ্ঞান স্বরূপ বলিলে কি বুঝায়? প্রথম এই বুঝায় যে তিনি স্বয়ং জ্যোতি স্বপ্রকাশ। অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশের জন্য অন্য পদার্থের অপেক্ষা নাই। যেমন সূর্য্য। সূর্য্যই সমস্ত বস্তুর প্রকাশ করে। সূর্য্যকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য বস্তুর অপেক্ষা করিতে হয় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায় যে জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন :——

কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষঃ।

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য সকল জ্যোতিঃ পদার্থের একে একে প্রত্যাখ্যান করিয়া জনককে চরম উপদেশ এইরূপে দিয়াছিলেন,—

আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি, আত্মনা এবায়ং জ্যোতিষা আস্তে পর্য্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতিবৎ (বৃ ৩৩৬)

অর্থাৎ আত্মাই আত্মার জ্যোতিঃ আত্মারই জ্যোতিঃ দ্বারা জীব সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে।

সেই জন্য তাঁহাকে শ্রুতি তেজ, জ্যোতি প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অথায়ম্ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব। (বৃ ৪।৪।৭)

অথ য এষ সংপ্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ সম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে। (ছা ৮ অ৪৬ ছা ৮।১২।৩)

অর্থাৎ ব্রহ্ম পরম জ্যোতিঃ। জীবমুক্ত অবস্থায় তাঁহাতে মিলিত হয়। ছা ৮'৪।২ এবং মৈত্র উপনিষদেও (৬।২৪) তাঁহাকে পরম্ জ্যোতিঃ বলা হইয়াছে। যখন তাঁহারই জ্যোতিতে সমস্ত জ্যোতিঃ জ্যোতিষ্মান্, তাঁহারই আলোকে সমস্ত আলোক দ্যুতিমান্, তাঁহারই প্রভায় সমস্ত বস্তু প্রভাবান্,তখন তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতিঃ।

(জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ) বলাই সুসঙ্গত। উপনিষদও অনেকস্থলে তাঁহাকে ইহাই বলিয়াছেন।

যস্মাদ্ অর্ব্বাক্ সম্বৎসরে অহোভিঃ পরিবর্ত্ততে তদ দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতি রায়ুর্হোপাসতেঽমৃতং (বৃ ৪।৪।১৬)

হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ তদ যদ্ আত্মবিদো বিদুঃ। (মুণ্ড ২।২।৯)

ব্রহ্ম যে স্বপ্রকাশ সমস্ত জ্যোতিঃ যে তাঁহারই জ্যোতির ছায়া মাত্র এবিষয় বুঝাইবার জন্য উপনিষদে একাধিক স্থলে এই নিম্নোক্ত সুন্দর শ্লোকটী উদ্ধৃত দেখা যায়।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

(কঠ ৫।১৫, শ্বেত ৬।১৪, ও মুণ্ড ২।২।১০)

সেখানে সূর্য্যের ভাতি নাই, চন্দ্রতারকার ভাতি নাই, বিদ্যুৎ সেখানে

প্রভান্বিত নহে, অগ্নি সেখানে কোথায়? তাঁহার ভাতির অনুসারে সমস্তের ভাতি তাঁহার প্রকাশে সমস্ত প্রকাশিত।

গীতা ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলং যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।

আদিত্যগত যে তেজ অখিল জগতকে উদ্ভাসিত করে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ সে তেজ ভগবানেরই।

ইহা রূপক বর্ণনা। প্রকৃত কথা এই যে তিনি স্বপ্রকাশ, জ্ঞান স্বরূপ, তাঁহার উজ্জ্বলনে সমস্ত উজ্জ্বলিত। এইজন্য তাঁহাকে বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানঘন, প্রজ্ঞানঘন ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়।

যোঽয়ম্ বিজ্ঞানময়ঃ। (বৃ ৪।৪।২২) *

স যথা সৈন্ধবঘনো অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরো অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব। (বৃহ ৪।৫।১৩)

অর্থাৎ যেমন সৈন্ধব খণ্ড অন্তরে বাহিরে সমস্তটা লবণময় এইরূপ আত্মা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রজ্ঞানময়, প্রজ্ঞানঘন, প্রজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও কিছু নাই।

যেহেতু তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানস্বরূপ, সেইজন্য তাঁহাকে "প্রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞাত্মা" † বলা হয়।

এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং। (বৃ ২।৩।২১)

যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ। (কৌষি ৩।৪)

স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ এষঃ লোকপালঃ এষঃ লোকাধিপতিঃ এষ সর্ব্বেশঃ (ঐ ৩৮)

অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের তিনি এক মাত্র বিষয়ী, তিনি দ্রষ্টা (প্রশ্ন ৬।৫) সাক্ষী (শ্বেত ৬।১১) চিন্মাত্র।

---

* এ সম্পর্কে বৃ ৪।৩।১৪ কঠ ৫।১৫ ছা ৮।৪।১ বৃ ৪।৪।১৮ ও কৌষীতকী ৪।৮ দ্রষ্টব্য।

† Absolute knowing subject

বিষয়ের বিলোপ হইলেও বিষয়ীর বিলোপ হয় না, কারণ তিনি অবিনাশী। তিনি চিৎ স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, জ্ঞাতা—জ্ঞান তাঁহার বৃত্তি বা গুণমাত্র নহে। এই তত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ে অতি বিশদ ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। নিম্নে তাহার একাংশমাত্র উদ্ধৃত হইল।

যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টে র্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ নতু তদ্‌ দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ।

(বৃ ৪।৩।২৩)

এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে অদ্বৈতের একাকার অবস্থাতেও যখন বিষয় বিষয়ীর- দ্রষ্টা দৃশ্যের ভেদ তিরোহিত হয় তখনও তাঁহার জ্ঞানস্বরূপের ব্যত্যয় হয় না,—কারণ তিনি চিৎ স্বরূপ। *

ব্রহ্মকে আনন্দ স্বরূপ বলিলে কি বুঝায় বারান্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

চৈতন্য কথায় অদ্বৈতবাদ

এবং

হরেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ।

"অদ্বৈতবাদ অর্থে মোটামুটি এই ধারণা যে জগৎ আপাততঃ বহুত্ব বাচক হইলেও বাস্তবিক পক্ষে একত্ব ভিন্ন উহার কোন সত্তা নাই।"

একথা আমি সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করি। "জন্মাদ্যস্য যতঃ।" এই জগতের জন্ম, স্থিতি, লয় ব্রহ্ম হইতে। ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ঈশ্বরের সত্তাই জগৎ ও জীবের সত্তা। জগৎ ও জীবের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এবিষয়ে কোন বিবাদ নাই।

---

* It has no conciousnes of object and yet is not unconcious. Denssen

জগৎ ও জীবের দুই প্রকার সত্তা আছে। এক পারমার্থিক সত্তা, অন্য ঔপাধিক সত্তা।

পারমার্থিক সত্তা সকল জীবের ও সকল জগতের এবং অখণ্ড ও অদ্বয়।

ঔপাধিক সত্তায় বিচিত্রতা আছে। উপাধি আবার ক্ষণিক। ক্ষণে ক্ষণে পরিণত হইতেছে। কিম্বা এক জীবন স্থায়ী। যেমন এক জীবনে, তোমার যতই পরিবর্ত্তন হউক না কেন, তুমি রাম কিম্বা শ্যাম কিম্বা উপাধিকল্পাবস্থায়ী। তুমি কল্প মধ্যে রামের আকার ধারণ কর বা শ্যামের আকার ধারণ কর, তুমি একই জীব। আবার জীবত্বই এক উপাধি। জগতের সম্বন্ধেও এইরূপ।

জীব ও জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য বিরাজিত, অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু জীবের উপাধি অনিত্য ও নিত্য পরিণামী।

জীব ও জগতের বাস্তবিক সত্তা অদ্বয় ব্রহ্ম সত্তা। কিন্তু জীব ও জগতের ঔপাধিক সত্তা অনির্ব্বচনীয়। সে সত্তা আছে বলা যায় না। কারণ এই আছে, এই নাই। এই রাম আজ ছিল কাল নাই।

কিন্তু রাম না থাকুক, রাম উপাধিধারী জীবিত আছে। হয়ত দুদিন পরে লোক তাহাকে শ্যাম বলিবে।

হয়ত জীবত্বের বাঁধন ভাঙ্গিয়া যাবে। তবু লোকে তাহাকে ঈশ্বর বলিবে। হয়ত ঈশ্বরত্বের বাধন ভাঙ্গিয়া যাবে। তবু তাহার ব্রহ্মসত্তা থাকিবে।

ঔপাধিক সত্তা এক অনির্ব্বচনীয় সত্তা। এই সত্তার সহিত ব্রহ্মের কি সম্বন্ধ এই লইয়া বিবাদ।

রামানুজ স্বামী বলেন দেহের সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ জড় ও জীবের অন্তর্যামী ভগবানের সহিত সেই সম্বন্ধ। যেমন আমার দেহ ও আমি ভিন্ন নহি, সেইরূপ ভগবান্ ও চিৎ, অচিৎ ভিন্ন নহে। এই মতে জীব ও জড়ের নিত্য প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে এবং নিত্য প্রবাহ চলিতে থাকিবে। জীব কখনই অন্তর্যামী ভগবান্ হইতে পারিবে না। অনন্তকাল জীব ভগবানের দেহ মাত্র থাকিবে। আমি এই মতের সমর্থন করি না।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের বিবর্ত্ত সম্বন্ধ। অর্থাৎ এক ব্রহ্মেরই সত্তা আছে জীবের ও জগতের সত্তা নাই। তবে যে জীব ও জগতের অনুভব হয়, তবে যে মনে হয় জীবের ইত্যাদি হইতেছে, জগতের

সৃষ্টি, স্থিতি লয় হইতেছে—সে এক প্রকাণ্ড ভ্রম মাত্র। রজ্জুতে সর্পের অনুভব হয়, সে কেবল ভ্রম। বাস্তবিক সর্প কোন কালে ছিলনা, কোন কালে নাই। রজ্জু কেবল রজ্জু মাত্র। যেমন জানিলাম এ সর্প নয়, রজ্জু, তেমনি মায়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

মরীচিকায় জল, আকাশে পুষ্প কেবল কথার কথা। জগতের সৃষ্টিও হয় নাই। জগতের স্থিতিও নাই। জগতের লয় ও হইবে না।

প্রবাহ রূপে জীব ও জগতের সত্তা নাই। এই অনন্ত প্রবাহ অজ্ঞান বশতঃ উপলব্ধ হয়।

ইহাই সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদ। আমি এই সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদের কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারি না। এই সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদ আমার বুদ্ধির অতীত। আমি নিত্য শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ, নির্ম্মল ব্রহ্মে অজ্ঞানের ছায়া দেখিতে পাই না। নিত্য প্রকাশ ব্রহ্মের অপ্রকাশ বা ভ্রমাত্মক প্রকাশ আমি কল্পনা করিতে পারি না।

ভগবদ্গীতা ও ভাগবত অনুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব বলেন জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শক্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মের শক্তিই তাহাদের সত্তা। শক্তি ও শক্ত যেমন ভিন্ন নহে, জীব ও ব্রহ্ম সেইরূপ ভিন্ন নহে। সেই শক্তিবশে জীব ব্রহ্মের অংশ, বিবর্ত্ত নহে।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

সেই ব্রহ্মের পরাশক্তি বা পর প্রকৃতি জীব, অপরা শক্তি বা অপরা প্রকৃতি জগৎ।

এই অপরা শক্তির পরিণাম হয়। সেই পরিণাম দ্বারা জগতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের প্রবাহ চলিতেছে।

ব্রহ্ম অপরিণামী। ব্রহ্মের পরিণাম নাই। ব্রহ্ম অপ্রতিহত শক্তি। জীব প্রতিহত শক্তি। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি। জীবের সসীম শক্তি।

একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তি স্তথেদমখিলং জগৎ ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

"জীবনিস্তারের হেতু সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
পরিণামবাদ ব্যাস সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তব্ অবিকার॥
ব্যাসভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র কয়॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রতি চৈতন্যদেব বাক্য

পুনশ্চ

"স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়॥
বিষ্ণুশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রাবখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি রিষ্যতে॥"

এই শক্তিবাদও অদ্বৈত বাদ। শক্তি স্বীকার করিলে অদ্বৈত বাদের হানি হয় না।

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

ভাগবত ২-৯-৩২,

অনুভবাত্মক অদ্বৈত বাদে মায়াশক্তি স্বীকার করা হয়। ষট্ অনাদিও স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মের শক্তি না থাকিলে, ষট্ অনাদি হইতে পারে না।

এই জন্য মোটামুটি অদ্বৈতবাদ অর্থে হরেন্দ্র বাবু যাহা বুঝেন, তাহার সহিত আমার বিবাদ নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

হরি-কথা।

আনন্দবাণী ওই শুন সবে শ্রবণে।
গোলক বিহারী হরি আস্‌বেন্ আবার ভুবনে॥
উঠ সবে, জাগ সবে, ছাড় মোহ ঘুম ঘোর।
আবার হেরিবে যদি গোপী-জন মনচোর॥
আনন্দবাণী শুন আনন্দ প্রাণে।
আনন্দে মাত সবে হরিগুণ গানে॥

হরি-কথা যেমন ভক্তের প্রীতিকর, সংসার-তাপনাশে উহা তেমনি হিতকর। এই কৃষ্ণ-কথা ভক্ত যতই শ্রবণ করেন, ভক্তিরস পানে ততই তাঁহার পিপাসা বৃদ্ধি হয়। এই হরি-কথা ত্রিতাপ নিবৃত্তির মহৌষধ—জগতের পরম মঙ্গলোপায়।

পুরাণে দেখিতে পাই শ্রদ্ধাবান মুনিগণ প্রসন্ন চিত্তে হরি-কথা শ্রবণ করিতেন। পুণ্যক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে মুনিগণ হরি-কথায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

উপনিষদে আভাষ পাই, ধ্যাননিষ্ঠ ঋষিগণ বেদান্ত শ্রবণজনিত জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিসহকারে হরি-কথা আলাপন ও হরিপাদমূল সেবন করিতেন।

এই মধুর হরি-কথা মহাভাগ মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়দেব গুরুমুখে শুনিয়াছিলেন, আবার বিদুর ঐকথা তাঁহার নিকট হরিদ্বারক্ষেত্রে শ্রবণ করেন।

মৈত্রেয়দেব বিদুরকে বলিয়াছিলেন—"বৎস! জ্ঞানেই যে কৈবল্য লাভ হয়, এমত নহে। ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে পুরুষ অবশ্য কৈবল্য লাভ করে।"

এই কথায় মৈত্রেয়দেবের অভিপ্রায় এই যে—শুধুই যে কেবল পরাবিদ্যা-দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে জানা যায়, তাহা নহে। ভগবানে ভক্তিমান হইলেও পুরুষ প্রজ্ঞাবলে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যোগ-শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায়ে "তত্ত্বমসি" আদি মহাবাক্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা যেরূপ আত্মদর্শনে সমস্ত বিদিত হয়, কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন, কৃষ্ণপদ চিন্তন দ্বারাও সেইরূপ হইয়া থাকে।

বিষয়ভোগবাসনা হইতে ত্রিতাপের উৎপত্তি, আবার বিষয়ভোগবাসনা-নাশে ত্রিতাপের নিবৃত্তি। হরি-কথায় চিত্ত আকৃষ্ট হইলে সেই বিষয়ভোগ-বাসনা বিনষ্ট হয়। ক্রমে চিত্ত তদ্গত হইলে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। দীনভাবে কৃষ্ণ-চরণে লুণ্ঠিত হইলে, ব্রহ্ম বিজ্ঞান মনুষ্যের সুখ-লভ্য হয়।

কৃষ্ণ-কথায় চিত্ত অভিষিক্ত হইলে, ভগবৎপদে ভক্তি জন্মে। এই ভক্তি দৃঢ় হইলে ভক্ত, প্রেমবিহ্বল-চিত্তে শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করিতে শিখেন। এই আত্মসমর্পণের চরম অবস্থাই Living in Eternal Life—Living in the one Life. এই অবস্থায় আসিবার পূর্ব্বে ভক্ত সবই কৃষ্ণময় দেখেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, তরু, নদী, ভূতসমূহ, সমুদ্র প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম—সবই—নবজলধর-কান্তি শ্যামসুন্দর। তখন ভক্ত ও ভগবান যেন সম্মুখ-সঙ্গমে নদীর জল ও সাগরের জল। যখন আত্মসমর্পণ একান্ত হয়, তখন আর ঐ ভেদ থাকেনা। তখন সবই সাগরের জল। তখন "আমি" নাই—আছেন কেবল—ওঁতৎসৎ।

মৈত্রেয় দেবের কথা সপ্রমাণ করিতেই যেন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব।

মহাপ্রভু শিখাইয়াছিলেন—কলিতে কৃষ্ণ বিনা আর গতি নাই। কৃষ্ণ বিনা মলিন জীবের উদ্ধারোপায় আর নাই।

সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদে পূর্ণ থাকে। ঐ যুগে মনুষ্য মজ্জাগতপ্রাণ, সত্যসেবী, সর্ব্বভূত-সুহৃৎ এবং শমদমাদি-পরায়ণ।

কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদ। তাহাও লুপ্ত প্রায় হইয়া থাকে। এই যুগে লোক অন্নগতপ্রাণ, অসত্যসেবী। কঠোর তপস্যা বা যোগ-সাধনে উপযোগী নহে। তাই ভগবানের শ্রীপদে দীনভাবে আত্মসমর্পণ বিনা এই যুগে লোকের উপায়ান্তর নাই।

কাল প্রভাবে ধর্ম্ম হীনবল হইলে, হরিকথা প্রচারে মহাজনগণ জনসমাজে আগমন করেন। অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে ভগবান স্বয়ং পার্ষদগণ লইয়া অবতীর্ণ হন।

পুরাণে দেখিতে পাই কোন কোন মহাজন বীজরূপে ভূমণ্ডলে এই কলিযুগে অবস্থান করিতেছেন। জীবের মলিনতা অপনোদনকল্পে তাঁহাদের আগমন অসম্ভব নহে। বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবার দুইবার আগমন সূচিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ধর্ম্মজগতে বিপ্লব চলিতেছিল। ধর্ম্মের ভাণে তখন ঘোরতর মিথ্যাচার অনুষ্ঠিত হইত। স্বার্থপরতার অতিবৃদ্ধি হইয়াছিল। স্বার্থসেবীদিগের উৎপীড়নে জনগণ অশেষ ক্লেশ অনুভব করিতেছিল। স্বর্গকামীর কর্ম্মানুষ্ঠান আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছিল। লোকে নাস্তিকতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল।

এইরূপ অবস্থায়ই করুণাময়ের হৃদয় আর্দ্র হয়। তখনই তিনি ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত করিতে পার্ষদগণ সহ আগমন করেন। আধুনিক ধর্ম্মজগতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ভগবানের আগমন সন্নিকট সূচিত হয়। চারিদিকেই হরি-কথা প্রচারের প্রয়োজন ইঙ্গিত হয়।

বিদুর যেমন মৈত্রেয় মুখে হরি-কথা শুনিয়াছিলেন, কে জানে এই ভারত-ক্ষেত্রে সেই শ্রীমুখে হরি-কথা আবার কথিত না হইবে! হরিনামে দিগ্-দিগন্ত ধ্বনিত হউক। ঐ শুনুন, পার্ষদগণ কেহ কেহ সময় প্রতীক্ষা করিয়া সকাতরে ডাকিতেছেন:—

"লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ
এস শ্রীগৌরাঙ্গ
চৌষট্টি মোহান্ত সনে।
স্বরূপ প্রকাশি
সদানন্দে ভাসি
নৃত্য কর সংকীর্ত্তনে॥
এসহে দয়াল
দ্বাদশ গোপাল
গদাধর দামোদর।
করতাল রঙ্গে
মধুর মৃদঙ্গে
মত্তকর চরাচর॥
এস শান্তি-দীপ
শান্তিপুরাধিপ
দয়ানিধি সীতাপতি।

এস বন্ধু জন
জাহ্নবী-জীবন
নিত্যানন্দ বন্ধুগতি।

দাম্ভিক দৈত্যরাজগণের অত্যাচারে বসুন্ধরা অশ্রুমুখী গাভীরূপ ধারণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতে দেবগণের নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে প্রণাম করিয়া পৃথিবী কাতরকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—

"হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! নারায়ণ লোকসমূহের পরম গুরু। তিনি আমারও পরম গুরু। আপনারা সকলেই তাঁহার অংশসম্ভূত। গ্রহনক্ষত্রাদি, আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি, বিষয়সমূহ সকলই বিষ্ণুময়। যক্ষ, রক্ষ, দৈত্য, দানব প্রভৃতি সকলই বিষ্ণুর রূপ। সমুদ্রে তরঙ্গবৎ এই বহুরূপে পরস্পর সংঘাত হইয়া থাকে। সম্প্রতি দৈত্যগণ মর্ত্ত্যলোক অধিকার করিয়া দিবানিশি প্রজাপীড়ন করিতেছে। বলদর্পিত, দিব্যমূর্ত্তিধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সেনা আমার ভারাতিক্রান্ত করিয়াছে। আমি তাহাদের ভার বহনে অসমর্থ হইয়াছি। আপনারা আমার ভার লাঘব করুন। আমাকে যেন ব্যাকুলা হইয়া রসাতলে যাইতে না হয়।"

ধরণী ও দেবগণসহ ব্রহ্মা ক্ষীরোদ-সমুদ্রতীরে সমাগত হইয়া নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন।

"প্রভো! পরা ও অপরা বিদ্যা তোমার রূপ। হে সর্ব্ব! শব্দ ও পরম ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মই তোমার রূপ। তুমিই বেদ চতুষ্টয়, তুমিই শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত। তুমিই ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। তুমিই ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, মীমাংসা, ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র। তুমিই পরমতত্ত্ব, সকলের আদিকারণ। তুমি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত এবং পরাৎপর। কর্ণ না থাকিলেও তুমি শুনিয়া থাক, চক্ষু না থাকিলেও তুমি দেখিয়া থাক। তুমি এক হইয়াও বহুরূপে বিরাজ কর। তুমি বিশ্বের আশ্রয়, ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা। তোমাতেই এই সমস্ত, তোমা হইতেই এই সমস্ত, তুমিই এই সমস্ত। হে অনন্তমূর্ত্তে! চারিদিকেই তোমার চক্ষু। তুমিই সকল তেজের প্রকাশক তুমিই সকলের প্রবর্ত্তক। তুমিই ব্যষ্টি, তুমিই সমষ্টি। তুমি ব্যক্ত এবং অব্যক্ত স্বরূপ। তোমা অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। তুমি সর্ব্বজ্ঞ, সকলের দ্রষ্টা। তুমিই সর্ব্বশক্তি, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। হে সর্ব্বেশ্বর! তুমি অনঘ, দীনবৎসল,

পরম করুণাময়। ধর্ম্মরক্ষার্থ তুমি দেহগ্রহণ করিয়া থাক। হে পুরুষোত্তম! তোমায় নমস্কার। হে বহুবক্ত্র, সহস্রবাহো, সহস্রপাদ, সহস্রমূর্ত্তে! তোমায় নমস্কার, পুনঃ নমস্কার, বহু নমস্কার। হে অপ্রমেয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম! তোমায় বারম্বার নমস্কার। হে ভগবান! তুমি প্রসন্ন হও। অসুর-ক্লিষ্টা পৃথিবী তোমার নিকট আসিয়াছেন। হে ঈশ! তুমি যৎকর্ত্তব্য আদেশ কর।"

এইরূপ স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা এক আকাশবাণী শুনিলেন। শুনিয়া, দেবতাদিগকে কহিলেন—"অমরগণ! পূর্ব্ব হইতেই ভগবান পৃথিবীর বিপদ অবগত আছেন। সেই পরমেশ্বর হরি, আপন কালশক্তিপ্রভাবে পৃথিবীর ভার নাশহেতু অবিলম্বে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্র অসুরগণ বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। তোমরা আপন আপন অংশে যদুবংশে জন্ম পরিগ্রহ কর।

পরমপুরুষ হরি শীঘ্রই বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। বাসুদেবের অংশ স্বরাট্ (স্বয়ংদীপ্ত) সহস্রবদন অনন্তদেব, ভগবানের প্রিয় বাসনায় অগ্রে জন্মিবেন। ভগবানের প্রিয় সাধন জন্য দেবাঙ্গনাগণ জন্মগ্রহণ করুন। ভগবতী বিষ্ণুমায়া যিনি জগৎ মোহিত করেন, ভগবানের আদেশে কার্য্য সিদ্ধির জন্য অংশে অবতীর্ণ হইবেন।"

* * *

যদুপতি সুরসেন মথুরায় বাস করিতেন। সেই হইতে মথুরা যাদব ভূপতিগণের রাজধানী। মথুরা অতি পবিত্র নগরী। ভগবান হরি সদা তথায় অবস্থিতি করেন।

উগ্রসেন তনয় কংশ তখন মথুরার রাজা। সুরবংশীয় বসুদেব নববধূ দেবকীকে লইয়া স্বগৃহে যাত্রার নিমিত্ত রথে উঠিলেন। দেবক নানাবিধ যৌতুক দিলেন। কংশ সারথি হইয়া নবদম্পতীর রথ চালনা করিলেন।

পথিমধ্যে কংশকে সম্বোধন করিয়া এক আকাশবাণী হইল।—

"ওরে মূঢ়! তুমি পতিসহ যাহাকে রথে লইয়া যাইতেছ, তাহার অষ্টম পুত্র তোমার প্রাণবধ করিবে।"

কংশ এই কথা শুনিয়া ত্রস্ত খড়্গ লইয়া দেবকীর কেশাকর্ষণ করিল।

বসুদেব বিপদ গণিয়া কংশকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বসুদেব কহিলেন—

"হে রাজন্! বীরগণ তোমার প্রশংসা করিয়া থাকেন। উদ্বাহ পর্ব্বে তুমি কোন্ প্রাণে ভগ্নীবধ করিবে? আজই হউক আর শতবর্ষ পরেই হউক মৃত্যু নিশ্চয়ই ঘটিবে। দেহান্তে দেহী কর্ম্মগতি লাভ করিয়া থাকে। গমনকালে যেমন মানুষ ভূমিতে এক পদ রাখিয়া অপর পদে ভূমিত্যাগ করে, জলৌকা যেমন তৃণান্তর অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ দেহাভাবে দেহী কর্ম্মগতিবশে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। কংশ! তোমার এই ভগ্নী বালিকা, ও ভয়কাতরা। ইহা হইতে তোমার ভয় নাই। ইহার পুত্র হইতেই তোমার ভয়। ইহার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হইবে, তাহাদের সকলকেই আমি তোমার হস্তে অর্পণ করিব।"

কংশ "তাহাই হউক" বলিয়া ভগ্নীবধে নিরস্ত হইল। বসুদেব হৃষ্টমনে স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

মরণ ও মরণান্তে।

পুনর্জ্জন্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। যে সুকৃতিবলে স্বর্গলাভ হইয়াছিল, তাহার ক্ষয় হইল, যে সংস্কার সমূহ আহৃত হইয়াছিল, তাহা পূর্ণরূপে আত্মায় মিশিয়া গেল, মানবমন আবার ঐহিক ভোগতৃষ্ণা লাভে লালায়িত হওয়াতে কালের হোরা বাজিয়া উঠিল! আর কি জীব স্বর্গে থাকিতে পারে? তখনই তাহার স্বর্গচ্যুতি ঘটিল। ইন্দ্রিয়-লালসাত আর ত্রিদিবে পূর্ণ হইতে পারে না কাজেই তাহাকে জড় জগতে অবতীর্ণ হইতে হইল। মানব যদি ধর্ম্ম পথে

অধিকদূর অগ্রসর হইয়া থাকে, পূর্ব্ব জীবন যদি পুণ্যময় ও উন্নতিশীল হয়, তবে তাহার স্বর্গবাসের সময় সুদীর্ঘ হয়। ধর্ম্মই যাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, যাহারা সাধন পথের পথিক, সেই যোগিগণের স্বর্গবাস কালের আর কথা কি? তাঁহারা যোগভ্রষ্ট হইলেও লক্ষ লক্ষ বৎসর স্বর্গসুখভোগ করিয়া পুণ্যাত্মা ও শ্রীমন্তদের গৃহে জন্মলাভ করেন।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১।৬ষ্ঠ অঃ। গীতা॥

সাধারণতঃ এক হাজার হইতে পোনর শত বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গবাসের কাল। কিন্তু বর্ত্তমানে ঘোর কলিকালে মানবজাতি অনবরত ভোগবাসনায় লিপ্ত থাকায়, স্বর্গবাসের এই মোটামোটি কাল হ্রাস পাইয়াছে। ইহা যেন মনে থাকে যে, ব্যক্তি বিশেষের স্বর্গবাস কাল সম্বন্ধে কথিত সাধারণ বা মোটামোটি কাল বলা হয় নাই। মনে কর, একজনের স্বর্গবাস কাল এক হাজার বছর, অপর জনের পঞ্চাশ বছর। এই দুইএর সমষ্টির অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৫২৫ বৎসর স্বর্গবাসের মোটামোটি সাধারণ সময়। অব্যবহিত পূর্ব্ব জীবনের পাপপুণ্যের উপর মানবের স্বর্গবাসকালের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যদি পূর্ব্ব জীবনে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও উন্নত মানসিক ভাবের স্ফুরণ ও প্রাচুর্য্য থাকে, তবে স্বর্গবাসকাল সুদীর্ঘ হয়। স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া যদি বিষয় ভোগে মন লিপ্ত থাকে, তবে স্বর্গবাস কাল হ্রস্ব হয়। তবে সাধু মহাজনদের স্বর্গবাসের কথা পৃথক। তাঁহারা স্বর্গভোগকে অতি তুচ্ছ মনে করেন। সময় অল্প হউক, অধিক হউক, সংস্কার রাশি মানবাত্মায় মিশিয়া গেলেই আর বিলম্ব নাই; সে পৃথিবীতে পুনরাগমনের জন্য প্রস্তুত হয় ও বর্দ্ধিত সংস্কার রাশি সঙ্গে নিয়া আইসে। বর্দ্ধিত সংস্কার বলার তাৎপর্য্য কি? তবে কি স্বর্গেও কোন কোন বৃত্তির স্ফুরণ হয়? হয় বই কি! সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, কাব্য প্রভৃতি আদর্শ অপার্থিব বিষয়ের চিন্তা ও জ্ঞান স্বর্গে উৎকর্ষতা লাভ করে।

স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে স্বর্গ দ্বার অতিক্রম করার সময়ে গত জীবনের দুষ্ক্রিয়া বীজ সকল আসিয়া তাহাকে অধিকার করিয়া ফেলে। তাহাদের হাত হইতে নিস্তারের উপায় নাই। স্বর্গভোগকালে মানব শোকতাপাদি জনিত দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্ত ছিল, কিন্তু পূর্ব্বজীবনে সে, যে সকল কুকাজ করিয়াছে,

তাহার তখন লোপ পায় নাই, কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় ক্রিয়াহীন অবস্থায় স্বর্গদ্বারে পড়িয়া ছিল মাত্র।

অগ্রহায়ণ ধান্য ফলানের জন্য কৃষক ভূমি চাষ করিয়া বীজ বপন করিল, সেই বীজ কিছুকাল নির্জীবাস্থায় মাটির নীচে পড়িয়া থাকিল। পরে সুবৃষ্টিতে ভূমি সিক্ত হইল, রৌদ্রে সেই ভূমি উত্তপ্ত হইল, তখনই সুপ্তবীজ ফুটিয়া উঠিয়া অঙ্কুরিত হইল। ঠিক সেইরূপ স্বর্গবাসকালে আমাদের পাপবীজ সমূহ নির্জীবাবস্থায় পড়িয়া থাকে, কিন্তু যেই আমাদের পুনর্জন্ম লাভের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই নবদেহে তাহারা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠে, এবং অঙ্কুরিত হইয়া শিকড় মেলিতে থাকে সেই অঙ্কুর কালে শস্যপূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হইয়া সেই জীবে আশ্রয় করে। বৌদ্ধগণ ইহাদিগকে "স্কন্ধ" বলেন।

পার্থিব গুণরাশি, অনুভব শক্তি, অপার্থিব বিষয়ের চিন্তা (abstract ideas), মানসিক গতি, মানসিক বৃত্তি ও শক্তি, এই সকলকে স্কন্ধ বলা হয়। কথিত গুণ ও শক্তি সমূহের বিশুদ্ধাংশ জীবের সঙ্গে স্বর্গে গমন করে। তাহাদের যে সকল অংশ স্থূল ও অপবিত্র, তৎসমস্তই বর্ণিতরূপে সুপ্তাবস্থায় নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে, পুনর্জন্ম গ্রহণ কালে তাহার স্কন্ধ সমূহ নূতন দেহে মিশিয়া যায়। প্রকৃত জীব সেই দেহাবলম্বনে সংসার রঙ্গভূমিতে পুনরায় অবতরণ করিয়া লীলা খেলা করে। এইরূপে জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে থাকে।

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥ ৯ম অঃ। গীতা।

জীবনচক্রনেমি এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিতে করিতে লীলাপূর্ণ, কার্য্যশেষ এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইলে সেই জীব পরিণামে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে। তখন জন্ম মৃত্যু আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুদর্শন দাস।

তীর্থযাত্রীর পথ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩০)

পরমপিতা সর্ব্বদা তোমার নিকট থাকিয়া তোমার কল্যাণ বিধান করিতেছেন। তিনি তাঁহার কৃপা প্রত্যাহার করেন—এরূপ চিন্তা করাই তোমার একটি ভ্রম। যখন আমাদের দুর্ব্বল চিত্ত অস্থির হয়, তখন মধ্যে মধ্যে এরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা কদাপি ঘটে না। যখন সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণায় তুমি নিপীড়িত হও, তখন তিনি সমধিক কৃপা বর্ষণ করেন। কিন্তু এই কৃপা অনুভব করিতে পারি না বলিয়াই আমরা ঠিক বিপরীত ভাবি। উপাসনা কার্য্যে যতই রত হইবে, ততই অধিকতর কৃপা ও করুণা তোমার উন্নতিপথে সহায়তা করিবে।

(৩১)

মনের বিক্ষেপ শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ক্রমাগত উপাসনা করিয়া যাও। তাঁহার করুণাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখিলে, একদিন সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে পারিবে। যখন চেষ্টা করিয়াও তোমার মনকে সুপথে চালিত করিতে না পারিবে, তখন তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিও। এবং বিলম্বেই হউক বা অবিলম্বেই হউক এই সাহায্য নিশ্চয় আসিয়া অল্পে অল্পে তোমার চিত্তের সুস্থতা সম্পাদন করিবে—এই বিশ্বাসটি যেন অটুট থাকে।

(৩২)

দিবারাত্রির মধ্যে অন্ততঃ ২।১ মিনিট করিয়াও যতবার পার ততবার জগৎপিতাকে স্মরণ করিবে। এইরূপ করিলে তুমি ক্রমশঃ অধিকতর সাহায্য পাইতে থাকিবে।

(৩৩)

তাঁহার কৃপা করুণার প্রতি সম্পূর্ণ ও অকপট বিশ্বাস রাখিও। এইরূপ করিলে বেশ বুঝিতে পারিবে যে তিনি সর্ব্বদাই তোমাকে রক্ষা করিতেছেন। ইহাতে তোমার চিত্তে তৎপ্রতি প্রেম ও তাঁহাকে পাইবার লালসা জাগিয়া উঠিবে। এবং এই ব্যগ্রতা উদিত হইলে তুমি সহজে ও স্বচ্ছন্দে (যদিও ধীরে ধীরে) অগ্রসর হইতে থাকিবে।

(৩৪)

যাবতীয় পার্থিব বস্তুর প্রতি ভালবাসা অন্তরে অন্তরে (অর্থাৎ লোককে দেখাইবার জন্য বাহ্যতঃ নহে) ত্যাগ কর। ইহাতে তোমার মন স্নেহযুক্ত হইবে। তোমার নবীন স্নেহস্রোতটিকে পূর্ব্বের ন্যায় নিম্নদিকে যাইতে না দিয়া উচ্চদিকে ফিরাইয়া দাও। এই স্রোতের মুখে রিপুগণ ও বিষয়-বাসনা ভাসিয়া যাইবে।

(৩৫)

প্রত্যহ মনে মনে তোমার সমস্ত সম্পত্তি (যা কিছু নিজস্ব আছে সব) নৈবেদ্যরূপে ভগবানকে অর্পণ করিবে ; এবং ভাবিবে তিনি সমস্তই গ্রহণ করিয়া তোমাকে প্রসাদী করিয়া দিলেন। অতএব তুমি যাহা কিছু ভোগ করিতেছ সমস্তই তাঁহার প্রসাদ এই জ্ঞানে প্রসাদের অপব্যবহার করিও না।

৩৬

তন, মন, ধন (অর্থাৎ শরীর, মন এবং সম্পত্তি) ভগবানে উৎসর্গ করিবে। এরূপ করিলে, উহাদের উপর তোমার অধিকার থাকিবে না, সুতরাং পার্থিব ভোগ বিলাস ঐশ্বর্য্যাদি লাভের কামনা হইতে তোমার মন কিয়ৎ পরিমাণে নিষ্কৃতি পাইবে। * ভক্তিলাভের জন্য ইহা প্রয়োজন, কারণ যে চিত্ত হইতে বিষয়বাসনা অন্তর্হিত হইয়াছে সেই চিত্তেই ভগবৎ-প্রেম ও তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা উদিত হয়। এই মানসিক পরিবর্ত্তের জন্য ক্রমাগত দৃঢ়ভাবে চেষ্টা কর ; ভগবৎকৃপায় সমস্তই সাধিত হইবে। মানব দুর্ব্বল ও অসহায়, সুতরাং এই মানসিক প্রলোভনগুলির সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি তাহার নাই। কিন্তু আমাদের ত্রাণকর্ত্তা মহান্—সর্ব্বশক্তিমান্। যদি তুমি একমনে, অন্তরের সহিত তাঁহার কৃপা ভিক্ষা কর, যাহা তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে বা ভক্তি নষ্ট করে

* ইহার চরম দৃষ্টান্ত পরমহংসদেবের জীবনে পাওয়া যায়। তিনি যখন কঠিন রোগে ভুগিতেছিলেন একব্যক্তি কাতর ভাবে বলিলেন "প্রভো, আপনার যন্ত্রণা দেখিয়া আমরা বড় কষ্ট পাইতেছি। আপনি মনে করিলেই তো যোগবলে রোগ-মুক্ত হইতে পারেন। তাহাই করুন না কেন ?" তিনি প্রথমে কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হওয়াতে বলিলেন "দেখ, এই মন ভগবানকে অর্পণ করিয়াছি। তুমি কি বলিতে চাও যে তাঁহাকে যাহা দিয়াছি তাহা ফিরাইয়া লইয়া পুনরায় উহাকে দেহের কার্য্যে নিয়োজিত করিব ?' —অনুবাদক

তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যদি প্রকৃতই ইচ্ছুক হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার পথের যেখানে যেখানে ফাঁদ-পাতা বা গুপ্ত গর্ত্তাদি আছে তিনি তৎসমস্তই দেখিতে পাইবেন ও দূর করিয়া দিবেন।

(৩৭)

নিদ্রা যাইবার ঠিক পূর্ব্বে চিত্ত একাগ্র করিবে। ইহাতে অনেক উপকার আছে। সহজভাবে নিদ্রা গেলে তোমার আত্মা নিদ্রিতাবস্থায় যে রাজ্যে থাকে, একাগ্র হইয়া নিদ্রা গেলে তদপেক্ষা উচ্চতর রাজ্যে অবস্থান করে।

কর্ম্ম ত্যাগ করিলে উপাসনা ভালরূপে করিতে পারিবে না, কারণ একটু শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত মন ও আত্মা উঠিতে পারে না। এই কর্ম্মের অভাব বশতঃই, (তথা-কথিত) সাধু ফকিরগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন চিন্তাই থাকে না। একটি সোপান আছে যদবধি মানবকে কর্ম্ম করিতে হয়। ঐ অবস্থায় উপনীত হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে সংসার ও কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন। অতএব কর্ম্ম করিতে করিতে উপাসনা কর। বর্ত্তমান অবস্থায় কর্ম্মত্যাগ করিলে আলস্য ও জড়তায় অভিভূত হইয়া সকল কার্য্যেই অপটু হইয়া পড়িবে।

(৩৮)

সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে যেন প্রলোভনে পড়িয়া অধিক মসলা যুক্ত ও গুরুপাক দ্রব্য আহার না কর। কারণ এরূপ খাদ্য আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের হানিকর। যাহাই আহার কর, ভোজনের পূর্ব্বে তাহা ভগবানকে নিবেদন করিবে।

(৩৯)

দিনান্তে একাহার সাধুসন্ন্যাসীদিগের পক্ষেই প্রশস্ত। যাঁহারা সংসারী, সর্ব্বদা কাজ কর্ম্মে নিযুক্ত, তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা এক তৃতীয়াংশ অল্প আহার করিবেন। যদি রাত্রে আহার করার একান্ত প্রয়োজন হয়, উপবাসী না থাকিয়া ⅔ অংশ আহার করিবেন (অর্থাৎ পূর্ণমাত্রার দুইভাগ খাইবে ও একভাগ ত্যাগ করিবে) অথবা একটু দুগ্ধ এবং অন্য কিছু অল্প পরিমাণে আহার করিবেন।

(৪০)

ভগবান তোমার মধ্যে এবং অপর সকলের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

অগ্রসর হইবার প্রণালী ও পথ প্রাপ্ত হইলে, স্বীয় অন্তরের মধ্যেই তাঁহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিবে এবং তাঁহার কৃপা ও সাহায্যের জন্য তদ্দিকে তাকাইবে। তাঁহাকে ভালবাস, কারণ ভালবাসা ব্যতীত তিনি তোমাকে টানিবেন না। প্রেমের আকর্ষণ পরস্পরের মধ্যেই হইয়া থাকে; সুতরাং তুমি তাঁহাকে যতই ভাল বাসিবে, তিনিও তাঁহার কৃপা করুণা ততই প্রদান করিবেন।

(৪১)

কখনো কখনো তোমার উন্নতি অলক্ষিতে ঘটিয়া থাকে। প্রতিদিন তুমি কিছু কিছু অগ্রসর হইতেছ, কিন্তু এই উন্নতির বিষয় তুমি সর্ব্বদা জানিতে পার না। তোমার মনে হয় তোমার কিছুই হইতেছে না, অথচ ঠিক বিপরীত ঘটিতেছে। ধীরভাবে অপেক্ষা কর, একদিন বুঝিবে তিনি যে প্রণালীতে তোমার উন্নতি সাধন করিতেছেন সেই প্রণালীটি তুমি বুঝিতে পার নাই বলিয়াই তোমার মনে ঐ ধারণাটি হইয়াছিল। এবং উক্ত ধারণাটি ভ্রান্ত ইহা জানিয়া সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করিবে।

(৪২)

যদি কখনো নৈরাশ্য বা নিরুৎসাহ আইসে, মনে মনে তাঁহাকে ডাকিবে, তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিবে, এবং দৈনিক উপাসনা কার্য্য যথাবিধি করিয়া যাইবে; কিন্তু তদ্দণ্ডেই তাঁহার কৃপালাভের প্রত্যাশা করিও না। এই উপায়েই ভক্ত তাহার দীর্ঘ পথে অগ্রসর হইতে পারে। অতিরিক্ত অধীরতা বা নৈরাশ্য সাবধানে ত্যাগ করিবে।

(৪৩)

তিনি সর্ব্বদাই গোপনে কৃপা করিতেছেন; ইহার বাহ্য প্রকাশ তুমি ইচ্ছা করিলেও সর্ব্বদা দেখিতে পাওনা। এই বাহ্য প্রকাশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং ইহা উপলব্ধি করিবার শক্তিও তিনি তোমাকে অধিকতর দান করিবেন। স্মরণ রাখিও তিনি অনেক সময় লুকাইয়া দয়া করেন, কারণ এরূপ করাতে তোমার কিছু উপকার হয়।

(৪৪)

বিষাদ উন্নতির একটি অঙ্গ। যাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি আরম্ভ

হইয়াছে তাঁহাদের প্রায় সকলকেই পর্য্যায় ক্রমে হর্ষ বিষাদ অনুভব করিতে হয়।

(৪৫)

ব্যাকুলতা এবং প্রতীক্ষা উন্নতি রূপ চক্রকে বেগবান্ করে। অতএব এই দুটিকে সর্ব্বদা পোষণ ও বর্দ্ধন করিবে। এই দুটি উন্নতির নিশ্চিত প্রমাণ।

(৪৬)

উপাসনা কালে আনন্দ বোধ এবং ভগবদ্ভক্তি এই দুইটি তাঁহার কৃপার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। কারণ এই দুইটি দ্বারাই মনের ময়লা বিদূরিত হয়। মনে কি কি ময়লা আছে তাহা জানিতে হয় এবং উহা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে হয়, মন নির্ম্মল করিবার ইহাই প্রথম উপায়।

(৪৭)

তুমি ভগবানকে যে রূপে বা মূর্ত্তিতে ধ্যান কর (অর্থাৎ ধ্যানের সময় তুমি ভগবানে যে রূপ বা গুণ আরোপ কর) তাহা সমস্তই তোমার নিজের কল্পনা, তথাপি ইহাতে উপকার আছে। তোমার চিত্ত উচ্চ প্রদেশে দাঁড়াইবার একটা স্থান পায়। ইহা হইতে তুমি আনন্দ পাইবে এবং প্রকৃতির গভীরতর রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হইবে।

(৪৮)

ধ্যান করিবার সময় তোমার চিত্ত একটি বিষয়ে বা বস্তুতে স্থির থাকিবে ইহা যেন লক্ষ্য থাকে। ভগবানকে যেরূপেই ধ্যান কর, যদি ধ্যানের উক্ত উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উপাসনা কার্য্য ক্রমশঃ সহজ বোধ হইবে। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারিবে তুমি ধ্যানের ফললাভ করিতেছ।

(৪৯)

মানস উপাসনার তিনটি অঙ্গ,—সমীরণ (নাম জপ), ধ্যান ও ভজন। দিনের মধ্যে যতবার পার ততবার সমীরণ ও ধ্যান করিবে, কারণ উহারা ভজনের ন্যায় কষ্টসাধ্য নহে।

(৫০)

তুমি অন্তরের মধ্যে সাধারণতঃ যে আলোক দেখিতে পাও, উহা কতক

পরিমাণে ঐশ্বরিক হইলেও, জড় পদার্থের দ্বারা কিঞ্চিৎ মলিন। অতএব উহার উপর সম্পূর্ণরূপে চিত্ত অর্পণ করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা মায়িক এবং শীঘ্রই অদৃশ্য হইবে। বাস্তব এবং শুদ্ধ আলোক (ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ) তোমার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অনেক দূরে, অনেক উচ্চে। কিন্তু ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিলে এবং একটা নির্দ্দিষ্ট সোপান অতিক্রম করিলে, তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ জ্যোতিঃ তোমাকে চকিতের ন্যায় দেখাইবেন।

সমাপ্ত—

অনুবাদক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী

সৃষ্টিতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেদান্তের মত আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, মায়াশক্তির আবির্ভাব না হইলে কোন কার্য্যই হয় না এবং সেই শক্তিহীন অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে কোন প্রমাণ দ্বারাই স্থির করা যায় না এজন্য তাহার অস্তিত্ব থাকা ও না থাকা দুইই সমান। সুতরাং এই অঘটন ঘটন চতুরা মায়াশক্তিই লীলাময় ভগবানের ক্রীড়া সাধন ব্রহ্মাণ্ডের মূল সূত্র। এই শক্তি হইতেই চরাচর জগতের উৎপত্তি বলিয়া ইহাকে প্রকৃতি (১) এই শক্তিতেই প্রলয়কালে সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে প্রধান (২) এবং ইহাই জগতের পূর্ব্বাবস্থা বলিয়া ইহাকে অব্যক্ত বলে। জগৎ এই অব্যক্তেরই পারিণাম সুতরাং জগৎও অব্যক্তময়। যে বস্তু যাহার পারিণাম তাহা তন্ময় হইয়া থাকে ; যেমন সূত্র হইতে উৎপন্ন বস্ত্র সূত্রময় এবং মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট মৃণ্ময়। কার্য্য যখন কারণ হইতে প্রকা-

(১) প্রকরোতি ইতি প্রকৃতি। যে করে সে প্রকৃতি।
(২) প্রধীয়তে লীয়তে অস্মিন্ ইতি প্রধানং। যাহাতে লয় হয় সেই প্রধান।
"প্রধানং স্থিত্যেব বর্ত্তমানং বিকারাকরণাদপ্রধানং স্যাৎ ; তথা গত্যেব।

শিত না হয়, তখন সে কারণে অব্যক্তভাবে থাকে, বস্ত্র প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে যে তাহার কারণ সূত্রেই অব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান ছিল, পরে তাহা হইতেই ব্যক্ত হইয়াছে। এই অব্যক্ত ও প্রলয় কালে সমস্ত জগৎ নিজ দেহে লীন হইলেও তিনিও সেই অনন্ত শক্তিমানের স্বরূপ শক্তিতে আত্ম সমর্পণ করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মহা বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করে। সে সময়ে স্বপ্রকাশ চিচ্ছক্তিও প্রকাশ্য অভাবে অপ্রকাশ হইয়া অবস্থান করেন সুতরাং অন্ধকারের সহিত তাহার কোনও পার্থক্য অনুভব করা যায় না। এই অবস্থা উদ্দেশ্য করিয়াই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রলয়াবস্থায় প্রকৃতিতে এরূপভাবে লীন হইয়াছিল যে প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রকার প্রমাণেরই অবিষয় হইয়াছিল। যাহা স্থূল তাহাই বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয় হয়। যাহা সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের পথ অতিক্রম করে তাহার প্রত্যক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এজন্য প্রকৃতি-লীন সূক্ষ্মতম পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নহে। অনুমান করিতে হইলেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের আবশ্যক। ধূম ও অগ্নি এক স্থানেই থাকে, অগ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকিলে ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান করা যায় না। প্রলয়কালে প্রত্যক্ষ যোগ্য কোন পদার্থই থাকে না, সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান না হওয়ায় অনুমানও হইতে পারে না। সে সময়ে অনুমান যোগ্য হেতুও থাকে না সমস্তই প্রকৃতিতে মিশিয়া গিয়াছে সুতরাং সে স্থানে অনুমান-প্রমাণ বিফল হইয়া যায় এবং বাহ্য শব্দ না থাকায় শব্দ প্রমাণ হইতেও তাহার নিশ্চয় হয় না। এই জন্য তাহা সর্ব্বতোভাবে অবিজ্ঞেয়। যাহার কিছু মাত্র জ্ঞান হয় না তাহাই অন্ধকারময়। সুষুপ্তি সময়ে জীব যেরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে তাহার পৃথক্ সত্তা থাকে না; সুষুপ্তি ভঙ্গে পৃথক্ বলিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ জগৎও প্রলয়ে প্রকৃতি-গর্ভে বিলীন থাকিয়া প্রলয় অবসানে পুনরায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই প্রকাশও নূতন ভাবে হয় না পূর্ব্বকল্পে যে যেরূপে প্রকাশিত ছিল প্রলয়াবসানেও সে সেইরূপেই উৎপন্ন হয়। "ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" বিধাতা পূর্ব্বকল্পের ন্যায়ই

বর্ত্তমান কল্পে সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ কারণে লীন পদার্থকে তর্কচতুর পণ্ডিতগণ অসৎ বলিয়াছেন। কিন্তু যাহা অসৎ তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" অসতের উৎপত্তি বা সতের বিনাশ নাই। যাহা সৎ তাহা চিরকালই সৎ। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য, কারণে অব্যক্ত থাকে পরে তাহা হইতেই অভিব্যক্ত হয়। যাহা থাকে তাহারই অভিব্যক্তি হইতে পারে। গৃহে মনুষ্য না থাকিলে সহস্র আলোক থাকিলেও তাহার প্রকাশ হইতে পারে না। এই জন্য কার্য্য কারণের একটি অলৌকিক সম্বন্ধও আছে। যাহা না থাকে তাহার উৎপত্তি বলিলে, এই কারণ হইতে অমুক কার্য্য হয়, ইহা হইতে হয় না এরূপ কোনও নিয়ম থাকিতে পারে না। তিলে তৈল থাকে বলিয়াই তাহা হইতে বহির্গত হয়, বালিতে থাকে না বলিয়াই তাহা হইতে বাহির হয় না। কার্য্য কারণের ঐরূপ নিয়ত সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, ঘট নির্ম্মাণের জন্য মৃত্তিকা সংগ্রহ এবং তৈলের জন্য তিল সংগ্রহের প্রয়োজন কি? অভাব হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইলে অভাব তো সর্ব্বত্রই সুলভ। ইহা হইতে অমুক কার্য্য জন্মে; এইরূপ কারণে যে কার্য্য উৎপাদনের শক্তি কল্পনা করা হয় উহাই উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে কার্য্যের সত্তা। তাহাকেই অনাগতাবস্থ কার্য্য বলে। সমস্ত কারণেই এইরূপে কার্য্য বর্ত্তমান থাকে এবং পরে তাহা হইতেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং জগৎও যে ব্রহ্মরূপ কারণ অবস্থায় পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল তাহা স্থির হইল। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।" ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬ষ্ঠ অধ্যায়। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপেই ছিল। সেই সৎ হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। সৎ বস্তু এক ভিন্ন দুই নাই। সেই বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের সত্তাংশ লইয়াই অন্য বস্তুতে সত্তার ব্যবহার হইয়া থাকে। লীলাময় যেরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাহাই সৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, আর যেরূপে তাঁহার আত্মপ্রকাশ নাই সে তুচ্ছ, সেই জন্যই তাহাকে অসৎ বলে। আকাশকুসুমে সেই প্রকাশরূপী পরমাত্মার কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই আকাশ-কুসুম বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতঃ" জগৎরূপকার্য্যে অনুপ্রবেশ এবং আকাশ কুসুমাদিতে তাহা না থাকায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যাহা হইতে হয়। যাহা সৎ

বলিয়া গৃহীত হয় তাহাতেই সতের অনুপ্রবেশ বা সম্বন্ধ আছে। এবং যাহাতে অনুপ্রবেশ নাই তাহাকে অসৎ বলে। সুতরাং সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ যেরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাহা সৎ এবং যেরূপে আত্মপ্রকাশ করেন নাই তাহাই অসৎ বলিয়া পরিচিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সেই এক বস্তু ভিন্ন অন্যের পৃথক্ সত্তা নাই, সুতরাং সৎ বলিয়া পরিচিত এই জগৎ সৎ ব্রহ্মেরই কার্য্য বা ক্রমিক বিকাশ। এই ক্রম বিকাশের নাম সৃষ্টি ও সৃষ্টির বিপরীত ক্রমে কারণে কার্য্যের লয় হওয়াকে প্রলয় বলে। এই সৃষ্টি ও প্রলয়কে অধ্যারোপ ও অপবাদ বলে। রজ্জুতে যেরূপ সর্পের আরোপ হয় সেইরূপ সত্য বস্তু ব্রহ্মে মিথ্যা জগতের আরোপকে অধ্যারোপ বলে। এই অধ্যারোপই সৃষ্টি এবং যেমন সর্প জ্ঞান রহিত হইলে পূর্ব্ব দৃষ্ট সর্প, রজ্জু ভিন্ন কিছুই নয় এইরূপ জ্ঞান হয়, সেইরূপ সৃষ্ট পদার্থের অসত্যতা জ্ঞান হইলে সমস্তই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানকে অপবাদ বলে। এই অপবাদই লয়। এই অধ্যারোপ ও অপবাদ জ্ঞান না হইলে অদ্বৈত জ্ঞান হয় না এই জন্যই শাস্ত্রে সৃষ্টি ও প্রলয়ের উল্লেখ হইয়াছে। শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন "স গুরুঃ পরমকৃপয়া অধ্যারোপাপবাদন্যায়েনৈনমুপদিশতি" অর্থাৎ গুরু দয়া করিয়া অধ্যারোপ ও অপবাদ যুক্তি দ্বারা শিষ্যকে অদ্বৈত তত্ত্বের উপদেশ দিবেন। এই অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে মৃত্যুভয় নিবারিত হয় না। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" অদ্বৈত পদার্থে যে নানারূপ দর্শন করে তাহার মৃত্যু হয় অর্থাৎ জন্মের পর মরণ, পুনর্ব্বার জন্ম, আবার মরণ এইরূপে নিয়ত সংসারে পরিভ্রমণ করে। এই অধ্যারোপ অর্থাৎ সৃষ্টি প্রণালী দেখাইয়া অদ্বৈত প্রতিপাদন করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে কিরূপে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি হয় এবং কিরূপেই বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় তাহাই এস্থানের আলোচ্য। এই সৃষ্টি প্রকরণ ভাগবতে যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, আমি সেই রূপেই প্রতিপাদন করিব। এই ভাগবতেও অদ্বৈতবাদেরই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই অদ্বৈত তত্ত্ব অতি দুর্ব্বোধ একথা পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি। সুতরাং মায়াশক্তির আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া কার্য্য-কারণের নিয়মানুসারে অন্যান্য পদার্থের সৃষ্টি-বুঝিতে দ্বৈতবাদীর ন্যায় প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই বুঝিতে হইবে। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ লইয়া চিরদিনই

বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদিগণেরও পরস্পর মতভেদ বহুপ্রকার রহিয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈত এবং রামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়াছেন, এইরূপ দ্বৈতবাদী সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনকারগণ প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ মত অবলম্বন করিয়াছেন। এই ভিন্ন ভিন্ন মতের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে বোধ হয় যে, নিজ নিজ বুদ্ধির প্রসার যাঁহার যতদূর হইয়াছে, তিনি ততদূর পর্য্যন্ত গিয়াছেন। একটি আখ্যায়িকা দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব। কোনও সময়ে কয়েকজন অন্ধ হস্তী কিরূপ জানিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়। ইহা দেখিয়া একজন দয়ালু হস্তিপালক একটি হস্তীর নিকটে ঐ অন্ধদিগকে লইয়া যায়। অন্ধগণ পরম আনন্দিত হইয়া হস্তীর নিকটে গেল এবং কেহ পদ, কেহ শুণ্ড, কেহ উদর, কেহবা পুচ্ছ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া, সকলেই হস্তীর স্বরূপ জানিতে পারিয়াছি মনে করিয়া আনন্দ প্রকাশ ও পরস্পরের নিকট হস্তীর পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। যে হস্তীর বিশাল দীর্ঘ জঙ্ঘা স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল, হস্তী একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের গুঁড়ির মত। যে শুণ্ডে হাত দিয়াছিল, সে বলিল, ঠিক গাছের গুঁড়ির মত নয়, নিম্নদিকে ক্রমান্বয়ে সরু এবং খুব লম্বা। যে উদর স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল,—হস্তী লম্বা হইবে কেন? অপরিমেয়, অসীম। যে পুচ্ছে হাত দিয়াছিল, সে বলিল,—হস্তী একগাছি মোটা দড়ির মত। এইরূপ যে যে অংশ স্পর্শ করিয়াছিল, সে সেইরূপই হস্তীর আকার স্থির করিল। বাক্য ও মনের অগোচর ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতেও সকলেই অন্ধ। সেই অলৌকিক পদার্থ নিশ্চয় করা লোক-বুদ্ধির আয়ত্তাধীন নহে, সেই জন্য সকল প্রমাণ অপেক্ষা প্রধান প্রমাণ অপৌরুষেয় বেদবাক্য প্রমাণ বলিয়া, বহুশ্রুতি-প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। লীলাময় ভগবানের লীলা কে বুঝিতে পারে? যে লীলায় জগৎ মুগ্ধ, যাঁহার অলৌকিক প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ব্রহ্মাও মুগ্ধ হইয়া সৃষ্টি করিতে অসমর্থ হইয়া ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন, সেই অনন্তশক্তির মহিমা অপার অনন্ত। জগৎ সৃষ্টি তাঁহার অপূর্ব্ব লীলা মাত্র। শিশু যেমন কোনও উদ্দেশ্য না রাখিয়া নানারূপ ক্রীড়া সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হয়, উন্মত্ত যেমন অভিসন্ধি না করিয়া নানা কার্য্যে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকে, মায়াবী যেমন ইন্দ্রজাল

দেখাইতে গিয়া কোনওটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর কোনওটি বা বিকলাঙ্গ জীব সৃষ্টি করে, ভগবানও তেমন কোনও অভিসন্ধি না রাখিয়া সুখী দুঃখী নানারূপ জীব সৃষ্টি করিয়া ক্রীড়া করিবার ছলে সেই সেইরূপে নিজেই আবির্ভূত হইয়া নানারূপে বিরাজ করিতেছেন। অথবা পরম কারুণিক ভক্তবৎসল ভগবানের পাপীর উদ্ধার ও ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করাই উদ্দেশ্য। অনাদি সংসারে কল্পের পর কল্প এইরূপে কতকল্প অতীত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের কর্ম্মফল অনুসারে জীব পর পর কল্পেও জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ পূর্ব্বকল্পে কেহ অল্পজ্ঞান, কেহ অর্দ্ধ জ্ঞান, কেহ বা ততোঽধিক জ্ঞানলাভ করিয়া, সৃষ্টির নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম হওয়ায় প্রলয়কালে আসিয়া উপস্থিত হইলে, জীবগণ মুক্তিলাভ করিতে অবসর পায় না। করুণাময় ভগবান্ তাহাদের সকলকেই মুক্তির পথ দেখাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত, পৃথিবীর ভারাবতরণ করাই তাঁহার অভিপ্রেত। সেই অভিপ্রায় সাধনের জন্যই জীবন্মুক্ত ভক্তগণকে ভূতলে অবতারিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা অজ্ঞান-তিমির-আচ্ছন্ন জীবগণকে তত্ত্ব উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে চরিতার্থ করেন। কখনও বা স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া শোক-সমাকুল প্রাণিকুলের অকূল সংসার-সাগরের কূল দেখাইবার জন্য দুর্ভেদ্য দেহ-কারাগার হইতে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। ভগবান্ যখন দেখিলেন যে, অর্জ্জুন, যুদ্ধ করিতে সমাগত আত্মীয় স্বজনগণকে বধ করিয়া রাজ্যভোগ করা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করাও শ্রেয়স্কর মনে করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন, তখন, প্রবল-অজ্ঞান তিমির আসিয়া তাঁহার বিবেক আচ্ছন্ন করিয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে তত্ত্ব উপদেশ দিয়া (অর্জ্জুনের সেই) অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করত যিনি কৃতার্থ করিয়াছিলেন, গোপনারীগণকে ভগবৎ-প্রেম সাগরে ভাসাইয়া যিনি অনন্তের অনন্তক্রোড়ে স্থান দিয়া অনন্ত সুখের অধিকারিণী করিয়াছিলেন, যাঁহার পবিত্র নামাবলী কলিরাজ-কিঙ্কর নর-নারীগণের একমাত্র অবলম্বন, যাঁহার পাদপঙ্কজ-গলিত পূত-বারি পুণ্যতোয়া জাহ্নবীরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিকালের কলুষপঙ্ক নিরন্তর ধৌত করিতেছে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ নন্ত, অনন্ত জীবগণকে অনন্তধামের অমৃতময় শান্তি-প্রস্রবণের শীতল সলিল পান করাইবার জন্যই, তাহাদিগকে ক্রমোন্নতির পথ দেখাইবার জন্যই কর্ম্মাধীন

জীবের অন্তর্যামিভাবে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকেই স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট সম্পাদনের জন্ম নিযুক্ত করেন, ইহাই ভগবানের সৃষ্টি-কৌশল। জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে যেরূপে জন্মগ্রহণ করে, ভগবান্ তদনুরূপ দেহে জীবভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন (১)। এবং সেই অনুপ্রবেশেই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক জগতের সৃষ্টি হয়। অচেতন পদার্থগুলি জীবের ভোগের উপকরণ। ভোগ সমাপ্ত হইলেই সেই সমস্ত প্রকৃতির কার্য্য প্রকৃতিতেই লীন হইয়া যায়। সাঙ্খ্যাচার্য্য কপিল বলিয়াছেন, অনাদি কর্ম্মবাসনায় আবদ্ধ জীব যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতির কার্য্যকে নিজের বলিয়া মনে করিয়া অভিন্নভাবে প্রকৃতির সহিত মিলিত থাকে, ততদিনই প্রকৃতি সেই পুরুষের জন্ম ভোগ্য সামগ্রী সৃষ্টি করে। জীব যতদিন পর্য্যন্ত মুক্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্তই এইরূপ প্রাকৃতিক সৃষ্টি-প্রবাহ চলিতে থাকে। পুরুষকে মুক্ত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি পর্য্যন্ত সৃষ্টি না করিয়া প্রকৃতি ক্ষান্ত হয় না।

"ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ।
পুরুষস্ত বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তং॥" সাঙ্খ্য কারিকা।

অর্থাৎ কোনও বিষয়ে বলবতী ইচ্ছা হইলে লোক যেমন সেই ইচ্ছা নিবৃত্তির জন্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহার সেই কার্য্যটি সম্পন্ন হইলেই ইচ্ছার নিবৃত্তি হয় ও কার্য্য হইতে বিরত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ বিবেক-জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ পর্য্যন্তই পুরুষের ভোগের উপকরণ সৃষ্টি করে। মুক্তি হইলেই প্রকৃতির সেই ইচ্ছার নিবৃত্তি হয়। সে তখন পুরুষ হইতে পৃথক হইয়া অবস্থান করে। এইরূপে ক্রিয়া-শূন্য প্রকৃতি ও স্বভাবত ক্রিয়াশূন্য পুরুষের পৃথক্ ভাবে অবস্থানেই সর্ব্ব দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইয়া থাকে। সাঙ্খ্যের প্রকৃতি নিত্যা সুতরাং প্রাকৃতিক সৃষ্টি বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে বীজ উৎপন্ন হয়; ইহার কোন্‌টি প্রথমে হইয়াছে, তাহা যেমন স্থির করা যায় না, সেইরূপ জন্ম হইতে কর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে জন্ম এইরূপ অনাদি

(১) "হন্তাহমিমাস্তিস্রোদেবতা অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ছান্দোগ্য উপনিষৎ। অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ এই তিন ভূতে জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ প্রকাশ করিব।

সংসার-চক্র অনাদি কাল হইতে পর্য্যায়ক্রমে চলিয়া আসিতেছে। জীব এই চক্রে নিয়ত ঘুরিতেছে। ভগবানের কাল-শক্তিই ইহার দণ্ড। তাহা হইতে ক্রিয়াশক্তি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ এই দণ্ড ধারণ করিয়া নিরন্তর সংসারচক্র-ঘূর্ণনে, নিযুক্ত রহিয়াছেন। সেই লীলাময়ের ইচ্ছায় কথনও কখনও এই ঘূর্ণনের বিশ্রাম হয়। ঐ বিশ্রামকালের নাম প্রলয়। ঐ প্রলয়কালে কোন বস্তুরই পৃথক্ সত্তা থাকে না। সমস্তই ভগবানের স্বরূপ চৈতন্যে লীন হইয়া থাকে। পরে 'আমি প্রজারূপে বহু হইব' তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা হয়। "স ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ছান্দোগ্য উপনিষৎ। অর্থাৎ সেই পরমাত্মা, আমি বহু হইব অতএব প্রজারূপে প্রকাশিত হইব, এইরূপ আলোচনা করিলেন। যখন তাঁহার ঐরূপ আলোচনা হইল, তখনই চৈতন্য-দীপ্তিতে প্রলয়ান্ধকার দূর করিয়া ত্রিগুণা মায়াশক্তি আবির্ভূতা হইলেন। এই মায়াশক্তিতে প্রতিবিম্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভগবান পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এই মায়াশক্তি-অধিষ্ঠিত পুরুষই পুরুষাবতারের প্রথম পুরুষ। পূর্ব্বোক্ত উপাধি-শূন্য চৈতন্যকে তুরীয় চৈতন্য বলে। ইনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত স্বপ্রকাশ। মায়া উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহাতে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইল। এই মায়া উপাধি অতি স্বচ্ছ। নির্ম্মল কাচ যেমন আলোকের আবরণ করিতে পারে না, সেইরূপ নির্ম্মল মায়া সংযোগেও জ্ঞান, ক্রিয়াশক্তির কিছু মাত্র আবরণ হইল না, সুতরাং মায়া-অধিষ্ঠিত প্রথম পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বররূপে অবতীর্ণ হইলেন। সাত্বত তন্ত্রে পুরুষাবতারের কথা এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ঞ্চাণ্ডসংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।

আদি পুরুষ বিষ্ণুর পুরুষাবতার তিনটি। মহত্তত্ত্ব যাহা হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রথম, অণ্ডস্থিত পুরুষ দ্বিতীয়, সকল প্রাণীতে অন্তর্যামিভাবে অবস্থিত তৃতীয়। তাহাদিগকে জানিতে পারিলে মুক্তি হয়। এই প্রথম পুরুষই কারণোদকশায়ী বিষ্ণু। এই বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত কালশক্তি প্রভাবে ত্রিগুণ মায়ার গুণক্ষোভ হইলে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে।

সাবা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়ানাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥
কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেণ বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্।
ততোহভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্দ, ৫ম অঃ ২৫।২৬।২৭ শ্লোক।

দ্রষ্টা পরমেশ্বরের দৃশ্য পদার্থ সমূহের আলোচনা শক্তিই কার্য্য ও কারণ এই উভয়রূপে অবস্থিত। ইহাকেই মায়া বলে। ভগবান সেই মায়া দ্বারাই এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবান বিষ্ণু ত্রিগুণ মায়াতে পুরুষরূপে চিচ্ছক্তির আভাস প্রতিবিম্বিত করিলে কালশক্তি বশে সেই অব্যক্ত ক্ষুভিত হইল। এবং সেই ক্ষুভিত অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হইল। বিজ্ঞানাত্মা মহত্তত্ত্ব, বীজগত অঙ্কুর যেমন বৃক্ষকে প্রকাশ করে, সেইরূপ নিজ-দেহস্থ বিশ্ব প্রকাশ কবিলেন। এই মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার সৃষ্টি ও গুণচিদাভাসও কালশক্তির অধীন।

সোহপ্যংশগুণকালাত্মা ভগবদ্দৃষ্টিগোচরঃ।
আত্মানং ব্যাকরোদাত্মা বিশ্বস্যাস্য সিসৃক্ষয়া ॥

অনন্তর সেই মহত্তত্ত্ব, গুণ, চিদাভাস ও কালশক্তি অধীন হইয়া ভগবানের দৃষ্টিগোচর হইলে এই বিশ্বেব সৃষ্টি ইচ্ছায় আপনার রূপান্তর করিলেন। যাহাতে চিদাভাস প্রতিফলিত হয়, সেই কালশক্তি প্রেরিত হইয়া গুণক্ষোভ প্রাপ্ত হয়, তৎপরে তাহা হইতে অন্য তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি ও কাল-শক্তির সমাবেশ না হইলে কোন কার্য্যই হয় না। শাস্ত্রে কথিত আছে,—

দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ পুরুষর্ষভ।
ত্রয়মেতন্মনুষ্যাণাং পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহং ॥

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। দৈব, পুরুষকার ও কাল এই তিনটি একত্র মিলিত হইয়া মনুষ্যের শুভাশুভ ফল সম্পাদন করে। ইহার মধ্যে একটির অভাব হইলেও অন্যের শক্তির বিকাশ হয় না। ভাগবতের পূর্ব্ব-উদ্ধৃত শ্লোক হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। চিদাভাস, দৈব; ঐ দৈব সহিত মিলিত কাল হইতে যে

গুণক্ষোভ হয়, উহাই তাহাদের পুরুষকার। মহত্তত্ত্বের পূর্ব্বোক্ত রূপান্তর হইতেই অহঙ্কার-তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। ত্রিগুণ মায়ার কার্য্য সকলেই সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ-ময়। এই ত্রিগুণের ভেদ বশতঃ সমস্তই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন রূপে প্রকাশিত। ঐ সকল গুণের আধিক্য বশতঃই ঐরূপ পৃথক নাম ও গুণের পার্থক্য হয়। উল্লিখিত অহঙ্কারও তিন প্রকার, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিদাভাস প্রাপ্ত হইয়া কাল-শক্তিতে গুণক্ষোভ হইলে ভগবানের অলৌকিক ইচ্ছা প্রেরিত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তামসিক অহঙ্কার হইতে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্ব কথিত নিয়মে শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশের উৎপত্তি, এই জন্য আকাশের গুণ শব্দ। স্পর্শ-তন্মাত্র সংযুক্ত আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি। ঐ বায়ুতে উভয় কারণের গুণ অভিব্যক্ত হওয়ায় শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর গুণ। এইরূপ রূপ-তন্মাত্র সংযুক্ত বায়ু হইতে অগ্নি,—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিন গুণযুক্ত, রস-তন্মাত্র যুক্ত অগ্নি হইতে জল,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারি গুণযুক্ত এবং গন্ধ-তন্মাত্র সংযুক্ত জল হইতে পৃথিবী,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ গুণযুক্ত, উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব কারণের গুণ অনুসারে গুণ পাইয়াছে। এজন্য আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকেরই এক একটি গুণ অধিক হইয়াছে। চিচ্ছক্তির অনুপ্রবেশে উৎপন্ন এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন রূপে প্রকাশিত। এই তত্ত্বগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ সকলেই সমভাবে উৎপন্ন এবং অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন দেবতাগণ অহং বুদ্ধিতে স্ব স্ব প্রধান হইলেন, কেহই অন্যের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত সৃষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন না। এবং তখন তাঁহারা সকলেই কর্ত্তব্যপালনে বিফল-মনোরথ হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, একত্র হইয়া ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্ত-বৎসল ভগবান্ তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অন্তর্য্যামিরূপে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রলয়কালে বিলীন তাহাদের ক্রিয়া-শক্তি অথবা জীবগণের পূর্ব্বজন্মার্জিত অদৃষ্টরূপে অবস্থিত কর্ম্ম-সমূহের অভিব্যক্তি করত সংহনন-শক্তি দ্বারা সকলকে একত্র করিলেন।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ।

(চণ্ডী)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিষ্য। আপনার কৃপায় অনেকগুলি সংশয় দূর হইল। এখন পুনরায় মূল বিষয়ে উপস্থিত হওয়া যাক। যখন সবই ভগবান্‌, তখন অবশ্য লোভী, কৃপণ, হিংস্র, খল, কপট, লম্পট প্রভৃতি দুষ্ট-চরিত্র ব্যক্তির মধ্যেও তিনি বিরাজিত ?

গুরু। নিশ্চয়ই। কারণ তাহারা তো সৃষ্টি ছাড়া নহে। দেখ, এই ভাবটি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে যেরূপ সুললিত সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বোধ করি জগতের কুত্রাপি সেরূপ হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যদি চণ্ডী না পড়িয়া থাক, একবার পাঠ করিয়া দেখিও, প্রতি পত্রে—প্রতি ছত্রে চরম জ্ঞান, চরম ভক্তি ও চরম কবিত্বের পরিচয় পাইবে। চণ্ডীস্তব জগতে অতুলনীয়, তাই ইহা হিন্দুর নিত্য পাঠ্য। যখন ব্রহ্মময়ীর স্তবের সহিত তোমার হৃদয় একতান হইয়া যাইবে, পড়িতে পড়িতে যখন অন্তরের সহিত বলিতে পারিবে "যিনি হিংসারূপে প্রেমরূপে লোভরূপে ত্যাগরূপে, দয়ারূপে, নিষ্ঠুরতারূপে, ক্রোধরূপে ক্ষমারূপে, লক্ষ্মীরূপে, জ্ঞানরূপে, অজ্ঞানরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ," তখন তোমার জীবন ধন্য, সেই মুহূর্ত্তটি তোমার জীবনের একটি অমূল্য মুহূর্ত্ত ; কারণ তৎকালে তোমার নিকট সুন্দর কুৎসিত, পবিত্র অপবিত্র, উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, চোর সাধু, প্রিয় অপ্রিয় কেহই থাকিবে না ; তুমি ক্ষণেকের জন্য এক অপূর্ব্ব শান্তিতে ভাসিবে।

শিষ্য। এই ভাবটি যদি সমগ্র জীবনে অক্ষুণ্ণ, নিরবচ্ছিন্ন থাকিয়া যায়, (যেমন প্রহ্লাদের ছিল), তাহাকেই তো আপনি ব্রহ্মসদ্ভাব বলিয়াছেন। সমগ্র জীবনে রাখা দূরে থাক্‌, আমরা এক মুহূর্ত্ত, এক সেকেণ্ডও রাখিতে পারি কি না সন্দেহ। আমিত ধারণাই করিতে পারি না কিরূপে একটা দুর্দ্দান্ত হিংস্র-প্রকৃতি পশুতুল্য মানুষেও ভগবান্‌কে দেখা যায়।

গুরু। ইহা বড়ই কঠিন, অনেক সাধনার ফল। অগ্রে যে সকল বস্তুতে তাঁহার অধিক বিকাশ, সেই সকলে তাঁহাকে দেখিতে হয়। সূর্য্যের তেজ প্রস্তরেও আছে অগ্নিতেও আছে সত্য, কিন্তু এক অন্ধকে যদি ঐ অসীম তেজের একটু আভাস দিতে চাও, তাহার হস্তে এক খণ্ড প্রস্তর দিলে সে তেজের কিছু ধারণা করিতে পারে কি ?

শিষ্য। কোন্ কোন্ পদার্থে ভগবানের অধিক বিকাশ তাহা জানিব কিরূপে ?

গুরু। গীতার দশম অধ্যায়ে অর্জ্জুন ভগবানকে ঠিক ঐরূপ প্রশ্নই করিয়াছিলেন—"কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া।" ইহার উত্তরে ভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পার কোন্ কোন্ পদার্থে তিনি সমধিক বিকাশপ্রাপ্ত। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে প্রত্যেক শ্রেণীর বস্তুর মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুন্দর, তেজস্বী বা বলবান্ সেইটিতেই তাঁহার অধিক বিকাশ বা অভিব্যক্তি।

শিষ্য। তাহা হইলে, আপনি বলিতেছেন সুন্দর কুৎসিত, পবিত্র অপবিত্র প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুতে ভগবানকে দেখা বড়ই কঠিন বলিয়া আমরা প্রথমে কেবল সুন্দর ও ভাল বস্তু গুলিতেই তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিব, কারণ এই গুলিতেই তিনি সমধিক বিকাশিত। আচ্ছা, মন্দ বস্তু গুলিতে তাঁহাকে দেখিতে হইলে কিরূপে দেখিতে হয় ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখন লাল রায় চৌধুরী।

ওঁ
পন্থা
মহাজনো যেন গতঃ স
সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৩শ ভাগ } পৌষ, ১৩১৬ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

বহুরূপী।

আলাইয়া—ধামার।

ঝরিছে চৌদিকে আহা
করুণা ধারা তোমার।
অসংখ্য মূরতি ধরি,
বিরাজিছ নিরাকার॥
মাতৃরূপে দিয়ে স্তন,
করিছ কত যতন,
অরি সেজে কর রণ,
বাড়াতে শকতি মোর॥

পুত্র কন্যা রূপ ধরে,
নিয়ত কে সেবা করে,
পত্নীরূপে কার ঝরে,
মোর দুখে অশ্রুধার ॥
তরু হয়ে ছায়া ফল,
তু'বিনা কে দিবে বল,
মেঘরূপে ঢালো জল
অনন্ত রূপ তোমার ॥
কভু এসে গুরুরূপে,
তারিছ সংসার-কূপে,
কভু রোগ শোক রূপে
খুলিছ বৈরাগ্য দ্বার ॥
মিত্ররূপে যত দান,
করিছ হে বিশ্বপ্রাণ,
শত্রুরূপে শত গুণ,
এ রহস্য বুঝা ভার ॥

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

গীতা-তত্ত্ব।

(শুভরায়ের গীতা-তত্ত্বের মর্ম্মানুবাদ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম প্রবন্ধ।*

যদি কোন একটি মতের উপর কোন ব্যক্তির অত্যন্ত আস্থা থাকে, তাহা হইলে, তিনি নূতন মত সহজে গ্রহণ করিতে চান না, তাহার কারণ আমরা যে বিষয় পছন্দ করি তাহা সহজে বদলাইতে চাহি না। কিন্তু কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, মন স্থির করিয়া বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। আমার মনের গতি অন্যরূপ বলিয়া যে কোন একটি মতের সত্যাসত্য একেবারে পরীক্ষা করিব না ইহা অন্যায়। কারণ সত্যই আমাদের লক্ষ্য। সত্য নিরূপণের জন্য পরীক্ষা আবশ্যক। সত্য নিরূপণের অন্তরায় এরূপ মানসিক অবস্থা কখনই ভাল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সকলের সকল মত প্রকাশেরই সমান স্বাধীনতা আছে। সত্যাসত্য পরীক্ষা না করিয়া কোন মতকে ভ্রমাত্মক বা অসত্য বলা সঙ্কীর্ণ মনের কাজ।

গীতার ধর্ম্ম শিক্ষক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির কতকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উপায় গুলি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে সত্য পথে যাইবার অনেকটা সুবিধা হয়। কিন্তু এই উপদেশ গুলির যথার্থ তত্ত্ব বুঝিতে না পারিলে অনেক সময় ভ্রমে পড়িতে হয়। গীতা কতকগুলি বিষয় না বুঝাইয়া মানিয়া লইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও এই সমস্ত তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই তথাপি স্থানে স্থানে আপনার মত সমর্থনের জন্য এই সমস্ত তত্ত্বের সাহায্য লইতে ত্রুটি করেন নাই। গীতার সত্যাসত্যের প্রমাণের জন্য এই সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব গুলি উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক।

গীতার তলদেশে এই দার্শনিক ভিত্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজ করিতেছে। সেই জন্য ইহাই আমাদের প্রথম জানিবার বিষয়। বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতেরা

* কোন কারণে দ্বিতীয় প্রবন্ধ ইহার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। পঃ সঃ

যেরূপ আলোচনার বিষয়ীভূত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। আমার এখানে গীতা-তত্ত্ব সমূহ সেরূপ করা অসম্ভব। কারণ ব্যাপারটি অতি বৃহৎ, জ্যামিতি শাস্ত্রে যেরূপ কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লওয়া হয় আমিও এখানে সেইরূপ কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লইব। এগুলি বুঝা কিছু আয়াস-সাপেক্ষ। শিক্ষার্থী যদি ইচ্ছা করেন চেষ্টা দ্বারা বুঝিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারেন।

এই সমস্ত তত্ত্ব অনেক স্থলে সাধারণ যুক্তি ও জ্ঞানের অতীত। সেই জন্য সাধারণের উপযুক্ত করিয়া বুঝান এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু অভি-নিবেশ করিলে দেখা যায় যে জগতে এতাবৎ দর্শন বা বিজ্ঞানের যে কোন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনটিরই সহিত এই সমস্ত তত্ত্বের অসা-মঞ্জস্য নাই। ঘটনাবলীর সহিত অসমাবেশহেতু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই সমস্ত তত্ত্ব অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এই গুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ের বা শিক্ষার সত্যাসত্য দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথম মানবের প্রকৃতি ও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি আর দ্বিতীয় জগতের অন্তর্নিহিত শক্তি এই দুইটি শক্তির স্বরূপ না বুঝিলে আমরা মানুষের শেষ লক্ষ্যের বিষয় কিছুই স্থির করিতে পারি না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উন্নতির কোন নির্দ্দিষ্ট পথ না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত উন্নতির পক্ষে কিরূপ শিক্ষা যথার্থ ফলপ্রদ তাহাও নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। সেই জন্য গীতা সম্যক্‌রূপ বুঝিতে হইলে জগতের ও মানবের প্রকৃতি ও উন্নতির যথার্থ লক্ষ্য স্থির করা প্রথম কর্ত্তব্য।

আদিকারণ হইতে সাকার পর্য্যন্ত চারিটি তত্ত্বের নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাহাদের স্বরূপাদি আমি ক্রমবিকাশের পর্য্যায়ক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথম তত্ত্ব বা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় পরব্রহ্ম। কোন দার্শনিকই মূল কারণের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। নাস্তিকেরাও ইহা অস্বীকার করে না। মূল কারণের অস্তিত্ব লইয়া কোন বিসম্বাদ নাই মানব এই আদিকারণে স্ব-বুদ্ধি মত বিভিন্ন গুণ আরোপ করিতে গিয়াই মতভেদ ও শ্রেণীভেদের বিড়ম্বনা উপস্থিত

করিয়াছে। আমরা এই আদিকারণের বাহ্যিক বিকাশের বিষয় সকল কথা জানিতে পারি কিন্তু ইহার গভীর রহস্য ভেদ করিয়া ইহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে বা অবধারণ করিতে কথনই সক্ষম নহি। সকল দর্শনকারই স্বীকার করেন যে এই আদি কারণ সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন ইনি পর্য্যায়ক্রমে কার্য্যশীল ও নিশ্চল ইহাও সর্ব্ববাদী সম্মত। প্রলয়ে ইনি নিশ্চল ও জাতিবিকাশের সময় ইনি কার্য্যশীল। সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না কারণ পরব্রহ্ম জড় বা জড়বৎ কোন পদার্থ নহেন। ইনি চৈতন্যও নহেন কারণ নির্দ্দিষ্ট আধার ব্যতীত আমরা চৈতন্যের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি না। উপাধিশূন্য চৈতন্য কিরূপ তাহা আমাদের ত দূরের কথা অহংজ্ঞানশালী কোন বুদ্ধিরই গম্য নহে। পরব্রহ্ম আত্মা নহেন কারণ আত্মা শাস্ত্রে আত্মজ্ঞান যুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, পরব্রহ্ম এরূপ আত্মজ্ঞান যুক্ত নহেন। পরব্রহ্ম জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় কিছুই নহেন। জগতে সমস্তই এই তিনের অন্তর্গত কিন্তু পরব্রহ্ম ইহার কিছুরই মধ্যে নহেন। কিন্তু তিনি যে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞানের কারণ তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। জ্ঞানের বিষয় সমস্ত অনাত্ম জিনিষই কতকগুলি গুণের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যুক্তি দ্বারাই হউক বা বোধ দ্বারাই হউক আমরা এই সমস্ত গুণের অধিকারস্বরূপ কোন সত্তা নিশ্চয়ই আছে মনে করি। অর্থাৎ এই সমস্ত গুণের আধারভূত কিছু একটা বস্তু আছে ইহাই আমাদের মনে হয়। যদিও কি তাহা বুঝিতে পারি না তথাপি মনে হয় যেন একটা কিছু আছেই আছে।

সমস্ত বৈদান্তিকেরাই পরব্রহ্মকে বিশ্বের স্থায়ী কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঋষিরা লিখিয়াছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। এই বাক্যে তাঁহারা সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া বিবেচনা করিতে বলিতেছেন না। মৃত্তিকা ও জল যেরূপ স্তম্ভের উপাদান কারণ সেরূপ ভাবে তাঁহারা ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণও বলিতেছেন না। তাঁহারা ব্রহ্মকে আমাদের গোচরীভূত তাবৎ গুণ সমষ্টির স্থায়ী ভিত্তি বলিয়া বুঝাইতেছেন। সমস্ত পদার্থের আধার ও হেতু-স্বরূপ পরব্রহ্ম যদিও জ্ঞানের বস্তু নহেন কিন্তু তিনি সর্ব্বসত্তার ও সর্ব্বজ্ঞানের এক মাত্র উৎপত্তি স্থল।

পরব্রহ্মই যথার্থ সত্তা ঈশ্বর ইঁহার শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ। ইঁহাকে ঋষিরা

প্রত্যগাত্মারা শব্দব্রহ্ম বলিয়াছেন। খৃষ্ট উপাসকেরা ইহাঁকে ভার্ব্‌ম্‌ বা মহাবাক্য বলেন। ইনি খৃষ্টস্বরূপে অনন্ত আত্মায় সর্ব্বদা লীন হইয়া আছেন। বৌদ্ধেরা ইঁহাকে অবলোকিতেশ্বর বলেন। সকল ধর্ম্মেই অনন্তব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ ঈশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রলয়ের সময় ইনি অব্যক্তভাবে ব্রহ্মে লীন থাকেন আবার সৃষ্টির সময় জ্ঞানময়-শক্তি-কেন্দ্ররূপে ব্যক্ত হন। ইনিই জগতে প্রথম জ্ঞাতা। জগতে জ্ঞানশালী আর সমস্ত জীবই ইঁহার প্রতিবিম্ব মাত্র। ইনি পরব্রহ্মের ন্যায় জ্ঞানের অগম্য নহেন। পরন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেরই আয়ত্ত। ইহাঁরই রহস্য ভেদ করিতে গিয়া নানা দর্শনের উৎপত্তি। গীতা বুঝিবার জন্য অনেক সময়ে ইহাঁরই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ঈশ্বর স্বভাবে জড় নহেন। বস্তুতঃ ইনি পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। অথচ আত্মাভিমান প্রযুক্ত পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। সুষুপ্তির সময়ে আত্মার অব্যক্ত ভাবের ন্যায় ইনি প্রলয়কালে পরব্রহ্মে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিতি করেন। ইনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ, সেইজন্য অনেকস্থলে সচ্চিদানন্দ বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

ঈশ্বরে চৈতন্য ও স্বতন্ত্রসত্তা আছে। পরব্রহ্মে এই ঈশ্বররূপী অসংখ্য শক্তিকেন্দ্র বর্ত্তমান, এ ভাবে ঈশ্বর এক নহেন অসংখ্য। এই অসংখ্য ঈশ্বরেরা আবার স্বরূপতঃ একরূপ নহেন, ইঁহাদের পরস্পর বিভিন্নতা আছে। গীতা বুঝিবার জন্য ঈশ্বর-সমূহের বিভিন্নতা বুঝা আবশ্যক করে না কারণ অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিবার জন্য কোন বিশেষ ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। অন্যান্য তত্ত্ব বিবৃত হইলে ঈশ্বরের স্বরূপ আরও সহজ বোধ হইবে। ঈশ্বরই পরম ব্রহ্মের প্রথম অভিব্যক্তি, সমস্ত সৃষ্টির আরম্ভ ও বিবর্ত্তনের চরম লক্ষ্য। ইনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিত্তি এবং চৈতন্যরূপে জীবনের [illegible]ার।

ঈশ্বর স্বতন্ত্র সত্তারূপে পরব্রহ্মে অভিব্যক্ত হইবার পর ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পরব্রহ্ম মূল প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। এই স্থানটি বিশেষ অনুধাবন করা উচিত। কারণ এই খানেই বেদান্তদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি লইয়া গোলযোগ। আমাদের পক্ষে প্রকৃতি জড়স্বরূপা বলিয়া বোধ হয়। স্তম্ভের গুণ-

সমূহের সমষ্টি যেরূপ স্তম্ভের স্বরূপ নহে মূল প্রকৃতি সেইরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। পরব্রহ্ম অবস্থাতীত অখণ্ড সত্য। মূল প্রকৃতি আবরণ মাত্র, পরব্রহ্মস্বরূপে দৃষ্টির অগোচর। ঈশ্বর পরব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি করিলে এই বিশ্বরূপা আবরণস্বরূপা মূল প্রকৃতি মাত্র দেখিতে পান। জগতে জড় বিকাশের ইহাই ভিত্তি। পরব্রহ্ম আত্ম স্বরূপে ঈশ্বরে ও মূল প্রকৃতি স্বরূপে জগতে ব্যক্ত হইয়া একই শক্তিতে ঈশ্বরের দ্বারা কার্য্য করিতেছেন। যেমন জ্যোতিঃ ও উত্তাপ মহাকাশে অবস্থিতি করিয়া সূর্য্য দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া ব্যক্ত হয়। ইহাই প্রাচীন দর্শনকারদিগের মত। পরব্রহ্ম ঈশ্বর হইতে বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপে ব্যক্ত হন। মোটের উপর পরব্রহ্মরূপ স্রোত ত্রিধারায় বহিতেছে। মূল প্রকৃতি, ঈশ্বর ও দৈবী প্রকৃতি। দৈবী প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি। জগতের প্রধান তিনটি তত্ত্ব মূল প্রকৃতিরূপ জড় পদার্থ, দৈবীপ্রকৃতিরূপ জগতের কার্য্যশীল শক্তি। শক্তি সকলের সমষ্টি এবং প্রত্যগাত্মা বা ঈশ্বরের প্রতিবিম্বরূপ জীব। মূলপ্রকৃতি ও দৈবী প্রকৃতির পার্থক্য বুঝিবার গোলযোগই অনেক দর্শনে মহা অনর্থের উৎপত্তি করিয়াছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই পার্থক্য উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বিশেষরূপে মনে রাখা উচিত যে মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরের পরব্রহ্ম দৃষ্টির আবরণ স্বরূপ আর দৈবী প্রকৃতি ব্যক্ত পরব্রহ্মের অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি। সাংখ্য দর্শনে ব্রহ্মের আবরণ স্বরূপ এই মূল প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে। গীতায় ইনি কূটস্থ বলিয়া কথিত হইয়াছেন জড় পদার্থ ও অবিকৃত জড়ের পার্থক্য কি তাহা আমরা মূল প্রকৃতি কথাটিতে বুঝিতে পারি। দৈবী প্রকৃতি নষ্টিকদিগের সোফিয়া ও খৃষ্ট উপাসকদিগের পবিত্রাত্মা।

কৃষ্ণকে যখন ঈশ্বর বলা হইয়াছে তখন বুঝা উচিত যে তিনি পরব্রহ্মের অভিব্যক্তি, অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতির অভিব্যক্তি নহেন। ঈশ্বর যখন মানব-আত্মায় প্রকটিত হয়েন তখনই তাঁহাকে মায়ারূপী দৈবীপ্রকৃতির সন্তান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বিশ্বপ্রকাশে দৈবীপ্রকৃতি ঈশ্বরের কন্যা।

গায়ত্রীকে কেহ কেহ প্রকৃতি বলেন। গায়ত্রী মূলপ্রকৃতি নহেন গায়ত্রী দৈবী প্রকৃতি। ধারণার সুবিধার জন্য সূর্য্যের জ্যোতিঃ-স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি জড়সূর্য্যের জ্যোতিঃ নহেন। জ্ঞান-সূর্য্য-স্বরূপ ঈশ্বরের জ্যোতিঃ। ইনিই বিশ্বের জ্যোতিঃ স্বরূপ মহাচৈতন্য। জ্ঞানরূপা বরণীয়

শক্তি। আলোক, চৈতন্য ও ক্রিয়া শক্তি অদ্বিতীয় শক্তিরই বিকাশ। ঈশ্বর নিঃসৃত এই দৈবী প্রকৃতিই বিশ্বে বিভিন্ন শক্তিরূপে চেতনে নানারূপ সম্বিৎরূপে ও জীবে বিভিন্ন জীবনরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইনি বিশ্বে বিশ্বশক্তি, বিভিন্ন আকারে বিরাজ করিয়াও মূলতঃ একই।

আমরা এই চারিটি তত্ত্ব পাইলাম, প্রথম পরব্রহ্ম, দ্বিতীয় ঈশ্বর, তৃতীয় গীতোক্ত ঈশ্বরের দৈবীপ্রকৃতি, চতুর্থ পরব্রহ্মের আবরণ মূলপ্রকৃতি। ঈশ্বরের ঈক্ষা শক্তি হইতে ক্রমবিকাশ বা সৃষ্টির আরম্ভ। অপূর্ব্ব জগৎ অভাবনীয় নিয়মাবলীর সহিত হঠাৎ উৎপন্ন হয় নাই। মূলপ্রকৃতির কোন প্রকার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা হইতেও ইহার উৎপত্তি নহে। পরব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তির এক মাত্র কেন্দ্রস্বরূপ জগতের অন্তর্গত সকল ক্ষমতা ও শক্তির আধার ঈশ্বর হইতেই ইহার উৎপত্তি।

মূল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কোন ক্ষমতা নাই। তবে যে বলা হইল তাহা কেবল বুঝাইবার জন্য গুণ আরোপ করা মাত্র। মূল প্রকৃতি গুণ-শূন্য জড়। গুণ-শূন্য জড় যে কিরূপ পদার্থ তাহা আমাদের বুঝা বড়ই কঠিন। দৈবী প্রকৃতি মূলপ্রকৃতির উপর কার্য্য করিলে গুণের উৎপত্তি হয়। এখন বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা এই সমস্ত গুণ গুলি মূলপ্রকৃতিতে আরোপ করিয়া লই। নচেৎ মূলপ্রকৃতির কোন গুণ নাই। অনেকগুলি বৌদ্ধ পুস্তকে দৈবী প্রকৃতির নাম কোহাট। বাস্তবিকই দৈবী প্রকৃতি অদৃশ্যমান ঈশ্বরের ঈক্ষা ও দৃশ্যমান্ বাহ্য জগৎ, এই দুয়ের সম্বন্ধের হেতু। ঈশ্বর দৈবী প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই কার্য্য করিতেছেন।

ভবিষ্যমাণ বাহ্য জগতের তাত্ত্বিক প্রতিবিম্ব বা কল্পনা ঈশ্বরে প্রথম ফলিত হয়। ইতিপূর্ব্বেই ব্যক্ত নির্গুণ মূলপ্রকৃতির উপর দৈবীপ্রকৃতি এই প্রতিবিম্ব অঙ্কিত করেন। ইহাই সৃষ্টি প্রক্রিয়া। বিশ্বের সর্ব্বস্থানেই এই কার্য্য চলিতেছে ইহার শেষ নাই।

অপূর্ব্ব সৌরজগৎ সমষ্টিভাবে বিশ্বের স্থূল শরীর। দৈবীপ্রকৃতি বিশ্বের সূক্ষ্ম-শরীর-স্বরূপা। ঈশ্বর যিনি এই সৌরজগতের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়াছেন, তিনিই বিশ্বের কারণ-শরীর। পরব্রহ্ম এই বিশ্বের আত্মা।

বেদান্ত ও উপনিষদের প্রণবের সহিত এই চারিটি তত্ত্বের গোলযোগ

হওয়া ভাল নয়। বেদান্তকারেরা প্রণব অর্থে ব্রহ্মাণ্ডও বুঝেন, পিণ্ডাণ্ড মানবও বুঝেন। এখানকার মীমাংসার বিষয়, তাঁহারা কেন ঈশ্বর বা শব্দ-ব্রহ্ম বলেন। ব্যাপারটি বড়ই রহস্যজনক। শাস্ত্রকারেরা চারি প্রকার বাক্যের কথা বলিয়াছেন। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরি। ইহা ঋগ্বেদে ও উপনিষদে দেখা যায়। আমরা বৈখরি বাক্যের কথা চাহি। প্রত্যেক বৈখরি বাক্যেরই মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরারূপ আছে। প্রণবকে বাক্য বলা যায়, কারণ চারিটি তত্ত্ব চারি প্রকার বাক্যের অনুযায়ী। এই বিশ্ব বৈখরি বাক্য। দৈবী প্রকৃতি মধ্যমা বাক্য। ঈশ্বর পশ্যন্তী ও পরব্রহ্ম বাক্যের পরা অবস্থা। বাক্যের অবস্থার যেরূপ সম্বন্ধ, চারিটি তত্ত্বেরও সেইরূপ।

প্রণব অর্থে মনুষ্য ও জগৎ। প্রণবের মাত্রা অনুসারেও চারিটি তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ১ম বৈশ্বানর ব্যক্ত জগতের মূলভিত্তি। ২য় হিরণ্য-গর্ভ সূক্ষ্ম জগতের মূলভিত্তি। ৩য় সূত্রাত্মা ও শেষে পরব্রহ্ম।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ক্রুক্সের আধুনিক রসায়নোক্ত ভূত-সমূহ-বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে মূলপ্রকৃতি কিরূপে অপর তিন তত্ত্ব হইতে বিভিন্ন হইয়া ভূত-সমূহের উৎপত্তি করিল তাহা বেশ বুঝা যায়। বৈশ্বানর হইতে কিরূপে সূক্ষ্ম পরমাণুর উৎপত্তি হইল, তাহা মহামতি ক্রুক্স যথাযথ বিবৃত করিয়াছেন। বাস্তবিকই মূল প্রকৃতিকে ভিত্তি করিয়া, অপর তিন তত্ত্ব হইতে এই ব্যক্ত সৌর জগতের উৎপত্তি। দৈবী প্রকৃতিই ঈশ্বরের ঈক্ষা-শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমবিকাশের আরম্ভ হইতে কার্য্য করিতেছে।

স্থাবর পদার্থকে আমরা প্রাণী বলিয়া ধরি না, কিন্তু ইহাতেও দৈবী প্রকৃতির অপরিস্ফুট ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্ জগতে আমরা ইহার অল্প পরিস্ফুটভাব দেখি। ক্রম বিকাশের নিয়মই এই যে, অবিশেষ-ভাব হইতে বিশেষভাবে প্রকাশ হওয়া। প্রাণিজগতে দৈবী প্রকৃতি চৈতন্যভাবে সুব্যক্ত হইয়াছে। চৈতন্য দৈবী প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র সৃষ্ট নহে। জীবন-স্বরূপা দৈবী শক্তির বিকাশ মাত্র। ক্রম বিকাশের অনুকরণ করিয়া যখন আমরা মানবে উপস্থিত হই, তখন এক স্বতন্ত্র চৈতন্যের বা প্রত্যগ্ জ্ঞানের অবস্থা বুঝিতে পারি। চৈতন্যের নিম্নাবস্থায় যদিও প্রাণীদিগের পরস্পর সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের উদ্দিষ্ট কার্য্যকে কর্ম্ম বলা যায় না।

যদিও ঐ সমস্ত কার্য্যকে কর্ম্ম বলা যায় না, তথাপি তাহাদের যে কোন ক্ষমতা নাই তাহা নয়, তাহারাই দৈবীপ্রকৃতির ভবিষ্যৎ বিকাশ নিয়মিত করে। মানব-চৈতন্য অর্থাৎ চৈতন্যের উচ্চাবস্থাতেই প্রত্যেককে স্বতন্ত্র জীব বলা যাইতে পারে। নিম্নাবস্থায় জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই।

মানবের মানসিক বা নৈতিক কর্ম্ম, অবস্থা প্রভৃতির এক জীব অন্য জীব হইতে স্পষ্টতর স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলে সঙ্গে সঙ্গে মানবের উপাদান-তত্ত্ব সকলও স্পষ্টতররূপে নির্দ্ধারিত হয়।

মানবে চারিটি তত্ত্ব আছে। ১ম স্থূল শরীর। এই বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা দেহতত্ত্ববিৎদিগের কার্য্য।

২য় সূক্ষ্ম শরীর। স্থূল শরীর অপেক্ষা ইহার উপাদান সূক্ষ্মতর পদার্থে নির্ম্মিত।

৩য় কারণ-শরীর। কারণ-শরীর বলিতে গেলে প্রাজ্ঞের কেন্দ্র বুঝায়। যে কারণে বিশ্বতত্ত্ব সকল বিভক্ত হইয়াছে,—সেই কারণেই সূত্রাত্মা এই কারণ-শরীরে শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছেন। এই তিনের পর চতুর্থত ত্বটি দৈবী প্রকৃতী। দৈবী প্রকৃতিই উপাধি যুক্ত হইয়া যথার্থ জীব বা প্রত্যগাত্মা রূপে কল্পিত হইয়াছেন। একখানি স্বচ্ছ দর্পণে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্প স্বচ্ছ কোন ধাতুপাত্রে ফেলিয়া সেই ধাতুপাত্রস্থ প্রতিবিম্ব যদি দেয়ালের উপর ফেলি তাহা হইলে কি দেখা যায়। আমরা একটি হইতে ক্রমশঃ স্বচ্ছ এরূপ তিনটি প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। এখানে দর্পণটি কারণ-শরীর। ধাতুপাত্র সূক্ষ্ম শরীর আর দেয়াল স্থূল শরীর। এই প্রত্যেক প্রতিবিম্বই উজ্জ্বলতায় সমান নহে। কিন্তু উপাধি বিশেষে স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর ভাবে পরিস্ফুট। বিম্বের উজ্জ্বলতা মানবের জ্ঞানতুল্য। পরিষ্কার উপাধি হইতে অপরিষ্কার উপাধিতে নীত হইয়া জ্ঞান ক্রমান্বয়ে স্বচ্ছ হইতে অস্বচ্ছ হয়। জলবায়ু দ্বারা চালিত হইলে ইহার বক্ষস্থ সূর্য্যবিম্ব যেমন ক্রমে অপরিস্ফুট হয় সেইরূপ মানবের প্রবৃত্তি ও রিপুর চালনে যথার্থ আত্মজ্ঞানকে এতই বিকৃত করিয়া ফেলে যে শেষে ইহার জ্যোতি আদতেই উপলব্ধ হয় না।

বেদান্তকারেরা, বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য সকলেই এই জীবজ্ঞানকে ভ্রমপূর্ণ বলিয়াছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল যে ভাবে জীবজ্ঞানকে মানসিক অবস্থা-সমূহের সমষ্টি বলেন, ইহারা সে ভাবে বলেন না। ঈশ্বরই প্রকৃত আত্মা, সাধারণ আত্মজ্ঞান ইঁহার

প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। সেইজন্য যথার্থ নহে। অবশ্য এই উদাহরণ একেবারে চরমসীমা পর্য্যন্ত খাটান যায় না। নচেৎ প্রতিবিম্ব স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে পারে না, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব ঠিক স্বাভাবিক প্রতিবিম্ব নহে। পরিস্ফুট বিম্বমাত্রই স্বতন্ত্র কেন্দ্রের উৎপত্তি করিতে পারে। জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বড়ই গোলযোগ হয়। তাহা হইলে চৈতন্য অবস্থায় জীবাত্মাকে স্থূল শরীরে বদ্ধ করা হয়। ঈশ্বরের সহিত জীবের মিলন কল্পনা না করিলে আত্মার অমরত্ব সম্ভবপর হয় না। ৪র্থতত্ত্ব স্বরূপতঃ দৈবীপ্রকৃতি কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বলিয়া ইহাকে আত্মা বলা হইয়াছে। মানবের চারিটি তত্ত্বের কথা বৈদান্তিকেরা ও শ্রীকৃষ্ণ সকলেই স্বীকার করেন।

কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্যেরা তিনটি তত্ত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের চতুর্থ তত্ত্ব অব্যক্ত। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে এই অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতিই উপাধিযুক্ত পরব্রহ্ম। এভাবে অব্যক্তের ভিতর দিয়া পরব্রহ্মই যথার্থ চতুর্থ তত্ত্ব। তাঁহাদের মতে অপর তিনটি তত্ত্বের অস্তিত্ব চতুর্থের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ অব্যক্তই ক্রমবিকাশে নানাবিধ জীবে পরিণত হয়। অব্যক্তই মানবের যথার্থ আধ্যাত্মিক সত্তা এবং মানবের চরম লক্ষ্য। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় কিছু না বলাতেই ইঁহাদের নিরীশ্বর নাম হইয়াছে। দর্শন-তত্ত্বের আলোচনায় ঈশ্বর ও দৈবী-প্রকৃতি এই দুইটী তত্ত্ব বাদ দিবার জন্যই ইঁহারা নিরীশ্বর, নচেৎ পরব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার জন্য নহে।　　　　(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমি।

(২)

আমি ছিলাম। আমি আছি। আমি থাকিব। সর্ব্ব দেশ ও কালেই আমি এক। দেশ ও কাল আমাকে হ্রাস বৃদ্ধির অধীন করিতে পারে না। ইংরাজের উচ্চ হেটের মধ্যে,—পার্শীর উল্টান টুপির ভিতর,—বাঙ্গালী ও জাপানীর খোলা মাথায়, যখন যেখানেই থাকি, আমি এক,—আমি সেই আমিই।

সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব সময়ে আমি ও আমার প্রশ্নগুলিও এক।

শৈশবে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায়, বার্দ্ধক্যে আমি সেই পুরাতন, নিত্য নবীন প্রকৃতি।

যে শুভ মুহূর্ত্তে অনন্ত চিৎশক্তির প্রথম ইচ্ছা, শক্তি ও চেষ্টা জনিত প্রথম গতি ও ঢেউ এই অসীম মহাশূন্যে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, সেই সময়ে, তাহার পূর্ব্বে ও পরে, সর্ব্বকালেই আমি এক। সেই প্রাচীন আকাশে নবজাগ্রত তারকারাজির সুপ্তোত্থিত শিশুর ন্যায় চকিত স্নেহদৃষ্টি, মঙ্গল-আরতি ও আনন্দ-নৃত্য আমি দেখিয়াছি। সেই প্রথম জ্যোতির আনন্দ-উল্লাস ভুলিয়াও আজ সংসারের মোহে ও জ্ঞানে, স্বর্গে ও নরকে,—পাপে তাপে,—দুঃখে ও সুখে,—ঐশ্বর্য্যে ও দারিদ্র্যে,—শক্তিতে ও দুর্ব্বলতায়,—নিন্দা ও প্রশংসায়,—জয় ও পরাজয়ে,—উন্নতি ও অবনতির মধ্যেও আমি সেই এক,—নিত্য, চিৎকণা।

আমার ভাল মন্দ, স্বর্গ নরক, আমারই রচনা। আমি-র মধ্যে যাহা অব্যক্ত গূঢ়,—কারণভূত,—আমার বহির্জ্জীবনে তাহারই প্রকাশ। আমার ভিতরের ছবি, নক্সা, অনুবাদ এই আমার বাহিরের জীবন। আমি ভিতরে গোপনে যা করি,—সাধন করি,—বহির্জ্জীবনে, তাহাই কারণ-প্রসূত কার্য্য-

রূপে, ফল-রূপে প্রকাশিত হয়। বাহিরে যাহা নয়নগোচর হয়, তাহা ভিতরের ছায়া-চিত্র, ফটোগ্রাফ !

আমিরই বিজয় নিশান মুকৃডেন্, পলাশী, মেরাথন, ব্লুম ফণ্টেন সমরক্ষেত্রে আমিত্বের জয় ঘোষণা করিয়াছিল। সমুদায় রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজ বিপ্লবাদিতেই আমি-র অভিব্যক্তি।

আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যকে জয় করিতে পারিলে। দেখি পৃথিবী আমার পদতলে। নচেৎ উচ্চমানব-শির ঐ প্রত্যেকটীর পদতলে প্রত্যহ শতবার লুণ্ঠিত। কামাদিকে পরাজয় করিতে পারিলে, ত্রিলোক জয় হয়,—মানব কামাদি পশুকে অধ্যাত্ম যজ্ঞে বলি দিয়া, দেবতা হবেন,—অমরত্ব লাভ করেন। শুনিয়াছি শাক্যসিংহ মারকে,—ঈশা শয়তানকে,—মহাদেব মদনকে,—রামচন্দ্র দশাননকে,—শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগকে দমন করিয়া জগতের পূজ্য হইয়াছিলেন ! আমিও সেই পথে চলিলে, হইতে পারি !

উহার পন্থা এক। অন্য পন্থা নাই। কামাদি-দমনই সেই পন্থা, যদ্দ্বারা জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক দুঃখ প্রভৃতির দমন হয়—জীবন ধন্য হয়,—কৃতার্থ হয়,—পূর্ণ হয়,—অমৃত লাভ হয়,—মৃত্যু-জয় হয়। বৌদ্ধ-গ্রন্থে আছে, 'যদিও কেহ সহস্র মনুষ্যকে যুদ্ধে জয় করে, তথাচ যিনি আপনাকে জয় করেন, তিনিই বড় " (১)

আমি দেশ বিদেশে রাজা মহারাজদের রাজ্য শাসন করিয়া বেড়াই, কিন্তু এই ক্ষুদ্র আমি-কে শাসন করিতে পারি না। রাজ্য,—প্রজাশাসন,—রণক্ষেত্রে বাহিনী অক্ষৌহিণী নিমিষ মধ্যে নশ্বরবৎ করা সহজ,—কিন্তু আমি র সুখান্বেষণ—বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ৈষণা দমন করা কঠিন,—বড়ই সুকঠিন। কেমন আমাদের অভ্যাস,—যে বিনয়ের কথা বলিতে যাইয়াও, আমিটাকেই মহিমান্বিত করিতে চাই,—ধর্ম্ম ও সাধন-ক্ষেত্রের ভিতরেও, অহঙ্কারকে হৃদয়ে লইয়াই, দেহে ছাই ভস্ম মাখি,—নাম-তিলক লিখি,—বাঘাম্বর পরিধান করি।

পন্থা, পন্থা করি,—কিন্তু সম্মুখে যে পন্থা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে দৃক্‌পাত করি না,—অন্য গোপনীয় পন্থা আছে মনে করি। অহঙ্কার ত্যাগ,—"তৃণাদপি সুনীচঃ" ভাবই যে প্রথম পন্থা তাহা ভুলিয়া যাই। বৈষ্ণব-অধ্যাত্ম

(১) Udanavarga 23. 3.

ব জ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন,—

"বৈষ্ণব হইতে বড মনে ছিল সাধ,
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ।"

খৃষ্টীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিৎ বলিয়াছেন,—"অনুতাপিত হও, তবেই স্বর্গরাজ্য নিকট।" অনুতপ্ত চিত্ত, তৃণাদপি নীচ, দীন আত্মা, নিরভিমানী, একই কথা। উহাই পন্থার প্রথম সোপান। কামাদি-দমনই পন্থা। অন্য পন্থা আমার নাই। আমি অন্য পন্থা দেখি নাই, অন্য পন্থা জানি না।

ধর্ম্মরাজ্যে আমি হিন্দু, আমি বৌদ্ধ, আমি খৃষ্টিয়ান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব বলিয়া, আমি মনে মনে নিজের দলের জারি করি,—অপরকে নীচ ও ভ্রান্ত,—অতএব নরকগামী ভাবি। হায়! হায়! কি ভুল! অহঙ্কার যা মনে করায়, তাহাই ভুল। নিজের ও নিজের দলের শ্রেষ্ঠতা ও তচ্চিন্তাজনিত আত্মপ্রসাদ অহঙ্কারমূলক।

সংসারে যেমন আমিত্বের উল্লাস,—ধর্ম্মসমাজ ও সাধনক্ষেত্রেও তাহাই।

সেই নিমিত্তেই আমি ধর্ম্মমার্গে ও সাধনে অগ্রগামী হইতে পারি না।

রজেতে লুণ্ঠিত হতে হবে। ব্রজের রজ হতে হবে। "অমানী মানদঃ" হতে হবে। "নিজে নিরভিমানী, অন্যে দিয়ে মান" হতে হবে। ভাই! তোমার আমার অভ্রভেদী উচ্চশির যবে দীন দুঃখীদের চরণে লুণ্ঠিত হবে, তবেই জান্‌বে ধর্ম্মসাধন-ফল ধরেছে,—বীজমন্ত্র স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে এবং সুবৃক্ষ ও সুফলে পরিণত হইয়াছে।

বিনয়-নম্রতাই ধর্ম্মের কষ্টিপাথর। মহর্ষি ঈশা আত্মার দীন ভাবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। যতক্ষণ আমি মনে করি যে আমির- কোন আধ্যাত্মিক অভাব নাই, ততক্ষণ দীনতা, দারিদ্র্য ও তজ্জনিত দুঃখের ভাব আসিবে কেন? আত্মপ্রসাদ, আত্মগৌরব থাকিলে তো মস্তক অবনত হয় না, ক্লেশ বোধ হয় না, অভাব বোধ না হইলে, ক্ষুধা পিপাসা হইবে কেন? ক্ষুধা, পিপাসা না হইলে, তন্নিবারণের চেষ্টা হইবে কেন? ক্ষুধা না থাকিলে, খায় কে,—আহার চেষ্টা করে কে? অভাব, দারিদ্র্য-বোধ, তজ্জন্য ক্ষুধা-পিপাসা ও ব্যাকুলতা একই কথা। ক্ষুধা-তৃষ্ণা না থাকিলে আহার, পানীয় গ্রহণ করিবে কে? আহার-পান করিলেই বা উহা পরিপাক হইবে কেন, পরিপাক করিবে

কে? কোনও আহার্য্য ও পানীয় রুচির সহিত গ্রহণ করিতে হইলে, পরিপাক ও তদনন্তর রক্ত, মাংস ও অস্থিতে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্ব প্রধান প্রয়োজন, তীব্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

আমি আত্মার দারিদ্র্য, অভাব, নীচতা, হীনতা বোধ না করিলে, ধর্ম্মের জন্য উৎকণ্ঠা, ক্ষুধা ও পিপাসা হয় না।

যিনি আমি-র আত্মা'ত ধর্ম্মান্ন বিতরণ করেন,—তিনি দেখেন আমির ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে কি না। যেখানে অপচয় সম্ভাবনা, সেখানে তিনি ধর্ম্মান্ন বিতরণ করেন না। ইহাই ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের ও ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিকগণের মত। ঈশা বলেন,—"যাহার আছে, সেই পাইবে। যাহার নাই, তাহার যাহাও আছে, তাহাও যাইবে।" "চাও তবেই পাইবে,—খোঁজ তবেই মিলিবে,—আঘাত কর, তবেই খুলিবে। কারণ যাহারা চায়, তাহারাই পায়, যাহারা খোঁজে, তাহারাই পায় যাহারা আঘাত করে,—তাহাদের নিকটেই খোলে।"

আমি অতি স্বার্থপর। স্বার্থপরতা জড়ের ও পশুর ধর্ম্ম। তাহারা স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে না। মানব সাধারণতঃ জড় ও পশুর সঙ্গে এক ধর্ম্মান্বিত। কিন্তু জড়ত্ব বা পশুত্বই মনুষ্যত্ব নহে! মানবত্বের জন্য জড়ত্ব বা পশুত্ব ছাড়াও আর কিছু চাই। সৃষ্টির প্রথম বিধি, আত্মরক্ষা। শ্রেষ্ঠ, শেষ, চরম বিধি, আত্ম দান। বেদে পরমাত্মাকে "আত্মদা!" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই বিস্ময়কর, অনন্ত জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা, যেমন, আকাশের প্রচ্ছন্ন শক্তি-তরঙ্গে সৃজন-কার্য্যের প্রথম কম্পন সঞ্চার করিয়া, তাঁহার অনন্ত-আত্ম-শক্তি-সাগরে, নিত্য নব-ক্রীড়াশীলা, লীলাময়ী বীচিমালা উত্থিত করিলেন,—অমনি তৎ সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আমাদের উপভোগের জন্য দান করিলেন,—আনন্দ-স্বরূপ স্বয়ং আনন্দ সাজিয়া অনন্তরূপে, অনন্তবেশে জীবের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন,—আমাদিগকে নিজেকে, অর্থাৎ আনন্দ প্রদান করিলেন,—নিজেকে বিতরণ করিয়া দিয়া, আমাদিগকে বাড়াইয়া দিলেন, তাই আমরা অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিলাম। তিনি এমনই বিনয়ী যে স্বয়ং অনন্ত হইয়া, অণুর ভিতর অণু হইয়া অণু-প্রবিষ্ট ও অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন! সেই অনন্ত আমি, নিজেকে দান করিলেন, আত্মদা হইয়া, অহঙ্কার-শূন্যভাবে, আমাদিগকে বাড়াইয়া দিয়া, কর্ত্তা সাজাইয়া, নিজে সংসারের চক্ষু হইতে সরিয়া পড়িলেন।

আমি এই যে ব্যক্তিত্ব লইয়া উন্মত্ত, উহাই স্রষ্টার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান, তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব আমাকে দিয়াছেন। জ্ঞান ও শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া উঠিলেই আমি পুনরায় স্রষ্টাকে চিনিতে ও ধরিতে পারি। এবং তিনি যেমন আপনাকে দান করিয়াছেন,—তেমনি আমরাও তাঁহাকে আত্মদান করিতে পারি। কামাদির অনুশীলনে দুর্ব্বল হইলে, তাহা পারি না। অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন,—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" ১।৩।২।৪

বলবীর্য্যহীন ব্যক্তি এই আত্মদান করিতে সক্ষম হয় না।

জল দিয়া যেমন জল টানিয়া আনা যায়, তেমনি আত্মা না দিলে আত্মা পাওয়া যায় না,—আত্মা না দিলে পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না।

যতই আমি কামের সেবা করি, ততই আত্মক্ষয় হয়। কামের বশ্যতা ও সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মন ও বুদ্ধি মলিন ও দুর্ব্বল হয়, এমন ইন্দ্রিয়-সুখে মন রত হয় যে, সে বুদ্ধি ও সে স্মৃতি থাকে না, যদ্দ্বারা সেই অনন্ত আমিকে আমির ভিতর ঢুকিয়া ধরিতে পারি। আমি যখন জড় বিষয়ের, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সুখকে তুচ্ছ করিয়া; আমির ভিতরে ঢুকি, তখন তিনি, সেই অনন্ত আমি আমাকে এড়াইতে পারেন না, পলাইতে পথ পান না।

অন্যমনস্ক হইলে, মরণশীল। ইন্দ্রিয়-সুখে ডুবিয়া থাকিলে, স্পষ্ট ভাবে, তাঁহাকে বুঝিতে বা মনে রাখিতে পারি না। অন্য দিকে মন যাইলে, তাঁর দিকে মন যায় না। একান্ত ভাবে না ভাবিলে, মনে, মজ্জায় সে জোর পাই না, যাহাতে তাঁহাকে চিন্তা ও ভাবনা করিয়া বুঝিতে পারি।

যতই ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা, যুক্ত-আহার,—যুক্ত-বিহার, যুক্ত-নিদ্রা, যুক্ত চেষ্টা, যুক্ত-স্বপ্ন, যুক্ত-জাগরণ হই, ততই বুদ্ধি নির্ম্মল ও বলিষ্ঠ হয়, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব প্রকাশ হয়, সমুদয় অধ্যাত্ম-জগৎ ও তাহার রহস্য আমি-র চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া যায় ও বিস্তারিত বোধ হয়।

যতই অধ্যাত্ম-চক্ষের ছানি কাটে, ততই দেখি, স্বার্থের পুঁটলি বাঁধিতে যাওয়া ও নিজের পায়ে কুঠার আঘাত করা একই কথা।

স্বার্থ দুই প্রকার। ধর্ম্মের ও সংসারের। জড়ের ও আত্মার,—বাহিরের ও অন্তরের যাহাতে একের স্বার্থোন্নতি, তাহাতে অন্যটীর স্বার্থহানি। আত্মার

স্বার্থ সাধন করিতে হইলে, আমিকে ইন্দ্রিয় সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। সংসারের উন্নতি করিতে হইলে, ধর্ম্মের হানি হয়, দুইটী বিভিন্ন পথে এক কালে বিচরণ করা চলে না। অর্থের মত, ব্যয় না করিয়া, আমিকে যতই জমা করি, ততই উহা বর্দ্ধিত হয়। সুখের চেষ্টায় উহাকে খরচ করিলে, ক্ষয় হইয়া পড়ে। স্বার্থরক্ষাই সংসারের উন্নতির উপায়। স্বার্থত্যাগই আত্মার উন্নতির উপায়। যতই নিজের জারি করি, সংসারে ততই বাহাদুরী। যতই উহা না করি, ততই ধর্ম্মের উন্নতি; লই লই, না করিয়া, দি দি, করিলে ও দিতে পারিলে, আত্মার ঐশ্বর্য্য বাড়ে। লইতে পারিলে ও না দিলে, সংসারের ধন বাড়ে। যতই নিজেকে ধর্ম্মের চরণে, সত্যের জন্য, ভগবানের চরণে বলি দি, ততই আত্মার মঙ্গল। তাঁহার দান, তাঁহাকে দিতে হইবে। তবেই জীবন সার্থক। তাঁহাকে দেওয়া ও তাঁহার সৃষ্ট জীবকে, তাঁহার সন্তানগণকে দেওয়া একই কথা। উত্তম রূপে স্বার্থসাধন করিতে হইলে, স্বার্থহীন হইতে হয়। যতই লইব, লইব করি ততই যাহা ছিল, তাহাও হারাই। দি যত, পাই তত। যত রাখিয়া চলি, ততই হারাই। ইহাই আত্মার বিধি।

আমি হারা হওয়াই, আমিকে সুদে আসলে পাইবার ফিকির।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ সিংহ।

একটি সাধক-রহস্য।

আজ জগদ্ধাত্রী পূজা। হিন্দুর ঘরে ঘরে আজ মা জগদ্ধাত্রীর উপাসনা হইতেছে; মা আনন্দময়ীর আগমনে মাতৃভক্তগণ আজ আনন্দে নৃত্য করিয়া মা! মা! বলিয়া ডাকিতেছে। মা জগদ্ধাত্রী আমাদের জগৎজননী। তিনি এই ত্রিজগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যে সাধক প্রাণ ভরিয়া মাকে ডাকিতে শিখিয়াছেন, তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পান, যে মা কুণ্ডলিনী আদ্যাশক্তি তাঁহাকে আপাদমস্তক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। তখন সেই সাধক মা কুণ্ডলিনীকে সাকাররূপে দেখিয়া প্রকৃতিস্থ হন, এবং সানন্দে শান্ত ভাব ধারণ করতঃ মা আনন্দময়ীর এই কুণ্ডলাকারের রূপ-ধ্যানে মগ্ন হইয়া নিজে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই কারণ জগতের মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বেরও উচ্চ সোপান। তিনি জ্ঞানী ও ধ্যান-পরায়ণ, এই উভয় ভাবেই ক্রিয়াবান; তিনি এই মহত্তত্ত্ব লাভ করেন এবং ক্রমশঃ প্রকৃত নির্ব্বাণ-পদ-দিকে ধাবিত হয়েন। তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধদেব ধর্ম্মপদের ভিক্‌খুবগ্‌গো অধ্যায়ে বলিয়াছেন;—

নত্থি ঝ্যানং অপঞ্‌ঞস্‌স পঞ্‌ঞা নত্থি * অঝ্যায়তো।
যম্হি ঝ্যানঞ্চ পঞ্‌ঞাচ স বে নিব্বান সন্তিকে॥ ১৩।

অনুবাদ—

"প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির ধ্যান নাই। যিনি ধ্যানে নিরত না থাকেন, তাঁহার প্রজ্ঞা জন্মিতে পারে না। যাঁহার ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে, তিনি নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ।"

এই বুদ্ধিতত্ত্বের উপর-সোপান যাহা আমরা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাই এক্ষণে প্রজ্ঞাশব্দে ব্যবহৃত করিতেছি। বৌদ্ধ মতের এই ধ্যানযুক্ত প্রজ্ঞা ভাবটিতে যিনি অবস্থান করিতেছেন, তিনি আনন্দ উপলব্ধি করেন, তাহাই আমাদের প্রকৃতিরূপিণী কুণ্ডলাকারে বেষ্টিত ও আশ্রিত-সাধকের আনন্দ। সাধক এই আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে প্রণবানন্দে মিশিয়া যান- এবং প্রণবানন্দের ধ্যান-মগ্ন হইয়া তাঁহার সেই সাকার রূপটি দেখিতে পান।

---

* অঝ্যায়িনো (ব্রহ্ম)

সাধক যখন এইরূপে তন্ময় হইয়া যাইলেন, তখন সেই আনন্দ-কাননে উপবেশন পূর্ব্বক আনন্দ-রসে এই গীত গাহিলেন।

গীত।

আনন্দ-কাননে জ্ঞান রোপেছি দুজনে।
পাশাপাশি ব'সে মোরা বুদ্ধ হয়েছি মন জ্ঞানে॥
জ্ঞান হৃদে আত্মা শিরে, ভক্তি হৃদের হার।
প্রণব হয়ে বসে বুদ্ধ অতি চমৎকার।
সরে যা সরে যা স্থূল, মনে আর হবে না ভুল,
(এখন) প্রণব সাজে সজ্জিত হয়ে রয়েছি মগন্ ধ্যানে॥

সাধক এই গীতটি একাগ্রচিত্তে গাহিতে গাহিতে বুঝিলেন যে, তিনি সেই বেদান্তের আনন্দময় কোষে মা আনন্দময়ীর ক্রোড়ে উপবেশন পূর্ব্বক বুদ্ধভাবে অবস্থান করিয়া রহিয়াছেন। এই আনন্দময়ী মা প্রকৃতি ও প্রণবরূপিণী কুণ্ডলিনী শক্তি; যে শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ক্রীড়া চলিতেছে, ইনি সাকাররূপিণী। তাই সাধক তাঁহার মহাকাশে অঙ্কিত প্রকৃতির এই রূপ দেখিতেছেন ও হৃদয়-কাননে প্রস্ফুটিত গাতের ভাবার্থ বুঝিতেছেন। যে আনন্দ-কাননে সে জ্ঞানরূপ বীজ রোপিত হইয়াছিল। তাহাই হৃদয় কাননে জ্ঞানরূপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়াতে হৃদয় আনন্দে গদ গদ হইয়া পূর্ণ-আনন্দময় হইয়া উঠিল। সেই হৃদয়-কানন এক্ষণে পূর্ণ আনন্দ-কানন; তাই তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরটি ওকার বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে। এই ওকার একটি ডিম্বাকারে আচ্ছাদিত ছিল, সেই অণ্ডাকার আচ্ছাদনটি অপসারিত হওয়াতে ওকাররূপ দৃষ্ট হইল। এই অণ্ডাকার মায়ারূপিণী, তাহাতেই সমগ্র জগতে মোহরূপ অন্ধকার বিরাজ করিয়া থাকে। যখন এই অণ্ডাকার দ্বিখণ্ড হইয়া ফাটিয়া যায়,তখন ওকার বহির্গত হয়। সাধক এখন এই ওকার-বেষ্টিত নিজ লিঙ্গ-শরীর প্রদর্শন পূর্ব্বক বুঝিলেন যে, তাহার উপরিস্থ যে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি (Crecent)টি রহিয়াছে,তাহাই পরা প্রকৃতি।

সাংখ্য শাস্ত্রে, যাহাকে পরাপ্রকৃতি বলিয়াছেন, সেই পরাপ্রকৃতিই এস্থলে সাধকের উর্দ্ধতম অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। পরাপ্রকৃতির মর্ম্ম বুঝিলেন। ইনি জড়প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভাবে শূন্যে অবস্থান করিতেছেন, এবং তৎ-উপরিস্থ যে সৎস্বরূপ বিন্দুটি মহাজ্যোতির্ম্ময়, উজ্জ্বল, শান্তভাবে বিরাজিত তাহাই এস্থলে পরম পুরুষ। এই

পরম পুরুষই অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্দুস্বরূপ, নিরাকার, সর্ব্বভূতস্থ, নির্লিপ্ত, নিস্ক্রিয়, দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থিত। তিনি নিরাকারে সর্ব্বভূতস্থ হইয়াও সর্ব্বভূত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। এই বিন্দু, তৎপরস্থিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি (Crecent) এবং তৎপরস্থিত ওকার এই তিনের লয় হইয়া একটি ওঁকার ফুটিয়া উঠিল। এই ওঁকারই প্রণবানন্দ, ইহার নাম প্রণব। এক্ষণে ইনি সাকার ওঁ শব্দরূপী * সাধকের হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিয়া সাধককে আনন্দে প্রণব-রহস্য বুঝাইতেছেন। এই শব্দটিকে দৃঢ়রূপে হৃদয়ে সযত্নে রক্ষিত করিতে পারিলে, প্রণব-রূপীর প্রকৃত রহস্য বুঝা যায়। তাই পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে বলিয়াছেন :—

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।

তৎ জপস্তদর্থভাবনম্॥ ওঁ

সাধক, মহর্ষির যোগ-শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা এইরূপ বুঝিলেন, যে ওঁকাররূপিণী প্রণব,ইনি কুণ্ডলাকারে নাদধ্বনি করিতেছেন, এই অবিরামধ্বনিই তাঁহার জপ, এবং ধ্বনি-শক্তিই কুণ্ডলিনী-শক্তি। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই মা আনন্দময়ী, ইনি ব্রহ্মাণ্ডময়ী।† ইনি ত্রিজগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং নাদধ্বনি করিতেছেন। ইনি কুণ্ডলিনী-শক্তি মা জগদ্ধাত্রী-রূপিণী ; ওঁকাররূপিণীই প্রকৃতি। ইনিই সাধককে আনন্দ দান করেন। এই আনন্দময়ী ওঁকাররূপিণীর রহস্য বুঝিবার জন্য, যে সাধক সচেষ্ট থাকেন, এবং তন্মধ্যস্থিত নিজেকে রাখিতে সচেষ্ট হয়েন, তিনিই রহস্যময় থাকিয়া প্রণব সাজে সজ্জিত হইয়া বুদ্ধ ভাবে ধ্যানেই মগ্ন থাকিতে সমর্থ হয়েন।

ইনিই মহাযোগী। মহেশ্বর কুণ্ডলিনী-শক্তিরূপিণী পরাভক্তিকে হৃদয়ের হারে গাঁথিয়া রাখিয়া মহাধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। ইনিই ধ্যানানন্দ, ইনিই জ্ঞানানন্দ, ইনিই সেই বৌদ্ধমতের প্রজ্ঞাভাবে সাকার ঈশ্বর। এবং ইনিই প্রকৃত প্রণবানন্দ। এই কুণ্ডলিনী-জড়িত যে আনন্দ, তাহাই প্রণবানন্দ।

---

* সাকার ওঁ শব্দ, চিদাকাশে অতি সূক্ষ্মস্থানে অঙ্কিত আছে, সেই আকাশে অনন্ত ধ্বনি হইতেছে। এই ধ্বনির এক একটি রূপ হইয়া অনন্তে মিশিয়া যাইতেছে।

† ব্রহ্ম + অণ্ড = ব্রহ্মাণ্ড। যে পুরুষ এই অণ্ডটিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডধাতা ; তাঁহারই শক্তি, ব্রহ্মাণ্ডধাত্রী।

কুণ্ডলিনী শক্তি বলিলে এই বুঝি, যে শক্তি, সুষম্না নাম্নী সূক্ষ্ম রশ্মিটি নাভিদেশ হইতে উত্থান পূর্ব্বক কুণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত হইয়া,| প্রণব মধ্য দিয়া যে সূক্ষ্ম রশ্মি-স্রোতটি উর্দ্ধমুখী হইয়া ললাট-নিঃসৃত তেজোময় ভেদ-পূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত চক্র ঘুরাইতেছেন, সেই শক্তিই কুণ্ডলিনী-শক্তি। সেই শক্তির রহস্য যে সাধক বুঝিয়াছেন, সেই সাধকই প্রণবানন্দ; ইনিই আমাদের সকলের গুরু।

অনেকের বিশ্বাস, মানব-দেহধারী আমাদের গুরু নামে খ্যাত। কিন্তু তাহা একেবারেই ভুল বিশ্বাস। মানব কাহারও গুরু হইতে পারেন না, সেই জগদ্-গুরুই প্রকৃত গুরু। তিনি অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সর্ব্বভূতস্থ হইয়া মহাগুরুরূপে বিরাজ করিতেছেন। মানবগণ এই প্রকৃত গুরুকে না বুঝিয়া দীক্ষাকালীন যে গুরুলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই প্রকৃত গুরু মনে করিয়া নিতান্তই ভ্রমে পতিত হন। তাহার ফলে অনেককে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, 'উনি গুরু হইবার যোগ্য নহেন, উনি জ্ঞানী নহেন।' কেহ কেহ এ কথা বলেন যে, 'গুরুবংশে উনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উনি আমাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, অতএব উঁহার নিকট হইতে কিরূপে দীক্ষিত হই? উঁহার নিকট হইতে দীক্ষিত হওয়া সঙ্গত নয় বলিয়াই আমার আর দীক্ষিত হওয়া ইহ জীবনে হইল না।' এইরূপে যথাযথ মানবকে গুরুজ্ঞান বশতঃ অবিবেচক-ভাবে অভক্তির প্রশ্রয় দিয়া থাকেন; কিন্তু যদি বুঝেন যে, মানব কাহারও গুরু নহেন, তিনি দীক্ষাকালীন কর্ণে যে মন্ত্র বলিয়া দিয়া গুরু নামে খ্যাত হইলেন, সেই মন্ত্রই জগৎগুরু-প্রেরিত। মানব গুরু আমরা প্রতিপদে প্রতিকর্ম্মে নানারূপে গুরু লাভ করিয়া থাকি। এমন কি কীটপতঙ্গাদি হইতে মানব পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবই আমাদের সাহায্যকারী; কিন্তু সকলকেই ত গুরু বলিয়া সকলের বিশ্বাস হয় না। যিনি সেইরূপ সর্ব্বজীবে একই গুরুর জ্ঞান করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার গুরু 'সর্ব্বভূতস্থ ও সর্ব্বজীবেই সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিয়া জগৎগুরু-রূপে বিরাজ করিতেছেন।' এইরূপ জ্ঞানই প্রকৃত দ্বিজ হইবার উপযুক্ত; এই জ্ঞান প্রহ্লাদের ছিল। "জলে হরি, স্থলে হরি, অনলে হরি, অনিলে হরি, হরি-ময় ভূমণ্ডল।" তাই তিনি হিরণ্যকশিপুকে একটি স্ফটিকস্তম্ভ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'ইহার মধ্যে আমার হরি আছেন।' এইরূপ জ্ঞান হইলে জ্ঞানীর গুরুভক্তি অপসারিত হয় না। সত্যই গুরু সেই স্থানে দৃষ্ট হন।

এইরূপ গুরুভক্তির ভাব যখন ক্রমশঃ দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয় ও সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়ে তাহাই সেই গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা।

এই গুরুভক্তি লাভ হইলে প্রণব রহস্য বুঝা সম্ভব হয়, গুরুগম্য বিদ্যাই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা। সেই জগৎগুরুর প্রতি অচলা ভক্তি রাখিতে পারিলে সর্ব্বরহস্যই প্রকাশ হয়; এই রহস্য প্রকাশ জন্য এস আমরা জগৎগুরুসমীপে অগ্রসর হই, তিনিই আমাদের সকল রহস্য বুঝাইয়া দিউন।

ওঁ গুরু ওঁ গুরু ওঁ গুরু
গুরু-কৃপাহি কেবলং।

গুরু ভিন্ন আমরা এক পদ অগ্রসর হইতে পারিব না, কিন্তু সাবধান! ভ্রম-পথে না চলি। প্রকৃত গুরুকে যেন বুঝিতে শিখি। সেই গুরুর কৃপা লাভ হইলে আর পতনের ভয় থাকিবে না। পথ বড়ই পিচ্ছিল; পদস্খলন যেন না হয়। খুব সাবধান ভাই, খুব সাবধান! পথ-প্রদর্শক গুরুকে যেন দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হই। এবং অর্জ্জুনের ন্যায় ভক্তিভাবে এই কথা যেন বারংবার বলিতে শিখি,—

কার্পণ্যদোষোপহত-স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্য স্তেহহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

গীতা।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গুরুশিষ্য-সংবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শত্রুরূপী ভগবান্।

গুরু। যাহাকে আমরা ভাল বলি তাহা যেমন ভগবানের কৃপা, যাহাকে মন্দ বলি তাহাও তাঁহার প্রচ্ছন্ন কৃপা মাত্র। ভগবান্ দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা সর্ব্বদা জীবের কল্যাণ-বিধান করিতেছেন। ইহাদিগকে আমরা আলোক অন্ধকার, সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্, প্রিয় অপ্রিয়, মিত্র শত্রু প্রভৃতি নামে অভিহিত করি। একটি শিশু বিস্ফোটকের যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছে। তুমি তাহাতে ফুঁ দিয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিলে। ইহাতে তাহার যাতনার একটু উপশম হওয়াতে সে তোমাকে প্রিয় বা মিত্র ভাবিতে লাগিল। পরক্ষণে একটি ডাক্তার আসিয়া নির্দ্দয়ভাবে তাহার হাত পা চাপিয়া ফোড়াতে ছুরি বসাইলেন। শিশু ভাবিল, কোথা হইতে তাহার এক বিষম শত্রু আসিয়াছে। একটি গাছের গোড়ায় তুমি কিঞ্চিৎ সার মাটি ও জল দিলে, গাছ ভাবিবে "এটি আমার মিত্র" আবার যখন এক প্রবল ঝড় আসিয়া ডাল পালা ভাঙ্গিয়া তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, গাছ নিশ্চয়ই ভাবে "এটি আমার শত্রু।" কিন্তু ঝড় ব্যতীত গাছ কি কখনও শক্ত সমর্থ হইয়া বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিত? আমাদের জীবনের যত কিছু অপ্রিয় ঘটনা, শোক দুঃখ, বিপদ্ আপদ,—সমস্তই আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছে, ছদ্মবেশে আমাদের প্রতি অশেষ কৃপা বিতরণ করিতেছে। সক্রেটিস্ বলিতেন "জানথিপির ন্যায় মুখরা ও প্রগল্‌ভা পত্নী না পাইলে তিনি কদাপি সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য লাভ করিতে পারিতেন না।" বাস্তবিক যাহাদিগকে আমরা শত্রু বলি তাহারাই আমাদের পরম মিত্র। যেমন কঠিন মাটি না থাকিলে মানব হাঁটিতে শিখিত না, যেমন উকা দিয়া না ঘষিলে অস্ত্র তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হয় না, সেইরূপ বিরুদ্ধ শক্তি ব্যতীত আমাদের অন্তর্নিহিত গুণরাজি (latent capacities) কদাপি বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। আমরা শীতাতপে কাতর না হইলে বস্ত্রাদিবয়ন ও গৃহনির্ম্মাণ শিখিতাম কি? সমুদ্র আমাদের গতায়াতের ব্যাঘাত উৎপাদন না করিলে, নৌকা, জাহাজ, ষ্টীমার প্রভৃতির

সৃষ্টি হইত কি? দূরত্ব না থাকিলে রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি আবির্ভূত হইত কি? রোগশোক, জরামৃত্যু না থাকিলে কি ষড়্দর্শনের জন্ম হইত? না বুদ্ধদেব ধরায় অবতীর্ণ হইতেন? দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্তের মূল আমাদের শত্রু। অতএব সম্পদ্ অপেক্ষা বিপদ্ ভাল, মিত্র অপেক্ষা শত্রু ভাল, কারণ শত্রুরূপেই ভগবান্ আমাদিগকে পূর্ণ কৃপা দান করিতেছেন।

শিষ্য। আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু এই ভাবে জগৎকে দেখা কি সম্ভব?

(কৃষ্ণ ও কালী)

গুরু। সম্ভব বৈ কি, তবে খুবই কঠিন। দেখ, পূর্ণ চন্দ্র, বসন্ত-বায়ু, ফুল্ল কুসুম, যমুনাতীর, সুস্বর মুরলী, সুন্দর নটবর শ্যামরূপ—এই সকলের মধ্যে ভগবানের প্রেম ও করুণা প্রত্যক্ষ করা বড় কঠিন নহে, কিন্তু অমানিশি, ঘোর অন্ধকার, ঝটিকা-বৃষ্টি, ভীষণ শ্মশান, ছিন্ন ভিন্ন শবদেহ, পেচক ও শৃগালের বিকট চীৎকার এবং লোলজিহ্বা খড়্গহস্তা রুধিরপায়িনীর গগনভেদী হুঙ্কার ও প্রচণ্ড তাণ্ডব—ইহার মধ্যে তাঁহার অনন্ত প্রেম—অপার করুণা দেখিতে পাওয়া বড়ই কঠিন, বড়ই দুর্লভ।

শিষ্য। আপনি কৃষ্ণ ও কালীর যেরূপ বর্ণনা দিলেন, তাহা হইতে বোধ হইতেছে যেন ইঁহারা ভগবানের দুইটি ভাব (aspeets) স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছেন, জগতের সুখসম্পদ, সৌন্দর্য্য, আলোকের দিক্‌টা যেন কৃষ্ণমূর্ত্তি দ্বারা এবং বিপদ্ দুঃখ, ভীষণ ও অন্ধকারের দিক্‌টা যেন কালীমূর্ত্তি দ্বারা সূচিত হইতেছে। ইহাই কি মূর্ত্তিদ্বয়ের রহস্য?

গুরু। ইহা একটি রহস্য বটে, কিন্তু মূর্ত্তিদ্বয়ে আরও অনেক রহস্য আছে। যতই চিন্তা করিবে, ধ্যান করিবে, ততই রহস্য স্ফুরিত হইবে।

শিষ্য। সে যাক্। যাহারা মন্দ বস্তুতে ভগবানকে দেখিতে না পারিবে, তাহারা কি করিবে?

গুরু। তাহারা মন্দ বস্তুগুলি ত্যাগ করিয়া কেবল ভাল বস্তুতেই তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করিবে। পাপী, দুষ্ট ও অসৎলোক সম্বন্ধে আলাপ ও চিন্তা

করিবেনা, সর্ব্বদা সাধু চর্চ্চা ও সাধু চিন্তা করিবে। অন্ধকারের দিক্‌টা না দেখিয়া আলোকের দিক্‌টাই দেখিবে।

শিষ্য। ইহা কিরূপে সম্ভব? পদে পদে তো আমাদিগকে দুষ্ট লোকের সহিত মিশিতে হয়, তাহাদের বিষয় শুনিতে হয়। তখন উপায়?

গুরু। ইচ্ছা করিয়া তাহাদের চরিত্র শ্রবণ বা আলাপ করিবে না। কিন্তু যখন একান্ত শুনিতেই হইবে, তখন ভাবিবে ভগবান্ ইহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন, বিকাশ পান নাই, দুর্ভেদ্য আবরণের মধ্যে আত্মজ্যোতি লুক্কায়িত রহিয়াছে। যখন সৎকর্ম্মের দ্বারা এই আবরণ বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ হইবে, তখন ঐ জ্যোতি বাহির হইবে। ইহা ভাবিলে তাহাদের প্রতি করুণার উদয় হইবে।

(মিত্ররূপে ভগবান।)

শিষ্য। আচ্ছা, তাহাই যেন হইল, মন্দ বস্তুতে ভগবানকে দেখিবার চেষ্টা করিলাম না। কিন্তু ভাল বস্তুতে তাঁহাকে কি ভাবে দেখিব?

গুরু। কেন? গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবানের কথার উল্লেখ করিয়া ইহার কিঞ্চিৎ আভাস তোমাকে পূর্ব্বেই তো দিয়াছি? জগতের যেখানে যত সৌন্দর্য্য, প্রেম, স্নেহ, দয়া, ভক্তি, ত্যাগ, জ্ঞান, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও তেজ দেখিবে, ভাবিবে তৎসমস্তই শ্রীভগবানের এক কণা মাত্র। একটি সুন্দর ও কোমল পুষ্প দেখিলে সেই অনন্ত সুন্দরকে মনে পড়িবে, পক্ষী স্বীয় শিশুকে আহার দিতেছে, গাভী হাম্বারবে বৎসের দিকে ছুটিতেছে বা মাতা পুত্রের মুখ চুম্বন করিতেছেন, ইহা দেখিবামাত্র তাঁহার অনন্ত করুণার স্মৃতি জাগিয়া উঠিবে। মানবের মিষ্ট কথায়, ভক্তের গানে, প্রেয়সীর হাস্যে, শিশুর আব্দারে, কুসুমের সৌরভে, এবং খাদ্যের মিষ্টতায় সেই পরম মধুরেরই আস্বাদ পাইবে। আমাদের প্রতিভাশালী ভক্ত কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ইহা কেমন সুন্দর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন শুন,—

"জীবন আমার যত আনন্দ পেয়েছে দিবস রাত।
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে স্মরিব জীবন-নাথ॥
বার বার তুমি আপনার হাতে স্বাদে, গন্ধে ও গানে।
বাহির হইতে পরশ করেছ অন্তর মাঝখানে॥

পিতা মাতা ভ্রাতা প্রিয় পরিবার, মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে হৃদয়ে প্রবেশি তুমি আছ মোর সাথ।
সব আনন্দ মাঝারে তোমারে স্মরিব জীবন-নাথ॥"

শিষ্য। ইহাও সামান্য কথা নহে। জগতের যেখানে যত সৌন্দর্য্য আছে, তৎসমুদায়েই সর্ব্বদা (অশনে বসনে শয়নে স্বপনে জাগরণে) ভগবান্‌কে দেখিতে পাওয়া যায়,—ইহাও আমার পক্ষে অতিশয় কঠিন বোধ হইতেছে। চিত্তের তীব্র একাগ্রতা, ধ্যানের প্রগাঢ়তা অগ্রে লাভ না করিলে, ইহা কি সম্ভব ?

গুরু। ঠিক ধরিয়াছ। অগ্রে একটি বস্তু অবলম্বনে চিত্তের প্রগাঢ় একাগ্রতা না জন্মিলে, বহু বস্তুতে একই বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং সুন্দর বস্তুমাত্রেই ভগবদ্দর্শন তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন থাকে না। মুহূর্ত্তের জন্য ঐভাব আসিলেও উহা স্থায়ী হয় না, ছুটিয়া যায়, তখন ভাবুক দুঃখ করিয়া বলেন,—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না ?"

শিষ্য। মাঝে মাঝে দেখিলে আর কি হইল ? বরাবর দেখিবার উপায় কি ?

(একাগ্রতা-সাধন)

গুরু। প্রথমে একটি বস্তুতে বা বিষয়ে একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হয়। বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে একাগ্রতা সাধনের প্রণালীও বিভিন্ন। যাঁহার যে বিষয়ে বা বস্তুতে চিত্ত সহজে আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই বিষয়েরই ধ্যান অভ্যাস করিতে পারেন। মনে কর তুমি গোলাপ ফুল ভালবাস। চক্ষু মুদিয়া মানস-চক্ষে একটি গোলাপ ফুল দেখিতে চেষ্টা কর, উহার প্রত্যেক পাতা, পাপ্‌ড়ি, বোঁটা, কেশর, পরাগ সমস্তই দেখা চাই, উহার কোমলতা অনুভব করিবে, সুগন্ধের আঘ্রাণ পাইবে। প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট হইবে, হয়ত এক সেকেণ্ড দুই সেকেণ্ডের অধিক উহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু নিত্য নিয়মিত রূপে ঐরূপ করিতে করিতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগত অভ্যাস করিলে, দেখিবে ঐ ফুলটি তোমার ধ্যানে যেন বাস্তব হইয়াছে। তখন তুমি অনায়াসে দু'এক ঘণ্টা উহাকে মনোমধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে, মন অন্য দিকে যাইবে না, উহাতেই স্থির হইয়া

থাকিবে। তখন বোধ হইবে যেন তোমার বাহ্যজ্ঞান ক্রমে কমিয়া যাইতেছে, যেন চক্ষু সম্মুখের জিনিষ আর দেখিতে পাইতেছে না, কর্ণ চতুর্দ্দিকের নানা শব্দ শুনিতে পাইতেছে না। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত হইবে এবং কয়েক ঘণ্টা তোমার চিত্ত ঐ পুষ্পে সমাধিস্থ হইয়া থাকিবে। ইহার পর যে যে অবস্থা ঘটে, তাহা উল্লেখ করিবার এখন প্রয়োজন নাই; তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এটি প্রথম সমাধি, ইহার পর আরও অনেকগুলি সমাধি আছে। প্রথম সমাধি দ্বারা তুমি ক্ষিতিতত্ত্বটি জয় করিলে মাত্র; কিন্তু সমগ্র প্রকৃতিকে জয় না করিলে ভগবদ্দর্শন ঘটিবে না। অতএব ঠিক এইরূপে তোমাকে এক একটি সমাধি দ্বারা এক একটি অবশিষ্ট তত্ত্ব (অপ্ তেজ বায়ু প্রভৃতি) জয় করিতে হইবে।

শিষ্য। আপনার শেষের কথাগুলি ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। যদি সুবিধা হয়, সময়ান্তরে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। এখন মূল বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য কর। অবশ্য গোলাপ ফুল আমি উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি। যে বিষয়ে মন সহজে বসে, সেই বিষয় লইয়াই অভ্যাস করিতে হয়। কেহ বা শিব, কৃষ্ণ, গণেশাদির মূর্ত্তি, কেহ বা সূর্য্য, কেহ বা জ্যোতিঃ, কেহ বা বিন্দু, কেহ বা মন্ত্রধ্বনি, কেহ বা সত্য-দয়াদি-ভাব, এবং কেহ বা শরীর মধ্যস্থ কোন চক্র বা নাড়ী অবলম্বন করিয়া, ধ্যান অভ্যাস করেন। সকলেরই উদ্দেশ্য এক—মনকে স্ববশে আনা বা একাগ্রতা-সাধন। যেরূপেই হউক প্রকৃতিকে যখন জয় করিতে পারিবে, মনটা যখন সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিবে, তখন তুমি উহাকে যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই রাখিতে পারিবে, তখন অহর্নিশ ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকিতে পারিবে, তখন আর "হারাই হারাই সদা ভয়" হইবে না। তখন যাহা কবি-কল্পনা তাহা তোমার জীবনে বাস্তব হইবে, তখন সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেই প্রেমময়, করুণাময়কে দেখিতে পাইবে, তখন দেখিবে নদ-নদী-সিন্ধুরূপে তিনিই মধুক্ষরণ করিতেছেন, সূর্য্য-চন্দ্র-বায়ুরূপে তিনিই অমৃত বর্ষণ করিতেছেন, অসংখ্য জীবরূপে তিনিই অসংখ্য কৃপা দান করিতেছেন, তখন অর্জ্জুনের ন্যায় বিস্ময়বিহ্বল ও ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে বলিতে থাকিবে—

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥

শিষ্য। মনটাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারিলেই কি এই জ্ঞান ও প্রেম আপনিই উদিত হইবে? না, চেষ্টা করিয়া আনিতে হইবে?

গুরু। যাহা চিরকালই আছে তাহার জন্য আবার চেষ্টা কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি আত্মা একটি স্বতঃ সিদ্ধ পদার্থ। ইনি অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেম-স্বরূপ। ইনি সকলের অন্তরেই বিরাজিত, কিন্তু মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদির আবরণে আবৃত থাকায়, সম্যক্ প্রকাশিত হইতে পারিতেছেন না। মনটার চঞ্চলতাকে নাশ করিলেই ইহার জ্যোতিঃ স্বতই বাহির হয়। যতক্ষণ মনের ক্রিয়া, যতক্ষণ সঙ্কল্প বিকল্প, যুক্তি তর্ক, বিচার বিবেচনা, স্মৃতি কল্পনা, ততক্ষণ এই প্রেম ও জ্ঞান আবৃত—আচ্ছন্ন। কিন্তু যেমনি সব স্পন্দনগুলি থামিয়া যায়, যেমনি মনটি স্থির ভাব ধারণ করে, অমনি আত্মার আলোক প্রকাশিত হয়। কিরূপ জান? যেমন আন্দোলিত—তরঙ্গায়িত সমুদ্রবক্ষে পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব প্রকটিত হয় না,—ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু জলটি স্থির হইলেই উহা প্রকাশ পায়, ইহাও সেইরূপ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী বিএ।

মরণ ও মরণান্তে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নির্ব্বাণ।

ইহ-জগৎ সম্বন্ধে স্বর্গরাজ্য যেরূপ, পুনর্জন্ম সম্বন্ধে নির্ব্বাণও সেইরূপ। পার্থিব সুখের বিশুদ্ধতা, উৎকর্ষতা ও চরমত্ব যেমন স্বর্গবাস কালে লাভ হয়, ঠিক সেইরূপ পুনর্জন্মের পূর্ণত্ব ও চরমত্ব নির্ব্বাণ মুক্তিতে পর্য্যবসিত হয়। নির্ব্বাণ অতি মহৎ ও অতি গরীয়ান অবস্থা। এই অভাবনীয় ও অতুলনীয় গুরুতর বিষয়ের আলোচনা 'এই সামান্য প্রবন্ধের যোগ্য নহে। তবে "মরণ ও

মরণান্তে" কথার মধ্যে "মরণান্তে" এই বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্ত তাহার অবতারণা করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। নির্ব্বাণ যে কি অবস্থা, তাহা সামান্ত মনুষ্য-ভাষায় ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাতে এই অত্যুচ্চ মহৎ অবস্থাটীকে কুৎসিত ও কদাকার করা হইবে মাত্র। নির্ব্বাণ কি, তাহা বলা বড়ই কঠিন। তবে নির্ব্বাণ যে কি, না, তাহা মোটামোটি বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্ব্বাণ অর্থে বোঝেন চিরধ্বংস, সংজ্ঞার বিনাশ ইত্যাদি। নির্ব্বাণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই ভ্রান্ত ধারণা বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছিল। তবে শ্রীযুত সিনেট সাহেবেব গ্রন্থাদি প্রচারে এ ভ্রান্তি বহু পরিমাণে দূব হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয়। নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ কামাগ্নি-নির্ব্বাণ, বাসনার বিনাশ। নির্ব্বাণ অর্থে কখনই জীবাত্মার বিনাশ বোঝায় না।

যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪।৫ অঃ।
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫।৫ অঃ।
কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬।৫ অঃ।

যাঁহার আত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই আরাম, আত্মাতেই প্রকাশ, সে ই যোগীই ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়েন। ২৪

যাঁহারা নিষ্পাপ, সংশয়-বর্জ্জিত, যতাত্মা ও সর্ব্বভূত-হিতে রত, তাঁহারা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। ২৫

যাঁহাদিগের হৃদয়ে কামক্রোধাদি উৎপন্ন হয় না, যাঁহারা সংযতচেতা এবং আত্মসাক্ষাৎকারবান্, তাঁহারা কি জীবিতাবস্থা কি মরণান্তে, নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৬

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি। ১৫।৬। অঃ।
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮।৬ অঃ গীতা।

সংযতচিত্ত, যোগাভ্যাসী পুরুষ মন নিরোধ করিয়া আমার স্বরূপভূত নির্ব্বাণ-রূপ পরম শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ১৫

এইরূপে নিষ্কাম ও ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ-বর্জ্জিত নিষ্পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্মরূপ-সংস্পর্শে অপরিমিত সুখ প্রাপ্ত হন। ২৮

এখন জিজ্ঞাস্য এই, নির্ব্বাণ লাভে ভগবৎসৃষ্টির সঙ্গে কি নির্ব্বাণীর সম্বন্ধ একেবারে রহিত হইয়া যায়? কখনই না। পুনরায় যখন নূতন সৃষ্টিপত্তন হয়, তখন নির্ব্বাণী নৈসর্গিক কার্য্যে যোগ দেন।

জ্যোতির্ম্ময় সূত্রটী অবিনশ্বর। নির্ব্বাণের সময় ইহার বিশ্লেষণ ঘটে মাত্র, কিন্তু বিনাশ হয় না। যখন বিশ্বনিয়ন্তার অমোঘ বিধান, সকলকে কার্য্যক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য আহ্বান করিবে, তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় সূত্রটী নির্ব্বাণ অবস্থা হইতে আবির্ভূত হইবে। তখন নির্ব্বাণী সৃষ্টিকার্য্যে ও নৈসর্গিক ব্যাপারে যোগদান করিবেন। নির্ব্বাণমুক্তি লাভের সময় সমস্তই লোপ পায়, কেবল ব্যক্তিগত সংজ্ঞা-কেন্দ্রটী বর্ত্তমান থাকে। এই সংজ্ঞা-কেন্দ্রটীকেই জ্যোতির্ম্ময় সূত্র বলা হইল। ওঁ।

পরলোকবাসীর সঙ্গে ইহলোকবাসীর সম্মিলন।

সাধারণতঃ ইহলোকবাসীকে "জীবিত" এবং পরলোকগামীকে "মৃত" বলা হয়, যেন স্থূলদেহই প্রকৃত মানুষ, অথবা প্রকৃত মানুষ যেন মরিয়া যায়। অতএব পরলোকগামীকে মৃত বলা ভ্রম, "জীবিত" ও "মৃত" এই দুই শব্দের পরিবর্ত্তে ক্রমে "দেহী" ও "দেহমুক্ত" শব্দদ্বয় ব্যবহার করাই সঙ্গত। দেহীর সঙ্গে দেহমুক্তের সম্মিলন বলিলেই ঠিক্ হয়।

আমরা যথাতথা আত্মা (Spirit) শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ আত্মা এক অসীম ও অনন্ত-শক্তি; ইহা পরিদৃশ্যমান জগতের একমাত্র মূলীভূত কারণ। দেহত্যাগের পর মানব নানা বিশেষ বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কাজেই সেই সেই অবস্থা বিবেচনায় দেহীর সঙ্গে দেহ-মুক্তদের সম্মিলনকে নিম্ন চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়।

(১) যখন জীব স্থূল (ভাণ্ড) দেহ পরিত্যাগ করিয়া ছায়া (পিণ্ড) দেহে অবস্থান করে। ইহা দীর্ঘস্থায়ী না হইলেও জীব পিণ্ডদেহে চক্ষুগোচর হইতে

হইতে পারে। এই সময় জীব নীরব থাকে, কোন কথা বলে না। রাত্রে নিদ্রাবস্থায় বোবায় পাইলে লোক যেমন নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ করে, পিণ্ডদেহধারী জীব দৃষ্টিগোচর হইলে ঠিক্ সেইরূপ দেখায়। স্থূলদেহ ত্যাগ করার ন্যায় জীব যখন পিণ্ডদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন ইহা স্থূলদেহের ন্যায় শবরূপে শূন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকে। তবে তাড়িতশক্তি বলে ইহাতে কৃত্রিম জীবনীশক্তি সঞ্চার করা যাইতে পারে।

(২) যখন জীবাত্মা কামলোকে অবস্থান করে। ইহার পরিমাণকাল সকলের পক্ষে সমান নহে। কামলোকে জীব কামদেহ ধারণ করে। তখন ইহলোকস্থ মানবের সঙ্গে, বিশেষতঃ চক্রস্থ আবিষ্ট লোকের সংসর্গে আসিয়া নানা গোপনীয় কথা ব্যক্ত করতঃ লোককে চমৎকৃত করে। পৃথিবীর সংস্পর্শে থাকা পর্য্যন্ত এইরূপ সম্মিলন সম্ভবপর। তবে ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

(৩) যখন জীব স্বর্গে বাস করে। তখন ইহলোকস্থ সাধক ইচ্ছা করিলে মানসদেহে স্বর্গলোকে গমন করিয়া স্বর্গবাসীর সঙ্গে মিলিত হইতে পারেন। তুমি তোমার অনেক বন্ধুসম্বন্ধে কি জান? তুমি এবং তোমার বন্ধু উভয়েই জীবিত। তোমার কথিত বন্ধুর আকার প্রকার, গতিক্রিয়াদির বলে তোমার মানসপটে তাহার যে মানসিক প্রতিবিম্ব অঙ্কিত হয়, সেই প্রতিবিম্বই প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার স্থূল জগতের বন্ধু। তাঁহার সম্বন্ধে এতাধিক জ্ঞান তোমার নাই। ইহাতে স্থূলজ্ঞানের কোনরূপ অভাব নাই। ঠিক্ সেইরূপ প্রতিবিম্ব স্বর্গবাসীর মানসপটের সংজ্ঞায় প্রতিফলিত হয়। তাহাতেও স্থূলজ্ঞানের কোন ব্যতিক্রম হয় না। যেমন স্থূলজগতের দর্শকের নিকট তাহার স্থূলোপাধি-বিশিষ্ট বন্ধুই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়, ঠিক্ সেইরূপ, মানস-জগতের দর্শকের নিকট সেই জগতের লোক তদনুরূপ প্রতীয়মান হয়। উন্নত সাধক ইহলোকে থাকিয়াও স্বর্গবাসীর সঙ্গে অনায়াসে পুনঃপুনঃ ইচ্ছানুসারে মিলিত হইতে পারেন। জাগ্রতাবস্থাপেক্ষা নিদ্রিতাবস্থায় এইরূপ মিলন সহজ। অনেক সুস্পষ্ট ও বিশদ স্বপ্ন বাস্তবিকই সত্য; তাহারা কখনই অমূলক চিন্তামাত্র নহে। এইরূপ স্বপ্নে পরলোকগামী কাহাকেও দেখিলে বুঝিতে হইবে, কামলোকে কিম্বা স্বর্গে নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিয়াছিল।

আমাদের মানসজাত চিন্তা-সমূহমধ্যে প্রত্যেকটী সূক্ষ্ম মানসরাজ্যে এক একটী নির্দ্দিষ্ট আকার-বিশিষ্ট ও বিশেষ বিশেষ কার্য্যকরী শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। আমরা যেমন লোকের ইষ্টানিষ্ট করিতে সক্ষম, তাহারাও তদনুরূপ করিতে সক্ষম। দেহী যেমন দূরদেশস্থ তাহার প্রিয়জনের নিকট মঙ্গলময় চিন্তা প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিতে পারে, সেইরূপ স্বর্গবাসী তাহাব প্রিয়জনের নিকট মর জগতে শুভচিন্তা প্রেরণ করিতে পারে। সেই চিন্তা-সমূহ অলক্ষিতভাবে সুপ্রসন্না শুভচণ্ডীর ন্যায় সেই স্নেহপাত্রের অজ্ঞাতসারে আপদে বিপদে তাহাকে রক্ষা করে ও সময় সময় তাহার প্রভূত মঙ্গল-সাধন করে। ইহা যেন বিশেষ-রূপে মনে থাকে যে, প্রেতবাদীদের চক্রে কাহারও মাতার আত্মা আসিয়া উপ-স্থিত হইয়া পুত্রের শোকতাপ অপনোদন কবিতে না পারিয়া যেমন নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় হতাশ-হৃদয়ে নীরবে দাঁড়াইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাইয়া থাকে, সেই সকলের সঙ্গে তাহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই।

দেহধারী মানবের দেহ-কারাগার হইতে সময় সময় জীবাত্মা বাহির হইয়া স্বর্গবাসীর সঙ্গে মিলিত হইতে পারে। অপার্থিব দৃশ্যে, স্বপ্নে বা আত্যন্তিক উল্লাসের সময় পরলোকগামী আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার-লাভ হয় ও তখন তাঁহাদের নিকট হইতে নানা সুপরামর্শ পাওয়া যায়। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে বুঝিতে হইবে যে, দেহী স্বর্গলোকে গমন করিয়া তথায় তাহার সেই আত্মীয়দের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। স্বর্গবাসী কখনই মরজগতে আসিয়া আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করিয়া যায় নাই। স্বর্গবাসী স্বর্গ ছাড়িয়া কখনই ইহলোকে আইসে না।

(৪) পরলোকগামী জীবাত্মা-ব্যতীত অপরের সঙ্গে সম্মিলন। এই শ্রেণীর যাহাদের নিকট হইতে বার্ত্তা পাওয়া যায়, তাহাদিগকে নিম্ন ছয় ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে।

(ক) কামদেহ বা খোসা হইতে বার্ত্তা মিলে। জীবাত্মার পাপ-ফল-ভোগের কাল অবসান হইয়া আসিলে, সে কামলোকে তাহার কামদেহ পরি-ত্যাগ করিয়া পুণ্যফল-ভোগের জন্য স্বর্গে গমন করে। এই পরিত্যক্ত কাম-দেহটাকেই খোসা (Shell) কহে। ইহা নির্জীব হইলেও তাহাতে কিছুকাল সেই দেহীর বিশেষ বিশেষ হাবভাব, গতি-ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে; এবং পরিত্যক্ত স্থূলদেহ যেরূপ, অনায়াসে সেই দেহীর বিশেষ বিশেষ গতি-ক্রিয়া অনায়াসে স্বয়ং

ব্যক্ত করে, ঠিক্ সেইরূপ এই কামদেহও কথিত কার্য্যপ্রণালী স্বয়ং ব্যক্ত করিয়া থাকে। কামলোকস্থ এই খোসাগুলি অনুকূল চিন্তার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া প্রেতবাদীদের চক্রে উপস্থিত হয় এবং সেই দেহীর কার্য্যকলাপ, হাবভাবাদি অবলীলাক্রমে প্রকাশ করায় লোকে ভ্রমবশতঃ মনে করে যে, পরলোকগত জীব স্বয়ংই চক্রে উপস্থিত হইয়াছে।

(খ) ভূতযোনি সমূহ (Elementaries) হইতে সময় সময় বার্ত্তা পাওয়া যায়।

(গ) নির্দ্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট মানসিক চিন্তা সমূহ (Elemental) হইতে অনেক সময় বার্ত্তা মিলে।

(ঘ) নির্ম্মাণকায়গণ হইতে সময় সময় উপদেশ পাওয়া যায়। নির্ম্মাণকায় গণ পূর্ণ মানুষ। তাঁহারা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণে মানবজাতির ক্রমোন্নতির সাহায্য কল্পে পৃথিবীর গণ্ডিতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা পরম দয়ালু ও জীবের হিতকারী। তাঁহারা নির্ব্বাণ মুক্তি লাভে অধিকারী হইয়াও কেবল শোকাতুর জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া এই পরম পদ হেলায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই মুক্তাত্মা মহাপুরুষগণ মনে করিলেন, অবিদ্যার বশীভূত হইয়া যখন আপামর অজ্ঞ জীব ক্লেশ ভোগ করিতেছে, তখন স্বয়ং নির্ব্বাণ লাভে শান্তি ভোগ করা নিতান্ত স্বার্থপরতার কার্য্য। তাঁহারা স্থূলদেহ-বিহীন, যেহেতু তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছেন। জীবের মঙ্গল কামনায় সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া তাঁহারা পৃথিবীর গণ্ডিতে বাস করিতেছেন। পবিত্র-চিত্ত পুণ্যাত্মা লোক ব্যতীত অন্যের সংসর্গে তাঁহারা কখনই আইসেন না। তাঁহাদের সঙ্গে সাধারণ আবিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে না।

(ঙ) বর্ত্তমানে ইহলোকবাসী মহাত্মাগণের নিকট হইতে সময় সময় অজ্ঞাতসারে উপদেশাদি পাওয়া যায়। গুরুরূপী মহাত্মাগণ বহুদূরদেশে অবস্থান করিয়াও তাঁহাদের শিষ্যদের নিকট আবশ্যকমত বহুমূল্য উপদেশাদি প্রেরণ করিয়া থাকেন। যদি কোন মহাত্মার সঙ্গে পূর্ব্বজন্মে কোন আবিষ্ট ব্যক্তির বন্ধন থাকে, তবে সেই আবিষ্ট ব্যক্তির নিকট তিনি কোন বার্ত্তা প্রেরণ করিলে তাহা পরলোকগত কোন আত্মা হইতে আসিয়াছে বলিয়া সহজেই মনে

করা হয়। লেখ্যে বা বাক্যে প্রকাশিত এইরূপ বার্ত্তা কোন কোন উন্নত শিষ্য বর্ত্তমান সময়ে পাইয়া থাকেন।

(চ) আবিষ্ট ব্যক্তির স্বীয় আত্মা হইতে সময় সময় নীরব বাণী আগমন করে। যদি কোন সরল পবিত্রাত্মা লোক ভগবৎকৃপা-লাভের জন্য একান্ত ব্যগ্রতা ও অনুরাগ প্রকাশ করে, তবে সেই আগ্রহযুক্ত চেষ্টার ফলে তাহার স্বীয় আত্মার জ্যোতি অবতরণ করিয়া তাহার চিত্তে প্রতিফলিত হয় ও মনকে উদ্ভাসিত করিয়া ফেলে। পুত্ররূপী মন, পিতারূপী স্বীয় আত্মার সহিত কথিতরূপে ক্ষণকালের জন্য মিলিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান-লাভের অধিকারী হয়, এবং তখন যে পরিমাণ জ্ঞান ধারণা করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তাহাই বাহ্যজগতে প্রকাশ করে।

ইহা ব্যতীত পরলোকবাসী আত্মঘাতীদের নিকট হইতেও সময় সময় বার্ত্তা পাওয়া যায়।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যায়, সাধারণতঃ পরলোকগত আত্মা হইতে বার্ত্তা পাওয়া যায় বলিয়া যে লোকে বিশ্বাস করে, তাহা কিরূপ ভ্রান্ত! কারণ পরলোকগত আত্মা ভিন্ন অন্যান্য নানা উপায়ে, অদৃশ্য ও অলৌকিকভাবে কথিত বার্ত্তা পাওয়া যাইতে পারে।

প্রকৃত প্রস্তাবে জীব মৃত্যুর পর যাহা করিতে পারে, দেহ ধারণ কালে ইহজীবনেও তাহা করিতে পারে। কাজেই লিখিত উপায়ে, সুষুপ্তি অবস্থায় বা অন্যান্য উপায়ে যেমন পরলোকগত আত্মা হইতে বার্ত্তা পাওয়া যায়, ইহলোকস্থ দেহধারী মানব হইতেও সেইরূপ বার্ত্তা পাওয়া যায়। অতএব লক্ষ্যভ্রষ্টের ন্যায় ছুটাছুটি না করিয়া বা অজ্ঞের ন্যায় বিপদ্-সঙ্কুল বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া সকলেরই স্থির ধীর-ভাবে আত্মোন্নতির প্রতি মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। কারণ আত্মশক্তির বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধনে নিরাপদে জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে থাকে ও ক্রমোন্নতির গতি দ্রুতগামী হয়। ইহাই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই একটী বিষয় ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিও—প্রকৃত মানবই জীবাত্মা, তাহার উপর মৃত্যুর কোনরূপ অধিকার নাই। দেহ-কারাগারের চাবি তাহার নিজ হাতেই আছে; ইচ্ছা করিলেই মানব এই চাবির ব্যবহার শিক্ষা করিতে পারে। মানবের প্রকৃত আত্মা স্থূলদেহাভিমানে অন্ধ হইয়া অন্যান্য আত্মার সংস্পর্শ বোধ

হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাই ইহলোকস্থ দেহী ও পরলোকস্থ জীবের মধ্যে মৃত্যু, সেতুস্বরূপ না হইয়া পরস্পর বিচ্ছেদকারী মধ্যবর্ত্তী সাগরতুল্য প্রতীয়মান হইতেছে। ওঁ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুদর্শন দাস (বি, এল,)।

ভিখারী।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এক কোণে পড়িয়া আছি। আমাকে কেহ ডাকে না, কেহ কাছে আসে না, আমার কথা কেউ শুনে না। দিবারাত্র মরমে জ্বলিয়া পুড়িয়া কতই কষ্ট পাইতেছি, আমাকে কেহ সুধায় না, আমার দিকে কেউ চাহে না। পথের ধারে লুটাপুটি খাইতেছি, ধূলায় অঙ্গ ধূসরিত করিতেছি, শূন্য আকাশের শূন্যতলে বসিয়া কতই নিরাশায় গান করিতেছি, আমার দিকে ভুলিয়াও কেহ ভ্রূক্ষেপ করে না। বিষাদের কালি লৈয়া যে গাথা আজ গাঁথিতেছি, তোমরা কি কেহ তাহা শুনিবে? শ্মশানের পূতিগন্ধযুক্ত শবের ছিন্নমুণ্ড কুড়াইয়া গলদেশে ধারণ করিয়াছি, তোমরা কি আমার ভীষণ মূর্ত্তি একবার দেখ্‌বে? তোমাদের বাগানে কত গোলাপ, মল্লিকা, জুঁইফুল ফোটে, আমার এ শ্মশান-কাননে কেবল শবের রাশি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। তোমাদের বাগানে কত পাপিয়া, কত কোকিল শান্তির ঝঙ্কার করে, আমার শ্মশান-কাননে শিবার দল হাঁ হাঁ করিতেছে। তোমরা আনন্দবাজারে সুখের পসরা সাজাইয়া সাধের বেচা-কেনা করিতেছ, আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তীর্ণ কাননের এক কোণে পড়িয়া বলিতেছি, "ভিখ্ দেও বাবা।"

আমি ভিখারী। জগতে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। পরের মুখাপেক্ষী হইয়া, পরের পায়ে ধরিয়া কত তোষামোদ করিয়া বলিতেছি ভিক্ষা দাও, কিন্তু কেহ আমার কথা শুনে না, দেখিলে দূরে পলায়ন করে, আমি কত মিনতি, স্তব-স্তুতি করিয়া বলি, আমি ভাণ্ডার পূরণ করিয়া চাহি না, উদর পুরিয়াও চাহি

না, চাহি কেবল এক মুষ্টি। কিন্তু হায়! এ বাজারে মুষ্টি-ভিক্ষাও মিলিতেছে না। সময় নাই, অসময় নাই, কত চিৎকার, কত রোদন করি। আশা নাই, ভরসা নাই, তথাপি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া নগরে নগরে, দ্বারে দ্বারে, ঘুরিয়া বেড়াই, তথাপি মুষ্টি-ভিক্ষাও মিলে না। কতকাল ধরিয়া কতদিন ধরিয়া কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া, এ ভিক্ষা-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, জানি না, কিন্তু ইহার সীমা নাই, শেষ নাই, এ ব্রতের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। কবে এ ব্রতের উদ্যাপন হইবে, তাহা জানি না। কবে ব্রতাবসানে হাঁসি মুখে পারণ করিতে বসিব, তাহা বলিয়া দাও বিভো! আর এ দুঃখ—এ যন্ত্রণা—এ মর্ম্মগাথা, নাথ! আর কত দিন গাহিব?

আমার ভিক্ষা কি! আমার ভিক্ষা অতি সামান্য—বেশী নহে। ধন চাহি না, মান চাহি না, নন্দনকাননের সুখ চাহি না, বাহ্য সুখের পিঞ্জরে পোষাপাখী হইয়া আনন্দের বুলি বলিতেও ভাল লাগে না। হয় ত আমি যা চাই, জগতের অনেকে তাহা চাহে না; আমি যার জন্য লালায়িত, অনেকে হয় ত তাহা ঘৃণার চক্ষে দেখে। বিষাদ-বিভোরা, বিষ-ভরা হৃদয় লইয়া শান্তির জন্য যে দিকে ঢলিয়া পড়ি, জগতের ভস্মস্তূপ ফেলিয়া আবেশ-বেগে বিবশ-হৃদয়ে যে দিকে এলাইয়া পড়িতে যাই, অনেকে হয়ত সেদিক মাড়াইতে চাহে না। না চাহুক ক্ষতি নাই, আমি কিন্তু চাই। আমি যা চাই—তাহা কি? তাহা আর কিছুই নয়—তাহা এক বিন্দু—সামান্য এক বিন্দু চক্ষের জল—একটু ভগবৎ-প্রেম-কণিকা। বেশী নয়,—বেশী চাহিলে হয় ত পাব না,—তাই এক বিন্দু। এ আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে বেশী ধরিবেই বা কোথায়?—তাই একবিন্দু—এক কণামাত্র। আমি গরিব ভিখারি, গরিবের এক রতি সোনাই বিপুল সম্পত্তি। গরিবের রাংই সোনা।

আহা! এমন অতুলনীয় জিনিস আর নাই। শোকে তাপে প্রাণ যখন হু হু করিতে থাকে, নৈরাশ্যের দাবানলে যখন চারিদিক ঘিরিয়া ফেলে, তখন শান্তিময় প্রস্রবণ খুলিয়া দেয় কে? এই অশ্রুজল। সংসারের মরুময় বক্ষে শোকে, তাপে যখন বুক ফাটিতে থাকে, তখন শীতল বারির ফোয়ারা খুলিয়া দেয় কে? এই প্রেমকণিকা, তাই বলিতেছিলাম, এমন জিনিস আর নাই, এমন মাধুরী আর নাই। হায়! আমার এ মুষ্টি-ভিক্ষা এ জগতে মিলে না। জ্ঞানের কথা যোগের কথা, এ বাজারে মিলে, কিন্তু আমি যাহা চাই, তা'ত মিলে না;

রোকের কথায় তেজের কথায় এ প্রাণ ভিজে না। পাষাণে পাষাণ মিশাইলে, আগুনের উৎপত্তি হয়, অমৃতের উৎস ছুটে না। শুষ্ক মাটিকে যদি মিশাইতে হয় তো আগে জল দিয়া ভিজাইতে হয়। নীরস ও সরস মিশিয়া এক হয় ইহাই ত নিয়ম। আমার নীরস জীবন রসের কূপে ডুবাইতে চাই, লৌহময় কঠিন প্রাণ প্রেমাগুণে গলাইতে চাই। গলাইয়া তবে ত জ্ঞানের মসলা মিশাইব। রস ও মশলা মিশাইয়া তবে ত রসকবা ভাজিব। তার পর রসের খোলা সাজাইয়া রসময়ের দোকানে বসিয়া বলিতে পারিব :—

"আয় আয় কে নিবি রসের মতিচুর !
নিত্যানন্দ রসের পুর ॥
ঐ যে দুঃখী তাপীর জুড়াতে প্রাণ,
পাত্‌লে দোকান শ্রীগৌর ;
কিবা সন্ধ্যা কিবা সকাল,
যথা যাও নাহি কালাকাল ;
টাট্‌কা রসে ভরা গাল অতি রসাল সুমধুর ॥"

হায়! এমন দিন কি হবে? ভিক্ষার সাধ কি পূরবে? পশু, পক্ষী, গিরি, নদী তোমরা বলিতে পার, আমার এ মরম যাতনা কি মিটিবে? জগতের এক কোণে পড়িয়া আছি, বলিতে পার কবে সে মহাকাশে উড়িব? সেই প্রাণের প্রাণ প্রাণনাথে প্রাণের ভিতর রাখিয়া প্রাণের কথা বলিতে বড় সাধ যায়। সেই শ্যামল মধুর মূরতি বুকের ভিতর রাখিয়া দরবিগলিতাশ্রুধারে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। সেই রাসরসিক রসেশ্বরের রসময় তরঙ্গে তাপিত প্রাণ শীতল করিতে বড় সাধ হয়। এ বাসনা কি মিটিবে? দরিদ্রের পর্ণকুটীরে দীনসখা কি দয়া করে একবার দেখা দিবেন না?

ওহো! আমি কি পাগল! যাহা কখনও দেখিতে পাইব না, তাহাই দেখিতে সাধ। ভিখারী হইয়া রাজরাজেশ্বরের দরবারে বড় দুঃসাহসে চলিয়াছি। রাজদর্শনে যাইতে হইলে, কিছু উপহার লইয়া যাওয়া নিয়ম আছে। আমি কিন্তু শূন্য হাতে শূন্য প্রাণে উলঙ্গ দেহে চলিয়াছি। প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, যাহা কিছু উপহার দিবার যোগ্য, তাহা ত আমার কিছুই নাই। সংসারের দাবানলে সকলই পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। এই নিদারুণ চিতাভস্মই পুঁজি,

ইহাই তাঁহাকে উপহার দিব। তাঁহার রাজদরবারের রজত-সিংহাসনে এ প্রেত হৃদয়ের শবাসন বিছাইয়া দিব। তিনি তাহাতে বসিবেন, আমি তাঁহাকে বসাইব। তাঁহার সম্মুখে নিবৃত্তির খর্পরকুণ্ডে আমার সমস্ত বাসনার বলি দিব। সেই ছিন্ন বাসনার মুণ্ডমালা তাঁহার গলদেশে দুলাইয়া দিব। তিনি নাচিবেন, আমি নাচিব, ত্রিজগৎ নাচিবে। তাঁহার ভৈরব হুঙ্কারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থর থর কাঁপিয়া উঠিবে। তাঁহার অট্ট অট্ট হাসে গগনতল ভাসিয়া যাইবে। তাঁহার দিগম্বর আলু থালু বেশের বিকট তাণ্ডবে দিগ্‌দিগন্ত টলমল করিয়া উঠিবে। তখনই আমার সাধ মিটিবে—ভিক্ষা পূরিবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

বেদান্তাভাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গীতি-কাব্যস্বর—কীর্ত্তনাঙ্গ লোফা একতালা।

হৃদয়ের জ্বালা জুড়াব বলিয়া
শরণ তোমার লয়েছি হরি।
করহে বিধান,
করুণা-নিধান,
কাতরে করুণা করুণা করি॥ ১।

জ্বলন্ত অনল-সমান সংসার,
জ্বলিছে মাথায় নিয়ত আমার,
(ওহে) সংসার-কারণ,
সংসার-বারণ,
নিবার সংসার চরণে ধরি॥ ২।

বিষম বিষয়-বাসনা-গরল,
জারিয়াছে মম হৃদয়-কমল,

তুমি হে শ্রীহরি,
জানি বিষহরি,
অনুনয় করি, লওহে হরি ॥ ৩।

জানি আমি তুমি হও অন্তর্য্যামী,
জানি আমি তুমি জগতের স্বামী,
তব অগোচর,
ত্রিলোক ভিতর,
না জানি কি আছে, দয়াল হরি ॥ ৪।

হৃদয়ের দ্বার দিয়াছি খুলিয়া,
অভিমান ভার লয়েছি তুলিয়া,
দেখ একবার,
যা কিছু আমার,
দিয়াছি, তোমার চরণে ধরি ॥ ৫।

আমার বলিতে কিছু না রেখেছি,
এ আমি কিছু না বিশেষ জেনেছি,
যে আমি তোমার,
দাও একবার,
অদলে বদলে নাহি হে ডরি ॥ ৬।

এ বিশ্ব হেরি হে তোমার নয়নে,
রেখেছ যাহারে আদরে শাসনে,
কে নাহি রেখেছে,
ভাল না বেসেছে,
আদরের ধন, আদর করি ॥ ৭।

যা'ক্ জুড়াইয়া হৃদয়ের জ্বালা,
লই কুড়াইয়া সংসারের ডালা,
ধরি শিরোপরে,
তোমার আদরে,
লীলা খেলা তব না বুঝি হরি ! ৮।

পারি না সহিতে যাতনা যে আর,
ঘুচাইয়া দাও অজ্ঞান-আঁধার,
দেখি দিব্য চখে,
নীরবে নিরখে,
বিপুল আনন্দে পরাণ ভরি ॥ ৯।

ছায়াবাজীকর কাঠের মূরতি,
বাঁধি একতারে খেলায় যেমতি,
তুমি একতারে,
বাঁধিয়া আমারে,
খেলাতেছ রঙ্গমঞ্চের'পরি ॥ ১০।

খেলিতেছি খেলা খেলেছি যেমন,
জনমে জনমে, পূরব মতন।
গেছে পূরে সাধ,
সেই সাধে বাদ,
সাধিতেছি, ক্ষম করুণা করি ॥ ১১।

ভবের খেলা আর লাগে না ভাল,
জীবন প্রভাত হইল বিকাল,
ভব পারাবার,
মাঝে এ সংসার,
উগারে অনল, পরাণে মরি ॥ ১২।

পাপী তাপী কত কটাক্ষে তোমার,
করিহে শ্রবণ, হইয়াছে পার,
(ওহে) শান্তি নিকেতন,
শ্রীমধুসূদন,
কর পার দিয়া জ্ঞানের তরি ॥ ১৩।

রায়।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

১৩শ ভাগ | মাঘ, ১৩১৬ সাল। | ১১ সংখ্যা।

নারদের প্রতি দৈববাণী।

হরি আরাধন,
করিলে সাধন;
কাজ্ কিরে বৃথা তপ্ জপে ?
হরি আরাধন,
না করে যেজন,
(বৃথা) কাজ্ কিরে তার তপ্ জপে ?
(যার) বাহিরে অন্তরে,
শ্রীহরি রাজেরে,
কাজ্ কিরে তার তপ্ জপে ?
যার অন্তরে বাহিরে
না হরি রাজেরে,
(বৃথা) কাজ কিরে তার তপ্ জপে ?

হওরে বিরত
তপস্যাতে যত
যাও ত্বরা শম্ভু জ্ঞান্‌সাগরে।
হরি ভক্তি রস
লভরে সুরস
ভব বন্ধ যাহে ছেদ করে॥

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র

নারদ-পঞ্চরাত্র।

ভক্তি-গ্রন্থের মধ্যে নারদ-পঞ্চরাত্র একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ। পঞ্চরাত্র অর্থে পঞ্চবিধ জ্ঞান। অতি সাত্বিক, সাত্বিক, নৈর্গুণ্য, রাজসিক ও তামসিক ভেদে জ্ঞান পঞ্চ প্রকার।

অতি সাত্বিক পরম তত্বজ্ঞান, জন্ম-মৃত্যু-জরাপহারী। মৃত্যুঞ্জয় শম্ভু এই জ্ঞান কৃষ্ণ-মুখে পাইয়াছিলেন।

মুমুক্ষুগণের অভিবাঞ্ছিত, মুক্তিপ্রদ শুদ্ধ সাত্বিক জ্ঞান শ্রীহরিপদ-কমলে লীন করে।

মঙ্গলময়, শুদ্ধ নৈর্গুণ্য জ্ঞান কৃষ্ণভক্তি-প্রদ।

রাজসিক বা যৌগিক জ্ঞান দ্বারা অণিমা-লঘিমাদি সিদ্ধি-নিচয় লাভকরা যায়।

তামসিক বা বৈষয়িক জ্ঞান দ্বারা মনুষ্যগণ বিষয়ে বদ্ধ-চিত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়-সেবায় রত থাকে।

যিনি ভক্ত তিনি রাজসিক জ্ঞান বাঞ্ছা করেন না। যিনি বিদ্বান্ তিনি তামসিক চাহেন না।

ব্রাহ্ম, শৈব, কৌমার, বাসিষ্ঠ, কাপিল, গৌতমীয় ও নারদীয় ভেদে পঞ্চরাত্র সপ্তবিধ।

নারদ-পঞ্চরাত্র-শুক-ব্যাস-সম্বাদে কথিত, কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্ব এই গ্রন্থে অতি মধুর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হইবারই কথা, বক্তা যখন স্বয়ং ভক্তি-অবতার দেবর্ষি নারদ।

সুর-সিদ্ধ-বন্দিত, লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তি-সেবিত, সর্ব্বকারণ কারণ, মঙ্গলালয়, বেদবন্দ্য, ভক্তেশ্বর, ভক্তিপ্রিয় ভগবান্‌কে প্রণতিপূর্ব্বক স্তুতি করিয়া নারদ যেরূপে এই গ্রন্থ আরম্ভ করেন, তাহা মঙ্গলাচরণে ইঙ্গিত আছে।

জ্ঞানামৃতং জ্ঞানসিন্ধোঃ সম্প্রাপ্য শঙ্করাদ্‌গুরোঃ।
পরাবরাচ্চ পরমাত্মাযোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরোঃ॥
বেদেভ্যো দধিসিন্ধুভ্যশ্চতুর্ভ্যঃ সুমনোহরম্।
তত্ত্বজ্ঞান-মন্থদণ্ডেন সংনির্ম্মথ্য নবং নবম্॥
নবনীতং সমুদ্ধৃত্য নত্বা শম্ভোঃ পদাম্বুজম্।
বিধিপুত্রো নারদোহহং পঞ্চরাত্রং সমারভে॥

পুরাকালে গোলোকে শতশৃঙ্গ-পর্ব্বতে বিরজাতীরে মনোহর বটমূলে শ্রীরাধিকা-সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ এই পঞ্চরাত্র কমলোদ্ভব ব্রহ্মাকে বলিয়া ছিলেন। বিধাতা এই পূর্ণ পঞ্চরাত্র শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণে প্রণাম করতঃ শিব-মন্দিরে গমন করিলেন।

শঙ্কর পরম আদরে ভক্তি-সহকারে ব্রহ্মার পূজা করিলেন ও বিনীত-ভাবে বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বর্গে মন্দাকিনী-তটে বটবৃক্ষ মূলে উপবেশন করতঃ, ব্রহ্মা এই শুভ পঞ্চরাত্র শম্ভুকে বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। শম্ভু-স্বশিষ্য নারদকে এই বার্ত্তা বলিয়াছিলেন। আবার নারদ পুষ্করতীর্থে সূর্য্য-পর্ব্বে পুণ্যদিনে এই পুণ্য কথা মুনিগণ-সমক্ষে বেদব্যাসকে বলিয়াছিলেন।

পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে সিদ্ধ নারায়ণ-ক্ষেত্রে পুণ্য নারায়ণাশ্রমে সুপুণ্য বটবৃক্ষ-মূলে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-ধ্যানে একাগ্রচিত্ত, "কৃষ্ণ" এই অক্ষরদ্বয় জপ-যুক্ত, কৃষ্ণ-ভক্ত, কৃষ্ণাজিনাসনে সুখাসীন, কৃষ্ণাংশ, কৃষ্ণকান্তি, পিতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে সম্বোধন করিয়া শুকদেব কহিলেন—

"ভগবন্! আপনি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বেদবেদাঙ্গ-পারগ। শ্রুতি-সম্মত নিগূঢ় জ্ঞান-সমূহের মধ্যে যাহা অজ্ঞান-তমঃ-প্রদীপ সারভূত জ্ঞান তাহা বিচার-পূর্ব্বক আমাকে উপদেশ করুন।

তিনি পিতা যিনি জ্ঞান দাতা। তাহা জ্ঞান যাহা কৃষ্ণ-ভক্তিপ্রদ। সেই ভক্তি পরমা শুদ্ধা, যাহা কৃষ্ণ-দাস্যপ্রদা। তাহাই উত্তম দাস্য, যাহা সাক্ষাৎ-চরণ-সেবন। নিত্য গোলোকে বাস, হরির অগ্রত-স্তবন, সর্ব্বদা হরি-পাদপদ্ম-দর্শন, অবিচ্ছেদে তাঁর সঙ্গ, সেবা-কর্ম্মাদি—ভক্তের বাঞ্ছিত, সারভূত বস্তু বলিয়া শ্রুতিতে শ্রুত হয়।"

পুত্রের কথা শুনিয়া ব্যাসদেব হাস্য করিলেন। পুত্র জ্ঞানবান্ জানিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। পুত্রকে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া, সর্ব্বভাবন, সর্ব্বজ্ঞ, ব্যাস গুরু-মুখ হইতে যথাপ্রাপ্ত উপদেশ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্যাস কহিলেন—"শুক! তুমি ভারতে ধন্য, মান্য ও পুণ্যরূপ। তোমার ন্যায় পুত্র জন্ম মাত্র পিতৃ-মাতৃ ও বন্ধুকুল অবলীলা-ক্রমে পবিত্র করে। সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া ভক্ত-বাঞ্ছিত, বেদের সারভূত, সনাতন, শুভ জ্ঞান বলিতেছি শ্রবণ কর।"

"এই জ্ঞানামৃত-পঞ্চরাত্র পুণ্যময়, পাপ-বিঘ্ন-বিনাশক। শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তি ও দাস্য-প্রদায়ক। ইহা বৈষ্ণবের সর্ব্বস্বধন, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। বেদ সকলের সারভূত, পরম অদ্ভুত এই নারদীয় পঞ্চরাত্র পুরাণ সমূহের মধ্যে সুদুর্লভ। সকল দেবগণের মধ্যে সর্ব্বান্তর্যামী, ব্রহ্মজ্যোতিঃ, সনাতন শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরিপূর্ণতম; সকল দেবীগণের মধ্যে ঈশ্বরী মূল-প্রকৃতি যেমন পূজ্য; বৈষ্ণব, জ্ঞানী, সিদ্ধ ও যোগিগণের মধ্যে যেমন শিব; শীঘ্রগতি, বিব্যস্ত ইন্দ্রিয় গণের মধ্যে যেমন মন; বেদজ্ঞদিগের মধ্যে যেমন ব্রহ্মা, পূজ্যগণের মধ্যে যেমন গণেশ্বর; মুনিগণের মধ্যে ভগবান্ সনৎকুমার যেমন শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধিমান্ গণের মধ্যে যেমন বৃহস্পতি, সিদ্ধগণের মধ্যে যেমন কপিল, যোগীন্দ্র গণের মধ্যে যেমন শুদ্ধ ঋষি নারায়ণ; কবিগণের মধ্যে যেমন শুক্র, পণ্ডিতগণের মধ্যে যেমন বৃহস্পতি, সরিৎ-সমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা, সমুদ্র-সমূহের মধ্যে যেমন ক্ষীরসমুদ্র; বনবৃন্দের মধ্যে যেমন বৃন্দাবন, বর্ষগণের মধ্যে যেমন ভারত; তীর্থ-সমূহের মধ্যে যেমন পুষ্কর; পূজ্যগণের মধ্যে যেমন বিষ্ণুভক্ত; আপ্ত-গণের মধ্যে যেমন আত্মাকাশ, পুরী-সমূহের মধ্যে যেমন কাশী; বৃক্ষ-সমূহের মধ্যে যেমন কল্পবৃক্ষ, কামধেনুগণের মধ্যে যেমন সুরভি; পুষ্প সমূহের মধ্যে যেমন পারিজাত; পত্র-সমূহের মধ্যে যেমন তুলসী; মন্ত্র-সমূহের মধ্যে যেমন

কৃষ্ণ মন্ত্র ; ধন-সমূহের মধ্যে যেমন বিদ্যা ; তেজস্বীদিগের মধ্যে যেমন সূর্য্য, মিষ্ট-সমূহের মধ্যে যেন অমৃত ; আধার ও স্থূল-সমূহের মধ্যে যেমন মহাবিষ্ণু ; সূক্ষ্ম-সমূহের মধ্যে যেমন পরমাণু ; গুরু-সমূহের মধ্যে যেমন মন্ত্র-তন্ত্র-দাতা ; স্নেহের পাত্রগণের মধ্যে যেমন পুত্র, নক্ষত্রগণের মধ্যে যেমন চন্দ্র ; গব্যের মধ্যে যেমন ঘৃত, শস্য-সমূহের মধ্যে যেমন ধান্য ; শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে যেমন বেদ , বর্ণাশ্রমের মধ্যে যেমন দ্বিজ ; দীপ্তিশালীদিগের মধ্যে যেমন মুক্তা-মাণিক্য-হীরকাদি রত্ন ; ছন্দ-সমূহের মধ্যে যেমন গায়ত্রী ; শক্তিমতী দিগের মধ্যে যেমন দুর্গা ; পতিব্রতাগণের মধ্যে যেমন লক্ষ্মী ; ক্ষমাশীলগণের মধ্যে যেমন পৃথিবী ; সৌভাগ্যবতী সুন্দরী কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে যেমন রাধিকা ; বানরগণের মধ্যে যেমন হনুমান্, পক্ষিগণের মধ্যে যেমন গরুড ; শঙ্করের বলশালী বাহনগণের মধ্যে যেমন বৃষ ; যন্ত্র-সমূহের মধ্যে যেমন শালগ্রাম ; পূজা-সমূহের মধ্যে যেমন শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন ; ব্রত-সমূহের মধ্যে যেমন একাদশী-ব্রত ; তপঃ-সমূহের মধ্যে যেমন অনশন, যজ্ঞ-সমূহের মধ্যে যেমন জপযজ্ঞ ; ধর্ম্ম-সমূহের মধ্যে যেমন সত্য ; প্রমথগণের মধ্যে যেমন সুশীল ; কীর্ত্তন-সমূহের যেমন কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ; পালক, উপকারক মিত্রগণের মধ্যে যেমন জননী ; লোক-সমূহের মধ্যে যেমন লোকেশ ; নাগসমূহের মধ্যে যেমন শেষনাগ, পূজিত অস্ত্র-সমূহের মধ্যে যেমন সুদর্শন ; শিল্পিগণের মধ্যে যেমন বিশ্বকর্ম্মা ; মহান ধার্ম্মিক দেবর্ষিগণের মধ্যে যেমন ব্রহ্মা ; বিজ্ঞ, বিষ্ণুভক্তগণের মধ্যে যেমন নারদ—এইরূপ সকল শাস্ত্রমধ্যে পঞ্চরাত্র পূজিত। অমৃত পান করিলে যেমন আর অন্যবস্তুতে স্পৃহা থাকে না, তেমনি সর্ব্বার্থজ্ঞানবীজ, অজ্ঞানান্ধ-প্রদীপ, বেদোদ্ধৃত-সারতত্ত্ব, সকলের অভীপ্সিত এই পঞ্চরাত্র জানিলে, অপর কিছুতেই আর স্পৃহা থাকেনা।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

মরণ ও মরণান্তে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পরিশিষ্ট।

আত্মঘাতী।

শাস্ত্রে বলে "আত্মহত্যা মহাপাপ।" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য আত্মঘাতীর পরিণাম সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

লোকে কেন আত্মহত্যা করে? মানুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃতকার্য্যের জন্য ইহ জীবনে তাহার ফলভোগ করে। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, শরীরে রোগ হয়, তাহা দূর করিতে হইলে, ঔষধের প্রয়োজন। সেইরূপ পূর্ব্ব-জন্মকৃত পাপে আধ্যাত্মিক ও মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়, তাহা উপশম করার জন্য পরম দয়ালু পরমেশ্বর বড় সুন্দর ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এই পীড়া হইতে মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায়, সেই সেই পাপ কার্য্যের ফলস্বরূপ, অবশ্যম্ভাবী যে সংসারের ত্রিতাপ ও যন্ত্রণা, তাহা ভোগ করা। ক্লেশ-ভোগ-ব্যতীত পাপের অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। ইহ জীবনে স্বকৃতকার্য্যের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইলে, মানব মাত্রেরই সাহস ও ধৈর্য্য-সহকারে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ও যাবতীয় দুঃখ কষ্ট নীরবে সহ্য করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না করিয়া, যে হতভাগ্য শোক-তাপে অভিভূত হইয়া হতাশ-হৃদয়ে রণে ভঙ্গ দেয়, তাহার স্মৃতিভ্রংশ হয়; স্মৃতিভ্রংশ হইলেই বুদ্ধি নাশ হয়; তখন সাংসারিক যন্ত্রণা অসহ্য ও জীবন ভারবহ বোধ হয়। জীবন-রঙ্গমঞ্চের যবনিকা-পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার অবসান হইবে ভাবিয়া, উন্মত্তের ন্যায় আত্মহত্যা করিয়া ফেলে। তদ্দ্বারা তাহার দেহ-নাশ হয় বটে, কিন্তু মানসিক যাতনার হাত হইতে রক্ষা পায় কি? কখনই না। ইহ জীবনের ন্যায় পরলোকেও ঠিক্ সেইরূপ তাহা ভোগ করিতে হয়। "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।" দুরূহ কর্ম্ম-সমষ্টির সংযোগে বিধাতা কর্তৃক প্রত্যেক মানবের পরমায়ুকাল নির্দ্দিষ্ট হয়; সেই

কালকে কেহ স্বেচ্ছায় হঠাৎ কমাইয়া ফেলিতে পারে না। বিধির বিধানে সেই নির্দ্দিষ্ট আয়ুকাল যেরূপেই হউক পূর্ণ হইবেই। তাহা লঙ্ঘন করে কার সাধ্য? ঘড়ীতে চাবি দিয়া স্প্রীং আঁটিয়া দিলে, সকল প্যাঁচ গুলি না খোলা পর্য্যন্ত স্প্রীং এর দণ্ড অনবরত ঘুরিতে থাকে, যদি ঘড়ীর ডায়েল এবং ঘণ্টার ও মিনিটের কাঁটা ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কি সেই ঘূর্ণন কার্য্য থামিয়া যায়? কখনই না। ডায়েল ও কাঁটা ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়া আমাদের অলক্ষিতে এই স্পন্দন কার্য্য চলিতে থাকিবে। স্প্রীংএর সমস্ত প্যাঁচ খুলিয়া গিয়া শক্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্পন্দন-কার্য্য অবিরত চলিবেই। সেইরূপ বিধি-নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুকালও জোর করিয়া কেহ নিঃশেষ করিতে পারে না।

দুর্ঘটনাবশতঃ বা অপঘাতে যাহারা হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম অর্থাৎ তাহাদিগকেও বিধি-নির্দ্দিষ্ট তাহাদের পরমায়ুর অবশিষ্টকাল কথিতরূপে পূর্ণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

আত্মঘাতীদিগকে দুই স্থূল ভাগে বিভাগ করা যায়:—

(১) যাহারা মহদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হওত অপরের জীবন বাঁচাইতে গিয়া, জানিয়া, শুনিয়া স্বেচ্ছায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করে।

(২) যাহারা স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া জীবনের শোক-তাপ ও জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করার জন্য আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার পর পরলোকে এই দুই শ্রেণির মধ্যে কোন্ শ্রেণির কি অবস্থা ঘটে, তাহা জানিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। প্রকৃতিই বল আর বিধাতাই বল, অদৃষ্টই বল বা ঈশ্বরই বল, যে নামেই বল না কেন, এক অপূর্ব্ব, অভাবনীয় স্বনিয়ামক যন্ত্র-বিশেষ চির বিদ্যমান আছে। যন্ত্র হইলেও ইহা এক বিশেষ যন্ত্র! শুনিবে কেমন যন্ত্র?

ইনি স্বীয় দেহ হইতে পাপ পুণ্য, ভাল মন্দের বস্ত্র অনাদিকাল হইতে বয়ন করিয়া রাখিয়াছেন. তাঁহার চৈতন্য এত প্রখর যে, সেই যন্ত্রের সূক্ষ্মতম সূত্রের ক্ষীণতম আন্দোলন তিনি অতি সহজে অনুভব করেন। এই মহান্ চৈতন্যের তুলনায় আমাদের মধ্যে অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চৈতন্য অতি হেয় ও স্থূল বলিয়া গণ্য হয়।

ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রত্যেক কাজেরই চিন্তা ও উদ্দেশ্য

(Motive) দ্বারা তাহার ফল নিরূপণ হয়। এমন কি কার্য্যবিশেষে একমাত্র উদ্দেশ্যই অসাধারণ ফলোৎপাদন করিয়া থাকে। কোন বীরপুরুষ যদি কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন, তবে তাঁহার দেহের শেষ রক্তবিন্দু-পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মধুর স্বপ্নাবেশে বিভোর হইয়া পড়েন। তিনি যাহা কামনা করেন, তৎসমস্তই ক্রমশঃ তাঁহার অনুগমন করে ; তৎপর স্বর্গধামে উপনীত হওয়া মাত্র তাঁহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় এবং অভীপ্সিত বিষয়-লাভ ও প্রত্যক্ষানুভব দ্বারা তিনি সুখ-সাগরে নিমগ্ন থাকেন। কামাদি চরিতার্থ করার ভাব মনে না থাকায়, তিনি কামলোকের যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া একেবারে স্বর্গে চলিয়া যান। এখন এই পরার্থপর বীর পুরুষের সঙ্গে সেই বিপথগামী স্বার্থপর হতভাগার তুলনা করিয়া দেখ। সে স্বকৃত অদৃষ্টফল এড়াইবার জন্য অন্ধভাবে নিজের অমূল্য জীবনের অবসান করিয়া ফেলিল। দেহত্যাগের পরই সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল। যে দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করার জন্য সে হঠাৎ তীব্র বেগে আত্মহত্যা করিয়া বসিল, তাহাত আর দূর হইল না! স্থূলদেহ নাশের পর সেই শোক-তাপ ও দুঃখ-যন্ত্রণার বেগ সে অধিকতর তীব্র ভাবে অনুভব করিয়া ক্রমে ক্রমে আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। হতাশ-হৃদয়ে অনুতাপ আসিল ; বলিতে লাগিল, "হায়! কেন আমি এমন কাজ করিলাম। শোক তাপের হাত হইতে মুক্ত হইতেত পারিলাম না, অধিকন্তু আমার প্রাণাধিক আত্মীয় কুটুম্ব ও আমার সমস্ত কাম্য বস্তু এবং ভালবাসার জিনিষ পশ্চাতে ফেলিয়া, আমি একা এই অপরিচিত স্থানে চলিয়া আসিয়া, এখন নির্ব্বাসিতের ন্যায় মর্ম্মযাতনায় হাহাকার করিতেছি! এজন্য দোষ দিব কাহার? ইহা যে আমার স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার ফল!" যে সকল কুবাসনায় পরিচালিত হওয়াতে তাহার ইহ জীবন দুঃখময় হইয়াছিল, দেহনাশে ত আর তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া গেল না। মনে বাসনার বেগ তীব্র হইল, কিন্তু তাহা চরিতার্থ করার ত আর সুবিধা সুযোগ মিলিতেছে না! কাজেই সেই হতভাগা অধিকতর দুঃখভোগ করিতে থাকে। সময় সময় অন্য মানবকে আশ্রয় করিয়া আংশিকভাবে কামনা পরিতৃপ্ত করে বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম ফল বড় ভীষণ ও বিষময়। এইরূপ করিতে করিতে তাহার ষষ্ঠ ও সপ্তমরূপ (বুদ্ধি ও আত্মা) ক্রমশঃ পৃথক্ হইতে হইতে

পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল অতি ভীষণ ও লোমহর্ষকর। বহুকালব্যাপী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগের পর সেই হতভাগা চিরদিনের মতন এককালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া অকূল কালসাগরে ডুবিয়া, অদৃশ্য হইয়া যায়! তাহার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র থাকে না। হায়! হায়!! ভ্রান্ত, স্বার্থপর আত্মঘাতীর এই ভয়ঙ্কর পরিণাম। ভাবিলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! প্রত্যেক লোমকূপ কণ্টকিত হয়!!

বিধির বিধান অলঙ্ঘ্য, তবে যাহারা প্রকৃতিস্থ থাকিয়া সজ্ঞানে আত্মহত্যা করে তাহাদের কি উদ্ধারের কোন উপায় নাই? আছে বই কি! দেহনাশের পর যদি পরলোকে সে ধৈর্য্যসহকারে তাহার শাস্তি ভোগ করে, কামাদি রিপুর আক্রমণ রোধ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, তবে তাহার নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুকালের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হওয়া মাত্র, তাহার ঊর্দ্ধতন রূপচতুষ্টয় পুনরায় একত্র মিলিত হয়। পরে যখন কর্ম্মিদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গগমনের সময় উপস্থিত হয়, তখন তাহার অপর কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকে না। পরিশেষে অপরের ন্যায় তাহার স্বর্গলাভ হইতে পারে।

ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীসুদর্শন দাস।

—※—

গুরুশিষ্য-সংবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(অদ্বৈতভাব ও দ্বৈতভাব)

শিষ্য। কতকটা বুঝিয়াছি। এখন একটি জিজ্ঞাস্য আছে। "অদ্বৈত" ও "দ্বৈত"—এই দুটি শব্দ প্রায় শুনিতে পাই। ইহাদের প্রকৃত অর্থ কি?

গুরু। "অদ্বৈত" শব্দের মৌলিক অর্থ অদ্বিতীয় বা এক এবং দ্বৈত শব্দের অর্থ দুই বা বহু। যিনি জগতের সর্ব্বত্র ভগবান্ বা ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পান না তিনি অদ্বৈত ভাবী; এবং যিনি নানা পদার্থ দেখিতে পান ও তাহাদের পার্থক্য অনুভব ও আস্বাদ করেন তিনি দ্বৈত-ভাবাপন্ন

অদ্বৈতীর নিকট এই বৈচিত্র্যময় জগৎ নাই, উচ্চ নীচ, সুন্দর কুৎসিত, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, উল্লাস অবসাদ নাই, তিনি সর্ব্বত্র এক সচ্চিদানন্দ বস্তুটিকেই প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং তাঁহার জীবনটি একবস,—নিস্তরঙ্গ জলধির ন্যায় শান্ত, স্থির, গম্ভীর; মেঘ-মুক্ত আকাশের ন্যায় নির্ম্মল; তাহাতে আলোক ও ছায়ার খেলা নাই, রামধনুর বিচিত্রতা নাই। দ্বৈতভাবীর নিকট ভগবান্ বৃহৎ, বিরাট, ভূমা; জীব ক্ষুদ্র, অনু, অল্প; ভগবান্ স্রষ্টা, কর্ত্তা, পাতা; জীব সৃষ্ট, আশ্রিত; ভগবান্ প্রভু, পিতা, মাতা, সখা, বা কান্ত; জীব দাস, সন্তান, বা সখী। তাঁহার ভগবান্‌টি এরূপ রসিক, এরূপ প্রেমিক, এরূপ দয়ালু যে অতি বৃহৎ হইয়াও তিনি অতি তুচ্ছ জীবের জন্য সদাই ব্যাকুল ও সর্ব্বত্যাগী, "নিশিদিন তাঁর ঝরে অশ্রুজল"। সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ—সবই তাঁর দান,—সবই তাঁর কৃপা। স্নেহময়ী মা কোলের ছেলেকে কথনো চুম্বন করিতেছেন, কথনো বা আদর করে একটা চড় মারিতেছেন; প্রাণেশ্বর কথনো প্রিয়তমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করেন, কথনো বা পরিহাসচ্ছলে একটু অন্তরালে যান। এইরূপে তাঁহার জীবনে নিয়ত উত্থান-পতন, আশা-ভয়, হর্ষ-বিষাদের তরঙ্গ খেলিতে থাকে। জগতের সকল রসই তিনি আস্বাদ করেন, তারা, মুদারা, উদারা সকল সুরেই তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রী কাঁপিতে থাকে।

শিষ্য। আচ্ছা, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ—এ দুয়ের মধ্যে সত্য কোন্‌টি? ইহারা তো পরস্পর বিরোধী (Contrary), সুতরাং দুইটিই কথনো সত্য হইতে পারে না।

গুরু। দেখ, একই বস্তুকে নানা ভাবে দেখা যায়। মনে কর মৃত্তিকা। ইহা হইতে হাঁড়ি, শরা, মালসা, তোলো, কলসী, জালা প্রভৃতি নানা দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। একজন হয়ত এই সকল পৃথক্ বস্তুর দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া, কেবল ইহাদের উপাদানটিকেই দেখেন, সুতরাং তাঁহার চক্ষে হাঁড়ি, শরা প্রভৃতি নাই, সবই মাটি। আর এক জনের হয়ত এরূপে দেখিলে তৃপ্তি হয় না। তিনি প্রত্যেক বস্তুটির আকার, গঠন, সৌন্দর্য্য ও বিচিত্রতা দেখিয়া, আনন্দ ভোগ করেন এবং ভাবেন, ইহারা সকলেই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, সুতরাং মৃত্তিকা ইহাদের জননী, ইহারা সন্তান। কথাটা একই, কিন্তু দেখাটা স্বতন্ত্র ভাবে। আবার ধর ইথার। মনে কর পৃথিবী আবির্ভূত

হইবার পূর্ব্বে কেবল অসীম ইথারই ছিল; এই ইথারের কিয়দংশ ঘনীভূত হইয়া, এই পৃথিবী এবং যাবতীয় পদার্থ (জল, বায়ু, বৃক্ষ, লতা, স্বর্ণ লৌহাদি ধাতু, কীট, পশু মানবাদির দেহ ইত্যাদি ইত্যাদি) উৎপন্ন হইয়াছে। অবশ্য তুমি জান যে ইথারটি এত সূক্ষ্ম যে ইহা ইট, কাঠ, পাথর, জল, বায়ু—সকল পদার্থের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, বাস্তবিক এই পৃথিবী যেন একটা অনন্ত ইথার-সমুদ্রে নিমজ্জিত রহিয়াছে। যে অনন্ত ইথারের এক অংশ জমাট বাঁধিয়া এই পৃথিবীতে পরিণত হইয়াছে, সেই ইথারের ক্রোড়ে পৃথিবী শায়িত, সেই ইথার জননীর ন্যায় পৃথিবীকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এখন যদি কেবল ইথারটির দিকেই তোমার দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে, জল বায়ু, মৃত্তিকা প্রস্তর, বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী প্রভৃতিকে মায়িক বা ক্ষণিক বলিয়া বোধ হইবে; ইহাদের রূপ-রস, গন্ধ-স্পর্শ বা শব্দ তোমার অনুভূতই হইবে না, সর্ব্বত্র এক ইথারেরই সত্তা উপলব্ধ হইবে। তোমার নিকট বিষ্ঠাও যেমন ইথার, চন্দনও তেমনি ইথার; বৃক্ষও ইথার, নিউটনের দেহও ইথার। আবার আর এক দিক্ হইতে দেখিয়া তুমি বলিতে পার "ইথার জননী-স্বরূপা। তিনি অসংখ্য বস্তু সৃষ্টি করিয়া, স্বীয় ক্রোড়ে তাহাদিগকে ধারণ ও পোষণ করিতেছেন। এই বস্তুগুলি সব একরূপ নহে, তাহাদের মধ্যে কেমন বৈচিত্র্য, কেমন সৌন্দর্য্য! ছোট বড়, অল্প উন্নত, অধিক উন্নত প্রভৃতি কত রকমেরই সন্তান মা'য়ের কোলে খেলিতেছে!" আচ্ছা, এখন দেখা যাক্ ইহা হইতে আমরা কি বুঝিলাম। একটি মাত্র বস্তু আছেন। ইনিই অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম বা আত্মা এবং দ্বৈতবাদীর ভগবান্। ইনিই ইচ্ছাপূর্ব্বক মাঝে মাঝে নিজের কিয়দংশ বিশ্বে পরিণত করিয়া, নিখিল ভূত ও জীবের প্রাণস্বরূপ হইয়া, তাহাদিগকে ধারণ ও পোষণ করেন। এই প্রকট অংশটির প্রতি অদ্বৈতবাদীর লক্ষ্য নাই। তিনি অপ্রকট, অব্যক্ত বস্তুটিকে একমাত্র সত্য জ্ঞান করিয়া, প্রকট বিশ্বাদিকে মায়িক, অলীক বা ক্ষণিক বোধে উপেক্ষা করেন। দ্বৈতবাদী এই অপ্রকট বস্তুটিকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হন না। তিনি বলেন "ভগবানের অপ্রকট ভাবটি দুর্জ্ঞেয়। তিনি ঈশ্বর-রূপে প্রকটিত হইয়া, বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইহাই তাঁহার প্রথম প্রকাশ। অতঃপর তিনি জীবের হিতার্থে স্থূলদেহে মধ্যে মধ্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। জীব যদি ভগবানের এই সকল

প্রকট মূর্ত্তির ধ্যান-ধারণা ও পূজা করে তাহা হইলেই সে কৃতার্থ হইতে পারে।"

শিষ্য। বুঝিলাম যে একই বস্তুকে বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখেন বলিয়া এক জন অদ্বৈতবাদী, আর একজন দ্বৈতবাদী। আচ্ছা ইহাঁদের সাধন-প্রণালীর পার্থক্য আছে কি?

গুরু। আছে বৈ কি। যখন দু'য়ের লক্ষ্য পৃথক্, উদ্দেশ্য বিভিন্ন, তখন সাধন-প্রণালী বিভিন্ন হইবেই হইবে।

শিষ্য। উদ্দেশ্য পৃথক্ কিসে? দুজনেই তো ভগবান্‌কে লাভ করিতে চান?

গুরু। অদ্বৈতবাদী ভগবান্‌কে পাইতে চান না। ভগবান্ হইতে চান। কারণ ভগবান্‌কে পাইলেও দুইটি বস্তু থাকেন—তিনি এবং ভগবান্ অর্থাৎ দ্বৈতভাব থাকিয়া যায়।

শিষ্য। ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। অদ্বৈতবাদী বলেন, "এক ব্রহ্ম বা আত্মা ভিন্ন কিছুই নাই, সমস্তই ব্রহ্ম, অতএব আমিও ব্রহ্ম—সোঽহং। তবে অজ্ঞান বশতঃ আমার দ্বৈতজ্ঞান হইতেছে। যতক্ষণ দ্বৈত-বুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ বুঝিব আমার অজ্ঞান ঘুচে নাই। যেমন অজ্ঞানটির নাশ হইবে, অমনি দ্বৈত-বুদ্ধিও দূর হইবে, অর্থাৎ আমি বুঝিব আমিই ব্রহ্ম,—আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই।" অতএব অদ্বৈতবাদীর উদ্দেশ্য ব্রহ্মে লীন হওয়া এবং দ্বৈতবাদীর উদ্দেশ্য ভগবানের রাজ্যে বা নিকটে থাকিয়া ভগবানের সেবা করা।

শিষ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উভয়ে কি কি উপায় অবলম্বন করেন?

গুরু। অদ্বৈতবাদী চিন্তা ও বিচারের আশ্রয়ে পরম বস্তুতে লীন হইতে চেষ্টা করেন। তিনি ভাবেন "আমি সচ্চিদানন্দ। আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। অজ্ঞান বশতঃ যেমন কোন ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ অবিদ্যা-প্রভাবে আমার আমাতেই এই জগৎ-ভ্রম হইতেছে। বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, চন্দ্র-সূর্য্য, বায়ু-অগ্নি, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি যাহা কিছু আমি দেখিতেছি বা অনুভব করিতেছি,—সমস্তই মিথ্যা, কল্পনা মাত্র। ইহাদের সহিত আমার

কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ ইহারা স্বপ্ন। আমি আর স্বপ্ন দেখিতে ইচ্ছা করি না। আমি প্রকৃত যাহা, তাহাই হইতে চাই, স্বরূপাবস্থা পাইতে চাই।" এইরূপ চিন্তা, বিচার ও ধ্যান করিতে করিতে, কোন না কোন জন্মে তিনি নির্ব্বাণ মুক্তি পান অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হইয়া যান।

শিষ্য। অদ্বৈতবাদীর জীবন বড়ই কষ্টকর বলিয়া মনে হইতেছে। এইরূপে যদি নির্ব্বাণ-মুক্তি পাইতে হয়, আমার নির্ব্বাণ-মুক্তির প্রয়োজন নাই। ভগবান্ চারিদিকে যে অনন্ত সৌন্দর্য্য ছড়াইয়াছেন, পত্র-পুষ্পে, গিরি-প্রস্রবণে, সিন্ধু-সরিতে, শশি-দিবাকরে, তারকাখচিত নীলাকাশে, মাতৃস্নেহে, সাধুচরিত্রে যে অসীম প্রেম ও করুণার পরিচয় দিতেছেন—এ গুলিকে সব মিথ্যা বলিতে হইবে? বলেন কি? যে প্রেম প্রতাপসিংহকে গিরিগুহাবাসী করিয়াছিল, বুদ্ধদেবকে সন্ন্যাসী করিয়া ছিল, গৌরাঙ্গকে জীবের দুঃখে, পথে পথে কাঁদাইয়াছিল, যে করুণা-প্রভাবে যবন হরিদাস (তাঁহার অঙ্গ বাইশ বাজারের প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইলেও) শত্রুদিগের জন্য ভগবানের নিকট কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন,

"এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥"

সেই প্রেম সেই করুণা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে সত্য কি?

গুরু। বৎস, তোমার হৃদয়বত্তার পরিচয় পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যেন প্রেমপথের পথিক হইয়া ভগবানকে লাভ করিতে পার। বাস্তবিক যাহার অন্তর প্রেম-প্রবণ, অদ্বৈতমার্গ তাহার নিকট বড়ই নীরস ও শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়। এখন বুঝিলাম জ্ঞান-মার্গ তোমার উপযোগী ও প্রীতি-প্রদ হইবে না।

শিষ্য। তবে দ্বৈতভাবে কিরূপে সাধনা করিব, কৃপা করিয়া, কিছু উপদেশ দিন।

গুরু। অদ্বৈতবাদী বলেন "আমিই ব্রহ্ম", কিন্তু দ্বৈতবাদী বলেন "আমি দাসানুদাস তিনি প্রভু, আমি সন্তান তিনি পিতা বা মাতা, অগ্রে ভগবানের সহিত এরূপ একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া লও। দাস হও, কি ছেলে হও, কি সখা হও,—তাতে বড় কিছু যায় আসে না; তবে একটা কিছু হওয়া চাই। আমার

বোধ হয় প্রথমে দাস কিম্বা সন্তান হওয়াই সহজ। তার পর যাহা করিতে হইবে, তাহা নিজেই কতক বুঝিতে পারিবে। আচ্ছা, তুমি কি করিলে, তোমার মাতাব অধিকতর স্নেহভাজন হইতে পার?

শিষ্য। কায়-মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিলে।

গুরু। বেশ বলিয়াছ। তাঁহার সেবা করিলেই তিনি তোমাকে অধিক ভাল বাসিবেন। ভাল, সেবা করিবে কিরূপে? তাঁহার পা টিপিয়া দিলে, গায়ে হাত বুলাইলে, পাখাব বাতাস কবিলে, বা তাঁহার জন্য ভাল খাদ্যদ্রব্য কি কাপড় চোপড আনিয়া দিলে, এইরূপ সেবা করিলেই কি তিনি খুব প্রসন্না হন, না অন্য কোন প্রকার সেবা ভাল বাসেন?

শিষ্য। আপনার অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। আচ্ছা, বাবা, তোমার মা নিজে ভাল খাইতে পরিতে পাইলেই কি সুখবোধ করেন? তিনি কি নিজের জন্যই অধিক কাতর না অপরের জন্য সদাই চিন্তাকুল?

শিষ্য। ওঃ এইবার বুঝিয়াছি। তিনি আমাদের জন্যই সর্ব্বদা চিন্তিতা সন্দেহ নাই। তিনি নিজে খান্ আর নাই খান্ তা'তে ভ্রূক্ষেপ নাই, কিন্তু সন্তানদের একটু কষ্ট দেখিলেই তাঁর চক্ষে জল আইসে।

গুরু। আচ্ছা বেশ। এখন বল দেখি কি করিলে তিনি তোমাকে খুব ভাল বাসিবেন? তাঁহাকে খাওয়াইলে? না তোমার ভাই-ভগিনী গুলিকে খাওয়াইলে?

শিষ্য। ঠিক বলিয়াছেন। আপনার কথায় আমার বাল্যকালের একটি ঘটনা মনে পড়িল। একদিন আমার ছো'ট ভাই কোথা হইতে একটি সন্দেশ আনিয়াছিল। তাহার হাতে সন্দেশ দেখিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। মা তাহাকে বুঝাইয়া, উহা হইতে একটু ভাঙ্গিয়া আমাকে দিলেন। আমার ভাগে কম হইল দেখিয়া, রাগে ও অভিমানে আমি উহা দূরে নিক্ষেপ করিলাম এবং মাকে গালি দিয়া তাঁহার কাপড় ছিঁড়িয়া দিলাম। কিন্তু ইহাতে মা একটুও রাগ না করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে কোলে লইলেন ও বলিলেন, "তোকে বাজার থেকে কিনে দিব।" ইহাতে আমার ক্রোধের শান্তি হইলনা। আমি কোল থেকে নামিয়া ছোট ভাইটিকে আক্রমণ করিলাম। যেমন ভাইটি

কাঁদিয়াছে, অমনি মা ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে তাহাকে কোলে লইলেন ও আমাকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম মা'কে মারিলে পার আছে কিন্তু ভাইকে মারিলে রক্ষা নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

গীতা-তত্ত্ব।

তৃতীয় প্রস্তাব।

প্রথম খণ্ড।

আদি কারণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এই পরব্রহ্মের কোন নিশ্চিত সংজ্ঞা দিতে আমরা সক্ষম নই। কোন কোন দার্শনিক কৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলেন অর্থাৎ তাঁহাকেই সগুণ ঈশ্বর (পরব্রহ্ম) বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু কৃষ্ণ নিজেই আপনার সহিত পরব্রহ্মের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কৃষ্ণ যে অন্যান্য ঈশ্বরের ন্যায় পরব্রহ্মের অভিব্যক্তি-প্রকাশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অদ্বৈতবাদীদের মতে প্রত্যগাত্মাই পরব্রহ্ম; যদিও এইমত অদ্বৈত-বাদের ভিত্তি, তথাপি সকল অদ্বৈতবাদী ইহা সমভাবে বুঝেন নাই। অদ্বৈত-বাদীরা যখন বলেন, "অহমেব পরং ব্রহ্ম" তখন তাঁহারা অহঙ্কারকে পরব্রহ্ম বলেন না। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর বা প্রত্যগাত্মাই পরব্রহ্মের বিকাশ।

কৃষ্ণ নিজেকে কখনই পরব্রহ্ম বলেন নাই। তিনি প্রায়ই আপনাকে প্রত্যগাত্মার ভাবে বলিয়াছেন। যেখানে প্রত্যগাত্মার উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে নিজের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু যখনই পরব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন, তখনই পৃথগ্‌ ভাবে বলিয়াছেন।

যে যে স্থানে পরব্রহ্মের উল্লেখ আছে, তাহার প্রথমটী গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে—

"অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবো'ঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥"

এখানে পরব্রহ্ম বুঝাইবার জন্য দুটী কথার ব্যবহার হইয়াছে, অক্ষর ও ব্রহ্ম। এ দুটী কথা কৃষ্ণ প্রায়ই ব্যবহার করিয়াছেন। ঈশ্বর, মহেশ্বর এমন কি, আত্মাও বলেন নাই। পরমাত্মা শব্দে পরব্রহ্মকে না বুঝাইয়া নিজেকে বুঝাইয়াছেন। আমার মতে ইহার কারণ এই যে, আত্মা অর্থে অহং বুঝায়, পরব্রহ্মের সহিত এ অহংএর সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বরেই প্রথম আত্মজ্ঞানের উদয়, সেই জন্য পরব্রহ্মকে পরমাত্মা বা কোন আত্মাই বলা যায় না। একস্থলে পর-ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি কৃষ্ণের আত্মা। ইহা ব্যতীত অন্যত্র কোথাও পরব্রহ্মকে আত্মাকে পরমাত্মা বলেন নাই। বাস্তবিক পরব্রহ্ম উচ্চতম অহং জ্ঞানের মূল ভিত্তি। পরমাত্মা অর্থে প্রত্যগাত্মা হইতে বিভিন্ন পরব্রহ্ম। এই অর্থেই পরমাত্মার ব্যবহার। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে পরব্রহ্মে অহংজ্ঞান অব্যক্ত ভাবে আছে। এই অব্যক্ত ভাবে অহং কেন, তাবৎ পদার্থই তাহাতে অবস্থিতি করে। এভাবে পরমাত্মা শব্দ পরব্রহ্মে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

গীতা ৮ম অধ্যায় ১১ শ্লোক—

"যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥"

এখানে কৃষ্ণ পরব্রহ্ম বুঝাইতে আর এক কথা বলিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে পদং আনন্দ-ধাম অর্থাৎ নির্ব্বাণ বলিয়াছেন; পরব্রহ্মকে পদং বলায় বৈকুণ্ঠাদি লোক বুঝাইতেছে না। তাঁহাকে আপনার আবাস স্থান বলিতেছেন; কারণ ঈশ্বর মাত্রই পরব্রহ্মে অবস্থিত। ঈশ্বর বিকাশিতই হউন আর অবি-কাশিতই হউন অনন্তকাল পরব্রহ্মেই অবস্থিত। গীতা ৮ম অধ্যায় ২১শ শ্লোক।

"অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিং।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"

একইভাবে পরব্রহ্মকে বলা হইতেছে। ঈশ্বর পরব্রহ্মের কেন্দ্র-স্বরূপ বলিয়া, যে কোন আত্মা যখনই ঈশ্বরে উপস্থিত হয়, তখনই পরব্রহ্মেও প্রকারান্তরে উপস্থিত হইল।

গীতা ৯ম অধ্যায় ৪,৫,৬ শ্লোক।

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ॥"

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥

এখানেও পরব্রহ্মকে ঈশ্বরের আবাস স্থান বলা হইয়াছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি পরব্রহ্ম ও মূল প্রকৃতির রহস্যময় সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পরব্রহ্ম কখন ব্যাকৃত হন না, যাহা ব্যাকৃত হয় তাহাই মূল-প্রকৃতি বা অব্যক্ত বলিয়া কথিত হয়। কূটস্থ অর্থে অব্যাকৃত পদার্থ। মূল-প্রকৃতি অর্থে যে সমস্ত স্থূল ব্যাপার বা পদার্থ বুঝায়, পরব্রহ্ম তাহার ভিত্তি স্বরূপ। যে কোন পদার্থ হউক না কেন আমাদের নিকট তাহা গুণের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনুমান দ্বারা অথবা মনের স্বাভাবিক প্রবণতার ফলে আমরা এই সমস্ত গুণ-সমষ্টির আধার-স্বরূপ এক স্বতন্ত্র সত্তা কল্পনা করি। কিন্তু এই গুণ সকল পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন নহে। তাঁহার আবরণরূপী মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। মূল-প্রকৃতি পরব্রহ্ম নহেন অনেকটা পরব্রহ্মের আভাস। ইহার বাস্তবিক সত্ত নাই। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-সত্তার প্রথম প্রকাশ বলিয়া, ইহা পরবর্ত্তী অন্যান্য বিকাশ অপেক্ষা স্থায়িতর। সেইজন্যই কৃষ্ণ বিশ্বকে পরব্রহ্মের অব্যক্ত মূর্ত্তিতে ব্যাপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় না বলিয়াই তাঁহাকে তাঁহার অব্যক্ত মূর্ত্তি বলিয়াছেন। পরব্রহ্ম ঈশ্বরের আত্মা। কিন্তু যদিও অব্যক্ত সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তথাপি ইনি জগতের আত্মা এবং ঈশ্বরের অব্যক্ত মূর্ত্তি। যদিও সমস্ত বিকারের আশ্রয় স্থান, তথাপি স্বয়ং বিকারী নহে। গীতা ১২ অধ্যায় ১৩।১৪।১৫।১৬।১৭ শ্লোক দেখিলে ও পূর্ব্ব লিখিত ভূমিকাতেই সহজে সমস্ত রহস্য ভেদ হইবে।

গীতা ১৪ অধ্যায় ২৭ শ্লোক—

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

কৃষ্ণ নিজেকে পরব্রহ্মের অভিব্যক্তি বা প্রতীক বলিতেছেন, নিজেকে পরব্রহ্ম বলিতেছেন না।

আবার গীতা ১৫ অধ্যায় ৬ শ্লোকে—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

এই কয় শ্লোকেই স্পষ্ট বুঝাযায় যে পরব্রহ্মের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক কি? ঈশ্বর-বিষয়ক শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

গীতাকে ঈশ্বর-দর্শন বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই ঈশ্বর-বিষয়ক কোন না কোন কথা আছে। কিন্তু কতকগুলি বিশিষ্ট শ্লোকেই ঈশ্বরের কার্য্য ও মানবের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিষয় উল্লিখিত আছে। গীতা ৪র্থ অধ্যায় পঞ্চম হইতে একাদশ শ্লোকে, কৃষ্ণ নিজের পূর্ব্ব জন্মের বিষয় বলিতেছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, ঈশ্বর পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত যুক্ত হইয়া, কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন, যে, সমস্ত বিষয়ই তাঁহার স্মরণ আছে। ঈশ্বরকে কর্ম্ম বাঁধিতে পারে না বলিয়াই তিনি মানবাত্মার সহিত যুক্ত হইয়াও নিজেব স্বাধীনতা হারাণ নাই। মানবাত্মার সহিত যোগেও তাঁহার বুদ্ধি ও জ্ঞান বিকৃত হয় নাই বলিয়াই তিনি পূর্ব্ব জন্মের কথা বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলিতেছেন যে, মানবের হিতসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। সেই কারণেই ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও অধর্ম্ম-নাশের জন্য তিনি কোন আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া-সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গীতায় কৃষ্ণের কথায় বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বে তাঁহার বহু মানবাবতার হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে কৃষ্ণের পূর্ব্বে রাম ও পরশুরাম ব্যতীত আর কোন মনুষ্য-অবতারের বিশেষ উল্লেখ নাই। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি মনুষ্যাবতার নহে। এমন কি, বামনও মানব পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন হন নাই। প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানের আবরণ যথেষ্ট-রূপে উন্মোচিত না হইলে, অবতার-রহস্যের পূর্ণ মীমাংসা হইবে না। ইহা হইতে পারে, যে, যিনি কৃষ্ণ অবতারের পূর্ব্বে রাম ও পরশুরাম হইয়াছিলেন, তিনিই তৎপূর্ব্বেও ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও অধর্ম্ম-বিনাশের জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অবতার হইয়াছিলেন। এখানে জন্ম অর্থে ঈশ্বরের অবতার ব্যতীত ঈশ্বরাবিষ্ট আত্মার আধ্যাত্মিক-উন্নতি-পথে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সঞ্চরণের কথাও বুঝাইতে পারে।

যখনই কোন ব্যক্তি উন্নতি-পথে এতদূর অগ্রসর হয় যে, ঈশ্বরের সহিত

যুক্ত হইবার যোগ্য হয় ও অবশেষে ঈশ্বরে মিলিত হয়; তখনই ঈশ্বর হইতে মানব-হিতসাধনের জন্য এক প্রতিক্রিয়া-স্রোত বহিয়া আসে। সূর্য্যের উপর ধূমকেতু পড়িলে অনেকটা এই ভাবের ক্রিয়া হয়। ধূমকেতু সূর্য্যের উপর পড়িলে, সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোকের কিঞ্চিৎও আধিক্য হয়। নিঃস্বার্থ, প্রেমপূর্ণ মানবাত্মা ঈশ্বরে যুক্ত হইয়া, এই প্রকারে ভগবৎ-প্রেমের বর্দ্ধন করে। সেই নিঃস্বার্থ আত্মার ৮০০ গুণ সকল ঈশ্বরে অর্পিত হইয়া, শেষ মিলনের সময় মানব-হিতার্থে অবতরণের জন্য এক ঈচ্ছার উৎপত্তি করে। এমন কি, এই ঈচ্ছা মানব-রূপে অবতীর্ণ না হইলেও মানবের উন্নতি কল্পে প্রভাব বিস্তার করে। যখনই কোন মহাত্মা ঈশ্বরে মিলিয়া যান, তখনই মানবের উন্নতি কল্পে এক অদৃশ্য আধ্যাত্মিকভাব ছড়াইয়া পড়ে। অনেকে বলেন, "মহাত্মারা অকর্ম্মণ্য জীব, কেন না তাঁহারা জীবিতাবস্থায় মানবের কোন উপকারে আসেন না, মৃত্যুর পর ত পরের কথা।" নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়াই এই কথা বলা হয়। সকল মহাত্মাই যে মৃত্যুর পর মানব-শিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হন তাহা নয়। কেহ কেহ অবতীর্ণ হন। কিন্তু প্রত্যেক মৃত মহাত্মারাই ঈশ্বর-মিলনের সময়, হয় অদৃশ্য শক্তিরূপে, নয় কৃষ্ণের ন্যায় মনুষ্যরূপে মানব হিতাকাঙ্ক্ষায় নামিয়া আসেন। হইতে পারে যে, এই কল্পে যে ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি পূর্ব্ব কল্পের কোন মহাপুরুষের আত্মার শেষ মিলনের শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সূত্রে গুপ্ততত্ত্ব-বিদ্যার এক গভীর রহস্য আছে। যাহা হউক কৃষ্ণকে সাধারণ ঈশ্বরাবস্থায় অবস্থিত করিয়া, গীতা পর্য্যালোচনা করিতে চেষ্টা করিব। সিক্রেট্ ডক্ট্রিন গ্রন্থে এই তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা আছে। কৃষ্ণ যে কথা বলিয়াছেন, বুদ্ধ বা খ্রীষ্টও সেই কথা বলিতে পারিতেন। গীতা ৪র্থ অধ্যায় দশম শ্লোকে—

"বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥"

এই রহস্যের ভেদ হইয়াছে। এখানে "মদ্ভাবং" অর্থে ঈশ্বরের অবস্থা বুঝাইতেছে। তিনি বলিতেছেন, অনেক মহাত্মাই ঈশ্বরে যুক্ত হইয়াছেন। ৫ম অধ্যায়ে ১৪.১৫ শ্লোকে তিনি বলিতেছেন—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥"

যে, ঈশ্বর কর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই বা জীবে কর্ম্মের ইচ্ছারও সৃষ্টি করেন নাই। কর্ম্ম বা কর্ম্মেচ্ছা ঈশ্বর বা দৈবী প্রকৃতি হইতে আসে না। মূল-প্রকৃতি কি তাহার বিকার হইতে আসে। দৈবী প্রকৃতি হইতে কোন প্রকার বন্ধ করিবার হেতু আসে না। অহঙ্কার মূল-প্রকৃতির বিকাশ-রূপ উপাধি সকলে যুক্ত হইয়া, কর্ম্ম ও কর্ম্মেচ্ছার উৎপত্তি করে। কিন্তু যথার্থ বলিতে গেলে ইহা দুইটীরই কার্য্য-কারণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পীর মুর্শিদ (The Divine Master)।

মহাত্মা গঙ্গাগীর পরমহংস।

ধর্ম্মের প্রশস্তপথ, বড় সোজা, খুব সুগম ও স্বাভাবিক। ইহা অতিশয় সহজগম্য, পরম সুন্দর ও কল্যাণকর সৎবস্তু। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহা বড়ই কঠিন, কদাকার, অস্বাভাবিক ও অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্ম বলিলেই হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, ইহুদীধর্ম্ম, বুদ্ধধর্ম্মাদি বুঝিয়া, ঐ ধর্ম্ম সম্প্রাদায় সকলকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিতাম, তাই ইহাদিগকে ভালরূপে জানিবার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং সেই জন্যই অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, নানা আশ্রম, পীঠ, মঠ, মন্দির, মস্‌জীদ, গির্জ্জা, সভা ও সঙ্গীতে যাইয়া বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, কোরাণ, আবেস্তা, বাইবেল, তন্ত্র, মন্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখিতে লাগিলাম। তখন ঘোর বিপাকে পড়িয়া গেলাম, আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইল। কূল কিনারা কিছুই আর

দেখিতে পাইলাম না,—বাঁশবনে ডোম কানা হইল। "এখন বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?" দেখিতে পাইলাম, ইহারা সকলেই সকলকে নিজের দিকে টানিতেছে, নিজের প্রশংসা প্রচুর পরিমাণে করিতেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে মন্দও বলিতেছে। ইহারা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করে,—ধনীর পক্ষে এক প্রকার গরিবের পক্ষে অন্য প্রকার। তাহা দেখিলে চক্ষুস্থির হয়। ইহাদের আড়ম্বর দেখিলে মাথা ঘুরিয়া পড়ে, ইহাদের বিধি নিষেধ শুনিলে পাগল হইতে হয়। তথাপি ইহাদের বচনে এমনি একটী মোহিনী শক্তি আছে, যাহা শুনিলে, বাধ্য হইয়া সময় বিশেষে এক ধর্ম্মের লোককে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আর এক ধর্ম্মে যাইতে হয়। কারণ প্রথম প্রথম ইহারা অনেকানেক প্রলোভন দেখাইয়া থাকে—লোভের নাম ধর্ম্মনাশা। লোভে পড়িয়াই হিন্দু খৃষ্টান হয়—মনে করে, সাহেব হইব—অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিব। তদ্রূপ আবার খৃষ্টান মুসলমান হয়—মনে করে, ইস্‌লামধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া, ইচ্ছামত বহু বিবাহ করিয়া সুখী হইব। এবম্প্রকার নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক নানা মতলব আঁটিয়া, বহু ফন্দী খাটাইয়া, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। নিস্পৃহ, নিরাকাঙ্ক্ষ, স্বার্থশূন্য হইয়া ধর্ম্মের জন্য কেহ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করেনা, তাহা করিবারও কোন আবশ্যকতা নাই, করিলেও ধর্ম্মলাভ হয় না, সুফল ফলে না। কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্ম কি এতই নীরস ও নিরানন্দময়? ধর্ম্মপথ কি এতই কঠিন ও জটিল? ধার্ম্মিক লোকেরাও কি কুটিল হয়? গোস্বামী তুলসীদাস বলেন,—শ্রুতিপুরাণ বহুরচা উপাই। ছুটেন অধিক অধিক অরুঝাই॥ "শ্রুতিপুরাণাদি মানুষকে মুক্ত করিবার জন্য অনেকানেক উপায় সকল আবিষ্কার করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তাহাতে কেহ মুক্ত হয় না, বরঞ্চ ক্রমশঃ বদ্ধদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" তবে উপায়? উপায় আছে, নিরুপায়ের উপায় মহাত্মারা! "জাকো দুনিয়া কঠিন বতাই। তাকো সৎগুরু সহজ লখাই॥" "জগৎ-সংসার যাহাকে (যে ধর্ম্মকে) অতিশয় কঠিন বলিয়া ব্যাখ্যা করে, তাহাকেই সদ্গুরু সহজে উপলব্ধি করাইয়া থাকেন" "অতএব মহাত্মা ভিন্ন আমার আর গতি নাই। "ধর্ম্ম ক্যাসায় হয়ে কিসি ক্যামিল্‌সে পুছা চাহিয়ে।" "ধর্ম্ম কি বস্তু, তাহা কোন সিদ্ধ মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।" ইহাই ভাবিয়া, প্রবল ইচ্ছা

দ্বারা দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম যে, যেমন করিয়াই হউক না কেন, আমাকে কোন মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করিয়া বাহির করিব, এবং তনু, মন, প্রাণ সমস্ত তাঁহাকে অর্পণ করিব, তাহার পর যা থাকে কপালে।

ধন্য দয়াল গুরু! ধন্য বাঞ্ছা কল্পতরু। প্রাণের ঠাকুর আজ আমার প্রাণের কথা শুনিলেন, প্রাণের ব্যথা বুঝিলেন। আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন, নিজগুণে দর্শন দিয়া কহিলেন "পুত্র! অশ্রুভরা নেত্র অপেক্ষা হাসি ভরা মুখ ভাল। কঠোর তপস্যা দ্বারা শরীর নষ্ট ও মন বিক্ষিপ্ত করিয়া কি হইল? শান্তি ত পাইলে না। সন্ত (শান্ত) ত হইলে না, জুড়াইতে ত পারিলে না। কিন্তু ইহা সদা সর্ব্বদা মনে রাখিও "সহজ মানুষ সহজ ভাবে সহজ পথে চলে যায়।"

"হিত অনহিত পশু পঁছী-চিহ্নত" "আপন ও পর পশু পাখীরাও বুঝিতে পারে।" মহাপুরুষের কথা শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে, আমি মনের মানুষ পাইয়াছি। ইহা ভাবিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম। দয়াল গুরু সান্ত্বনা প্রদান করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন "রোদন করিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে?" সাধুর আশ্বাসবাণী শুনিয়া আমি করযোড়ে বলিলাম, "নাথ! তুমিত অন্তর্য্যামী, ত্রিকালদর্শী, তুমি ত সব জান, তবে আর কাটা ঘায়ে নুন মাখাইতেছ কেন? তুমি কি জাননা লোকে কি বলে? সকলের মুখে শুনিতে পাই, ধর্ম্ম, বড় কঠিন, ধর্ম্ম বড় দুর্ল্লভ ও দুষ্প্রাপ্য। যদি তাহাই হয়, তবে নাথ! আমার কি গতি হইবে? আমার ত ধন নাই যে, দান করিব, বিদ্যা নাই যে, শাস্ত্র সকলের নিগূঢ় অর্থ বুঝিব, আমি দুর্ব্বল, সদাই পীড়িত থাকি, আমার দ্বারা তীর্থ, ব্রত, নিয়ম, যোগ, আরাধনা, ধ্যান, তপস্যা কিরূপে সমাধা হইবে? শরীরের ত এই দশা, আজ আছে ত কাল নাই। এই যে শাস্ত্রের অনুষ্ঠান সকল বোধ হয়, হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিলেও সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহাদের গোলমালের কথা শুনিলে নিরাশার সাগরে ডুবিয়া মরিতে হয়, তবে নাথ! উপায়?" আমার কথা শুনিয়া মহাত্মা মধুর হাস্যমুখে মৃদুস্বরে কহিলেন "উপায়

বড় সহজ, সিধারাস্তা (সোজাপথ), চক্ষু বন্ধ করিয়া যাওয়া যায়। ধর্ম্ম মানে সৎ, (There is no religion higher than truth. Truth is always truth & every where the same) সৎ মানে চিৎ, সত্তা থাকিলেই চিতের উদয় হয়, এবং তাহাতেই আনন্দ উদ্ভূত হয় (জ্ঞান) এবং তাহাই আনন্দ। তদ্রূপ অধর্ম্ম মানে অসৎ, অসৎ, মানে মিথ্যা, মিথ্যা মানে প্রপঞ্চ, প্রপঞ্চ মানে দুঃখ, শোক, সন্তাপাদি। ধর্ম্ম সত্য, সর্ব্বকালে স্বয়ং জাজ্বল্যমান, একরঙ্গ, একরস, একরূপ; কিন্তু অধর্ম্ম বা মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী তাহাও সাজাইতে (জাল প্রস্তুত করিতে) কত প্রয়াস পাইতে হয়, কত কষ্ট স্বীকার করিয়া দাঁড় করাইতে হয়, তথাপি তাহাও বিফলে যায়। এখন বল দেখি ধর্ম্ম সহজ না শক্ত (কঠিন)? আর দেখ—ধর্ম্ম যদি অতিশয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী হয়, তবে তাহা দুর্লভ হইবে কেন? তাহা হইতেই পারে না; কারণ প্রয়োজনীয় বস্তু সকল দুর্লভ হয় না। ইহা কি সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পার না যে, যিনি দয়ার সাগর, বিশ্বকর্ম্মা-বিশ্বম্ভর, তিনি জীবগণের অতি আবশ্যকীয় বস্তু সকল যথা—বায়ু, যাহা না হইলে এক মুহূর্ত্তও প্রাণিগণ প্রাণ রক্ষা করিতে পারে না। অগ্নি, জল ইত্যাদি, যাহা না হইলে এক দণ্ডও চলে না, তাহা, বিনামূল্যে, বিনা বিনিময়ে অয়সতী (অমান) (Freely) জগতে প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু হীরা, লাল, জওয়াহির,, জম্মুরদ বা কোহিনুরাদি অপদার্থ-বিলাসিতার সামগ্রী পাথর সকল, যাহা না হইলে কাহারও কিছু আটকায় না, তাহাই তিনি এ জগতে দুর্লভ করিয়াছেন। ধর্ম্ম যদি আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী অপেক্ষাও অধিক দরকারী বস্তু হয়, তবে তাহা তিনি ঘোর অন্ধকারময় রসাতলের গভীর গহ্বর গর্ভে লুকাইয়া রাখিবেন কেন? অতএব স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছ যে, ধর্ম্ম বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পোষাকী জিনিষ বা হুজ্‌মিগুলী নাই। শরীররক্ষাকরাও ধর্ম্ম, অর্থনীতির আলোচনাও ধর্ম্ম। আবার বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণে যে, ঐ একই কথা বলে, যথা "হত্যা করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা কথা কহিও না ইত্যাদি।" ইহা পালন করাও ধর্ম্ম। যাহা থাকিলে মানুষ খাঁটী মানুষ হয় এবং যাহা না থাকিলে মানুষ, মানুষ থাকে না, সেই অসাধারণ মানবের ধর্ম্ম। ধর্ম্ম মানে স্বভাব-সিদ্ধ আত্ম-বোধ, এই স্বভাব-সিদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভই ধর্ম্ম লাভ বা জীবন লাভ; ইহার অভাবই অধর্ম্ম, মৃত্যু বা দুঃখ।

হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, ইহুদীধর্ম্ম, বুদ্ধধর্ম্ম, কবীর ধর্ম্ম বা যে কোন ধর্ম্ম, যাহাদিগকে লোকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকে, তাহা মানুষ-কৃত এক একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়, সমাজ, সভা বা দল (Society) মাত্র। ইহাদিগের আদেশ-উপদেশ, বিধি-ব্যবস্থা, একটু উৎকট বিশেষ, তাই অন্য কোন জাতীয় জীব-জন্তু ইহাদিগের সহিত কোন সম্পর্ক বা সংসর্গ রাখে না। তুমিও শুনিয়াছ যে, জগতে চৌরাশী লক্ষ যোনির বা চৌরাশি লাখ রকমের জীব-জন্তু আছে। ইহাদের মধ্যে মানুষ ভিন্ন অন্য কোন জীব-জন্তু এই ধর্ম্ম সম্প্রদায়, সমাজ, সভা বা দলা-দলির সহিত কোন সম্বন্ধই রাখে না, তবে কি তাহারা সকলে নরকগামী হইল ? যদি তাহাই হইত, তবে তাহারা (এক একটী পশু বা পাখী) দেবতাদিগের বাহন হইত না। গরুড় কেমন নিরামিষাশী বা ব্রতধারী তাহা কে না জানে ? যাঁহার পচা মাংস না হইলে নয়, তিনি বিষ্ণু-ভগবানের বাহন। সিংহ কেমন দয়ালু তাই বা কে না জানেন ? যিনি হিংসকদিগের রাজা, তিনি দয়া-ময়ী মা দুর্গার বাহন। অধিক আর বলিবার আছে কি ? সর্প, যিনি খলতার উপমার স্থান, তিনি পরম যোগী দেবাদিদেব মহাদেবের কণ্ঠের হার। কিন্তু যে মানব চৌরাশিলাখ জীবযোনির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব, সেই মানুষ সেই সকল দেবতাদিগকে ধ্যানেও পায় না। যে মানুষ না জানি, কতই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই মানুষের অশান্তির অন্ত বা শেষ নাই। যাহাকে মানুষ ধর্ম্মানুষ্ঠান বলে, পশুপাখীরা তাহার একটীও করে না, তথাপি তাহারা কত আনন্দে বিচরণ করে। কিন্তু মানুষ সে সকল সমাধা করিয়াও জলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে থাকে। ইহার কারণ কি ? ইহার কারণ এই যে পশুপাখীরা যদিও হিংসক বা খল বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তাহারা নিজের কাজে নিজে খাঁটী থাকে, আত্ম-প্রবঞ্চনা জানে না। সেই জন্য তাহারা এত সুখী। কিন্তু মানুষের বিস্-মিল্লাই গায়ের—গোড়ায় গলদ, মানুষ আত্ম-প্রবঞ্চক, মানুষ আপনাকে আপনি ঠকায়, অকরণীয় কার্য্য মাত্রই করিয়া থাকে, যাহা পরকে করিতে নিষেধ করে, তাহাই নিজে করিয়া থাকে, তাই মানুষ আত্ম-প্রতারক (self decciver)। এই কারণে মানুষের কোন চালাকী খাটে না, মানুষ জুড়াইতে পারে না। অতএব আত্ম-প্রবঞ্চনাই মহাপাপ বা দুঃখ। সহজ কথা সহজভাবে বুঝিয়া দেখ না কেন—যদি রাতদিন আপনাকে আপনি ফাঁকী দেওয়া যায় এবং শাস্ত্র সকলও

মুখস্থ করিয়া রাখা যায়, তাহাতে কি হইবে ? পুস্তক পড়িয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা কি অসুরদিগের ছিলনা ? তাহারা কি যোগাদি করিত না ? তাহাতে কি হইত ? কেবল অসুরত্বই বাড়িয়া যাইত। পরের কাছে সাধু সাজিলে কি হইবে, যদি নিজের কাছে নিজে সাধু না হইলে ? পরের চক্ষে ধুলা দেওয়া বড সহজ ; কিন্তু নিজের চক্ষে ধূলি দেওয়া বড়ই কঠিন। মুখে কহিলে ধর্ম্মকথা, অন্তরে রহিল আত্ম-প্রতারণা, আর কার্য্যে হইল ধর্ম্মশাস্ত্র বিগর্হিত ব্যবহার। এমন অবিবেকীর এমন কপটচারীর, এমন আত্ম-প্রতারণার্থ জপ-পূজাপরায়ণের কখন কি সর্ব্বদুঃখের শান্তি হয় ? তাহাই বলিতেছি যে, ছলনা-শূন্য ও নিষ্কপট হইয়া যাও। শঠতা, কপটতা, বাচালতা ও ধূর্ত্ততার ত চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে, আর কেন ? জন্ম-জন্মান্তর, যুগ-যুগান্তর না জানি কতই বাহানা ও সেয়ানাপানা, চাতুরী ও চালাকী (Mockery) হইয়া গিয়াছে, যাহার হদমুদ নাই (সীমা নাই)। এবার একটু অন্য রকম কবিয়া দেখ না কেন ?—অধিক আর কিছুই করিতে হইবে না—কেবল মাত্র একটু খাঁটী (Sincere) হইতে হইবে। তখন দেখিতে পাইবে যে, ধর্ম্ম কেমন সহজ, কেমন সুন্দব ও কেমন সুখকর বস্তু।

*　　*　　*　　*　　*　　*

পলক (চক্ষের পাতা) যেমন আপনি পড়ে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, ধর্ম্মকেও তখন তদ্রূপ দেখিতে পাইবে—সেই ধর্ম্মের এই একটী মাত্র কথা "আপনাতে আপনি সিধা ও সচা (সাঁচা) হইয়া যাও" (Be true your own self.)। আপনাতে আপনি মগন (নিমগ্ন) ও মস্ত (উচ্চতম) হইয়া থাক, পরের কথা আর শুনিও না, পরের পানে আর চাহিও না, পরের মুখাপেক্ষী আর হইও না, পর বলিয়া কোথাও কিছু নাই, ইহা পরে বুঝিবে।

"আপ ভলা ত জগৎ ভলা"

নিজে ভাল হইলেই জগৎ ভাল হয়—জগৎ ত আর অন্য কিছু নহে, নিজেরই ছায়া (Shadow) মাত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরঞ্জন মিশ্র রিক্ত।

বৈষ্ণব-স্মৃতি।

শ্রীসনাতন গোস্বামী বলিলেন "প্রভো" আপনি আমাকে বৈষ্ণব-স্মৃতি সংগ্রহ করিবার আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আপনার উপদেশ ভিন্ন আমি কি তাহা সম্পাদন করিতে পারি? অতএব আপনি সূত্রাকারে উপদেশ করুন, আমি তদনুসারে স্মৃতি সংগ্রহের চেষ্টা করিব"।

প্রভু বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়ের কারণ, শ্রীগুরু চরণাশ্রয়, শ্রীগুরুলক্ষণ, নিষিদ্ধ গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, নিষিদ্ধ শিষ্যলক্ষণ, গুরুশিষ্য পরীক্ষণ, শ্রীগুরু-মাহাত্ম্য, শ্রীগুরুসেবা-বিধি, অধিকারী নির্ণয়, মন্ত্রসংস্কার, শ্রীবিষ্ণুমাহাত্ম্য, শ্রীবৈষ্ণব-মন্ত্র মাহাত্ম্য, দীক্ষা-নিত্যতা, দীক্ষা-প্রয়োগ, দীক্ষিতের পূজার নিত্যতা, সদাচার, নিত্যকৃত্য, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাবন্দন, তিলকধারণ, মাল্যধারণ, পুষ্পাদ্যাহরণ, বস্ত্রাদি সংস্কার, প্রবোধন, পঞ্চাদি উপচার দ্বারা অর্চ্চন, পূজা, আরাত্রিক, ভোজন, শয়ন, শ্রীমূর্ত্তির লক্ষণ, শালগ্রাম-লক্ষণ, হরিক্ষেত্র-গমন, শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, নাম-মাহাত্ম্য, নামাপরাধ-বর্জ্জন, বৈষ্ণব-লক্ষণ, সেবাপরাধ-খণ্ডন, শঙ্খাদি-লক্ষণ, জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ প্রণাম, বন্দন, পুরশ্চরণ, প্রসাদ-ভোজন, অনিবেদিত-বর্জ্জন, বৈষ্ণবনিন্দাদি-বর্জ্জন, সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবন, অসৎ সঙ্গত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ, দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি-বিবরণ, মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি-বিধি বিচারণ, একাদশী প্রভৃতির বিদ্ধা ত্যাগপূর্ব্বক অবিদ্ধা-করণ, অকরণে দোষ, করণে ভক্তিলাভ, শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাদি শাস্ত্রবচন দ্বারা নিরূপণ করিবে। আমি কেবল সূত্ররূপে বলিলাম। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমার হৃদয়ে যাহা স্ফুরিত হইবে, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে যাহা লিখাইবেন, তুমি তাহাই লিখিবে।"

১। শ্রীকৃষ্ণের করুণায় তদীয় ভক্তজনের সঙ্গ হইতে ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ঐ ভক্তির লাভে অভিলাষ হইলে, সদ্গুরুর চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য। বিষয়-সুখাসক্ত জনগণের ভক্তিমাহাত্ম্যজ্ঞান দুর্ঘট হইলেও কেবল দুঃখসাগর-তরণের ইচ্ছাতেও ভক্তিলাভের অভিলাষ হইয়া থাকে। ভক্তিলাভের অভিলাষ হইলে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোকে নিত্য দুঃখ-পরম্পরার অনুভব হইয়া থাকে, এবং শাস্ত্রেও শ্রবণ করা যায় যে, পরলোকেও দুঃসহ

দুঃখশ্রেণী ভোগ করিতে হয়। অতএব সুবুদ্ধি লোকেরা ঐ সকল দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের নবমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—ধীরপুরুষ বহুজন্মের পর এই সুদুর্লভ, অর্থপ্রদ, অনিত্য মনুষ্য-দেহ লাভ করিয়া, মৃত্যুর পূর্ব্বেই মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করিবেন, বিষয় ভোগ পশ্বাদি যোনিতেও লাভ হইতে পারে। বিংশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—সর্ব্বমঙ্গলের মূলভূত, যদৃচ্ছালব্ধ, সুদুর্লভ, পটুতর, গুরু-কর্ণধার-বিশিষ্ট, পরমাত্মকৃপানুকূলপবন কর্ত্তৃক পরিচালিত, এই নরদেহরূপ নৌকা প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি সংসার সাগর পার হইতে যত্ন করে না, সে আত্মঘাতী।

শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়—

উহারই তৃতীয়াধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—অতএব যে ব্যক্তি উত্তম শ্রেয়ঃ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, পরব্রহ্মের অনুভব-সম্পন্ন ও পরম শান্ত শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিবেন। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি হস্তে সমিধ্ গ্রহণপূর্ব্বক বেদজ্ঞ ও বেদনিষ্ঠ সদ্গুরুর সমীপে গমন করিবেন। কারণ,—গুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। আগমসারে গুরুশব্দের অর্থ এই প্রকার নির্দ্দেশ করেন,—গকার সিদ্ধিদ, রকার পাপদাহক এবং উকার স্বয়ং শম্ভু, অতএব গুরুশব্দ দ্বারা সিদ্ধিপ্রদ ও পাপনাশক শম্ভুই উক্ত হয়েন। আচার্য্য শব্দের অর্থ কুলার্ণব-গ্রন্থে এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—যিনি স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক শিষ্যকে আচারে স্থাপন করেন, এবং যিনি শাস্ত্রার্থ প্রকাশ দ্বারা অজ্ঞান নাশ করেন, তিনিই গুরুপদ-বাচ্য।

শ্রীগুরু-লক্ষণ—

বিশুদ্ধবংশজাত, স্বয়ংও বিশুদ্ধ, পবিত্রাচার-পরায়ণ, আশ্রমী, ক্রোধ-রহিত, বেদবিৎ, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, শ্রদ্ধাবান্, অসূয়ারহিত, প্রিয়বাক্য, প্রিয়দর্শন, শুচি, সুবেশ, তরুণ, সর্ব্বভূত-হিতে রত, বুদ্ধিমান, অনুদ্ধতমতি, পূর্ণ, তত্ত্ববিচারক, বাৎসল্যাদিগুণযুক্ত, অর্চ্চনপরায়ণ, কৃতজ্ঞ, শিষ্য-বৎসল, নিগ্রহানুগ্রহ-ক্ষম, হোমমন্ত্রপরায়ণ, বিচার প্রণালীর জ্ঞানসম্পন্ন, শুদ্ধাত্মা ও কৃপালু ব্যক্তিই গুরু-গৌরবের উপযুক্ত। যিনি স্বীয় ইষ্ট দেবতার উপাসনা-পরায়ণ, শান্ত, দান্ত, অধ্যাত্মবেত্তা, বেদাধ্যাপক, বেদশাস্ত্রার্থজ্ঞান-সম্পন্ন, উদ্ধার ও সংহারে সমর্থ,

ব্রাহ্মণোত্তম, মন্ত্র ও মন্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, সংশয়-চ্ছেত্তা, রহস্যবেত্তা, পুরশ্চরণকারী, হোমমন্ত্রসিদ্ধ, প্রয়োগকুশল, তপোনিরত, সত্যবাদী ও গৃহস্থ, তিনিই গুরুকরণের যোগ্য। যিনি শিষ্যের নিকট হইতে সেবা, যশ ও ধনাদি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি গুরুকরণের যোগ্য নহেন। পরন্তু যিনি কৃপাসিন্ধু, সর্ব্বগুণপূর্ণ, সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী, নিস্পৃহ, সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা ও আলস্যরহিত তিনিই গুরুপদ-বাচ্য হয়েন। নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—পঞ্চরাত্র-বিধানোক্ত পঞ্চকালের জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু হইবেন। তদভাবে শান্ত-চিত্ত, ভগবন্ময়, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, সর্ব্বজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎক্রিয়া-পরায়ণ এবং মন্ত্র, গুরু ও দেবতার সাধনসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ও গুরুপদের যোগ্য হইবেন। ক্ষত্রিয় গুরু, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের দীক্ষাপ্রদানে অধিকারী। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ের অভাব হইলে, তাদৃশ বৈশ্যও বৈশ্য ও শূদ্রের গুরু হইতে পারেন। তদভাবে শূদ্রও শূদ্রজাতির গুরু হইতে পারেন। স্বদেশেই হউক বা বিদেশেই হউক বর্ণোত্তম গুরু পাওয়া গেলে, শুভার্থী ব্যক্তি হীন বর্ণকে গুরু করিবেন না। বর্ণোত্তম গুরুর সদ্ভাবে হীন বর্ণকে গুরু করিলে, ইহলোক ও পরলোক নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্রোক্ত আচার সর্ব্বদা পরিপালনীয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র স্বোৎকৃষ্ট বর্ণকে শিষ্য করিবেন না, ইহাই শাস্ত্রীয়াচার। পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু হইবেন। তিনি শ্রীহরির ন্যায় সকলেরই পূজ্য হয়েন। মহাকুল-প্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত এবং সহস্রশাস্ত্রাধ্যায়ী ব্যক্তিও যদি বৈষ্ণব না হয়েন, তবে তাঁহাকে গুরু করিবে না। যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ তিনিই বৈষ্ণব।

নিষিদ্ধ গুরু লক্ষণ—

বহুভোজী, দীর্ঘসূত্রী, বিষয়াদিলোলুপ, হেতুবাদরত, দুষ্ট, অবাচ্যবাচক, গুণনিন্দক, অরোমা, বহুরোমা, নিন্দিতাশ্রমসেবী, কালদন্ত, কৃষ্ণোষ্ঠ, দুর্গন্ধ-শ্বাস-যুক্ত, দুষ্টলক্ষণ-সম্পন্ন, বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত ব্যক্তি ঈশ্বর-তুল্য হইলেও শিষ্যকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া থাকেন।

শিষ্য-লক্ষণ—

শুদ্ধবংশজাত, শ্রীমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাক্য, পবিত্র-চরিত্র, বুদ্ধিমান্, দম্ভরহিত, কামক্রোধত্যাগী, গুরুভক্ত, দেবতাভক্ত, নীরোগ, পাপরহিত,

শ্রদ্ধাযুক্ত, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃলোকের পূজাপরায়ণ, যুবা, সংযতেন্দ্রিয়, দয়ালু প্রভৃতি সদ্‌গুণযুক্ত ব্যক্তিই দীক্ষার অধিকারী হয়েন।

নিষিদ্ধ-শিষ্য-লক্ষণ—

অলস, মলিন, ক্লিষ্ট, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রুগ্ন, রুষ্ট, বিষয়াসক্ত, ভোগ-লালস, অসূয়াপরায়ণ, মৎসর, শঠ, পরুষবাদী, অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জনকারী, পরদাররত, জ্ঞানীরশত্রু, অজ্ঞ, পণ্ডিত-মানী ভ্রষ্টব্রত, কষ্টবৃত্তি, পরচ্ছিদ্রান্বেষী, পরপীড়ক, বহ্বাশী, ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্মা ও নিন্দিত ব্যক্তি, দীক্ষায় অনধিকারী।

যাহাদিগকে অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারা যায় না, বা যাহারা গুরুর শাসন সহ্য করিতে পারে না, তাহারাও শিষ্যত্বের অযোগ্য। যদি কেহ লোভ প্রযুক্ত তাদৃশ ব্যক্তিকে শিষ্য করেন, তবে তিনি দেবতার ক্রোধভাজন, দরিদ্র, স্ত্রীপুত্র-বিহীন হইয়া, অন্তে নরক যাতনা ভোগ করিয়া তির্য্যগ্‌ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন।

গুরু-শিষ্য-পরীক্ষা—

গুরু ও শিষ্য এক বৎসর পর্য্যন্ত একত্র বাস করিয়া পরস্পর পরস্পরকে পরীক্ষা করিবেন। এই পরীক্ষার পরই দীক্ষাদান ও দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরু-মাহাত্ম্য—

শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, গুরুকে আমার স্বরূপই জানিবে, কদাচ অবজ্ঞা করিবে না; গুরুকে মনুষ্য ভাবিয়া তাঁহাতে দোষারোপ করিবে না, কারণ, গুরু সর্ব্বদেবময়।

গুরুর সন্নিধানে যে শিষ্য অন্যকে পূজা করেন, তাঁহার সেই পূজা নিষ্ফল হয়, এবং তিনি নরকে গমন করিয়া থাকেন। গুরুর সেবা করিলে, সর্ব্ব পাপের ক্ষয়, পুণ্য সঞ্চয় ও সর্ব্বকার্য্যের সিদ্ধি হয় যাহা কিছু নিজের প্রিয়বস্তু, তাহাই বিত্ত শাঠ্যবর্জ্জিত হইয়া শ্রীগুরু দেবকে অর্পণ করিবেন। এইরূপে যিনি শ্রীগুরুর পূজা করেন, তাঁহারই অগণ্য পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে।

শ্রীগুরু-সেবাবিধি—

প্রতিদিন গুরুদেবের জলকুম্ভ, কুশ, পুষ্প ও যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ করিবেন। তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জন, চন্দন লেপন, গৃহ মার্জ্জন ও বস্ত্র প্রক্ষালন করিবেন। তাঁহার

নির্ম্মাল্য, শয্যা, পাদুকা, আসন, ছায়া ও বেদী লঙ্ঘন করিবেন না। তাঁহার দন্তকাষ্ঠ আহরণ ও তাঁহাকে নিজকৃত্য নিবেদন করিবেন। সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় ও হিতে রত থাকিবেন এবং তাঁহার আজ্ঞা না লইয়া কুত্রাপি গমন করিবেন না। গুরু সন্নিধানে কদাচ পাদ-প্রসারণ করিবেন না। তাঁহার সন্নিধানে জৃম্ভণ, হাস্য, কণ্ঠাচ্ছাদন ও আস্ফোটন করিবেন না। গুরুপুত্র, গুরুপত্নী ও গুরুর আত্মীয়বর্গের প্রতিও গুরুবৎ আচরণ করিবেন। অসাক্ষাতে শ্রীশব্দাদি ব্যতিরেকে কেবল গুরুর নামাক্ষর উচ্চারণ করিবেন না। তাঁহার গতি, বাক্য ও কার্য্যের অনুকরণ করিবেন না। গুরুর গুরু সন্নিহিত থাকিলে, তাঁহাকেও গুরুর ন্যায় পূজা করিবেন। গুরুর আজ্ঞা না লইয়া, পিত্রাদি গুরুজনকেও অভিবাদন করিবেন না। অকারণে বা অভক্তিপূর্ব্বক গুরুর নাম গ্রহণ করিবেন না। যখন গ্রহণ করিবেন, তখন ওঁ শ্রী অমুক বিষ্ণুপাদ। এই প্রকারেই নামোচ্চারণ করিবেন। কখনও মোহবশতঃ তাঁহাকে কোনরূপ আজ্ঞা করিবেন না, এবং কদাচ তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না। গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবেন না, বা তাঁহার ভক্ষ্যদ্রব্যও ভোজন করিবেন না। তাঁহার আগমনকালে অগ্রসর হইবেন ও গমনকালে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবেন। তাঁহার সম্মুখে শয্যা বা আসন গ্রহণ করিবেন না। যে কিছু নিজের প্রিয়বস্তু, শ্রীগুরুদেবকে নিবেদনপূর্ব্বক পশ্চাৎ ভোজন করিবেন। গুরু কর্ত্তৃক তাড়িত বা পীড়িত হইয়াও তাঁহার অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। তাঁহার বাক্যে অবহেলা করিবেন না। ধন ও প্রাণ দ্বারা কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রিয়াচরণ করিবেন।

শ্রীবিষ্ণু-মাহাত্ম্য—

চরাচর জগতের মোহনার্থ কোন কোন পুরাণ ও আগমাদি কল্প পর্য্যন্ত তত্তদ্দেবতাকে পরমদেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিলেও, সকল শাস্ত্র বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে, এক ভগবান্ বিষ্ণুই পরদেবতা বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকেন।

শ্রীবৈষ্ণব মন্ত্র-মাহাত্ম্য—

মনুষ্য শ্রীগুরুর অনুগ্রহে শ্রীবৈষ্ণব-মন্ত্র-রাজাদি জপ করিতে করিতে সর্ব্বৈশ্বর্য্য লাভানন্তর শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সহস্র বৎসর বিপুল তপস্যা করেন, তাঁহারাই বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারাই

লোক-পাবন হয়েন। সমস্ত প্রধান প্রধান মন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণু-মন্ত্রের মধ্যে আবার কৃষ্ণমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণমন্ত্র ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই সাধন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহধারী পরম ব্রহ্ম। তদীয় মন্ত্রের স্মরণমাত্র ভোগ ও মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কৃষ্ণমন্ত্রের মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণের গোপ-লীলা-সূচক মন্ত্রই শ্রেষ্ঠতর এবং তন্মধ্যে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই শ্রেষ্ঠতম।

ক্রমশঃ—

৺শ্যামলাল গোস্বামী

কয়েকটী পদ।

(১)

তিনি আছেন ভবে, সর্ব্বজীবে
　　উদ্ধারিতে তপোধন।
যিনি গুরুর গুরু, পরম গুরু
　　দয়ানিধি দীন-তারণ॥
আছেন তিনি সন্তলেতে
　　বোধিসত্ত্ব বীজরূপে।
(ওরে) আছেন কত মহাপুরুষ
　　কলিযুগে বীজরূপে॥
গ্রাম্য সুখে মত্ত জীবে
　　হ'লে তত্ত্ব বিস্মরণ।
(ওরে) ঘোর আঁধারে আলোর মত
　　দেন তাঁরা এসে দরশন॥
তিনি ভক্ত তরে, অকাতরে
　　নিলেন শিরে সর্ব্বপাপ।
(ওরে) সেই মহাজন, আস্‌বে এখন
　　ঘুচ্‌বে ভবে সর্ব্বতাপ॥
গৌররূপে নবদ্বীপে
　　প্রেম বিলাতে দয়াময়।
যেমন এসেছিলেন, নেচেছিলেন.
　　মাতিয়েছিলেন সর্ব্বময়॥
তেম্‌নি প্রেমের হাট বসিবে
　　জগৎ জোড়া সেই মেলা।

যদি সেই হাটে মন হাট্ করিবি
(হরি নাম) সম্বল কর্‌রে এই বেলা ॥
হরিনামে নাইকো কোন
উগ্র কঠোর তপ-সাধন।
এতে আছে কেবল দীনভাবে
তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন ॥

(২)

সংসার-সাগরে প'ড়ে কর কেন
হাহাকার।
ভজ কৃষ্ণ, স্মর কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ
অনিবার ॥
ভবের কাণ্ডারী হরি,
শরণ লও তাঁর চরণ-তরি,
ঘোর তুফানে এমন ভেলা নাইকো
আর হতে পার।
(ওরে) হরি বিনে এ দুর্দ্দিনে নাইকো
জীবের গতি আর ॥
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ
কর সার।
ভজ কৃষ্ণ, স্মর কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ
অনিবার ॥

(৩)

মিলে যত ব্রজবালা কালাচাঁদে
ঘিরেছে।
আভীর আবীর অঙ্গে, রঙ্গে কত
দিতেছে ॥
মরি মরি কি মাধুরী রাধাকৃষ্ণ-
অনুরাগ।
ঢল ঢল প্রেমে দোঁহে, মরি কিবা
প্রেম-সোহাগ ॥
কালো বরণ নাগর রাঙা বরণ
হয়েছে।
(আহা) পুলকে পুলকে যেন
রাধাপ্রেম ফুটেছে।

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

পরাবিদ্যা-সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

উপরে আমাদের সপ্তজগতের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে এই স্থূল-সমেত সপ্তস্তর লইয়া এই বিশ্ব—এই কয়েক স্তরের অণুসকল সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে পরস্পর পৃথক্—সূক্ষ্মতা অনুসারে স্পন্দনশক্তিও পৃথক্—স্থূলস্তরের অণু-সমূহ আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—স্থূল বাহ্য জগতের অণুগুলির স্পন্দন আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গণ গ্রহণ করিতে পারে (কখনও যন্ত্রাদির সাহায্যও প্রয়োজন হয়), কিন্তু সূক্ষ্মেন্দ্রিয় ব্যতিরেকে সূক্ষ্ম (astral প্রভৃতি) স্তরের অণুগণের স্পন্দন গ্রহণ ও তৎপ্রতিস্পন্দন-সঞ্চালন স্থূল ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কদাচ হইতে পারে না—ইহাতে অধিকতর শক্তির বিকাশের আবশ্যক। সূক্ষ্মেন্দ্রিয়-সমূহ উচ্চস্তরে সূক্ষ্মকোষসমূহে অবস্থিত। ইতিপূর্ব্বে কোষ ও শরীর, স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর, স্থূলেন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মেন্দ্রিয়—এই শব্দ কয়েকটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ সকল সূক্ষ্ম শরীর বা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ ধারণা হওয়া অসম্ভব; চেষ্টা করিয়া যাহাতে ছায়ামাত্র জ্ঞান হইতে পারে কিঞ্চিৎ তাহার আলোচনা এস্থলে প্রয়োজন। প্রথম প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে নামরূপ-মধ্যে বহু হইয়া প্রকাশিত হইবার সঙ্কল্প ঈশ্বরে কোন অনির্ব্বচনীয় ও অনির্দ্দেশ্য কারণে উদ্ভূত হইলে, তাহা হইতে অসংখ্য জীব বা কুমাররূপী অংশ নিঃসৃত হইয়াছিল। সেই জীবে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ-ত্রিভাব গুহ্যরূপে বর্ত্তমান ছিল—সেই ভাবত্রয়ের পূর্ণবিকাশের জন্য, জীবকে সকল স্তরের মধ্য দিয়া কঠিনতমস্তরে অবতরণ করিতে হইয়াছে। অবতরণকালে প্রত্যেক স্তরের অণুদ্বারা কিয়দংশে জড়িত হইয়া আসিয়াছেন—ঐ জড়িতাংশ বা আবরণগুলিকে বেদান্তে বিবিধ কোষ কহে। উহাতে প্রত্যেক স্তরের স্পন্দনশক্তি নিহিত। ঐ কোষগুলি ভবিষ্যতে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া, জীবের আত্মজ্ঞান জন্মাইবার জন্য বিবিধ শরীর নির্ম্মাণ করিবে। খনিজ, উদ্ভিজ্জ, জান্তব রাজ্য মধ্য দিয়া আগমন-কালে কোষগুলির পরিপুষ্টি ক্রমশঃ সাধিত হইয়া, মানবরাজ্যে অনেকগুলি অধিকতর

পুষ্টিলাভ করিয়াছে। প্রথমে স্থূল অন্নময় কোষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুষ্টি হওয়ায় এই সুন্দর মানবদেহ হইয়াছে—ইহার মধ্যে অপর সকল কোষই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সেই সকলের অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণ উন্নতি হইয়াছে। মানবের বর্ত্তমান অবস্থায় কামময় (astral) কোষ সমধিক বর্দ্ধিত হওয়ায়, সাধারণ লোকের কামময় (astral) দেহ নির্ম্মিত হইতেছে। অত্যুন্নত মানবগণের মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ পর্য্যন্তও পরিপুষ্ট হইয়া, মানসিক দেহ, বুদ্ধিক দেহও নির্ম্মিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত প্রকার উন্নত অবস্থাপন্ন লোক-সংখ্যা অতি বিরল। অনেক চিন্তাশীল মানবের মনোময় কোষও বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু রীতিমত দেহ প্রস্তুত হয় নাই—কোনও ভাগ্যবানের বা প্রস্তুত হইতেছে। কারণ-শরীর (বিজ্ঞানময় কোষ) সাধারণতঃ মানসের প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মার—উপাধিমাত্র হইয়া রহিয়াছে এবং অতি ধীরে ধীরে সবল হইতেছে। অপর শরীরের ন্যায় ইহার বিনাশ নাই—যতদিন জীব মুক্তিলাভ না করিতে পারে, ততদিন এই দেহ বিবিধ জন্মের সঞ্চিত জ্ঞানের সঞ্চয়াগার-সদৃশ স্থায়ী থাকে। জীব এই সকল দেহে পৃথক্‌রূপে কার্য্যক্ষম হইতে পারিলে মুক্ত হয়েন। স্বভাবের নিয়মানুসারে দেহ সকল জীবের প্রকৃত উপাধিরূপে নির্ম্মিত হইতে অধিক কাল অপেক্ষা করিতে হয়, শীঘ্র করিতে হইলে বহুসাধনার প্রয়োজন। এই সকল দেহ-নির্ম্মাণের প্রকরণ বিশদরূপে বর্ণনা করিতে হইলে প্রবন্ধ বৃদ্ধির আশঙ্কায়, কিরূপে স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি ও তৎপরে (astral or desire body র) কামময় শরীরের ইন্দ্রিয়গুলি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। বহুকাল অতিবাহিত হইলে (Evolution) ক্রমোন্নতি এরূপ এক অবস্থায় উপনীত হয়, যখন জান্তব রাজ্যে জীব কামময় কোষমধ্যে কিঞ্চিৎ কার্য্যশীল হয়েন। জীব যতদিন পূর্ণ কার্য্যক্ষম না হইতে পারেন, ততদিন বিষ্ণুশক্তির ক্রোড়ে অবস্থান করেন, এবং বিষ্ণুশক্তি দ্বারা ক্রমাগত উত্তেজিত হইতে থাকেন। তাঁহাকে প্রথমে স্থূল জগৎ জানিতে হইবে ও স্থূল শরীরে আত্মজ্ঞান Self consciousness) লাভ করিতে হইবে। যখন জীব কামময় কোষে কিঞ্চিন্মাত্র কার্য্যশীল হইলেন তখন ঐ বিষ্ণুশক্তির, সাহায্যে তাঁহা হইতে কিঞ্চিৎ শক্তি সঞ্চালিত হইল—ঐ শক্তি বা প্রাণ চৈতন্যবিশিষ্ট—ইতিপূর্ব্বে কামময় কোষের নিম্নভাগে কতকগুলি astral

অণু একত্র সংযোগে একটী কেন্দ্র প্রস্তুত করিতেছিল, তাহাও পূর্ব্বোক্ত ঐ শক্তি হইতেই হইতেছিল। এক্ষণে ঐ (astral) কামময় প্রাণ উক্ত কেন্দ্র মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হওয়ায়, স্থূল প্রাণের সহিত মিশ্রিত হইয়া, একযোগে Etheric body তে একটি আবর্ত্ত উত্থাপিত করিল—ঐ আবর্ত্ত স্থূলদেহ হইতে স্থূলতর কতকগুলি অণু আকর্ষণ করতঃ তদ্দ্বারা একটী স্নায়বীয় কোষাণু বা ক্রমে কোষাণুপুঞ্জ নির্ম্মিত করিল। তাহাতে স্থূল দেহেও কতকগুলি কেন্দ্রের সৃষ্টি হইল। ঐ স্নায়বীয় কেন্দ্র বাহ্য স্থূল জগতের স্পন্দন গ্রহণ করতঃ ঊর্দ্ধস্থিত কামময় কেন্দ্রে চালিত করিতে থাকে—স্পন্দন ঐরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—উক্ত দুই কেন্দ্রের পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে—ক্রমে কেন্দ্র-দ্বয়ের ক্রিয়া জটিল ও উত্তরোত্তর অধিকতর কার্য্যশীল হইতে থাকে। কালক্রমে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুদেগের উহা হইতে (Sympathetic) স্নায়বীয় যন্ত্র প্রস্তুত হয়—তদ্দ্বারা Hart (হৃদয়), Lungs (ফুস্‌ফুস্), পরিপাক যন্ত্র প্রভৃতি বলপ্রাপ্ত হয় ও নিয়মিত হইয়া থাকে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, ক্রমে ঐ কোষাণু বা কোষাণুপুঞ্জ (ganglia) যেমন পুষ্ট হইতে থাকে তাহা হইতে বহু সংখ্যক সূত্রের ন্যায় স্নায়ুজাল বহির্গত হইয়া, Astral ও Physical কেন্দ্রদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ দৃঢ়ীভূত করে। এইরূপে স্নায়বীয় Sympathetic প্রণালী কামময় Astral কেন্দ্রগুলির সহিত মুখ্যভাবে (directly) সংলগ্ন উহা হইতে ক্রমে ধীরে ধীরে Carebro—spinal প্রণালী (System) অঙ্কুরিত হইয়াছে, এবং প্রথমে উহার নিম্ন বা সামান্য কার্য্য Sympathetic প্রণালীর সহিত সংযুক্ত ছিল—কিন্তু ক্রমশঃ প্রবল হইয়া স্নায়ুজাল বিস্তৃত-করণে জীবের স্থূল আত্মজ্ঞানের অর্থাৎ (Waking consciuosness) জাগ্রৎ-চৈতন্যাবস্থার প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইল। Sympathetic প্রণালীর যেরূপ astral কামময় কোষের সহিত সম্বন্ধ,Cerebro spinal প্রণালীর সেইরূপ মনোময় কোষের সহিত সম্বন্ধ—মনোময় কোষ হইতে প্রাণ বা শক্তি সঞ্চালিত হইয়া শেষোক্ত স্নায়বীয় প্রণালীটী প্রস্তুত হয়—কামময় কোষের সহিত ইহার প্রথমোক্ত প্রণালীর মধ্য দিয়া গৌণভাবে (Indirectly) সম্বন্ধ। বেদান্তোক্ত মনোময় কোষ দুইভাগে বিভক্ত—উহাদের স্বতন্ত্র বিশেষ কার্য্যানুসারে উপরস্থ অংশটীকে 'নিম্নমানসিক' এবং নিম্নস্থ অংশকে 'কামময়' কহে। এক হইতে চিন্তা (Thought) ও

অপর হইতে ইচ্ছা (Desire) উৎপন্ন হয়—বিভিন্ন স্তরের অণুর বিভিন্ন কার্য্যকরী ক্ষমতা। উহা বিষ্ণু-শক্তি (Life of Logas ii) কর্ত্তৃক বিভিন্ন স্তরের অণুতে বিভিন্ন গুণ প্রদত্ত হইয়াছে।

কালক্রমে উপরোক্ত কামময় কোষের সম্মুখস্থ পুঞ্জীভূত অণুসমূহে ১০টী প্রধান কেন্দ্র নির্ম্মিত হইল—ঐগুলি (Sympathetic) স্নায়ুজাল দ্বারা স্থূল মস্তিষ্কে অনুরূপ দশটী কেন্দ্রে যুক্ত হইয়া স্থূল অর্থাৎ জাগ্রৎ চৈতন্যাবস্থার (of waking Consciousness) ক্রিয়ার প্রবল যন্ত্ররূপে পরিণত হইল—জাগ্রত অবস্থা দ্বারা জীব চৈতন্যের সেই অবস্থাটীকে বুঝিতে হইবে, যাহার ক্রিয়া সাধারণতঃ (Cerebro-Spinal) প্রণালী বা স্নায়বীয়-জাল দ্বারা সাধিত হইতেছে। উক্ত ১০ দশটীর মধ্যে ৫ পাঁচটীর দ্বারা স্থূল বাহ্যজগতের স্পন্দনসমূহ গৃহীত হইতেছে অর্থাৎ যে করণদ্বারা জীব-চৈতন্যের স্থূল অনুভূতি সম্পাদিত হইতেছে—এই পাঁচটীকে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। অপর যে পাঁচটীর দ্বারা জীব-চৈতন্যের প্রতি স্পন্দন স্থূল বাহ্য জগতে চালিত হয়—তাহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, স্থূল ইন্দ্রিয়গণের কেন্দ্রগুলি কামময় কোষে নিহিত, এবং স্থূলদেহে বাহ্য যন্ত্রস্বরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চজ্ঞান দ্বার এবং হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটী কর্ম্মের সহায়, বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ইন্দ্রিয়গুলির কার্য্য আরম্ভ হইলে, জীব স্থূল, বাহ্য জগৎ জানিতে পারিলেন, অর্থাৎ তাঁহার 'অপর' বা 'অনাত্মা' সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিল—যে মুহূর্ত্তে অপর বলিয়া কিছু বোধ হইল, সেই মুহূর্ত্তেই নিজ (Self) জ্ঞান উপজাত হইল। পূর্ব্বে কেবল 'আমি' মাত্র ছিল—কোনই জ্ঞান জন্মায় নাই—বাহ্য স্থূল জগতের স্পর্শ হইতে উৎপন্ন, স্পন্দন-সমূহ স্থূল ও সূক্ষ্ম কোষের মধ্য দিয়া, তাঁহার নিকট নীত হইলে, তাঁহার ভিতরে সামান্য অবস্থান্তর হইত মাত্র।

স্থূল জগতে আত্মজ্ঞান (Self Consciousness) যেরূপে সাধিত হইল, সূক্ষ্ম জগতেও ঠিক ঐ প্রকার জীব ক্রমে আত্মজ্ঞান লাভ করিবে। স্থূল দেহের ইন্দ্রিয়গুলি নির্ম্মাণ করিবার জন্য যেমন পূর্ব্বে কামময় কোষের নিম্নভাগে কতকগুলি অণু একত্র হইতে থাকে ও ক্রমে তথায় স্থূল ইন্দ্রিয়গণের কেন্দ্র প্রস্তুত হয়, সেইরূপ (Astral Body) প্রস্তুত করিতে হইলে, জীব

মনোময় কোষে কিঞ্চিৎ কার্য্যশীল হয়েন, এবং ঐ কোষের নিম্নভাগে কতিপয় অণু একত্র সংযোগে একটী মানসিক কেন্দ্র প্রস্তুত হইতে থাকে—পরে পূর্ব্ববৎ বিষ্ণু-শক্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, জীব-চৈতন্য হইতে শক্তি সঞ্চালিত হয়—উহা মানসিক শক্তি বা প্রাণ—ঐ জীবনী শক্তি কামময় (Astral) প্রাণের সহিত মিশ্রিত হইয়া (Astral) কামময় কোষে পূর্ব্ববৎ একটী আবর্ত্ত সৃজন করতঃ, যেরূপে স্থূল হইয়াছিল, সেখানে সেইরূপ সমস্ত প্রক্রিয়া ধারাবাহিকরূপে হইয়া, কামময় সূক্ষ্ম শরীরে সূক্ষ্মেন্দ্রিয়-সমূহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে—তদ্দ্বারা স্থূলাতীত সূক্ষ্ম জগতের জ্ঞান জন্মিতে থাকে। এস্থলে পূজনীয়া বেসান্তের 'Study in Consciousness' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলে, এ বিষয় কথঞ্চিৎ পরিস্কুত হইতে পারে। "Higher clairvogance fallows the growth of mind, and cannot appear until the organisation of the *astaral body,* in contradistinction to the *astral sheath,* has been carried to a considerable height. When this is effected by the play of intellect and the perfecting of the physical intellect at apparatus, then the true astal senses, callec chakras or wheels, from the whirling appearance, are gradually evalved. These develop on the astral plane, as astral senses and organs, and are built and controlled from the mental plane, as were the brain centres from the astral." কিন্তু আমাদের বিশেষরূপে জানা উচিত যে, সূক্ষ্ম শরীর সকল সুন্দররূপে গঠিত করিতে হইলে—Astral and Mental Bodies নির্ম্মিত করিতে হইলে—তাহাদের শক্তি-কেন্দ্র সমূহ নির্ম্মিত করিয়া জীবন-চৈতন্যের গুহ্যশক্তি বিকাশিত করা প্রভৃত সাধনা-সাপেক্ষ। স্থূল দেহে নিহিত, সুপ্ত কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিত না হইলে,উহা সাধিত হইতে পারে না। এই সুপ্ত অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্বে সেই অঙ্কুরোন্মুখ সূক্ষ্ম চক্রগুলিকে স্থূলদেহের Sympathetic স্নায়বীয় যন্ত্রের বৃহৎ বৃহৎ কোষাণুগুলির (Ganglionic cells) সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। এই সেতু প্রস্তুত হইলে, কুণ্ডলিনী শক্তি সেই সেতু অবলম্বনে ধাবিত হইয়া, উক্ত সূক্ষ্ম চক্রসমূহকে প্রস্ফুটিত করিতে পারিবে, এবং সূক্ষ্ম শরীরে অনুভূত ঘটনাবলী স্থূল মস্তিষ্কে

সঞ্চালিত হইয়া, স্থূল শরীর দ্বারা সেই অনুভূতি সম্পাদিত হইবে। মনে করুন 'Consciousness' একটী বৃহৎ ডিম্বাকার জ্যোতির সদৃশ—তাহার এক প্রান্ত মাত্র স্থূল মস্তিষ্কে নিহিত—তাহাকে জাগ্রৎ চৈতন্যাবস্থা (Waking Consciousness) কহে। as Consciousness (জীবচৈতন্য) becaues Self *Cons cious* on the astral plane and the brain developes sufficiently to answerd to its vibrations, astral Consciousness will become part of the waking-Consciousness Later still, when Consciousness because Self-conscious on the Mental plane, and the bain developes sufficiently to its answer to its vibrations, the waking-consciousness will include mental consciousness. And so on, until all the consciousness on our five planes has evalved to waking-Conscionsness." পুনরায় "For the inclusion of the astral Self. Conscionsness, Pituitary Body should be evalved beyknd its present condition·· " and for theinclusion of the metal, the Pincal Gland must be rendered active· ·" যতদিন আমরা *pituitary body* এবং *pineal gland* আমাদের মস্তিষ্কের এই দুইটী কোষাণুকে কার্য্যক্ষম করিতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম শরীরে জীব-চৈতন্য কার্য্যক্ষম হইলেও সেই সূক্ষ্মচৈতন্যের কার্য্য স্থূলে পরিণত হইতে পারে না, এবং আমাদের জাগ্রৎ-চৈতন্যের অংশ বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ Pituitary Body দ্বারা Astral সূক্ষ্ম জগতের জ্ঞান স্থূল মস্তিষ্কে নিহিত হয়; এবং Pinceal Gland সূক্ষ্ম Astral একটী চক্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া তদ্দ্বারা মনোময় দেহে (Menal Body তে) যুক্ত হয় এবং চিন্তা-পরিচালনের মুখ্য স্থূল যন্ত্র হয়।

এক্ষণে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারিলাম, কি জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টা সময়ে সময়ে বিফল হইয়া যায়—কি জন্য বহু যত্ন ও পরিশ্রমে কোন কোন আবিষ্কার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অন্বেষণে অগ্রসর হইতে হইতে একস্থলে এককালে থামিয়া পড়িতে হয়—তাহার স্পষ্ট কারণ এই যে, পুরাকালে যোগী ঋষিদিগের ন্যায় ইহাদের সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের বিকাশ

অদ্যাপি হয় নাই,—সুতরাং সূক্ষ্মকারণ দর্শনে অক্ষম। যে সকল বৈজ্ঞানিক-দিগের মত আপাতত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, এবং যাঁহারা স্থূলাতীত শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন ও তদনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন, কালে তাঁহাদের চেষ্টা সকল সুন্দর ফল প্রসব করিবে। Myers প্রমুখ Psychieal Research society সভ্যগণ এই সম্বন্ধে অনেক অগ্রসর হইয়াছেন—Sir aliver Ladge প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের উদ্যম অতীব উৎসাহ-প্রদ—বলা বাহুল্য যে, Mrs. Basent এর "Ocent Chemistry" রসায়ন বিদ্যাবিদ্-দিগের নিকট সমধিক আদরণীয় ও তাঁহাদের একটী প্রধান সহায়রূপে পরিণত হইবে—উহা প্রাচ্য প্রথা অবলম্বনে প্রস্তুত হইতেছে। এইরূপে যদ্যপি সকল আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ পরাবিদ্যা-সমিতির প্রদর্শিত পথানুসরণ করতঃ প্রথমে স্ব স্ব অন্তর্নিহিত গুহ্যশক্তি সমূহ বিকাশিত করিবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েন, তাহা হইলে অচিরাৎ সমগ্র শাস্ত্র পুনরায় সেই পুরাতন উচ্চতম স্থান অধিকার করিবে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু জগৎ দ্বন্দ্বময়—ব্রহ্মের সগুণরূপে আদি বিকাশ হইতেই দ্বন্দ্ব আরম্ভ Spirit-matter, চৈতন্য—জড়, আলোক—অন্ধকার, সুখ—দুঃখ, জ্ঞান—অজ্ঞান, শান্তি—অশান্তি—যতই দেখিব একটি থাকিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিরোধী অপরটী অন্যদিকে বর্ত্তমান। সুতরাং মানবের এই গুহ্যশক্তি অনুসন্ধানে যেমন একটী সুধাময় ফল আছে, আবার তৎসঙ্গে উহাতে একটী অতি বিষময় ফলও বর্ত্তমান রহিয়াছে (১) শক্তির বিকাশের সহিত মানবের সেই বিশ্বব্যাপী অনন্ত সমষ্টি-শক্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই উভয় শক্তির আধার, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে, ব্যষ্টি-মানব ধীরে ধীরে সেই সমষ্টি ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে। ক্রমে ক্রমে ব্যষ্টি সূক্ষ্ম-শক্তি একের পর একজনে তৎপরে অন্যজনে বিকাশিত হইতে হইতে, দিন দিন নূতন নূতন অদৃষ্টপূর্ব্ব আবিষ্কার প্রবলবেগে যতই হইতে থাকে, মানবকুল সেই অনন্তশক্তির খেলা দেখিয়া বিমোহিত হইয়া পড়ে; এবং মানবে পৃথক্ পৃথক্ভাবে নিহিত সামান্য শক্তিসমূহ সেই মহাশক্তিরই পৃথক্ অংশজ্ঞানে অবশেষে সেই পরমা শক্তির শরণাপন্ন হইলে, তদ্দ্বারা যথাসময়ে সেই জগন্মাতার অনুকম্পালাভে সমর্থ হয় ও জগদ্বিকাশের প্রারম্ভে যাঁহা হইতে তিনি বহির্গত

হইয়া, এই বিশাল বিশ্ব সৃজন ও ধারণ করিতেছেন ও যাঁহা হইতে তিনি অভিন্ন, তাঁহার প্রসাদে সেই অনন্ত ব্রহ্মে বিলীন হইতে সক্ষম হন।

(২) পুনশ্চ অন্তরায়েব দিকে দৃষ্টি করুন—আমরা সকলে একই সময়ে জন্মগ্রহণ করি নাই—কাহারও অল্পসংখ্যক এবং কাহারও বা বহুসংখ্যক জন্ম অতিবাহিত হইয়াছে, যাঁহার বহুজন্ম হইয়াছে তাঁহার জ্ঞান অপর অপেক্ষা অধিক, তিনি যাহা করিবেন তাহার অগ্রপশ্চাৎ বিলক্ষণরূপে দেখিয়া-- পূর্ব্ব সংস্কাব জাত মানসিক ক্ষমতা দ্বারা উত্তমরূপে বিচার করিয়া সেই সকল কার্য্য করিবেন—কিন্তু যাঁহার পূর্ব্বসংস্কার ও তজ্জনিত বিচারশক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প, তিনি পূর্ব্বোক্তরূপে বিচার করিয়া সমস্ত করিতে পারিবেন না। সুতরাং উক্ত দুই জনে এককালে কোন সুকৌশল সাধনা অবলম্বনে সূক্ষ্ম শক্তিসমূহ বিকাশিত করিলে, উভয়ের বিভিন্ন ফল লক্ষিত হওয় সম্ভব। প্রথমতঃ উভয়ের একই রূপ ফল লাভ না হইতে পারে। যদ্যপি তাহাই প্রথমে হইয়া উঠে, তাহা হইলে এক জন তাঁহার শক্তিসমূহ জগতের হিতার্থে এবং পরমার্থ জ্ঞানলাভের মানসে নিয়োগ করিতে চেষ্টা করেন, অপর ব্যক্তি কিঞ্চিৎ অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া, আপনাকে সাধারণ অপেক্ষা অধিকতব উন্নত মনে করিয়া অহঙ্কৃত হইয়া পড়েন। প্রথমোক্ত নিরহঙ্কারী ধীর ব্যক্তি ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া উত্তরোত্তর অধিকতর ক্ষমতাবান্ হইতে থাকেন, এবং জগতের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করতঃ, সাধনামার্গে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি অলৌকিক ক্ষমতা-প্রদর্শনে জগৎকে মোহিত করিতে উদ্যত হয়েন, কিম্বা স্বীয় স্বার্থলাভে তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করতঃ, অবশেষে যোগমার্গ হইতে চ্যুত হয়েন। দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, যাহাতে পুনঃ পুনঃ নিবারিত হইয়াও তাঁহারা দূরশ্রবণ, দূরদর্শন প্রভৃতি অদ্ভুত ক্ষমতা-প্রদর্শনে বিমুখ না হওয়াতে, অনতিবিলম্বে তাঁহাদের শক্তি সকল অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং সাধনামার্গে উন্নতির কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের নিতান্ত অবনতি হইয়াছে। এক জন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া হেলায় যাহা নষ্ট করিয়াছেন, তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন মাত্র—চেষ্টা ফলদা হইতেছে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১১শ ভাগ	ফাল্গুন, ১৩১৬ সাল।	১৩ সংখ্যা।

সিন্ধু ও শম্ভু। *

নহেত সাগর, ও যে দিগম্বর, সতী-হারা ভোলানাথ,
শোকেতে পাগর, বিরহে কাতর, ত্রিনয়নে ধারাপাত !
গগন বিশাল, পরশয়ে ভাল, জটাজুট-বিলম্বিত ;
ও নহে তরঙ্গ, গরজে ভুজঙ্গ, হৃদি পরে শত শত।
নহে সিন্ধু-নাদ, "বম্ বম্" বাদ, ঘন ঘন উতরোল ;
কভু করতাল, কভু বাজে গাল, নাচে হর উতরোল।
নহে সিন্ধু-গতি, পাগলের মতি, মাতালের পারা চলে ;
যেতে যেতে চায়, থমকি' দাঁড়ায়, যেতে পুন পড়ে ঢলে !

* পুরীধামে প্রবাসকালে রচিত।

২

ভোলারে ভুলায়ে, সতীরে লুকায়ে, কোথায় রেখেছ হরি ?
তাই তব দ্বারে, যাচে সে তাহারে, কিবা দিবা বিভাবরী।
হাসিছে ঈশান, ভাবিছে বিধান, "দেহ, দেহ জগন্নাথ!"
বহে ঘন ঘন, প্রলয় পবন, নাসায় নিশ্বাস-বাত।
তোমার হৃদয় সতীর আলয়, সদসদতীত তুমি ;
কব নিববাণ সে চিরশ্মশান মহেশের চিতা-ভমি।

সিন্ধু-সংকীর্ত্তন।

নগরীর উপকণ্ঠে সহস্র তরঙ্গ কণ্ঠে উঠে হরিনাম ;
নাহি ক্ষুধা, নাহি তৃষা, নাহি দিবা, নাহি নিশা, নাহিক বিরাম।
মৃদঙ্গ ভোরঙ্গ ঘন বাজিতেছে অনুক্ষণ মহাশূন্য ভরি' ;
ভাবাবেশে বালু, তটে আছাড়ে পড়িছে লুটে ভক্তগণ মরি!
সে পবিত্র সংকীর্ত্তন শুনিবারে দেবগণ আসে "স্বর্গ-দ্বারে" ;
সে সুধা কবিতে পান বিরাজেন ভগবান্ মন্দির মাঝারে।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ।

জীব-সেবাই ভগবৎ-সেবা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গুরু। এখন বুঝিলে কি কিসে তোমার মাতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতা হন? তোমার জননীর পক্ষে যে নিয়ম, বিশ্ব-জননীর পক্ষেও ঠিক তাই। তোমাদের সুখেই যেমন তোমার গর্ভধারিণীর সুখ এবং তোমাদের দুঃখেই তাঁহার দুঃখ, সেইরূপ অসংখ্য সন্তানের আনন্দেই জগন্মাতার আনন্দ। তোমার

ভাই-ভগিনীগুলিকে ক্লেশ দিয়া তুমি ভাল খাদ্য বা বস্ত্রাদি দ্বারা মা'য়ের সেবা করিলে যেমন তিনি প্রসন্না হন না, ঠিক সেইরূপ যাঁহারা লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে স্বর্ণ-প্রতিমা করিয়া খুব ধূমধামে দেবদেবীর পূজা করেন, অথচ সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত্ত বিবস্ত্র ত্রিতাপ-তাপিত নরনারীর প্রতি একবার ফিরিয়াও তাকান না, তাঁহাদের ভগবৎ-সেবা ব্যর্থ হয় জানিবে। অতএব কায়মনোবাক্যে জীব-সেবাই প্রকৃত ভগবৎ-সেবা।

শিষ্য। ইহা তো বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কথা।

গুরু। কেবল বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কেন, সকল ধর্ম্মেরই মূল কথা এই। তবে বুদ্ধদেব এই ভাবটি, যেমন পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন, জগতে আর কেহই সেরূপ করেন নাই। কেন, হিন্দু ধর্ম্মে বা খৃষ্টান্-ধর্ম্মে কি এ কথা নাই? হিন্দুর স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা—সর্ব্বত্রই এ কথা পাইবে। দু'একটি উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারিবে। তন্ত্রে আছে,—

"কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতং॥
অধীশেনাবৃতং বিশ্বং নাশং যান্তি নিনক্ষবঃ।
তৎপাতৄন্ পাতি বিশ্বেশঃ তস্মাৎ লোকহিতো ভবেৎ॥"

শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "দেবি, ভগবান্ এই বিশ্বকে ধারণ ও আবরণ করিয়া রহিয়াছেন, অতএব বিশ্বের হিতসাধন করিলেই ভগবান্ প্রীত হন। যাহারা বিশ্বের নাশেচ্ছু তাহারা নাশ প্রাপ্ত হয়, এবং যাহারা জগতের মঙ্গল করে, ভগবান্ তাহাদিগকে রক্ষা করেন। অতএব লোকের হিতসাধনই ধর্ম্ম।" আবার, প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের নিত্যকার্য্যের মধ্যে যে পঞ্চ যজ্ঞের ব্যবস্থা মন্বাদি-স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে সেই পঞ্চ যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি তাহা বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখ নাই। ইহা ভগবানের মহা-যজ্ঞ বা বিরাট ত্যাগের একটি ক্ষুদ্র ছায়ামাত্র। প্রত্যেক জীবকে এই বিরাট ত্যাগের পথে অল্পে অল্পে অগ্রসর করানই ইহার উদ্দেশ্য।

শিষ্য। ভগবানের মহা-যজ্ঞ বা বিরাট ত্যাগটা কি?

গুরু। সে কথা পরে বলিব। এখন পঞ্চ যজ্ঞের কথা শুন। ব্রহ্ম-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, দেব-যজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ—এই পাঁচটি যজ্ঞ গৃহস্থমাত্রের নিত্য-

কর্ত্তব্য। যজ্ঞ শব্দের অর্থ আর কিছুই নয়, পরার্থে ত্যাগ। এখন দেখ, নিত্য তোমাকে কিরূপ ত্যাগ অভ্যাস করিতে হইবে ;—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥"

অর্থাৎ ঋষিগণের প্রীত্যার্থ তোমাকে রোজ বিদ্যাদান করিতে হইবে, পিতৃগণকে জলদান, দেবগণকে ঘৃতদান, পশুপক্ষীদিগকে খাদ্যদান এবং নরনারীকে অন্নদান করিতে হইবে। অর্থাৎ তোমার চতুঃপার্শ্বে যত জীব আছেন, তাঁহারা উচ্চই হউন আর নীচই হউন, সকলের জন্যই তোমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ অভ্যাস করিতে হইবে। তর্পণের একটি মন্ত্র শুন,—

"যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥"

অর্থাৎ ইহ জন্মে বা অন্য জন্মে যাঁহারা আমার মিত্র ছিলেন বা শত্রু ছিলেন, সকলেই পরিতৃপ্ত হউন। ইহাতেও যেন হিন্দু তৃপ্ত না হইয়া, আবার ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছেন,—

"আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।"

জগতের যে যেখানে আছেন সকলেই তৃপ্ত হউন, সকলেই তৃপ্ত হউন, তাঁহাদের আনন্দেই আমার আনন্দ।

শিষ্য। গীতাতে এই ত্যাগের কথা কিছু আছে কি ?

গুরু। গীতার সর্ব্বত্রই এই ত্যাগের কথা। বাস্তবিক গীতাকে এই ত্যাগের গান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই পঞ্চযজ্ঞের কথাই উল্লেখ করিয়া ভগবান্ কি বলিতেছেন শুন,—

"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥"

অর্থাৎ যিনি যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করেন, তিনিই পাপমুক্ত ও সাধু ; কিন্তু যে কেবল নিজের জন্যই অন্ন পাক করে (অপর জীবকে দেয় না) সেই পাপিষ্ঠ পাপই ভক্ষণ করে। আবার সমগ্র গীতাতে ভগবান্ পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, "সর্ব্বদা কর্ম্ম কর, কদাপি কর্ম্মত্যাগ করিও না, জনকাদি কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছেন। দেখ, আমার অপ্রাপ্য বা অপ্রাপ্ত কিছুই নাই, তথাপি আমি

নিয়ত কর্ম্ম করি, অতএব তোমরাও কর্ম্ম কর, কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কর, যাহা কিছু করিবে, আমাতে অর্পণ কর (তৎকুরুষ মদর্পণম্), আমার সহিত এক যোগে কর্ম্ম কর (যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি), সমস্তই আমার প্রীত্যর্থ কর ইত্যাদি।" আচ্ছা, ভগবান্ এই যে কর্ম্মের কথা বলিতেছেন, সে কর্ম্মটা কি এবং তাহাতে সব কর্ম্ম অর্পণ করাইবার অর্থ কি, কখন ভাবিয়াছ কি?

শিষ্য। আজ্ঞে না, বিশেষ করিয়া চিন্তা করি নাই।

গুরু। অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই অর্জ্জুন 'কর্ম্ম কি" এই প্রশ্ন করিলে ভগবান্ তদুত্তরে বলিলেন,—

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।

অর্থাৎ প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য যে ত্যাগ, সেই ত্যাগের নামই কর্ম্ম। ইহাই ভগবানের কর্ম্ম; এবং জীবের কর্ম্মও ঠিক এই আদর্শে গঠিত হওয়া চাই। ইহাই ভগবানের উদ্দেশ্য। যে মহাযজ্ঞ বা বিরাট্ ত্যাগের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম তাহা এখন বুঝিলে কি? উহা এই কর্ম্মেরই নামান্তর-মাত্র।

শিষ্য। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

(ভগবানের বিরাট্ ত্যাগ)

গুরু। যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করিয়া ভগবান্ এই বিশ্বের সৃষ্টি, ধারণ ও পোষণ করিতেছেন তাহা কিরূপে বলিব? যেহেতু আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণী উহার বিশালতা ও মহত্ত্ব ধারণা করিতে অক্ষম। তবে, দু'একটা লৌকিক উদাহরণ দিয়া ইহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করি। আচ্ছা, তুমি তো একজন স্বাধীন ব্যক্তি, অনেক বিষয়েই তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তুমি যাহা ইচ্ছা খাইতে পার, যাহা ইচ্ছা দেখিতে পার, যাহা ইচ্ছা চিন্তা করিতে পার, মুক্ত বায়ুর ন্যায় যথা-ইচ্ছা বিচরণ করিতে পার। এখন মনে কর তুমি দেখিলে, এক নদী স্রোতে অসংখ্য পিপীলিকা ভাসিয়া যাইতেছে। তোমার দয়ার উদয় হইল, ইহাদিগকে রক্ষা করিবার বাসনা জন্মিল। তখন তুমি সকল কর্ম্ম, সকল চিন্তা, সকল স্বাধীনতা—আহার, বিহার, গল্প ভ্রমণ—সব ত্যাগ করিয়া এক গলা জলে দাঁড়া-ইয়া রহিলে এবং এক একটি পিপীলিকাকে উদ্ধার করিতে লাগিলে। আচ্ছা, কতক্ষণ এরূপে থাকিতে পার বল দেখি। স্মরণ রাখিও যে এক মুহূর্ত্তও অন্য-

মনস্ক হইতে পারিবে না, কারণ তাহা হইলে শত শত পিপীলিকা মরিয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। উহা বড়ই কষ্টকর বোধ হইবে। দশ পনর মিনিটেই হয়ত অধৈর্য্য আসিবে।

গুরু। আচ্ছা। আবার মনে কর রুসিয়ার সম্রাট্ একজন কত বড় স্বাধীন ক্ষমতাশালী, প্রতাপবান্ নরপতি। তিনি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। সৈন্য সামন্ত, দাস দাসী, ধন রত্ন, গাড়ী ঘোড়া, বিভব ঐশ্বর্য্য, প্রভাব প্রতিপত্তি —কিছুরই অভাব নাই। এখন মনে কর তিনি এই সব ত্যাগ করিয়া, তাঁহার সকল স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া অতি দীনবেশে একখানি জীর্ণ বস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া কুষ্ঠরোগীদিগের হাঁসপাতালে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বহস্তে তাহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা এই যে, যদবধি না তিনি সকল রোগিগণকে রোগমুক্ত করিতে পারিবেন, তদবধি তিনি ঐ গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবেন, অন্য কোন কর্ম্ম করিবেন না, অন্য কোন চিন্তা করিবেন না। এই রাজার দয়া ও ত্যাগ কিরূপ বল দেখি?

শিষ্য। অসাধারণ! এরূপ তো কখনও শুনি নাই।

গুরু। তুমি যেমন সব সুখ ও স্বাধীনতা ছাড়িয়া এক গলা জলে দাঁড়াইয়া, পিপীলিকাগণের উদ্ধারসাধনে ব্রতী হও, রাজা যেরূপ তাঁহার অতুল বিভবাদি ত্যাগ করিয়া হাস্যমুখে পূতিগন্ধময় ঘৃণাজনক হাঁসপাতালে আবদ্ধ হন, ভগবান্ সেইরূপ তাঁহার অনমুমেয়, অননুভবনীয় নির্ব্বাণ-সুখ—তুরীয়-স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া, জীবের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতির জন্য অনন্তকাল আপনাকে এই ক্ষুদ্র বিশ্ব কারাগারে,—প্রকৃতি-নিগড়ে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তিনি এই বিশ্বের —যাবতীয় ভূতের ও জীবের প্রাণস্বরূপ হইয়া, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় ইহাদিগকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্প এই যে, যদবধি না তিনি অসংখ্য জীবকে (অতি ক্ষুদ্র কীটানুকীটকে পর্য্যন্ত) ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও উন্নত করিয়া সেই নির্ব্বাণ সুখের অধিকারী করিতে পারিবেন, সেই পরম ধামে লইয়া যাইতে পারিবেন, যতদিন না জাত ও অজাত জীবমাত্রকে নির্ব্বাণ মুক্তির মিষ্ট আস্বাদ দিতে পারিবেন, ততদিন তিনিও সেই আস্বাদ গ্রহণ করিবেন না, সর্ব্ব ত্যাগী সন্ন্যাসিরূপে এই বিশ্ব-শ্মশানে আবদ্ধ থাকিয়া, জীবের যাবতীয় বিষ ভক্ষণ

করিতে থাকিবেন,—পিতা, মাতা, প্রভু বা সখা-রূপে জীবের ক্লেশভাগী হইয়া সস্নেহে নয়নজল মুছাইবেন, ধীরে ধীরে তাহাকে মুক্তি-পথে লইয়া যাইবেন। ইহাই তাঁহার ব্রত, ইহাই সঙ্কল্প। বৎস, এ দয়াব,—এ ত্যাগের কি তুলনা আছে, না আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব ইহার ধারণা করিতে সক্ষম ?

শিষ্য। দেব, যাহা শুনিলাম তাহাতে রোমাঞ্চ হইতেছে। আমরা পুস্তকেই পড়ি "তাঁহার অনন্ত প্রেম"। ইহা কিরূপ এতদিন বুঝি নাই। আজ যেন ইহা একটু বুঝিলাম।

গুরু। বৎস, এখন ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ,—জীবের সৃষ্টি ও উন্নতির জন্য বিরাট ত্যাগ—বুঝিলে কি ? ইহাই ভগবানের "কর্ম্ম"। এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন "তাঁহার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু না থাকিলেও তিনি সদাই কর্ম্মরত। এই কর্ম্মের জন্যই তিনি জীবকে আহ্বান করিতেছেন, বলিতেছেন, "আমি যেমন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অসংখ্য সন্তানের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইয়াছি, জীব, তুমিও আইস, যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি—এই কর্ম্মে আমার সহিত যোগ দাও, মৎকর্ম্মপরমো ভব—আমার কর্ম্মই কর, স্বীয় ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আমার কর্ম্মের অনুকরণ কর, ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম, এই কর্ম্মের দ্বারাই জনকাদি সিদ্ধ হইয়াছেন।"

শিষ্য। জীব সেবা-রূপ এই মহৎ ব্রত অবলম্বন করিতে চায় না, এরূপ পাষণ্ড কেহ আছে না কি ?

গুরু। এই ব্রত যে কিরূপ কঠিন, কিরূপ দুরূহ তাহা তোমার আদৌ জ্ঞান নাই বলিয়া ওরূপ বলিতেছ। স্বর্লোকের, কি মহর্লোকের, কি জনলোকের সুখ যে কতই গভীর, কতই মনোহারী, কতই চিত্তাকর্ষক তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। সুতরাং সাধনাবলে ও সৎকর্ম্ম দ্বারা যাঁহারা ঐ সকল উচ্চতর লোকে স্থান পাইয়াছেন, জীব-সেবার জন্য তাঁহাদের ভূতলে নামিয়া আসা যে কিরূপ কষ্টকর, কিরূপ বিপুল ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন তাহা তুমি-আমি বুঝিব কিরূপে ? মনে কর, যিনি ইন্দ্র বা মনু হইয়াছেন, তিনি যদি জীবহিতার্থে নরদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, ভাব দেখি তাঁহাকে কতদূর স্বার্থত্যাগ করিতে হয়।

শিষ্য। মহাপুরুষগণ আমাদের সেবার জন্য উচ্চতর লোক হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না কি ?

গুরু। হন্ বৈকি। তবে, সকলে এরূপ কঠোর ত্যাগস্বীকারে সমর্থ হন না। এই পৃথিবীতে সাধনা দ্বারা যে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় করেন, পরম করুণাময় ভগবান্ তাঁহাকে তদনুরূপ উচ্চপদ প্রদান করেন, কেহ বা আদিত্য, কেহ বসু, কেহ ইন্দ্র, কেহ মনু, কেহ বা প্রজাপতির পদ প্রাপ্ত হন। অনেকেই এই সকল সুখের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া নীচে নামিতে পারেন না, যাবৎ পুণ্যক্ষয় না হয়, তাবৎ উচ্চলোকে থাকিয়া অপার আনন্দ ভোগ করেন। কিন্তু যাঁহারা প্রেমিক ও ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা এরূপ সুখ চান না, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত তাঁহারা পায়ে ঠেলিয়া দেন। তাঁহারা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ভগবান্‌কে বলেন, "প্রভো, বিশ্বপতে, রসিকবর, তুমি তোমার অনন্ত সুখের আলয় ত্যাগ করিয়া জীবহিতার্থ বিশ্ব-কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছ; আর আমি নগণ্য কীটানুকীট স্বচ্ছন্দে উচ্চলোকে বসিয়া সুখভোগ করিব? কৃপাময়, এ দাসের প্রতি এরূপ নিগ্রহ কেন? যদি কণামাত্র কৃপা থাকে, তবে দাসকে ঐ চরণ-সেবা হইতে বঞ্চিত করিও না, যেন জন্মে জন্মে, যুগে যুগে, কল্পে কল্পে, এ দাস ভূতলে আসিয়া জীবের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারে, যেন জীবের ক্রমোন্নতি কার্য্যে তিলমাত্রও সহায়তা করিয়া স্বীয় জীবন ধন্য করিতে পারে।"

শিষ্য। ধন্য প্রেম! ধন্য ভক্তি!! ধন্য ত্যাগ!!! এরূপ মহাপুরুষের চরণধুলি মাখিলেও দেহ পবিত্র হয়, অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়।

গুরু। বৎস, এইরূপ প্রেমিকের চূড়ামণি, সন্ন্যাসীর শিরোমণি, ত্যাগীর অগ্রগণ্য কে তাহা জান কি? পুরাণাদিতে যে মহাদেবের বর্ণনা আছে সে বস্তুটি কি কখনো ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? শ্মশানে মশানে থাকে, বাঘছাল পরে, কতকগুলো অস্পৃশ্য ভয়ঙ্কর ভূতপ্রেত ও সাপ্‌কে মাথায় ও কাঁধে করিয়া রাখে, আর ক্রমাগত বিষ খায়—এ বেটা কে জান কি? ইনিই ভগবানের বিরাট্ ত্যাগের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। পরম ধাম ছাড়িয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন,—তাই সন্ন্যাসী, শ্মশানবাসী, কৌপীনধারী। আবার আর এক দিক্ থেকে দেখ,—তিনি জীবকে সুখ, সম্পদ, ধন রত্ন ঐশ্বর্য্য—সব দিয়াছেন, নিজের জন্য কিছুই রাখেন নাই, তাই তিনি ফকীর, শ্মশানবাসী। জগতে যাহাদিগকে সকলেই ঘৃণা করে, ভয় করে, কেহই আশ্রয় দেয় না, তিনিই কেবল তাহাদের আশ্রয়,—অশরণ-শরণ; তাই ভূত, প্রেত ও সর্পগণকে বুকে করিয়া রাখিয়াছেন। আবার,

জীবের যে গুলো প্রবল শত্রু,—ক্রমোন্নতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিঘ্নকর,—কাম ক্রোধ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি—ইহারাই বিষ, তাই কৃপাময় জীবহিতের জন্য সর্ব্বদাই বিষপান করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর-মধ্যলীলা।

বেদান্ত-ব্যাখ্যান।

একদিবস প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত জগন্নাথ দর্শন করিলেন। দর্শনের পর ভট্টাচার্য্য প্রভুকে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে বসিতে আসন দিয়া স্বয়ং শিষ্যগণকে বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঠারম্ভ করিয়াই প্রভুকে বলিলেন, "তুমিও পাঠ শ্রবণ কর; বেদান্ত-শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।" প্রভু "যে আজ্ঞা" বলিয়া নিঃশব্দে ভট্টাচার্য্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে সাত দিন পর্য্যন্ত প্রভু ভট্টাচার্য্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যান শ্রবণ করিলেন, একদিনও ভাল মন্দ কোন কথাই বলিলেন না। অষ্টম দিবসে অধ্যাপনার পর শিষ্যগণকে বিদায় দিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে বলিলেন "তুমি সাতদিন হইল বেদান্ত শ্রবণ করিতেছ, একদিনও ভাল মন্দ কিছুই বলিতেছ না, নীরবে শুনিতেছ, বুঝিতেছ কিনা তাহাও বুঝিলাম না।" প্রভু উত্তর করিলেন, "আমি মূর্খ, আমার কিছুই অধ্যয়ন নাই, কেবল আপনার আজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বলিয়াই বেদান্ত শ্রবণ করিতেছি, কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন "ভাল, শ্রবণও কর আর সঙ্গে সঙ্গে যাহা না বুঝ তাহা জিজ্ঞাসাও কর, বুঝিবার চেষ্টা কর, ক্রমেই বুঝিবে"। প্রভু বলিলেন "কিছুই বুঝি না, কি জিজ্ঞাসা করিব? সূত্রের অর্থ বরং কিছু কিছু বুঝিতে পারি, আপনার ব্যাখ্যানের কিছুই বুঝিতে পারি না।" প্রভুর এই শেষ কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বজনসম্মত পাণ্ডিত্যের প্রতি আঘাত অসহ্য হইল। গুরু-

গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আচ্ছা. তুমি সূত্রের অর্থ কি বুঝিয়াছ, এবং সূত্রের সহিত ব্যাখ্যানের কি অসঙ্গতি দেখিতেছ, তাহাই বল শুনি।"

"প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্ শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য ব্যাস সূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দেব কর লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতিকে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।
শ্রুতি বাক্যে সেই দুই মহা পবিত্র হয়॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে।
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন॥"

প্রভু বলিলেন—

"লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্মনীষিণঃ॥"

লঘু অর্থাৎ অনতিদীর্ঘ, অল্প অক্ষর ও অল্প পদযুক্ত, অনেক অর্থের সূচক ও সর্ব্বতোভাবে সারভূত বাক্যকেই পণ্ডিতেরা সূত্র বলিয়া থাকেন। সূত্র-বোধ ব্যাখ্যান-সাপেক্ষ।

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহবাক্যযোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণং॥"

পদচ্ছেদ, প্রত্যেক পদের অর্থনির্দ্দেশ, সমস্ত পদের ব্যাসবাক্য উপন্যাস করণ, বাক্যের যোজনা অর্থাৎ বাক্য-ঘটক পদ-সমূহের অর্থ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন ও আক্ষেপের অর্থাৎ আশঙ্কার বা আপত্তির সমাধান অর্থাৎ নিরসন এই পাঁচটি ব্যাখ্যানের লক্ষণ।

"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানিচ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।"

যে গ্রন্থে সূত্রানুসারী পদ-সমূহ দ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং স্বপ্রযুক্ত পদ সকলও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকেই ভাষ্য বলা হয়।

ভাষ্য সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিবে। আপনি যে ভাষ্য বলিতেছেন, তাহা সূত্রের অর্থ প্রকাশ না করিয়া আচ্ছাদনই করিতেছে। ভবদুক্ত ভাষ্য সূত্রের মুখ্যার্থ প্রকাশ না করিয়া, গৌণার্থদ্বারা মুখ্যার্থকে আচ্ছাদন করিতেছে। উপনিষদের যাহা মুখ্যার্থ, তাহাই বেদান্ত-সূত্রে বিচারিত হইয়াছে। ভবদুক্ত ভাষ্য ঐ মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছে। আপনার ভাষ্য উপনিষদুক্ত শব্দ সকলের অভিধাবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা অর্থ নির্ণয় করিতেছে। প্রমাণের মধ্যে বেদই প্রধান প্রমাণ। বেদ যাহা বলেন, তাহাই প্রমাণ। জীবের অস্থি ও বিষ্ঠা সাধারণতঃ অপবিত্র। বেদ বলিতেছেন, শঙ্খ ও গোময় পবিত্র। বেদ বলাতেই শঙ্খ ও গোময় জীবের অস্থি ও বিষ্ঠা হইয়াও পবিত্র হইয়াছে। দৃষ্টাদৃষ্টার্থক বেদ লৌকিক ও অলৌকিক সর্ব্ববিধ জ্ঞানের নিদান। বেদ আত্মার সত্তা ও স্বরূপ, তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক গতি, দেহের সহিত সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ, জগতের স্বরূপ, জীবের পরম পুরুষার্থ ও তৎসাধনোপায় প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞানের আকর। যাহা এই সকল জ্ঞানের আকর, তাহা অবশ্য পরতঃ প্রমাণ না হইয়া স্বতঃ প্রমাণ হওয়াই উচিত। বেদ আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়াই আপনার প্রমাণ হয়েন। মুখ্যার্থই স্বতঃপ্রমাণ স্বপ্রকাশ বেদের প্রাণ; মুখ্যার্থ ত্যাগ করিলে, বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যের প্রকাশত্বের হানি হয়। বেদ শব্দে লক্ষণা স্বীকার করিলে, লক্ষার্থ-প্রকাশক বেদকে প্রমাণ করিবার জন্য প্রমাণান্তরের প্রয়োজন হয়, অনুমানাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বেদার্থনির্ণায়ক বেদান্তরূপ

স্বপ্রকাশ সূর্য্যের মুখ্যার্থরূপ কিরণ ভবদুক্ত ভাষ্যরূপ মেঘের লাক্ষণিক অর্থদ্বারা আচ্ছাদিত ; অতএব স্বপ্রকাশতা-রহিত অর্থাৎ পরপ্রকাশ্য হইয়া, বুদ্ধিকেও আচ্ছাদন করিতেছে।

"বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥
ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান্ বহু হইতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন॥
সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥"

বেদে ও তদর্থনির্ণায়ক পুরাণাদিতে ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ নিরতিশয় বৃহৎ বস্তুই উক্ত হইয়াছেন। যিনি স্বয়ং বৃহৎ ও যিনি অন্যকে বৃহৎ করেন, অর্থাৎ আশ্রয়-স্বরূপে ধারণ করেন, তিনিই ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ। ঐ অর্থে ব্রহ্মবস্তু সশক্তিক বা সবিশেষই হইতেছেন। শক্তিরহিত, ধর্ম্মরহিত, গুণরহিত, বিশেষরহিত বস্তু নিরতিশয় বৃহৎ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারেন না। বস্তুর উৎকর্ষাপকর্ষ তদ্গত ধর্ম্মদ্বারাই নির্ণীত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম বৃহৎ ও সর্ব্বাশ্রয় হইলে, তাহাতে বৃহত্ত্ব ও সর্ব্বধারকত্বরূপ ধর্ম্ম স্বীকার্য্য হইতেছে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, নির্গুণ শ্রুতি সকলের গতি কি হইবে? তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

যে যে শ্রুতি ব্রহ্মবস্তুকে নির্বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই সেই শ্রুতিই আবার তাঁহাকে সবিশেষও বলিতেছেন। অতএব বিচারে সবিশেষ পক্ষই অধিকাংশস্থলে বলবান্ হইতেছে।

শ্রুতি সামান্যতঃ দ্বিবিধা, ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী ও নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী। ত্রৈগুণ্য-বিষয়িণী শ্রুতি সকল আবার তিন প্রকার; প্রথম প্রকার তল্লক্ষক, দ্বিতীয় প্রকার তন্মহিমাপ্রদর্শক, তৃতীয় প্রকার পরম বস্তুর উদ্দেশক। সৃষ্ট্যাদিবোধিকা শ্রুতি সকল ব্রহ্মের সৃষ্টি-পালন ও সংহার-রূপ তটস্থ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া তাহার লক্ষক হয়েন। যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য বর্ণন দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রচার করেন, তাঁহারাইত মহিমাপ্রদর্শক বেদ। আর যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মের ত্রৈগুণ্যের নিষেধ দ্বারা পরম বস্তুর উদ্দেশমাত্র করেন, তাঁহারাই পরম বস্তুর উদ্দেশক বেদ। এই শেষোক্ত শ্রুতিও আবার দুই প্রকার। এক প্রকার শ্রুতি গুণ-নিষেধ দ্বারা পরম বস্তুর উদ্দেশক বেদ হয়েন, এবং অপর প্রকার শ্রুতি গুণ-সামানাধিকরণ্য দ্বারা পরম বস্তুর উদ্দেশক বেদ হয়েন। নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী শ্রুতি সকলও দুই প্রকার। প্রথম প্রকার নির্গুণ বেদ কেবল বিশেষ্যের নির্দ্দেশ করিয়া ব্রহ্মপর হয়েন এবং দ্বিতীয় প্রকার নির্গুণ বেদ স্বরূপ শক্তি বিশিষ্টের নির্দ্দেশ করিয়া ভগবৎপর হয়েন।

ক্রমিক উদাহরণ যথা।

১ ক। "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি
১ খ। "ইন্দ্রোযতো বসিতস্য রাজা" ইত্যাদি
১ গ ১। "অস্থূলমনণু" ইত্যাদি।

১ গ ২। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি

২ ক । "আনন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

২ খ । "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি

"যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে সৃষ্ট্যাদি তটস্থ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবস্তুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "ইন্দ্রো যতো বসিতস্য রাজা" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য বর্ণন দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রচার করা হইয়াছে। "অস্থূলমনণু" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রহ্মের প্রাকৃত গুণের নিরাস দ্বারা পরম বস্তুর উদ্দেশ অর্থাৎ নাম করা হইয়াছে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে জগদ্রূপা বহিরঙ্গা শক্তির ও জীবরূপা তটস্থা শক্তির সহিত সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ তাদাত্ম্য দ্বারা পরম বস্তুর উদ্দেশ অর্থাৎ নাম করা হইয়াছে। আর "আনন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে কেবল বিশেষ্য ব্রহ্মের নির্দ্দেশ দ্বারা ব্রহ্মপরতা এবং "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে শক্তিবিশিষ্ট ভগবানের নির্দ্দেশ দ্বারা ভগবৎ-পরতা নির্দ্দেশ হইয়াছে। প্রথমোক্ত চারিপ্রকার শ্রুতি ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী এবং শেষোক্ত দুই প্রকার শ্রুতি নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী। এই ছয় প্রকার ভিন্ন আর কোন প্রকার শ্রুতি নাই। সমস্ত শ্রুতিই এই ষড়্‌বিধা শ্রুতির অন্তর্গতা। অতএব সকল শ্রুতিরই সার্থকতা হইতেছে, কোন শ্রুতিই নিরর্থক হইতেছেন না। ব্রহ্ম শব্দদ্বারা সর্ব্বশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানই বোধিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবান্ কখনই নির্বিশেষ হইতে পারেন না। তবে যে কোন কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিতে দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য সামান্যতঃ বিশেষের নিষেধে নহে, প্রাকৃত বিশেষের নিষেধে। প্রথম প্রকার শ্রুতিতে, যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, যদ্দারা এই সকল ভূত জীবন ধারণ করিতেছে ও যাহাতে এই সকল ভূত লয় পাইতেছে, এই প্রকার উক্তি দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)

গীতা-তত্ত্ব।

তৃতীয় প্রস্তাব।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মূলপ্রকৃতি দৈবী প্রকৃতির সাহায্য-ব্যতীত কার্য্য করিতে অক্ষম; সে যাহা হউক, কর্ম্মের ফল সকলের ও মানবের চিরস্থায়ী কর্ম্ম-কর্ত্তৃ ভাবের উৎপত্তিস্থল মূলপ্রকৃতি, দৈবী প্রকৃতি নহে। সেই জন্যই মূলপ্রকৃতি যথার্থ বন্ধকারণ এবং দৈবী প্রকৃতি ঈশ্বরের সহিত যুক্ত করিয়া মুক্তি দিবার একমাত্র উপায়। এই দৈবী প্রকৃতিই মানবের উৎকৃষ্টতর ভাব। অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইবার সমস্ত ভাবই দৈবী প্রকৃতি হইতে আসে।

গীতা ৭ম অধ্যায়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে কৃষ্ণ দৈবী প্রকৃতি হইতে মূল প্রকৃতির পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই দৈবী প্রকৃতি গীতার মতে বিশ্বের একমাত্র মহাচৈতন্য, একমাত্র শক্তি, যাহা হইতে অপর সমস্ত শক্তিই বিকশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন সাংখ্যদিগের প্রকৃতি হইতে এই প্রকৃতি বিভিন্ন।

৭ম অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
মরি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥"

কৃষ্ণ আপনার সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক নির্দ্দেশ করিতেছেন। দুইটি প্রকৃতি, মূলপ্রকৃতিকে ঈশ্বরের বিদ্যা ও দৈবী প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলা যাইতে পারে। যদিও এই দুইটী কথার অপর অর্থও আছে তথাপি উপরোক্ত ভাবে ধরিলেও অনেকটা ঠিক হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বরকে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েরই চালকস্বরূপ বলা হইয়াছে। ঐ শ্লোকে সমস্ত উত্তম গুণ সকল আপনা হইতে উদ্ভূত দেখাইয়াছেন। যদিও অপর গুণ সকল মূলে তাঁহা হইতেই আসিয়াছে, তথাপি মূল প্রকৃতিকেই তাহাদের কারণস্বরূপ ধরা যাইতে পারে।

গীতা ৭ম অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে—

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥"

*　*　*　*　*

ও পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে শ্রীকৃষ্ণ কতকগুলি নানাবিধ গোলযোগপূর্ণ বিষয়

বলিয়াছেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সাংখ্যেরা অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি-আচ্ছাদিত পরব্রহ্মকে যথার্থ আত্মা বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অব্যক্ত ঘটনা-বিকাশে উপাধি যোগের দ্বারা জীবাত্মা হইয়াছেন।

এইরূপে তাঁহারা দ্বিতীয় তত্ত্ব ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য না রাখায়, কতকগুলি অদ্ভুত ফল ফলিয়াছে। অব্যক্ত যদিও অপ্রকাশিত, তথাপি উপাধিভেদে একমাত্র অব্যক্ত বিভিন্নভাবে প্রকাশিত বোধ হইতেছে।

অতএব যদি কোন প্রকারে আমরা উপাধির কার্য্য রহিত করিতে পারিয়া, ইহার সৃষ্ট মায়ার ধ্বংস করিতে পারি, তাহা হইলে ফলে অব্যক্ত পরব্রহ্মে মানবাত্মার লয় হয়। এই মতই আমাদের দেশের অদ্বৈতবাদকে নষ্ট করিয়াছে। সিংহল, বর্ম্মা ও চীনের বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইহা হইতেই এত দুর্দ্দশা উপস্থিত করিয়াছে। অনেক বেদান্তকার এই মত আশ্রয় করিয়া নির্ব্বাণ যে আত্মার যথার্থ লয় এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

পরব্রহ্ম অনন্তস্থায়ী অপরিজ্ঞেয় রহস্যময় সত্তা। তাঁহার নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কাজেই নির্ব্বাণধ্বংসবাদীদের মতে আত্মা যতই কেন উন্নত হউক নির্ব্বাণের পর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারায় এবং পরব্রহ্মে মিলিয়া গিয়া পরব্রহ্মই থাকে। সাংখ্যেরা প্রণবে অর্দ্ধমাত্রা অর্থে কেবল আত্মাই বুঝিয়াছেন। কতকগুলি উপনিষদে দেখা যায় যে এই অর্দ্ধমাত্রাই বিকাশিত হইয়া মানবাত্মারূপে পরিণত হয়। যখন উপাধি জন্য বিকাশের ধ্বংস হয় তখন আত্মার পরব্রহ্মে লয় হয়। ভারতবর্ষে অনেক অদ্বৈতবাদীরই এই মত। এবং অনেক স্থলেই এই মত যথার্থ বৈদান্তিক মত বলিয়া প্রচলিত। ইহাই পূর্ব্বতন সাংখ্যদিগের মত। যে সকল বৌদ্ধ নির্ব্বাণকে পরব্রহ্মে আত্মার লয় বলেন, তাঁহাদেরও এই মত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কারণশরীর উপাধিবিশেষ। এই উপাধি হইতে পরব্রহ্মে পৌঁছিবার দুইটি পথ আছে। কারণশরীর পদার্থ দ্বারা অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি দ্বারা গঠিত। মূলপ্রকৃতিই কারণশরীরের উপাদান। কিন্তু মূলপ্রকৃতি গুণশূন্য, সেই জন্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে দৈবী প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে। পরব্রহ্মে পৌঁছিবার প্রথম পথ কারণশরীর হইতে ক্রমে ক্রমে উপাদানস্বরূপ মূল প্রকৃতিতে লক্ষ্য রাখিয়া পরবর্ত্তী উন্নতির পথেই পরব্রহ্মে পৌঁছান যায়। অপর উপায় উপাধির দিকে লক্ষ্যশূন্য অন্তরস্থ জ্ঞান-জ্যোতি হইতে ক্রমে ক্রমে সেই জ্যোতির

উপাদানস্বরূপ দৈবীপ্রকৃতির দিকে উৎপত্তিস্থল ঈশ্বরত্বে উপনীত হইয়া পরব্রহ্মে পৌঁছিবার চেষ্টা করা।

এই দুইটি পথের মধ্যে অনেক বৈদান্তিক, সাংখ্য ও বৌদ্ধেরা প্রথমোক্তটিকে কিছু সহজসাধ্য ও সুগম বলিয়াছেন। কিন্তু এই জন্য তাঁহারা ঈশ্বর ও দৈবী প্রকৃতির বিষয় বিস্মৃত হইয়াছেন। গুপ্তত্ত্ববিদেরা এই জন্য এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা আত্মা যে কেবল অব্যক্তের বিকাশ, এ কথা স্বীকার করেন না।

ফলে দাঁড়াইল এই যে, উপাধিশূন্য হইলেও এই বিকাশিত পদার্থ অর্থাৎ আত্মা বিকাশিতই থাকে। অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহা পরেও থাকে, মূলপ্রকৃতি বা অব্যক্তই থাকে। ইহার পরেই পরব্রহ্ম। মানবের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব এই-রূপে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গেল। এরূপ স্থলে অবতারবাদ কোনরূপেই সম্ভব নহে। মহাত্মা কিম্বা মহাপুরুষ এই অবস্থায় পৌঁছিলে, লোক-হিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া পড়েন। সিংহলী বৌদ্ধেরা এই যুক্তির যথাযথ সমর্থন করিতে গিয়া, বলিতে-ছেন যে, বুদ্ধ যখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, তখন সকলেই তাঁহার মতে চলিলে, অবশেষে আত্মার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিবেই করিবে। সেই জন্য তাঁহাদের মতে তিব্বৎদেশীয় বৌদ্ধগণের ইহা প্রকাণ্ড ভ্রম যে, বুদ্ধ, মানবকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে বা আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কারণ পরা নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পর বুদ্ধ নামক ব্যক্তির আত্মার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য নাই। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এই মত সমর্থন করেন না।

২৪ শ্লোকে বলিতেছেন, ঈশ্বরের অবস্থাটি না বুঝার জন্য এরূপ ভয়ঙ্কর ভ্রমে পতিত হইয়াছে। ঈশ্বর যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া দ্রষ্টব্য নহেন। এই যোগ-মায়াই তাঁহার জ্যোতি। চতুঃপার্শ্বস্থ জ্যোতি দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু কেন্দ্র দৃষ্টি-গোচর হয় না।

এই জ্যোতি সর্ব্বদাই মূলপ্রকৃতির সহিত মিশ্রিত দৃষ্ট হয়। সেই জন্যই সাংখ্যেরা ইঁহাকে মূলপ্রকৃতির বিক্ষিপ্ত অবস্থা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অব্যক্ত পদার্থ ও শক্তি উভয়েরই উৎপত্তিস্থল।

শ্রীকৃষ্ণের মতে এই জ্যোতি অব্যক্ত হইতে আসে না। ইহা ঈশ্বর হইতে আসিতেছে। কিন্তু এই উৎপত্তি-স্থান অরূপ ও রহস্যময় বলিয়া দার্শনিকেরা

ইহার অগ্রপশ্চাৎ অব্যক্তব্যতীত কিছুই দেখেন নাই। ক্যাথলিষ্টদিগের আদনীকে যে সেকিনা দ্বারা আবৃত বলে, সেইরূপ এই জ্যোতি ঈশ্বরের আবরণ-স্বরূপা, ইনিই খৃষ্টের রক্তমাংস-স্বরূপা পবিত্রাত্মা। মানবের উচ্চতম অধ্যাত্মদৃষ্টির নিকটেও ঈশ্বর এই জ্যোতিস্বরূপ উপাধিতে প্রকাশিত। শঙ্করাচার্য্য সৌন্দর্য্য-লহরীতে জ্যোতিকে আহ্বান করিতেছেন—"তুমিই শম্ভুর শরীর" এই জ্যোতি ঈশ্বরের যেন প্রকাশ হইবার ছদ্মবেশ। জ্যোতির যথার্থ কেন্দ্র উচ্চতম অধ্যাত্মদৃষ্টির নিকটও অপ্রকাশিত, ইহা তোমার ক্ষমতার অতীত, কারণ যখন তুমি ইহাতে পৌঁছিয়াছ তখন তুমি আপনাকে হারাইয়াছ। ইহাকে ধরা যায় না, কারণ ইহা বরাবরই পিছাইয়া যাইতেছে। তুমি এই জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিতে পার, কিন্তু ইহার আলোক কখন স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

ইহা বিশেষরূপে মনে রাখা উচিত যে শতকরা ৯০ জন বৈদান্তিক যাহা বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাহার বিরুদ্ধবাদী। কারণ অনেক বৈদান্তিকই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায়ে ৫ম হইতে

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

১৬শ পর্য্যন্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ মানবের গভীর অর্থযুক্ত দুইটি বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন। প্রথমটি আত্মা ক্রমে উন্নত হইয়া তাঁহাতে পৌঁছিতে পারে। দ্বিতীয়টি যে আত্মা একবার তাঁহাতে পৌঁছিয়াছে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

শেষোক্ত কথাটির বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আত্মা ঈশ্বরে পৌঁছিল। ঈশ্বরকে যখন মানবাত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া, পৃথিবীতে মানবের সহিত সম্পর্কে আসিতে হয়, তখন যে আত্মা ঈশ্বরে পৌঁছিয়াছে, তাহার যে পুন-

র্জন্ম হয় না, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ঈশ্বরের সহিত আত্মা কি ভাবে যুক্ত, তাহা না জানাতেই এই ভ্রমের উৎপত্তি। যতদূর আমরা জানি, আমাদের এই উপস্থিত আত্মজ্ঞান সময়-অনুসারে ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রতিদিনই নূতন জ্ঞান মিলিত হইয়া, এই আমিত্ব-সমুদ্রে রহস্যময় ভাবে মিশিতেছে। যদিও লোকের প্রত্যেক জন্মে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, তথাপি কারণশরীরে এইরূপ অনেকগুলি অস্তিত্ব মিশ্রিত। এই সমস্ত জন্ম-জন্মের স্বতন্ত্র কারণশরীর স্বাভাবিক-মিশ্রণে মিশ্রিত নহে। স্বভাব-যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া, এই সমস্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মিশিয়া গিয়া (অনেকটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ন্যায়) এক অস্তিত্বে আনীত হইয়াছে। যদিও মানবাত্মার এই উচ্চতর স্বাতন্ত্র্য মহৎ, তথাপি ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সত্তা ইহা অপেক্ষাও মহত্তর। কারণশরীর যেরূপ জন্ম-জন্মের অস্তিত্ব হইতে আপনার ধারণের উপযোগী জ্ঞান বাছিয়া লইয়া, অপরাংশ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ঈশ্বরও মানবাত্মায় মিশিবার সময় নিজের উপযোগী অংশ বাছিয়া লইয়া, আর সমস্ত পরিত্যাগ করেন। সেই জন্য মোটের উপর মানব-স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ উচ্চতম অংশই কেবল ঈশ্বরস্থ হয়।

এখন দেখা যাক, মানব-চৈতন্য কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবামাত্র, মানব বুঝিতে পারে যে, সে নিজেই ঈশ্বর এবং তাঁহারই জ্যোতি হইতে এই সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়া, আবার তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। এখন হইতে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঈশ্বরাস্তিত্ব-ব্যতীত পরবর্ত্তী স্বতন্ত্র ভাব কিছুই থাকে না। ঈশ্বর ইহা এইরূপে দেখেন :—

ঈশ্বর যেন বিভিন্ন উপাধিতে নিজের জ্যোতি পাঠাইয়া দিয়াছেন। জন্মে জন্মে এই জ্যোতি যখনই কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছে, তখনই তাহা ঈশ্বরের স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত হইয়াছে। এইরূপে মানবের অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব হইয়া যায়। মানব যখন ঈশ্বরে যুক্ত হয়, তখন ঈশ্বর সময়ের প্রারম্ভ হইতে যে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া, আপনাকে অসংখ্য অধ্যাত্ম সত্তার মধ্যে একটি মনে করে। সেই জন্য সেই ব্যক্তি আর জগতে ফিরিয়া আসে না। যখন ঈশ্বরের জ্যোতি লইয়া কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, তখন যদি ঈশ্বর মনে করেন তিনি জন্মাইলেন (অর্থাৎ ইহা জন্মাইল)* তখন এই মুক্ত ব্যক্তির এক প্রকার পুনর্জন্ম হইল, বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর

কখন ভোগ করেন না, কারণ তিনি প্রকৃতির বিক্রমের বশবর্ত্তী নহেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, তিনি কেবল উপদ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী মাত্র, কোন মহাত্মার ঈশ্বর-প্রবেশ ভিন্ন আর কোন সময়েই ফলবিষয়ে ইচ্ছুক নহেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "সেই সময় ব্যতীত আমি নিজে কিছুতেই জড়িত নহি। কারণ এতাবৎকাল আমি স্বার্থশূন্য দ্রষ্টা মাত্র। যদিও আমার জ্যোতি সর্ব্ব উপাধিতে বিকীর্ণ, তথাপি সাক্ষী বলিয়া আমি দুঃখকষ্টের ভাগী নহি। আমি সর্ব্বজীবস্থ হইয়াও, আমার আধ্যাত্মিক স্বভাব হইতে বিচ্যুত হই নাই।" সূর্য্যের জ্যোতি যেরূপ অপরিচ্ছন্ন স্থানে পড়িলেও, জ্যোতির বিকৃতাবস্থা হয় না, ঈশ্বরের জ্যোতিও সেইরূপ সুখদুঃখ-ভোগী জীবে বিম্বিত হইলেও অপরিষ্কার হয় না। ঈশ্বর কোন বিষয়ভোগ করেন না। আত্মা সুখদুঃখের অতীত, সেই জন্য ঈশ্বরে মিলিত হইলে, জীব সুখদুঃখের অতীত হয়।

যখন বলিতেছি যে, ঈশ্বরের জ্যোতি চৈতন্যরূপে বিশ্বে বিকীর্ণ হইয়া, কম্পিত হইতেছে, তখন যেন এরূপ অর্থ না করা হয়, যে কোন আত্মা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া আবার জন্মগ্রহণ করে। যদিও ঈশ্বরের চৈতন্য জগতে ব্যক্ত এবং সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর অবতীর্ণ হন, এবং ব্যক্তি-বিশেষে আবিষ্ট, তথাপি তিনি ভোগী নন বলিয়া তাঁহার যথার্থ পুনর্জন্ম বলা যাইতে পারে না। ঈশ্বর সৎস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ। সেই জন্য একবার ঈশ্বরে মিলিত হইলে, আর কখনও মানব-জীবনের দুঃখ বা আনন্দের অধীন হইতে হয় না।

ইহাকেই আত্মার অমরত্ব বলে। কতক বৈদান্তিকের ন্যায় বা সিংহলী বৌদ্ধ-দিগের ন্যায় অমরত্ব বুঝিলে, তাহা মানবাত্মার আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ নহে। যদি আত্মার উন্নতি হইলে, স্বাতন্ত্র্য না রক্ষিত হয়, তাহা হইলে অমরত্ব অর্থবিহীন বৃথা বাক্যমাত্র।

যদিও অনেকের সহিত আমার অনৈক্য হইবে, তথাপি আমি বলিতেছি যে, আমি বিশ্বাস করি এবং এই বিশ্বাস কৃষ্ণের অনুমোদিত যে, ইহাই বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য কথিত যথার্থ মত। গীতা নবম অধ্যায় ১১শ শ্লোকে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

কৃষ্ণ নিজেকে ঈশ্বর বলিতেছেন। আবার ১৩ শ্লোকে—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

যে দৈবী প্রকৃতির কথা উল্লেখ করিতেছেন, তাহা অনেকের মতে পরিহার্য্য, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। মানব এই দৈবী প্রকৃতির সাহায্যে এই কেন্দ্র অর্থাৎ উৎপত্তিস্থানে পেঁ ৗছিতে পারে।

১৮ শ্লোকে—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥

অনেকটা খৃষ্টের ন্যায় বা অপর ধর্ম্ম-শিক্ষকের ন্যায় আপনাকে ঈশ্বর বলিতেছেন। ২২ শ্লোকে—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাম্ যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

তিনি বলিতেছেন—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ—অনেক স্থলেই শুদ্ধ সাক্ষী মাত্র। মানবাত্মার উন্নতির পথ দেখিতেছেন মাত্র। কিন্তু যেখানে যথার্থ আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, সেখানে ঈশ্বরে মিলিবার পথ প্রস্তুত হইতেছে।

ঈশ্বর উন্নতিশীল ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য অধিক উদ্যোগী হন। তাহার সাথী হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন, আলোক হইয়া অন্ধকারে পথ দেখাইয়া দেন। এইরূপে ক্রমে ঈশ্বর মানবাত্মার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মানব যেমন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রগামী হয়, শেষে আপনার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব না দেখিয়া ঈশ্বরই দেখে। কেবল এইরূপ স্থলেই ঈশ্বর কেবল মাত্র সাক্ষী নহেন।

এই অধ্যায় ২৯ হইতে—

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

**　　**　　**　　**

শেষের কয়টি শোকে কৃষ্ণ যে দুইটী বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন, তাহা তিনি সার্ব্বভৌমিক ভাবে বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন "আমার কেহ মিত্রও

নহে, কেহ শত্রুও নহে”। কি প্রকারে তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে হয়, তাহা তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। দৈত্যের মধ্যেও প্রহ্লাদ পরম ভাগবত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উপদেশের সময় কাহাকেও পক্ষপাত করিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন যে, মানব যে কোন আশ্রমেই থাকুক না কেন, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন, শূদ্রই হউক আর ব্রাহ্মণই হউক, স্ত্রীই হউক বা পুরুষই হউক, নীচই হউক আর উচ্চই হউক, তাঁহার নিকট কোন পার্থক্য নাই। তাঁহার নিকট আসিবার একটি পথ আছে, যে সেই পথ অবলম্বন করিবে, সেই আসিবে। তিনি কর্ম্মযোগীদিগের মতের সহিত এই বিষয়ে পৃথক্। কতক লোকের মতে কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীস্থ লোকই নির্ব্বাণের উপযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, তাহা নহে। মাধ্বদিগের ন্যায় তিনি আত্মার তিনটি বিভাগ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, একদল লোক আছে, তাহারা নিত্যনারকিক। তাহারা যতই কেন উন্নত হউক না, তাহাদের নরকে যাইতেই হইবে। আর একদল তাহারা নিত্যাশ্রমিক, তাহারা পৃথিবীতে থাকিবেই। আর একদল ইহমুক্ত, তাহারা যতই কেন খারাপ কাজ করুক না বৈকুণ্ঠে যাইবেই। শ্রীকৃষ্ণ এইমত সমর্থন করেন না। কতক লোক বুদ্ধ অবতারের প্রয়োজনীয়তা, যেরূপ অন্যায়ভাবে চিত্রিত করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার বিরুদ্ধবাদী। কতক ব্রাহ্মণ লেখক বুদ্ধকে কৃষ্ণের অবতার স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহাদের মতে বুদ্ধ ধর্ম্মনাশ করিতেই জন্মিয়াছিলেন। তিনি লোককে অধর্ম্মাচরণ শিখাইয়া নরকস্থ করিবার জন্যই জন্মিয়াছিলেন। ঈশ্বর দুষ্টদিগকে দমন করিবার উদ্দেশে জন্মিয়া, ঐ সমস্ত দুষ্টদিগকে অধর্ম্ম শিখাইয়া, নরকস্থ করিয়া বড় বিষম সাজাই দিয়াছেন। বড়ই লজ্জার বিষয়! কিন্তু এই কথা কতক শাস্ত্র-গ্রন্থে আছে। শ্রীকৃষ্ণ কি অপূর্ব্ব বিভিন্ন ভাবই শিক্ষা দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,"আমার চক্ষে সকলেই সমান, যখন কেহ উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করে, তখনই কেবল আমি অপরের সহিত তাহাদের কিছু পার্থক্য করি।” তিনি অমুক ব্রাহ্মণ, অমুক বৌদ্ধ, অমুক পারসী বলিয়া কোন পার্থক্য করিতেছেন না। আধ্যাত্মিক উন্নতিই তাঁহার মতে পরস্পরের পার্থক্য।

দশম অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিতেছেন—

যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

যে, তিনি জন্মরহিত, তিনিই বিশ্বের ঈশ্বর, বিশ্বপ্রলয়েও ঈশ্বরের ধ্বংস হয় না। বিশ্বপ্রলয় হয় কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। আমরা সৌর প্রলয় বা বিশ্বে চৈতন্যের অভাব, এক প্রকার সম্ভব ভাবিতে পারি, কিন্তু যুক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবদ্ধ গঠন হইতে অনিয়ন্ত্রিত অনন্ত কিছু বুঝাইতে অক্ষম। যাহা হউক, গুপ্ত-তত্ত্ববিৎদিগের বিশ্বাস যে, যদিও বিশ্বপ্রলয় চিন্তাতীত সময়-সাপেক্ষ—তথাপি উহা একদিন না একদিন হইবেই। কিন্তু এই বিশ্ব-প্রলয়ের সময়েও ঈশ্বরের মৃত্যু হইবে না। কারণ তাহা হইলে, পুনঃসৃষ্টির সময় আবার ঈশ্বরকে জন্ম লইতে হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে; কারণ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে অজ অথবা জন্মরহিত বলিতেছেন। বিশ্বপ্রলয়ের সময় ঈশ্বর ব্রহ্মে সুপ্ত থাকেন, আবার বিশ্বোৎপত্তির সময় জাগরিত হন। সিনেট্ সাহেব বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিতেছেন, "এই কল্পের ঈশ্বরগত প্রলয়ের পর বিশ্বে মানবোন্নতির সময় ধ্যান যোহান রূপে উন্নতি-চক্র চালাইয়া দিয়া, নিজের উপযুক্ত সূক্ষ্ম জগতে থাকিয়া মানবের উন্নতি লক্ষ্য করিতেছেন ও কখন কখন সাধুদিগকে পরিত্রাণ ও দুষ্টদিগকে দমন করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছেন।" ইহা অনেকটা সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ সেই জাতীয় ঈশ্বর বলিয়া ধরা যাইতে পারে। (যিনি পূর্ব্বে মানবের উন্নতিস্রোত নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।) দশম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে—

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোকইমাঃ প্রজাঃ॥

সপ্ত ঋষি ও মনু সকলকে আপনার মানস পুত্র বলিতেছেন। তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই যুগপ্রারম্ভের প্রজাপতি। সকল পুরাণেই মহর্ষিদিগকে প্রজাপতি বা ব্রহ্মার মানস পুত্র বলা হয়। তিনিই জগতে আদি সৃষ্ট-জীব। তাঁহার পিতা না থাকার জন্য অর্থাৎ তিনি অযোনিসম্ভব বলিয়া তাঁহাকে স্বয়ম্ভব বলা হয়। তিনি তাঁহার মানসিক শক্তিতে মনু ও মহর্ষি সকলের সৃষ্টি করেন। মনু-স্মৃতিতে লেখা আছে যে, প্রজাপতি এইরূপে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তিনি যে একেবারেই জগতের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করি-

য়াছেন তাহা নহে; তিনি ঈশ্বররূপে মানবের উন্নতিকল্পে সমস্তই লক্ষ্য করিতেছেন ও প্রয়োজন মত অবতীর্ণ হইতেছেন।

এইস্থলে একটি বিশেষ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণ চারি মনুর বিষয় বলিতেছেন। তিনি চারিটি মনুর কথা বলিলেন কেন? আমরা এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরে বাস করিতেছি। তাঁহার অতীত মনু হিসাবে ছয় জনের বিষয় বলা উচিত ছিল। কিন্তু কেন চারি জনের বিষয় বলিলেন, তাহা লইয়া নানারূপ গোলযোগ ও মীমাংসা হইয়াছে। "চত্বারঃ" "মনবঃ" এই দুইটি কথা বিভিন্ন করিয়া সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনৎসুজাত এই চারি জনকে ব্রহ্মার মানস পুত্রের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতে অর্থবিপর্যায় হয়। এই শ্লোকেই এই লোক-সমূহের একটি বিশেষণ আছে। সনক ও অপর তিনজন, অপরাপর সন্তানদিগের ন্যায় সৃষ্টি-বিস্তার করিতে স্বীকার করেন নাই। সেই জন্য মানব-পিতৃগণের মধ্যে ইহাঁ-দের ধরা যাইতে পারে না। সমাস না ভাঙ্গিয়াই এই শ্লোকের অর্থ করিতে হইবে। মনুর সংখ্যা তাহা হইলে চারিটিই হয়। যদিও ইহা পৌরাণিক তত্ত্ব খণ্ডন করে, তথাপি ইহা গুপ্ততত্ত্বে কোনরূপে আঘাত দেয় না। সিনেট লিখিয়াছেন যে, আমরা পঞ্চম আদি জাতি। প্রত্যেক আদি জাতি এক এক মনুর সন্ততি। যখন চারিটি আদি জাতি গত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই চারিটি মনু গত হইয়াছে। আর একটি বিষয় বক্তব্য—মনু-স্মৃতিতে লিখিত আছে, আদি মনু (স্বায়ম্ভব) সপ্তমনুর সৃষ্টিকর্ত্তা। স্মৃতির মধ্যে আর কোন নূতন মনু-সৃষ্টির কথা নাই। পুরাণে ১৪টি মনুর উল্লেখ দেখা যায়। কি প্রকারে এই প্রকাণ্ড ভ্রম আসিয়াছে তাহা একটু গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্যের সহিত পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। পণ্ডিতেরা ইচ্ছা করিলে, যে কোনরূপ অর্থ করিতে পারেন, কিন্তু যথার্থ কি, তাহা নির্ণয় করা আয়াস-সাধ্য। এ বিষয়ের আন্দোলন পাঠকের সময়ের ও অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য বিষয়টি যদিও আনন্দজনক তথাপি আমরা এখানে ইহার অধিক আন্দোলন করিলাম না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরাবিদ্যা-সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যোগমার্গে ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য থাকিলে, পতন ভিন্ন উন্নতি নাই। অহঙ্কার ঐ পথের প্রধান কণ্টক—১৮৯৭ সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখের একখানি পত্রে Mrs. Besant এ সম্বন্ধে অতি পরিষ্কাররূপে উপদেশ দিয়াছেন, কেবল সেই একমাত্র স্থলে নহে—পদে পদে অহঙ্কার নষ্ট করিবার উপদেশ, তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়—পুরাতন আর্য্য ঋষিদের উপদেশ-সমূহে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে. ইহা আধ্যাত্মিকতার মহাবিরোধী। সাধারণতঃ ত্রিবিধ অহঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটী বিবিধ বাসনা ও ইন্দ্রিয়ভোগেচ্ছা-জনিত স্থূল দেহাত্মভাব হইতে উৎপন্ন—যাহাকে সচরাচর আমরা অহঙ্কার কহি বা যদ্দ্বারা স্বার্থপরতা (Selfishness or a sense of separateness) উৎপন্ন করে। দ্বিতীয়টী তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর—সাধারণ লোক অপেক্ষা বিদ্যা-বুদ্ধিতে কেহ উন্নত হইলে, প্রায়ই তাঁহার এই বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। পার্থিব ধনাদি হইতে জাত অহঙ্কার অপেক্ষাকৃত সহজে নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রতিভাশীল ব্যক্তির গরিমা হঠাৎ বিনষ্ট হয় না—কারণ স্থূল হইতে সূক্ষ্মের ধ্বংস হওনে অধিকতর কালবিলম্ব হইয়া থাকে। পরস্পরকে একতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য সেইটী প্রথম—পশ্চাতে দুইটী তাহার আনুষঙ্গিক ও সহায়স্বরূপ। কিন্তু এই একমাত্র দোষ, অহঙ্কার একতাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে সক্ষম—একতা ও অহঙ্কার দুই ভিন্ন Poles বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সভ্যগণের মনে 'আমি বড় ও অপরে ছোট', 'আমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও অপরে মূর্খ, নির্ব্বোধ', 'সমিতিতে আমার একান্ত যত্ন আছে ও অপরের অতি সামান্যমাত্র আছে', যে মুহূর্ত্তে এই জ্ঞান উদয় হইবে, তখনই জানিবেন যে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ইহার উপরেও প্রবলতর একটী অহঙ্কার আছে—সেটী আধ্যাত্মিক (spiritual)—'আমি অধিকাংশ সভ্যগণ হইতে অত্যন্ত উন্নতিলাভ করিয়াছি', 'আমি মহাত্মাদিগের সমকক্ষ শীঘ্রই হইব', 'আমি মহাত্মাদিগের সঙ্গে উচ্চস্তরে বিচরণ করিব',—সেই স্বার্থ জ্ঞান মনে উদিত হইলে, তাহা

দূর করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন—কারণ সেটী সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম। সুতরাং সমিতির উপযুক্ত সভ্য হইতে হইলে—সমিতির শক্তি-কেন্দ্রে জীবনীশক্তি সঞ্চালন করিতে হইলে—সাধনমার্গে আরোহণ করিতে হইলে, প্রথমে অহঙ্কারকে বিনাশ করিতে হইবে। অপরাপর গুণের আবশ্যকতা আছে বটে, কিন্তু ইহার সহিত তুলনায় সেই গুলি অতি সামান্য মাত্র। এ সম্বন্ধে কুমারী লিলিয়ান্ এড্গার (Miss. Lilian Edger) গত ডিসেম্বর ১৯০৭ ও জানুয়ারি ১৯০৮ সালের Theosophical Review মধ্যে দুইটী প্রবন্ধে বিশদরূপে সমস্ত লিখিয়াছেন এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের পন্থাতেও ঐ প্রবন্ধদ্বয় অনুবাদিত হইয়া বাহির হইবে—সকলে একবার সেইগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন। সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র মতভেদ আছে। মানবের সূক্ষ্মশক্তি-বিকাশ দ্বারা সূক্ষ্মস্তরের ঘটনাবলীর অনুসন্ধানের তিনি সম্পূর্ণ পোষকতা করেন না। তিনি কেবলমাত্র আত্মার অনুসন্ধানের উপদেশ দিয়াছেন। যে পথে অল্পবিবর্ত্তিত মানবের অহঙ্কার জন্মিবার আশঙ্কা আছে, বোধ হয় সেই পথ পরিত্যাগ করা মঙ্গলজনক বিবেচনা করিয়া, তিনি ঐরূপ লিখিয়াছেন। শক্তি লাভের দিকে মন ধাবিত হইলে, পরমার্থলাভ দুরূহ। তাঁহার মতামত অবশ্য তাঁহার প্রবন্ধে সবিশেষ দেখিতে পাইবেন। আত্মার অনুসন্ধান সম্বন্ধে কাহারও দ্বিতীয় কথা হইতে পারে না। তৃতীয় উদ্দেশ্যসম্বন্ধে সমিতি-স্থাপয়িতৃগণের যে অভিপ্রায়, এস্থলে আমি তাহাই লিখিলাম। এক্ষণে কঠোপনিষদ্ হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, প্রবন্ধ শেষ করিতে ইচ্ছা করি এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে যেরূপ লিখিয়াছেন তাহাও তৎসঙ্গে দিতেছি :—

"যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥" ১০।৪র্থ বল্লী।
"মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥" ১১।ঐ।

এখানে (রূপাদির মধ্যে) যাহা, সেখানে (ব্রহ্মেও) তাহা, এবং সেখানেও যাহা, এখানেও তাহা, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যু হইতে থাকে, যিনি রূপাদিতে নানা বিভিন্নবৎ দেখেন,—মনের দ্বারাই কেবল তাঁহাকে পাওয়া যায়, এখানে কোন বিভিন্নতা নাই, যিনি এখানে

নানারূপ দেখেন, তিনি এক মৃত্যু হইতে অপর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ সম্পূর্ণ একত্ববোধ না হইলে, জন্মমৃত্যুর হাত এড়াইতে পারেন না। শঙ্কর কহেন যে, এই বিশ্বমধ্যে ব্রহ্মা হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত কোন বিশিষ্ট কারণ বশতঃ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক, এখানে যাহা কার্য্য-কারণের আশ্রিত এবং অজ্ঞান ব্যক্তি যাহাকে পরিবর্ত্তনশীল মনে করিয়া থাকে, সে সমস্তই ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নহে—তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। প্রত্যেক জীবের ভিতরেও তিনি, এবং বাহিরেও তিনি বর্ত্তমান—"অবিভক্তং বিভক্তেষু (সর্ব্বভূষু)" চরাচর সমস্ত আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। শাস্ত্রাদি-অধ্যয়ন ও উপযুক্ত গুরুর উপদেশ দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করতঃ, মানব বিশুদ্ধ মনের দ্বারাই কেবল 'ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নাই' এই জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়। অবিদ্যা-নাশ হইলে বিভিন্ন জ্ঞান দূরীভূত হইবে। যতদিন ভিন্ন জ্ঞান থাকিবে, ততদিন মৃত্যু-পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ভিতরে বাহিরে উভয় স্থানেই সেই আত্মার অনুসন্ধান প্রয়োজন। কেবলমাত্র শক্তির বিকাশের দিকে লক্ষ্য থাকিলে, সকলই নষ্ট হইবে। আত্মার জ্ঞান হইলে শক্তি সকল আপনা আপনি আসিয়া পড়িবে। এবং সর্ব্বশক্তিমানের জ্ঞান জন্মিলে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিকণা তাঁহারই শক্তির অংশমাত্র - উপলব্ধি হইবে। তখন অহঙ্কার আর মনে স্থান পাইবে না, অথচ জানিবারও কিছুই বাকী থাকিবে না।

এতাবতা বিবিধরূপে আলোচনা দ্বারা যতদূর বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সমিতির তিনটী উদ্দেশ্য ফলে একই দাঁড়াইতেছে —সকলেরই লক্ষ্য একতা সংস্থাপনের দিকে। প্রথমটীতে স্থূল জগতে (on the physical plane) সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের একটী বীজ-কেন্দ্র বা শক্তি-কেন্দ্র প্রস্তুতকরণ—যদ্দ্বারা উচ্চস্তরে (on the higher *i. e.* Buddhic plane). এই ভ্রাতৃভাব অর্থাৎ একাকার জ্ঞান (perfect unity) যথার্থ বিদ্যমান আছে, ভবিষ্যতে তাহা অনুভব করা যাইতে পারে—এটী একত্বজ্ঞান লাভের প্রথম সোপানস্বরূপ। দ্বিতীয়টীর দ্বারা সকল দেশের শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মহাত্মগণকর্ত্তৃক একই উপদেশ, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে

বিবিধরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা উপলব্ধি হয়—এটী একত্বজ্ঞানের দ্বিতীয় সোপানবৎ। তৎপরে তৃতীয়টীতে ঋষি-প্রদর্শিত পুরাতন পথ যোগমার্গ অবলম্বনে স্ব স্ব সূক্ষ্ম শরীর-সমূহ আত্মার উপাধিরূপে গঠিত করিয়া, আত্মজ্ঞানলাভ ও আমরা সকলেই সেই পরমাত্মার পৃথক্ পৃথক্ অংশমাত্র এবং তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন এইরূপে সমস্তই ব্রহ্মময় জ্ঞানে জীব মুক্ত ও ব্রহ্মে লীন হয়েন—এই সোপানে উঠিতে পারিলে, জীব-ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি ক্রমশঃ হইবার সম্ভাবনা। এজন্য সমিতির সভ্য হইয়া আমাদের সকলেরই এই উদ্দেশ্য-ত্রয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া প্রয়োজন। এবং ইহার সম্যক্ ধারণা হইলে, সকলেই যে, একমনে সমিতির উন্নতি-চেষ্টায় ব্রতী হইবেন, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ তদ্দ্বারা স্ব স্ব উন্নতি আপনা আপনিই সাধিত হইবে। মানবসাধারণ এই সমিতির সভ্য হইয়া আত্মানুসন্ধানে রত হইলে, ক্রমশঃ জগৎ হইতে হিংসা, দ্বেষ, কলহ সমুদায় তিরোহিত হইয়া, সকলে একতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে পারিবে—'আমি' 'তুমি' ভাব অন্তর্হিত হইয়া একটী একাকার জ্ঞানের উদয় হইবে এবং ভগবানকে "বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ" বলিয়া সকলের উপলব্ধি হইবে—দুই Pole এক হইয়া সোঽহং ভাবে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে—জীব শিব হইয়া এক অদ্বৈত শিবমাত্র রহিয়া যাইবে।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গোস্বামী।

একটি অদ্ভুত স্বপ্ন।

একদা আমি :একখানি কম্বলে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া, নিজ গৃহে শয্যোপরি শয়ন করিয়া নিজ চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছি; নিদ্রা ঠিক নয়, তবে একটু বেশ আছন্ন ভাবে রহিয়াছি। অদূরে আমারই ঠিক যেন কর্ণমূলে 'কুহু' 'কুহু' শব্দে একটি কোকিল ডাকিল; আমি কোকিলের স্বর শ্রবণ করতঃ তন্নিকটস্থ হইতে অগ্রসর হইলাম। যত যাই শব্দ শুনিতে পাই, কোকিলের রূপ দৃষ্ট হয় না। আমি ক্রমশঃই চলিতে লাগিলাম, কোকিলের শব্দ আমার অগ্রবর্ত্তী হইতেছে বুঝিতে পারিতেছি—কিন্তু কোকিলকে দেখিতে পাইতেছি না। তখন বুঝিলাম যে, এই কোকিলের শব্দ মায়াবী, এই মায়াবী-শব্দটি আমাকে কেবলমাত্র তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করাইতেছে। আমি তথাপি সেই কুহু, কুহু শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছি এবং ভাবিতেছি যে, কতদুর যাইব। অনেক পথ আসিয়া পড়িয়াছি—কি হবে? মিথ্যা আশা, কেবলই আশা; তখন বুঝিলাম,—না, এরূপ ভাবে আর কোকিল দেখিবার আশা করিব না। এই কোকিল আমাকে বড়ই পথ-হণ্টন করাইতেছে, না,—আমি যাইব না— এই বলিয়া যেমন দণ্ডায়মান হইলাম, আকাশস্থ কুহু কুহু তীব্র স্বর শ্রুত হইল, যেন বলিল 'আমিই আশা।'

আমি বলিলাম, আশা! আমাকে এতদুর আনিলে কেন?

উত্তর—(নেপথ্যে) আমার আবশ্যক আছে, এ আমার খেলা।

আমি—তোমার আবশ্যক আছে, তবে আমাকে কষ্ট দাও কেন? আমার বড় রাগ হচ্ছে, আমি আর যাইব না। এই বলিয়া সম্মুখে দুই পদে অগ্রসর হইলাম। সম্মুখস্থ একটি উদ্যান দেখিলাম, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনটি বেশ বাঁধান, সেই স্থানে একটু দণ্ডায়মান হইয়া উদ্যানটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; দেখিলাম প্রাঙ্গনের শেষ সীমা হইতে একটি লম্বা উচ্চ প্রাচীর। সেই প্রাচীরটি উদ্যানটিকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচীরের দুইভাগে দুইটি ফটক রক্ষিত আছে, দক্ষিণ পার্শ্বের ফটকে উজ্জ্বল আলোকাক্ষরে লিখিত 'বিদ্যা', বাম পার্শ্বের ফটকে কৃষ্ণবর্ণাক্ষরে

লিখিত 'রাগ, দ্বেষ, অস্মিতা'। প্রাচীরের বাম পার্শ্বস্থ সর্ব্ব দেওয়ালটি কৃষ্ণবর্ণাকৃতিতে আবৃত এবং দক্ষিণাংশটি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণে প্রজ্বলিত।

এইরূপে আমি দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেছি, এমন সময়ে কোকিলের স্বর বামপার্শ্বের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, আমি তীরের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, যেমন উহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, অমনি এক অতি দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে উপনীত হইলাম। সেখানে অনেকগুলি পশু, পক্ষী ইত্যাদি রহিয়াছে, আমি সেই স্থানে থাকা সম্ভব নহে বলিয়া পুনশ্চ ফটকের বহির্ভাগে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু ফটক হইতে নির্গত হইতে পারিতেছি না; কারণ একটি বিকটাকার রাক্ষসী বিকট হাস্য করতঃ এক গাছি যষ্টি হস্তপূর্ব্বক ফটক চাপিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে এবং একটি ব্যাঘ্র ও একটি সিংহকে আমার প্রতি ইঙ্গিত করতঃ তাড়িত করিয়া দিতেছে। ব্যাঘ্রটি মুখব্যাদান করিয়া আমার সম্মুখে আসিতেছে ও সিংহটি ভয়ঙ্কর গর্জ্জনপূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিতেছে, আমি মহাবিপদে পতিত হইলাম, ভীত স্বরে মা! মা! মা! শব্দে ডাকিতে লাগিলাম।

গীত।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

বুঝি বা যায় আমার দুর্লভ পরাণি,
কেমনে বাঁচাই বল ওগো ত্রিলোচনি।
প্রীতি অভাবে মা, আমি হতেছি কাতর,
প্রীতি দান কর মা গো জগত-জননী।

এমন সময়ে প্রাচীরের অপরাংশ হইতে চকিতের মধ্যে বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দ শ্রুত হইল "স্থিরোভব।" তৎশ্রবণে আমি স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিলাম; তাহাতে তাহারাও স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিল; এই অবসরে আমি রাক্ষসীর প্রতি চাহিয়া দেখি যে, সে পুনশ্চ কিছু ইঙ্গিত করিতেছে কিনা। আমি দেখিলাম রাক্ষসী বৃদ্ধা, তাহার কপোলে লেখা রয়েছে 'অস্মিতা' সিংহপ্রতি চাহিলাম, দেখিলাম তাহার কপোলে লেখা রহিয়াছে 'দ্বেষ'; ব্যাঘ্র-প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম তাহার কপোলে লিখা রহিয়াছে "রাগ"; এবং

অন্যান্য পশু-পক্ষিগণ-প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলাম এবং বুঝিলাম যে, এই রাক্ষসীরূপী অস্মিতা সকলকে যাদু করিয়া পশু করিয়া রাখিয়াছে, এবং জীবগণ ইহার মায়াবশে আসিলেই তাহাদিগকে পশ্বাকারে পরিবর্ত্তন করিয়া রাখে; ইহা যেমন আমার মনে উদয় হইল, আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অমনি সেই ব্যাঘ্ররূপী রাগটির পৃষ্ঠোপরি একটি পদস্থাপনপূর্ব্বক সিংহরূপী দ্বেষটির পৃষ্ঠোপরি অপর পদটি স্থাপন করিয়া, যেমন দণ্ডায়মান হইলাম, অমনি সিংহটি একটি লম্ফ প্রদান করিল। সুতরাং আমার অপর পদটি ব্যাঘ্রপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত হইয়া সিংহ-মস্তকোপরি স্থাপিত হইল। অনতিবিলম্বেই আমি যুক্তপদে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া প্রাচীরের উপরিভাগে উত্থান করিলাম। সিংহটি নিম্নে প্রক্ষিপ্ত হইল। এ ঘটনাটি লিখিতে অধিক সময় লাগিল, কিন্তু ঘটনাটি এক নিমেষ মধ্যেই ঘটিয়াছিল।

প্রাচীরটি অত্যন্ত উচ্চ; এ স্থলে কোন পশু আসিবার আশঙ্কা নাই; আমি নির্ভীকচিত্তে প্রাচীরের উপর উত্থিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছি যে, অনতিবিলম্বেই আমি পশু দ্বারা আহত হইতাম, কেবল মাত্র জগৎ-মাতার কৃপায় পরিত্রাণ লাভ করিলাম। মা, মা, শব্দ বড়ই মিষ্ট। আশারূপী কোকিলের মিষ্ট কুহু স্বরে যদি না ভুলিতাম, তখন যদি মা! মা! শব্দে মুগ্ধ হইতাম, তা হলে আমায় আর এত ভোগ ভুগিতে হইত না। আমি মা! মা! করিয়া একটু ডাকি। এই বলিয়া মাকে প্রাণ ভরিয়া যেমন ডাকিতে যাইব, অমনি ক্ষীণ, বামাকণ্ঠে একটি গীত শ্রুতিগোচর হইল;—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আমি তোমা বাসি ভাল তুমি ভাল বাস না
আমি যে অন্তরে রাখি তবু তুমি আস না॥
কেন নাথ কি দোষ করেছি জানি না।
বারেক দেখা দিলে কেন গো মিলে না॥
আশাপথ চেয়ে আছি এই কামনা।
এসে দেখা দিয়ে ঘুচাও এ যাতনা॥

গীতটি শুনিলাম, গীত সমাপ্ত হইল এবং আমার সম্মুখে একটি গোলাপি

বর্ণে রঞ্জিতা এক দেবী-মূর্ত্তি আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি এসেছ? আমি তোমারই জন্য ঘুরিতেছি। কেন এতক্ষণ আমার প্রতি বিমুখ ছিলে?

আমি চিনিলাম, প্রীতি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম প্রীতি, তুমি আমাকে 'স্থিরোভব' বলিয়া কি রক্ষা করিলে?

প্রীতি। হাঁ। আমি জানি যে, তুমি স্থির হইলে উহারাও স্থির হইবে, তজ্জন্য আমিই নেপথ্যে তোমাকে সাবধান করিয়াছিলাম। প্রীতিলাভে তুমি যেন বঞ্চিত না হও, এই প্রীতি লাভ না হইলে ভক্তিলাভ হয় না। তোমার মঙ্গলের জন্যই আমার অস্তিত্ব, তুমি যে আমার প্রাণেশ্বর। তাই তোমাতে আমাতে এক হতে চাই।

আমি।—বেশ করেছ প্রাণ। এই বার হইতে আর আমি প্রাণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না; প্রাণের সহিত মিশিয়া উভয়ে ঐক্যভাবে ভক্তি-দেবীর সেবা করিব।

প্রীতি। চল, উভয়ে এক হইয়া ভক্তি-দেবীর নিকট যাই। তখন আমরা মনপ্রাণে এক হইয়া ভক্তিভাবে মাকে ডাকিতে লাগিলাম। এমন সময়ে অদূরে এক সুমিষ্ট বামাকণ্ঠ-গীতধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

গীত।

ভৈরবী—একতালা।

মনপ্রাণে ঐক্য যার,
হৃদে ভক্তি গাঁথা তার।
প্রণব নামেতে পিতা, শান্তি সহ জ্ঞানদাতা।
মাতৃক্রোড়ে শান্ত যথা, আনন্দে বিরাজে তথা ॥
পূর্ণ জ্ঞানানন্দ কহে এই মিলন সবার।
ভ্রাতৃগণে মিলি সবে আসি দেখ একবার ॥

বামাকণ্ঠের এই গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতে আমি বিভোর হইয়া গেলাম। গীত সমাপ্ত হইয়া গেল। ক্ষণিক পরে আমার চমক্ ভাঙ্গিল; দেখিলাম সম্মুখে একটি দেবীমূর্ত্তি। নিশ্চল, নিস্পন্দ ভাবে আমার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। দেবীর সৌম্যমূর্ত্তি, ধীর, মিষ্টভাবে,

করুণাদৃষ্টিপূর্ণ নয়নদ্বয় আমার প্রতি স্থিরভাবে স্থাপন করতঃ দণ্ডায়মান হইল। তদ্দর্শনে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম "মা! তুমি কে? এই অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী রূপধারিণী তুমি কে মা?" দেবী আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক উত্তর দিলেন "বৎস! আমি ভক্তি-দেবী, জীবের মঙ্গলের জন্য আমি এই স্থানে অবস্থান করি; যে ভক্ত এই প্রাচীর পার হইয়া এই স্থানে উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে পারে, আমি তাহাকে আমার পথ প্রদর্শন করাইয়া লইয়া যাই। আমার পথের নাম (ভক্তিমার্গ)। বৎস! তুমি রাগ, দ্বেষ, অস্মিতার অপরাংশ প্রাচীরের উপরে উত্তীর্ণ হইয়াছ এবং প্রীতির সহিত মিলিত হইয়া, আমার সন্নিধানে আসিতে সমর্থ হইয়াছ এবং এক্ষণে আমি তোমাকে আমার মার নিকট লইয়া যাইব। এই দেখ সরল পথ, এই পথে তোমাকে লইয়া যাইব; চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, এই ফটকের উপর লিখা রয়েছে ভক্তিমার্গ। এই পথ দিয়া চল যাই।" এইরূপে ভক্তি-দেবীর সহিত ভক্তিমার্গ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম; পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষগুলি সুন্দর ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে যেন কে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

বৃক্ষগুলি উজ্জ্বল নীলাভাসে ভূষিত ও ফলভরে অবনত। ভক্তি দেবীর বর্ণের আভাটি সর্ব্ব পথটিকে ও বৃক্ষগুলিকে নীলাভাসে ভূষিত করিয়া রাখিয়াছে। ভক্তি দেবীর বর্ণটী উজ্জ্বল নীলাভাস। দেবী আমাকে প্রতি বৃক্ষ হইতে একটি একটি করিয়া ফল ভক্ষণ করিতে দিলেন এবং আমি সেই সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ফল একটি একটি করিয়া ভক্ষণ করিতে করিতে পথ চলিতেছি; সেই ফলগুলি একটি একটি জ্ঞানস্বরূপ আমার অন্তরে জাগরূক হইতে লাগিল। সে সকল ফলের নাম, বৃক্ষের নাম কত প্রকার, তাহাই দেবী প্রদর্শন করাইতেছেন, তাহা আমি কত বলিব—আমি সর্ব্বগুলি বলিতে সক্ষম নহি।

দেবী আমাকে বলিয়া দিলেন যে, "যে সাধক এইপথ (ভক্তিমার্গ) দিয়া চলিতে আরম্ভ করে, তাহার জ্ঞানলাভ হয়, বিত্তলাভ হয়, আনন্দ ও শান্তিলাভ হয়, পরিশেষে তাহার উদ্ধার হইয়া থাকে।" ক্রমশঃ আমরা চলিতে চলিতে আর একটি ফটকের সন্নিকটে আসিয়া উপনীত হইলাম, সেই ফটকের উপরিভাগে লিখা রহিয়াছে জ্ঞানমার্গ। দেবী আমাকে বলিলেন "এইবার

এই পথ ধরিয়া চলিয়া যাও ; সম্মুখে গায়ত্রী দেবীর দর্শন হইবে। আমি এই স্থানে রহিলাম।" তদনন্তর আমি সেই ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দিব্য সুগম্য পথ, পথটি সবুজবর্ণের আভায় ভূষিত। বৃক্ষ-লতাও ঐরূপ সবুজ বর্ণের আভায় ভূষিত হইয়া রহিয়াছে, অনেক পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে এবং যেন বৃক্ষ, লতা, পথ প্রভৃতি হইতে এই ত্রিপাদ গায়ত্রী-ছন্দ-মন্ত্র-শব্দ উত্থিত হইতেছে :—

ওঁ ভূ র্ভুব স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্য।

(১)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার ঐতিহাসিক রহস্য, উপন্যাস নহে। তাঁহার অবতার বিশ্বরঙ্গে মানব-নাট্য। তিনি মনুষ্যনাট্যে বিশ্বরঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় লীলা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার অবতারের লীলা সকলও ঐতিহাসিক ঘটনা, রূপক-কল্পিত নহে। রূপক-কল্পনা না হইলেও ঐ সকল ঐতিহাসিক ঘটনার অভ্যন্তরে যে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ঐ সকল নিগূঢ় তত্ত্বের রহস্য উদ্ভিন্ন হইলে, উহা মানবের হৃদয়-ক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন মনুষ্য-নাট্যে প্রপঞ্চ-মধ্যে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার সহিত তদীয় পার্ষদবৃন্দেরও অবতার হইয়া থাকে। তাঁহার পার্ষদবর্গও তাঁহার ন্যায় মনুষ্যনাট্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার অবতরণের পূর্ব্বে ও পরে এই ধরাধামে অবতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার পার্ষদবর্গের অবতারে একটি ঘোরতর সুরাসুর-সংগ্রাম উপস্থিত হয়; কারণ, তদ্দ্বেষী অসুরবর্গেরও তদীয় পার্ষদবর্গের ন্যায় ধরাধামে আবির্ভাব শ্রবণ করা যায়। পার্ষদবর্গ জ্ঞানভক্তির প্রচার দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্থাপনের সাক্ষাৎ সহায়, অতএব তাঁহার মিত্র-পক্ষ, এবং অসুরবর্গ উক্ত কার্য্যের বাধা উৎপাদন দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্থাপনের পরম্পরায় সহায়, অতএব তাঁহার অরিপক্ষ। উভয় পক্ষের যুগপৎ আবির্ভাবে সুরাসুর-সংগ্রাম অনিবার্য্য; অতএব উভয় পক্ষের সংগ্রামেই মানব-লীলার উপসংহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানব-লীলার উপসংহার হইলেও, লীলার পরিসমাপ্তি হয় না, অপ্রকটে অনন্ত প্রকাশে দেবলীলা হইতে থাকে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রভৃতি সকলই নিত্য। শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে, "যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ," "একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদন্তরাত্মা"।

নিত্যধামের অনন্ত লীলাকেই দেবলীলা বা অপ্রকট লীলা বলা হয়, ঐ নিত্য-ধাম গোলোক ও পরব্যোম ভেদে দ্বিবিধ, গোলোকের নামান্তর কৃষ্ণলোক। কৃষ্ণ-লোক নিত্য-ধাম-রূপ পদ্মের কর্ণিকারস্থানীয় এবং পরব্যোম উহার দলস্থানীয়।

"সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥"

আথর্ব্বণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যেসহস্র দলপদ্মমধ্যে কল্পতরোর্মূলে অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভুজো ময়ূরপিচ্ছশিরো বেণুবেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজতে, দ্বিপার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চেতি। যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিরিতি, অগ্রেচ তস্যাস্যা প্রকৃতীরাধিকা নিত্যা নির্গুণসর্ব্বালঙ্কারশোভিতা প্রসন্নাশেষলাবণ্যসুন্দরীতি,—"

ছান্দোগ্যে "স ভগবান্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? স্বে মহিম্নীতি,"
মুণ্ডকে "দিব্যপুরেহ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইতি"
ঋগ্বেদে "তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরীতি,"
গোপালোপনিষদে "তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরীহি।"

শাস্ত্রে কৃষ্ণলোককে পদ্মের কর্ণিকারসদৃশ এবং পরব্যোমকে পদ্মের দলসদৃশ বলিয়াই বর্ণন করেন। ভক্তগণ ভক্তিভাবিত অন্তরে দর্শনও তদ্রূপেই করিয়া থাকেন। উহা ভক্তগণ কর্ত্তৃক দৃশ্য হইলেও পরিছিন্ন নহে।

"প্রকৃতির পার পরব্যোম নামধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাঁহাই বিশ্রাম॥"

প্রকৃতির পারে সর্ব্বগামী, অপরিছিন্ন ও ব্যাপক পরব্যোম, পরব্যোমের উপরিভাগে কৃষ্ণলোক, কৃষ্ণ লোকের দ্বারকা, মথুরা, গোকুল এই তিনরূপে অবস্থিতি; সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল অর্থাৎ শ্রীগোকুলই কেন্দ্রস্থানীয়, গোলোক, বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপ ঐ শ্রীগোকুলেরই নামান্তর, শ্রীগোকুল শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির ন্যায় সর্ব্বগ অনন্ত ও বিভু। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারেই প্রকটকালে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, আবার যখন ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অপ্রকাশ হয়, তখন তিনি অপ্রকট প্রকাশেই অবস্থান করেন।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ, লীলা, ধাম ও গুণ প্রভৃতি সকলই অনন্ত, কেহই তাঁহার

গুণাদির অন্ত পান না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই নিজগুণের অন্ত পান না।

শ্রুতি বলিতেছেন,—

"দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরা গুণিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎ শ্রুতয়
ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥"

হে ভগবন্ আপনি অনন্ত, অতএব দেবতারা আপনার অন্ত পান না। দেবতাদিগের কথা দূরে থাকুক, আপনিও আপনার অন্ত পান না। সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড সকল আকাশে রজঃকণার ন্যায় কালচক্র দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া আপনার দেহ মধ্যেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ভবৎপর্য্যবসিতা শ্রুতি সকল অতন্নিরসন-মুখে অর্থাৎ 'তন্ন তন্ন' বিচার করিয়া আপনাতেই ফলিত হইয়া থাকে।

ঐ কথাও ত্যাগ কর, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতরণ করিলে যদি তাঁহার সেই অবতার-লীলা বিচার করিতে অভিলাষ করা যায়, তবে মন ঐ লীলারও অন্ত পায় না। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ এক মুহূর্ত্তেই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুইপ্রকার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এক মুহূর্ত্তেই বৈকুণ্ঠনাথের সহিত অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ড নাথের সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছিলেন। এরূপ আর কোথাও শ্রবণ করা যায় নাই। ইহা শ্রবণ করিলে চিত্ত ঔদাসীন্য অবলম্বন করে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মার মোহনার্থ অসংখ্য গোধন ও গোপবালক এবং তাঁহাদিগের বসন ভূষণাদি সমস্তই স্বয়ং রচনা করিয়া ব্রহ্মাকে ঐ সকল আবার চতুর্ভুজ নারায়ণের আকারে দর্শন করাইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা মোহিত হইয়া অনেক স্তব স্তুতির পর বলিয়াছিলেন,

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরম্॥"

হে প্রভো, বহু উক্তির প্রয়োজন নাই যাহারা তোমার বৈভব জানি বলিয়াই অভিমান করে, তাহারা জানুক, তোমার বৈভব আমার কিন্তু শরীর বাক্য ও মনের অগোচর।

শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথাও পরিত্যাগ কর। শ্রীবৃন্দাবন-ভূমির আশ্চর্য্য বিভুত্ব দেখ, শাস্ত্র বলেন, শ্রীবৃন্দাবন ষোলক্রোশভূমি, সেই ষোলক্রোশী শ্রীবৃন্দাবনের এক দেশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছিল—বলিতে বলিতে—প্রভুর ঐশ্বর্য্য সাগর স্ফুরিত হইল,—শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন।

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥

যাঁহার সমান নাই এবং যাঁহা অপেক্ষা অধিক কেহই নাই, যিনি ত্র্যধীশ্বর ও পরমানন্দ স্বরূপ সম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোকপাল সকল উপহার লইয়া কিরীট কোটি দ্বারা যাঁহার পাদপীঠের স্তব করিয়া থাকেন, সেই কৃষ্ণের উগ্রসেনানুবৃত্তি আমাদিগের বিশেষ ব্যথা উৎপাদন করে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের ঈশ্বর হইয়াও যাঁহার আজ্ঞাকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণই অধীশ্বর। স্থূল, সূক্ষ্ম ও সমষ্টির অন্তর্যামী, তিন পুরুষ জগতের ঈশ্বর হইয়াও যাঁহার অংশ, সেই শ্রীকৃষ্ণই ত্র্যধীশ্বর।

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ সইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

লোমকূপে আবির্ভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যাঁহার একটী নিশ্বাস-পরিমিত কালকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ অধিকারে প্রকটরূপে অবস্থিতি করেন, সেই মহাবিষ্ণুও যাঁহার কলাবিশেষ, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি।

গোলোক বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময় অন্তঃপুর, সেই অন্তঃপুরে পিতা মাতা ও বন্ধুগণ, যোগমায়া-রূপা দাসী এবং মধুর রাসাদিলীলা সকল বিরাজ করেন। সেই অন্তঃপুর অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের ভাণ্ডার। সেই অন্তঃপুরের তলে পরব্যোম-নামক মধ্যম আবাস অর্থাৎ বৈঠকখানা বাড়ী, সেই মধ্যম আবাস শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার এবং সেই মধ্যম আবাসেই অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণ বিরাজ করেন।

বেদান্তাভাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তাল যৎ- রাগিনী সাহানা।

বধূ আমার রূপের ঘরে নেচে নেচে আসে যায়।
কেমনে ধরিব তারে সে যে ধরা নাহি দেয় ॥
হেরিতে দর্পণে মুখ
নাহি হয় যত সুখ
কল্পনা বিহনে কভু
যথা নাহি দেখা যায়। ১ ॥
এমনি প্রেমের ফাঁদ বধূর বদন চাঁদ
সুপ্রকটে অকল্পনে
ততোধিক সুখ তায় ॥ ২।
আমারি কি রূপরাশি মুখে মৃদু মৃদু হাসি
মুনি ঋষি কাঁদে বসি
তবু না দেখিতে পায়। ৩ ॥
চমকে চকিত করে থমকে সে মনোহরে
অমানুষী রূপ ধরে
বিজলী জড়িত কায়। ৪ ॥

গীতি কাব্য। ভৈরবী—পোস্তা।

হরি আরাধনা আমার এবার বুঝি আর হ'ল না।
কল্পনা কুহক নইলে মন হ'তে কেন গেল না ॥
পড়েছি বিষম দায়,
মন মত্ত মাতঙ্গ প্রায়,
যথা ইচ্ছা তথা ধায়,
আমার বশে কই এল না।

ধরিতে সেই মন চতুরে,
গিয়াছিলাম অন্তঃপুরে,
দেখ্‌লাম দশজন বিষম চরে,
করে তার উপাসনা ॥

দেখিলাম তার একাধারে,
ব'সে পঞ্চপ্রাণ কুমারে,
ব্যজন করে সেই বাতাসে
উঠে তরঙ্গ কল্পনা।

সেই তরঙ্গ নিবারিতে,
হবি পদে মন রাখিতে,
যোগীজনে, অনশনে
করে প্রাণের সাধনা ॥

যোগে যাগে নাই শকতি,
ভজন পূজনে সঙ্গতি,
হায় রে! দুর্ম্মতির গতি,
কি হবে তা কেউ বল না?

শ্রীমতিলাল রায়।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৩শ ভাগ। চৈত্র ১৩১৬। ১২শ সংখ্যা।

একটী পদ।

জীবন-যমুনা-জলে
অগাধ হৃদয়-তলে
কাম-কালীয় করে কেলী।
দারুণ বাসনা-বিষ
ঢালে তায় অহর্নিশ
মন পাখি পিয়ে পড়ে ঢলি॥
ব্যাকুল পরাণ মম
কোথা কৃষ্ণ অনুপম
হে বাল-গোপাল-বেশধারি।

এসহে কালিন্দী-কূলে
পিরীতি কদম্ব মূলে
গোবিন্দ গোকুল-হিতকারি ॥

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

গীতা-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঐ অধ্যায়ে ১১শ শ্লোকে—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে মুক্তির উপায় বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন। নিজেকে জ্ঞানের উৎপত্তিস্থান বলিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দৈবী প্রকৃতির তিনটি আকার আছে। প্রথম জীবন বা বিশ্বের মহাচৈতন্য, দ্বিতীয় শক্তি, বৌদ্ধেরা যাহাকে কোহাট্ বলেন। তৃতীয়তঃ জ্ঞান, হিন্দু দার্শনিকদিগের চিচ্ছক্তি, আমাদের গায়ত্রীতে এই তিন ভাবই যুক্ত হইয়াছে। বশিষ্ঠ ইঁহাকে চিচ্ছক্তি বলিয়াছেন। অপর স্থলে ইঁহাকে জপের পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্কল্পরূপিণী বিশ্বের জীবন বলা হইয়াছে।

দশম অধ্যায়ের বিভূতিসকলের বর্ণনার বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক।

"অহমাত্মা"—কারণ অপর সমস্ত আমিই এই আমির বিকাশ, এই অর্থে ঈশ্বর সমস্ত উপাধিব্যাপী অহম্ বা আমি। এরূপ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ ঈশ্বরত্ব হইতে বলিতেছেন, কোন বিশেষ ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করেন নাই। এই ঘটনাপূর্ণ জগতে আমরা যাহা কিছু উত্তম, মহৎ, গম্ভীর ও সুন্দর দেখিতে পাই, এমন কি, অন্যান্য লোকেও যাহা কিছু উত্তম, সমস্তই ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ। যাহা কিছু আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বিঘ্নজনক সমস্তই প্রকৃতি হইতে

আসে। বিশ্বে দুইটি বিভিন্ন শক্তি কার্য্য করিতেছে। একটি এই প্রকৃতি (যাহার উৎপত্তি পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে), অপরটি দৈবী প্রকৃতি উপাধি হইতে উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নামিয়া আসিয়াছে। যে সকল ধর্ম্মে পাপ ও পুণ্যের সংগ্রাম বর্ণনা করিয়াছে, সে সমস্তই প্রকারান্তরে এই ভগবজ্জ্যোতি ও ভগবৎজ্ঞানের সহিত শেষোক্ত প্রকৃতির সংগ্রাম লক্ষ্য করিয়াছে। একটি মানবকে উন্নত করিয়া দেবসদৃশ করিতে চায়, অপরটি মানবকে অবনতির পথে টানিয়া লইয়া আসে। দেবাসুর-সংগ্রাম, সয়তানে ও স্বর্গীয় দূত সমূহের যুদ্ধ ইত্যাদি যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের কল্পিত উত্তম ও অধম নিয়মের পরস্পর বিরোধের ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন জগতে যাহা কিছু উত্তম আছে, সমস্তই আমারই তেজাংশ-সম্ভব. আমরা যখনই হৃদয়ে একবার ঈশ্বরের মহীয়সী ক্ষমতা ও জ্ঞান-জ্যোতির বিষয় ভাবি, তখনই বুঝিতে পাবি যে, কৃষ্ণের বিভূতি-বর্ণন প্রলাপ ও বৃথা আড়ম্বর নহে।

১১ অধ্যায়—ঈশ্বরে সমস্ত জগৎ বিম্বিত বহিয়াছে অর্থাৎ ঈশ্বরে বীজাবস্থায় জগৎ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জগৎ শব্দের প্রকাশ ও ঈশ্বর এই শব্দের পশ্যন্তি আকৃতি। ঈশ্বরে বিম্বিত ছায়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, মূল প্রকৃতির ভিতর দিয়া সৌরজগৎ-রূপ বিকাশ হয়। চিদাকাশে চিন্তিত না হইয়া কোন ক্ষমতাই জগতে আসিতে পারে না।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদিগের "তত্ত্বত্রয়ম্" ঈশ্বর, দৈবীপ্রকৃতি ও মূল প্রকৃতি। মূলপ্রকৃতি তাহাদেব অচিৎ, দৈবীপ্রকৃতি চিৎ ও ঈশ্বর। আর এক ভাবে জগৎকে দেখা যাইতে পারে। সমুদায় অসীম অসংখ্য সৌরজগৎ পরব্রহ্মের স্থূলশরীর। জ্যোতিঃস্বরূপা দৈবীপ্রকৃতি সূক্ষ্ম শরীর। ঈশ্বর কারণ-শরীর এবং পরব্রহ্ম স্বয়ং আত্মা। এই বিভাগের সহিত আমাদের এই দৃশ্যমান সৌরজগতের বিভাগের সহিত গোলমাল হওয়া উচিত নহে। পরব্রহ্মের সূক্ষ্ম শরীর ভুবর্জ্জ্যোতি নহে। ভুবর্জ্জ্যোতি বৈশ্বানরের সূক্ষ্মাকৃতি। ঈশ্বরের বিশ্বরূপ উপরোক্ত যুক্তি-সমূহের দ্বারা কিছু সুগম হইবে বলিয়াই আমার এই সব বলিবার উদ্দেশ্য।

ঈশ্বর যদি অচিৎরূপ অপেক্ষা অধিক কিছু না হন, তাহা হইলে অর্জ্জুন কি প্রকারে স্বসমীপে জগতের প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলেন।

অর্জ্জুন ঈশ্বরকে দেখেন নাই। ঈশ্বরের বিশ্বরূপ দৈবীপ্রকৃতির আলোকে বিভাসিত দেখিয়াছিলেন। মানবের পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার সম্মুখেও ঈশ্বর অপর কোনরূপে প্রকাশিত হন না।

এই বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুনের ভয় পাইবারই কথা, কারণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যাহা কিছু বীভৎস ব্যাপার ঘটিবে, তাহা সমস্তই এই বিশ্বরূপে চিত্রিত ছিল। ঈশ্বর জগতের চিন্তারূপ বলিয়াই, জগতে পরে যাহা কিছু ঘটিবে, সমস্তই তাঁহাতে উপস্থিত রূপে প্রতিফলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই বিশ্বরূপ দেখান, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ সকলেই জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যু ও সমগ্র সৈন্যের নাশ এই বিশ্বরূপে সূচিত হইয়াছিল। বাস্তবিক ঈশ্বরের কোন রূপ নাই। ইহাঁর রূপ দৈবী-প্রকৃতিতে স্পষ্ট হইয়া, উপস্থিত কিম্বা ভবিষ্যৎ ঘটনার সমাবেশ লইয়া প্রকাশ হয়, নচেৎ ঈশ্বরের বাস্তবিক কোন রূপ নাই।

শ্রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রভুর বেদান্ত-ব্যাখ্যান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই প্রকার উক্তি হইতে ব্রহ্মের অপাদানত্ব, করণত্ব ও অধিকরণত্ব রূপ তিনটি অর্থাৎ উপাদানত্ব, নিমিত্তত্ব ও ব্যাপকত্ব রূপ তিনটি সবিশেষ চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকার শ্রুতিতে, ইন্দ্র অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্ম জঙ্গম ও স্থাবরের রাজা অর্থাৎ নিয়ন্তা, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এইরূপ উক্তি হইতে ব্রহ্মের নিয়ন্তৃস্বরূপ ঐশ্বর্য্য দ্বারা মহত্ব অর্থাৎ বিশেষত্বই পরিব্যক্ত হইতেছে। তৃতীয় প্রকার শ্রুতিতে, ব্রহ্ম স্থূল নহেন, ব্রহ্ম সূক্ষ্ম নহেন, ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত স্থৌল্যাদি গুণের নিরাস দ্বারা তাঁহার উদ্দেশমাত্রই করা হইয়াছে, বিশেষের নিষেধ করা হয় নাই। চতুর্থ প্রকার শ্রুতিতে, এই সমস্তই

ব্রহ্ম, ইত্যাদি উক্তিদ্বারা বিশ্বের সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্য নির্দ্দেশ-সহকারে তাঁহার উদ্দেশমাত্রই করা হইয়াছে, বিশেষের নিষেধ করা হয় নাই। পঞ্চম প্রকার শ্রুতিতে, ব্রহ্ম আনন্দমাত্র, এই প্রকার বলিয়া কেবল বিশেষ্যের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বিশেষের নিষেধ করা হয় নাই। আর ষষ্ঠ প্রকার শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মের শক্তির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মের ত্রিপাদৈশ্বর্য্য এবং পাদৈশ্বর্য্য উভয়ই শক্তির বিলাস। শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মের ত্রিপাদৈশ্বর্য্যের সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের অনুপপত্তি হয়। অতএব ব্রহ্মের শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য।

বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তত্তৎকার্য্যের উৎপত্তির নিমিত্ত তত্তৎকারণের তত্তৎকারণস্বরূপ ধর্ম্ম-বিশেষ স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। সকল উপাদানকারণে এবং সকল নিমিত্তকারণেই উক্ত প্রকার ধর্ম্ম স্বীকার্য্য। ঐ ধর্ম্মই শক্তি, উহা কারণ হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু কারণেরই স্বরূপ। বিবর্ত্তবাদেও রজতাদিস্ফূর্ত্তি বিষয়ে শুক্ত্যাদিকেই অধিষ্ঠান বলিয়া অঙ্গীকার করা হয় না। অঙ্গারাদিকে রজতাদি-স্ফূর্ত্তির অধিষ্ঠান বলিয়া অঙ্গীকার করা হয় না। শুক্ত্যাদি ভিন্ন অঙ্গারাদিতে রজতাদির স্ফূর্ত্তি হয় না। প্রস্তুত বিষয়ে ব্রহ্মকেই জগতের অধিষ্ঠান বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, অন্য কাহাকেও উহার অধিষ্ঠান বলিয়া অঙ্গীকার করা হয় না। অতএব জগৎকার্য্যের সিদ্ধির নিমিত্ত তদধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মের কারণস্বরূপ ধর্ম্ম বা শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। শক্তিস্বীকারে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বেরও হানি হইতেছে না; কারণ, স্বয়ংসিদ্ধ তাদৃশাতাদৃশ তত্ত্বান্তরের অভাবহেতু এবং স্বশক্ত্যেকসহায়ত্ব হেতু ও পরমাশ্রয় ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে ঐ সকল শক্তির অসিদ্ধত্ব হেতু ব্রহ্মের সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ত্রিবিধ ভেদেরই অভাব হইতেছে। ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্মসদৃশ স্বয়ংসিদ্ধ বস্বন্তর হইলে, উহার সহিত ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ ঘটিত। উহা ব্রহ্ম হইতে বিসদৃশ স্বয়ংসিদ্ধ বস্বন্তর হইলে, ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ ঘটিত। আর ঐ শক্তি ব্রহ্মের ধর্ম্ম না হইয়া ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বয়ংসিদ্ধ বস্বন্তর হইলে বা ব্রহ্মের অনধীন স্বয়ংসিদ্ধ বস্বন্তর হইলে, ব্রহ্মের স্বগত ভেদের আপত্তি হইতে পারিত। জীবশক্তি ব্রহ্মসদৃশ স্বয়ংসিদ্ধ বস্বন্তর না হওয়ায়, উহার স্বীকারে, ব্রহ্মের সহিত জীবের সজাতীয় ভেদ ঘটিতেছে না।

মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে বিসদৃশ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তন্তর না হওয়ায়, উহার স্বীকারে, ব্রহ্মের সহিত মায়ার বিজাতীয় ভেদ ঘটিতেছে না। আর স্বরূপশক্তি ব্রহ্মানতিরিক্ত ও ব্রহ্মাধীন ব্রহ্মধর্ম্ম হওয়ায়, উহার স্বীকারে, ব্রহ্মের স্বগত ভেদের আপত্তি ঘটিতেছে না। স্বরূপের অন্তর্গত না হইয়াও, সামানাধিকরণ্য দ্বারা স্বরূপের লক্ষয়িত্রী জীবশক্তি ব্রহ্মের তটস্থ প্রকাশ, অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী বিচিত্র জগজ্জননী মায়াশক্তি ব্রহ্মের অপ্রকাশ; আর অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ। জীবশক্তি ব্রহ্মরূপ রবির বহিশ্চর কিরণ-পরমাণুস্থানীয়া; মায়াশক্তি তমঃস্থানীয়া, স্বরূপশক্তি মণ্ডলস্থানীয়া। তন্মধ্যে মায়াশক্তি ও জীবশক্তি বিশ্বের উপাদান-কারণ এবং স্বরূপ শক্তি নিমিত্ত কারণ। অতএব উক্ত শক্তিত্রয়ের অনঙ্গীকারে জীব-জড়াত্মক জগতের সৃষ্টি অনুপপন্ন হয়। এই নিমিত্তই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও শারীরক ভাষ্যে বলিয়াছেন;——

"শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মনার্থা কল্প্যমানা নান্যা নাপ্যসতী কার্য্যং নিয়চ্ছেৎ অসত্ত্বাবিশেষাদন্যত্বাবিশেষাচ্চ। তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যমিতি" (২।১।১৮)—শক্তি কারণের অতিশয় বা ধর্ম্ম। উহা কারণে থাকিয়া কার্য্যকে নিয়মিত করে। উহা কার্য্যের নিয়মনার্থ কারণে কল্পিত হয়। উহা কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন নহে এবং অসৎও নহে। উহা যদি কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন এবং অসৎ হইত, তবে কার্য্যকে নিয়মিত করিত না, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উৎপত্তি হইবে এরূপ একটি নিয়ম হইত না। কার্য্য সকল কারণের অপরিবর্ত্তনীয় ও অবশ্যম্ভাবী শক্তির বিকাশ।

বিশেষতঃ যাহাতে জ্ঞান, তাহাতেই অজ্ঞান, ইহাই নিয়ম। উক্ত নিয়ম দর্শনে জ্ঞানের সত্তাতেই অজ্ঞানের সত্তা—জীব-জড়াত্মক জগতের সত্তা পর্য্যবসিত হয়। ঐ সত্তার স্ফোরকতারূপ লিঙ্গ দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তির অনুমান করা যায়। অতএব "অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃহংতি বৃংহয়তি" এই শ্রুতি এবং "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ" এই স্মৃতি, বৃদ্ধি ও বর্দ্ধন দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তিমত্ত্ব দেখাইতেছেন। এই নিমিত্তই শারীরকভাষ্যকারও বলিয়াছেন,——

"নন্বু তব দেহাদিসংযুক্তস্যাপ্যাত্মনো বিজ্ঞানস্বরূপমাত্রা ব্যতিরেকেণ প্রবৃ-

ত্ত্যনুপপত্তেরনুপপন্নং প্রবর্ত্তকত্বমিতি চেৎ, ন, অয়স্কান্তাদিবদ্‌ রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তি-রহিতস্যাপি প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ” (২।২।২)—যদি বলেন,—আত্মা দেহাদিতে সংযুক্ত, সত্য ; কিন্তু তাঁহার নিজের প্রবৃত্তি নাই, কেবল বিজ্ঞানের প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না ; অতএব তাঁহার প্রবর্ত্তকতাও নাই ;—তাহার উত্তর এই যে, অয়স্কান্ত মণি ও রূপ প্রভৃতি প্রবৃত্তি রহিত বস্তুর প্রবর্ত্তকতার দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবৃত্তিরহিত আত্মার ও ব্রহ্মেরও প্রবর্ত্তকতারূপ স্বরূপসামর্থ্য উপপন্ন হয়। তথাপি যদি বলেন, যে জগদ্রূপ কার্য্য দ্বারা যে অজ্ঞান অঙ্গীকার করা হয়, সেই জগৎ ও সেই অজ্ঞান এতদুভয়েরই অসত্ত্ব অর্থাৎ মিথ্যাত্ব হেতু তদুভয়ের প্রবর্ত্তকতা দ্বারা লক্ষিতা শক্তিও অসৎ অর্থাৎ মিথ্যাই হইতেছে,—তাহা হইলে, তাদৃশ অসৎ জগতের সৃষ্ট্যাদি দ্বারা লক্ষিত ব্রহ্মেরও অসত্ত্ব প্রসঙ্গ হইতেছে। আর যদি ব্রহ্মের অসত্তার পরিবর্ত্তে সত্তাই স্বীকার করা হয়, তবে সেই ব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্য জগৎ হইতে অতিরিক্ত তৎপ্রবর্ত্তকতারূপা স্বরূপশক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। অজ্ঞানের নাশে ঐ স্বরূপশক্তির নাশ হয় না। প্রকাশ্যের নাশে প্রকাশেরও নাশ হয়, কেবল প্রকাশকই থাকেন, এরূপও বলা যায় না, কারণ, প্রকাশ-রহিত প্রকাশক থাকেন বলিলে, অর্দ্ধ কুকুটীর ন্যায় উপহাস্যাস্পদ হইতে হয়। স্বয়ং শারীরক ভাষ্যকারই বলিতেছেন,——

“অসত্যপি কর্ম্মণি সবিতা প্রকাশতে ইতি কর্তৃত্বব্যপদেশদর্শনাৎ। এবমসত্যপি জ্ঞানকর্ম্মণি ব্রহ্মণস্তদৈক্ষতেতি কর্তৃত্বব্যপদেশোপপত্তে র্ন দৃষ্টান্ত বৈষম্যম্” (১।১।৫) যখন কর্ম্ম বা প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ অবিবক্ষিত থাকে, তখন যেমন সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন, এইরূপ অকর্ম্মক কর্তৃত্বের উল্লেখ হয়, তদ্রূপ, সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞানকর্ম্ম বা জ্ঞেয়বস্তু না থাকিলেও, তৎ ঐক্ষত তিনি ঈক্ষণ করিলেন এইরূপ অকর্ম্মক কর্তৃত্বের উপপত্তি হয় বলিয়া দৃষ্টান্তের বৈষম্য ঘটিতেছে না। এই নিমিত্তই সহস্রনাম ভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে, “স্বরূপসামর্থ্যেন ন চ্যুতো ন চ্যবতে ন চ্যবিষ্যত ইত্যচ্যুতঃ শাশ্বতং শিবমচ্যুতমিতিশ্রুতেঃ”।

অতএব, যেরূপ বস্তুর ক্রিয়া সামর্থ্যরূপা শক্তি কার্য্যের পূর্ব্বে এবং পরে ও মন্ত্রাদির শক্তির ন্যায় বস্তুতে থাকেই, কার্য্যকাল পাইয়া ব্যক্ত হয়, তদ্রূপ, ব্রহ্মেরও তাদৃশী শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। এই নিমিত্তই শারীরক ভাষ্যকারও বলিতেছেন, “বিষয়াভাবাদিয়মচেতয়মানতা ন চৈতন্যাভাবাৎ” (২।৩।২৮)

"যদ্ বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই বুঝা যায় যে, জ্ঞাতা যখন দেখেন না, তখন দ্রষ্টব্যের অভাবই দেখেন না, দ্রষ্টব্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধের অভাবই দেখেন না, সামর্থ্যের অভাবে দেখেন না এমন নয়। জ্ঞাতার জ্ঞানশক্তি অবিনাশিনী, বিশেষতঃ শক্তির উৎপত্তি ও নাশ হয় বলিলে, কার্য্যত্ব নিবন্ধন কারণস্বরূপা শক্তির হানি হইয়া উঠে।

আরও দেখুন, আশ্রয়তত্ত্ব সত্তামাত্র না হইয়া জ্ঞানবিশিষ্ট হওয়াই সঙ্গত; কারণ, যিনি অজ্ঞানের আশ্রয়, তিনি উক্ত অজ্ঞানের বিরোধি জ্ঞানেরও আশ্রয় ইহা নিয়মিতই আছে। নিয়ম অপরিহার্য্য। আবার যিনি জ্ঞানাশ্রয়, তিনি অবশ্য জ্ঞানশক্তি-সমন্বিত। অথবা যখন চিন্মাত্র-ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত সমস্ত বিষয়ের নিষেধ করা হয়, অর্থাৎ যখন তাদৃশ ব্রহ্মাতিরিক্ত বিষয় নাই বলা হয়, তখন তাদৃশ নিষেধ-বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞাতা কে হইবেন?

অধ্যাসকেই জ্ঞাতা বলিব? অধ্যাস কখনই জ্ঞাতা বা জ্ঞানের কর্ত্তা হইতে পারে না কারণ, ঐ অধ্যাস ও নিষেধের বিষয় হওয়ায় উহা তন্নিবর্ত্তক জ্ঞানের কর্ম্মই হইতেছে। অতএব ব্রহ্মই জ্ঞাতা হইতেছেন। ব্রহ্ম যদি জ্ঞাতা হয়েন, তবে আমাদিগের পক্ষই পরিগৃহীত হইল। প্রকাশস্বরূপ বস্তুর স্বপ্রকাশ-শক্তির ন্যায় জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞাতৃস্বরূপা জ্ঞানশক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য হইয়া পড়িল। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ; ব্রহ্মের চিদানন্দসত্তা ও চিদানন্দস্ফূর্ত্তিই তাঁহার স্বরূপশক্তি। উহার অস্বীকারে মুক্তিতে জীবের স্বরূপাবস্থানরূপ পুরুষার্থত্ব শূন্য হইয়া উঠে! কেবল জড়দুঃখ-প্রতিযোগিনী সত্তা বা শূন্যত্ব একই কথা নয় কি? শক্তি পক্ষে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা ও স্বরূপ-সামর্থ্য একই। ঐ স্বরূপ-শক্তি অহিকুণ্ডলের ন্যায় ভেদ ও অভেদ উভয় লক্ষণ-সমন্বিত। অহি-কুণ্ডলাধিকরণে স্বয়ং বাদরায়ণ ঐরূপই বলিয়াছেন। সবিতা ও তৎপ্রকাশ যেমন বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও, সবিতা তৎপ্রকাশের আশ্রয়রূপে উহা হইতে ভিন্ন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তিও তদ্রূপ অভিন্ন হইয়াও আশ্রয়াশ্রিতভাবে পরস্পর ভিন্ন। এই অচিন্ত্য ভেদ থাকাতেই প্রকাশৈকরূপ ব্রহ্মকে স্বপরপ্রকাশন-শক্তিসমন্বিত বলা হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দস্বরূপ হইয়াও স্বপরজ্ঞানানন্দের হেতু হয়েন। বস্তুতঃ একই তত্ত্বের স্বরূপত্ব এবং ঐ স্বরূপত্বের অপরিত্যাগেই স্বরূপ শক্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

ব্রহ্মের কার্য্যোন্মুখ স্বরূপই ব্রহ্মের শক্তি। অন্তরঙ্গ কার্য্যোন্মুখ স্বরূপের নাম অন্তরঙ্গা শক্তি; বহিরঙ্গ কার্য্যোন্মুখ স্বরূপের নাম বহিরঙ্গা শক্তি; আর মিশ্র কার্য্যোন্মুখ স্বরূপের নাম তটস্থা শক্তি। উক্ত ত্রিবিধ শক্তিমদ্ ব্রহ্ম বিশেষ্য এবং তাঁহার কার্য্যোন্মুখস্বরূপ শক্তিত্রয় তাঁহার বিশেষণ।

উহা ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে ভিন্ন বা অভিন্নরূপে চিন্তার অযোগ্য বলিয়া, ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম শক্তির অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকৃত হয়। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ধর্ম্মভেদই উক্ত হইয়াছে। অসত্য জড় ও অপরিচ্ছেদের ব্যাবর্ত্তন ও ধর্ম্ম বিশেষই। যদি বলেন, অসত্যের ব্যাবর্ত্তনরূপ সত্য, জড়ের ব্যাবর্ত্তনরূপ জ্ঞান এবং পরিচ্ছেদের ব্যাবর্ত্তনরূপ অনন্ত ব্রহ্ম-স্বরূপ, ধর্ম্মান্তর নহে, তাহা হইলে, তত্তদ্‌ব্যাবৃত্তির যোগ্যতাও ব্রহ্মে আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে। ঐ যোগ্যতাই কি শক্তি নহে? ঘুরিয়া ফিরিয়া শক্তিই উপস্থিত হইতেছেন।

(ক্রমশঃ)

সাধনা।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

গীতা ৫ম অধ্যায় ১৮ শ্লোক।

অর্থাৎ বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গরুতে, হস্তীতে ও কুকুরে পণ্ডিতগণ সমদর্শী হইয়া থাকেন। "যিনি সকল প্রাণীকে আপনার মত ভাবেন, তিনিই পণ্ডিত পদবাচ্য। -এই প্রকার সমদর্শী হইতে হইলে সাধনা আবশ্যক। কেবল আপনি পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিলে চলিবে না, সম্পূর্ণরূপে অভিমান বর্জ্জিত হইতে হইবে। উক্ত ভগবদ্বাক্য কেবল পুস্তকে পড়িলে চলিবে না, উহা আদায় করা চাই অর্থাৎ কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক। উহা আদায় না করিলে সাধনা হয় না, এবং পণ্ডিত হওয়া যায় না। কেবল শাস্ত্রে উপদেশ পড়িলে চলিবে না, সেই অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা না করিলে প্রকৃত

সাধনা হইবে না। এক বিষয় লাভের জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করার নাম সাধনা। অর্থোপার্জ্জনই বল, উচ্চপদলাভই বল, যশই বল, পাপ-পুণ্যই বল, সত্য মিথ্যাই বল, আর যাহাই বল না কেন, সকলই সাধনার দ্বারা লাভ হইতে পারে। যাঁহার যে প্রকার সাধনা, তাঁহার লাভও সেই প্রকার হইয়া থাকে, অসাধ্য কার্য্য সাধনা দ্বারা সুসাধ্য হইয়া উঠে। আর এক দিকে, সাধনার দ্বারাও মায়ার পোষাক খুলিয়া দিয়া, দেবত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারা যায়। সাধনার দ্বারা না হইতে পারে এমন কিছুই নাই। কার্য্য হইতেই সাধনার উৎপত্তি, কার্য্য না করিলে সাধনা হইতে পারে না। প্রকৃত সাধনা করিতে হইলে, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা চাই। যিনি ধৈর্য্য-সহকারে ষড়্‌রিপুর বেগ সহ্য করিয়া কার্য্য অর্থাৎ সাধনা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর-সাধক। প্রকৃতি অনুসারে সাধনাও ভিন্ন প্রকার। সাধনারও তারতম্য আছে। যাহার যে প্রকার কার্য্য তাহার ফলও সেই প্রকার। কার্য্য ভাগ্যের প্রকাশক। কার্য্য না করিলে ভাগ্যও নষ্ট হইয়া যায়। কার্য্যকেই সাধনা বলা যাইতে পারে। সাধনার দ্বারা ভাগ্যকেও অতিক্রম করিতে পারা যায়। সাধনা হইতেই ভাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভাগ্যের হাত, পা নাই যে, মুখে গ্রাস তুলিয়া দিবে! সুতরাং ভাগ্য লাভ করিতে হইলে সাধনা চাই। সাধনার অর্থাৎ কার্য্যের চরমসীমা ঈশ্বর লাভ পর্য্যন্ত, আনন্দময়ীকে লাভ করিতে পারিলে, মনুষ্যের আর সাধনা অর্থাৎ কার্য্য থাকে না। যাঁহার জন্ত সাধনা, তাঁহাকে পাইলে আর কার্য্য কি? ফর্দ্দ অনুসারে দ্রব্য কিনিলে আর ফর্দ্দের প্রয়োজন কি? হারান সামগ্রী খোঁজ করিয়া পাইলে, আর খুঁজিতে হয় না, সেই প্রকার আনন্দময়ীকে লাভ করিতে পারিলে, আর কার্য্যের অর্থাৎ সাধনার প্রয়োজন কি? মায়ের কোল পাইলে শিশুর আর কি কার্য্য থাকিতে পারে? তখন শিশু সকল খেলা ভুলিয়া যায়। জগজ্জননীর কোল পাইলে আর বারম্বার সংসারে যাতায়াত করিতে হয় না, সংসার-খেলা সাঙ্গ হয়। এই জগৎ-সংসার সাধনার দ্বারা চলিতেছে, মনুষ্যও সাধনার বলে চলিতেছে। আধ্যাত্মিক উন্নতিই বল, আর সামাজিক উন্নতিই বল, সকলের মূলে সেই এক সাধনা, প্রাচীন আর্য্যগণ কেবল সেই সাধনার বলে দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং সকল বিষয়ে উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, ধৈর্য্য যেমন আবশ্যক, সেইপ্রকার আবার সময়ে

সময়ে আত্মোৎসর্গ চাই। বিপদে পতিত হই তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি নাই, তবু সত্য পালন করিতে হইবে। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পতন" এই প্রকার জীদ আবশ্যক, নতুবা সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় না।

অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তি; এই শক্তিদ্বয়ের দ্বারা এই জগৎ-সংসার চলি-তেছে। কেবল অনুকূল শক্তি জগতে থাকিলে জগৎ থাকিত না। জগৎ কেবল এক প্রকার ভাবে থাকিলে কার্য্য হয় না, সেই জন্য জগতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সু, কু, পাপ, পুণ্য, সত্য, মিথ্যা, ন্যায়, অন্যায়, ইত্যাদি রহিয়াছে। জগতে এই অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনবরত বিবাদ হইতেছে। পূর্ব্বকালে দেবাসুর-সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই প্রকার আমাদের দেহের মধ্যেও সর্ব্বদা সংগ্রাম চলিতেছে অর্থাৎ অনুকূল ও প্রতিকূলের সংগ্রাম চলিতেছে। আমাদের ভিতরও নিরন্তর সত্ব, রজঃ ও তমগুণের লড়াই হইতেছে। সুবিধা পাইলেই একটী অপরটীর উপর আপন প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে। আমাদের বিবেকের সহিত প্রলোভনেরও অনবরত এই প্রকার কলহ হইতেছে। আমাদের বিবেক বলিতেছে "একার্য্য করিও না, এ কার্য্য করিলে অতিশয় অনিষ্ট আছে, লোকে অখ্যাতি করিবে।" তৎপরে প্রলোভন বলিতেছে "এ কার্য্য কর, কেহ জানিতে পারিবে না, ইহাতে কোন অনিষ্টও নাই।" এই সংগ্রামে যাহার শক্তি অধিক সেই জয়লাভ করি-তেছে। যিনি বিবেকের বাক্য অনুসারে সহিষ্ণুতার সহিত সাধনা দ্বারা প্রলো-ভনকে বাধা প্রদান করিতে পারেন, তিনিই এই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই প্রকার পূর্ব্ব জন্মের সাধনার শক্তির সহিত বর্ত্তমান জন্মের সাধনার বিপরীত শক্তির ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া থাকে, যাহার শক্তি অধিক, সেই অপরটীর উপর আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া থাকে। এই জগৎ-সংসারে যাবৎ থাকিতে হইবে তাবৎ সাধনা থাকিবে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সত্য, মিথ্যা, জ্ঞান, অজ্ঞান ইত্যাদি দ্বৈতভাব যাইলে সাধনারও শেষ হইবে। যিনি নিজ সাধনার দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি তাঁহার সাধনার বলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত মন্দ কার্য্যের ফলও নষ্ট করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

ভগবান্ গীতায় কহিতেছেন;—

"অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥"

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন ॥
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥"

গীতা ৪র্থ অধ্যায় ৩৬, ৩৭ শ্লোক।

অর্থাৎ যদি সমুদায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপকারী হও, তথাপি সমুদায় পাপরূপ সমুদ্র জ্ঞানপোত দ্বারাই সম্যক্‌রূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। হে অর্জ্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠ-সকলকে ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদায় কর্ম্মকেও ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।

পাপী যদি সাধনাবলে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে তাহার দুষ্কৃত-জাত মন্দ ফলও কার্য্যকরী হইতে পারে না। সকল সাধনা অপেক্ষা যে সাধনা দ্বারা দৈবশক্তি লাভ করা যায়, তাহাই অধিক বলবান্। জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এই প্রকার সাধনা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, এবং তাঁহারাই ঐরূপ শক্তি লাভ করিতে পারেন। এই মহাশক্তি আশ্রয় করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরুবংশ ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ঐ প্রকার সাধন করিতে হইলে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা আবশ্যক। সর্ব্ব প্রকার বাহ্যিক অত্যাচার ধীর ভাবে সহ্য করিতে হইবে। মহারাজ যুধিষ্ঠির কত লাঞ্ছনা, কত প্রকার অত্যাচার, কত অপমান সহ্য করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্ব প্রকার অত্যাচার অগ্রাহ্য করিয়া কেবল ব্যাকুল অন্তঃকরণে সেই বিপদ্‌ভঞ্জন শ্রীমধুসূদনকে ডাকিয়াছিলেন, তাই তিনি দৈবশক্তি লাভ করিয়া সমুদায় বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন, এবং এই প্রকারেই তিনি ভগবানের ভালবাসা পাইয়াছিলেন।

কাহারও ভালবাসা পাইতে হইলে ভক্তি চাই। ঐ ভক্তি লাভ করিতে হইলে সাধনা আবশ্যক। সাধনা ব্যতিরেকে ভক্ত হওয়া যায় না। আর ভক্ত না হইলে অন্যের ভালবাসা লাভও হয় না। শ্যামকে ভালবাসিতে হইলে, শ্যামকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হইবে, তবেত শ্যাম ভালবাসিবেন? কার্য্য করিয়া শ্যামের প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইতে হইবে, শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইতে না পারিলে, শ্যাম ভালবাসিবেন না। ভালবাসিবার পাত্র হওয়া চাই, তবেত ভালবাসা পাইব? "আমায় ভালবাস, আমায় ভালবাস" বলিলে কেহ কি ভালবাসিয়া থাকে? মায়ের পাঁচ ছেলে, যে ছেলেটী অতিশয় সুবোধ, মাতৃভক্ত, তাহাকেই মা অধিক ভালবাসিয়া থাকেন। শান্ত ছেলেকে মা কখনও প্রহার কিম্বা তিরস্কার করেন

না, কিন্তু দুষ্ট ছেলেকে সর্ব্বদা তাড়না করিয়া থাকেন। শান্ত ছেলেকে প্রহার করিবার আবশ্যক হয় না, কারণ সে সকল বিষয়ে সু। দুষ্ট ছেলে মায়ের কথা শুনে না, তাই মা তাহাকে তিরস্কার করিয়া থাকেন। এই প্রকার ভাল-বাসার পাত্র না হইতে পারিলে কি, কেহ ভালবাসিয়া থাকে? বিনা সাধনায় ভালবাসার পাত্র হইতে পারা যায় না : সাধনার দ্বারা শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিলে, তবে ভালবাসা পাইতে পারা যায়। আধ্যাত্মিক জগতেও এই প্রকার নিয়ম। কোন কোন ভক্ত সাধনার দ্বারা "ভক্তি" লাভ করিয়া ভগবানের ভালবাসা পাইতে পারেন, নিম্নলিখিত ভগবদ্বাক্যেতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভগবান্ কহিতেছেন :—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥"

গীতা সপ্তম অধ্যায় ১৬ শ্লোক।

অর্থাৎ হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী এবং আত্মজ্ঞানী এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন।

আর্ত্ত অর্থাৎ ভবব্যাধিগ্রস্ত। ভবব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে ভক্ত সাধনা করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত আর্ত্ত ভক্ত। বিষয়কে বিষ বোধ করিয়া যে ভক্ত কাতর স্বরে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভগবানকে ডাকিয়া থাকেন, তিনিই আর্ত্ত ভক্ত। যিনি বিবেকের সাহায্যে প্রলোভন হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল অন্তঃকরণে সেই জগজ্জননীকে ডাকিতে পারেন, তিনিই আর্ত্ত ভক্ত। সাধনার বিঘ্ন অনেক। প্রলোভন-রূপ শত্রু সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছে যে, কোন উপায়ে সে আমাদিগকে সাধনা হইতে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ে নিক্ষেপ করিবে ; এই জন্য সাধনার সময়ে সেই দুরাত্মা আমাদের মনে কতই কুচিন্তার উদয় করিয়া দিয়া থাকে। এই প্রকার শত্রুর অত্যাচারে পীড়িত হইয়া, যিনি কাতর-হৃদয়ে সেই করাল-বদনা কালীর শরণাগত হয়েন, তিনিই আর্ত্ত ভক্ত। এই প্রকার ভক্ত হইতে হইলে, ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বিবেকের সাহায্যে সাধনা আবশ্যক, তাহা না হইলে প্রবল: শত্রুকে জয় করা সহজ নহে। এই প্রকার ভক্ত হইলে ভগবানের ভালবাসা পাওয়া যায়।

জিজ্ঞাসু অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব জানিবার জন্ত ব্যাকুল যে ভক্ত, তিনিই জিজ্ঞাসু। যে বিষয় জিজ্ঞাসার নিমিত্ত ব্যাকুলতা আসিলে, আমাদের জীবন ধন্য হইয়া যায়, সে প্রকার জিজ্ঞাসা আমাদের প্রাণের ভিতর আসে কৈ? আমি কতদিনে ধনী হইব? কবে বিষয়-সম্পত্তি পাইব? কি করিলে প্রচুর অর্থ পাইব? এই প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমাদের যে প্রকার আগ্রহ, সেই প্রকার আনন্দ-ময়ীর তত্ত্ব নিরূপণের জন্য যে ভক্ত-হৃদয় ব্যাকুল হয়, তিনিই জিজ্ঞাসু ভক্ত। প্রলোভনের সকল বাধা সহ্য করিয়া যিনি বিবেকের সাহায্যে সাধনা করিতে সমর্থ তিনিই ঐ প্রকার ভক্তের অধিকারী, এবং তিনিই ভগবানের ভালবাসা পাইতে পারেন।

অর্থার্থী শব্দে আমরা "ধনং দেহি, পুত্রং দেহি" মনে করিয়া থাকি, প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহা আমরা ভাবি না। যে অর্থ পাইলে সংসারের কোন অর্থেই প্রয়োজন হয় না, সেই অর্থই প্রকৃত অর্থ। কোন মুসলমান রাজা সাধুর সঙ্গীতে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে আপন হীরক-অঙ্গুরী উপহার দিতে চাহিলেন। সাধু রাজার অহঙ্কার চূর্ণ কবিবার জন্ত কহিলেন "ঐ দেখুন মহারাজ, ইহা অপেক্ষা কত বড় বড় হীরক রহিয়াছে, আপনার প্রয়োজন হইলে, লইতে পারেন।" রাজা বুঝিলেন যে, সাধু সাধনার দ্বারা যে অর্থ লাভ করিয়াছেন, এ অর্থ পাইলে আর কোন অর্থের অভাব হয় না। কিন্তু তাহা আমরা কয়জনে বুঝিয়া থাকি? আমরা কেবল অনর্থকে অর্থ মনে করিয়া, উহা পাইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া থাকি। যে অর্থ পাইলে আমাদের কোন অভাব থাকে না, সেই অর্থই প্রকৃত অর্থ, সেই অর্থ পাইতে হইলে সাধন চাই। একটু অগ্রসর হইলেই এ অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা এতই হতভাগ্য যে, অনর্থ রূপ অর্থ পাইবার জন্ত কেবল ছুটিয়া আসিতেছি, একটুকুও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। প্রভু রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছিলেন যে, "সাধন করিতে কেবল এগিয়ে যাও, রত্ন দেখিতে পাইবে।" তাই বলিতেছি কেবল অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। পশ্চাৎ ফিরিয়া সাধনা করিলে আমরা কেবল বিষয় পাইব। সাধন-পথে অগ্রসর হইলে আমরা যে অর্থ পাইব, তাহাতে শান্তি মিলিবে; আর অগ্রসর না হইয়া সাধন করিলে কেবল অনর্থই পাইব, তাহাতে প্রকৃত শান্তি মিলিবে না। সাধনদ্বারা অর্থ ও অনর্থ দুইই লাভ হইয়া থাকে।

জ্ঞানী অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। যিনি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছেন। যিনি সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখিয়া থাকেন। অন্যের কষ্টে আপনার কষ্ট মনে করেন, অর্থাৎ যিনি সমদর্শী হইতে পারিয়াছেন, তিনিই জ্ঞানিভক্ত। সাধনার দ্বারাই এই প্রকার জ্ঞানিভক্ত হওয়া যায়। সাধন-পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা না হইলে হইবে না। একেবারে জনক রাজা হওয়া যায় না, ধীরে ধীরে সাধন-পথে অগ্রসর হইলে, আমরাও জ্ঞানিভক্ত হইতে সক্ষম হইতে পারিব, এবং তাহা হইলেই ভগবানের ভালবাসা লাভ হইবে।

ভক্তি আবার অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে হৈতুকী আর অহৈতুকী ভক্তির কথা বলা যাইতেছে। "ধনং দেহি, পুত্রং দেহি" ইহা হৈতুকী ভক্তির অন্তর্গত। এই ভক্তিতে কামনা আছে। ধ্রুব রাজসিংহাসন পাইবার জন্য সাধনা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত হৈতুকী ভক্তি। এই সাধনা-বলে ধ্রুব রাজ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি আবার নিজ সাধনাবলে পরে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। হৈতুকী ভক্তি হইতেই অহৈতুকী ভক্তি লাভ করা যাইতে পারে। কাম্য কর্ম্ম করিতে করিতে সাধক নিষ্কাম অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। এই প্রকারে ভগবান্ ধ্রুবের সাধনায় প্রসন্ন হইয়া যখন তাঁহাকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন, তখন ধ্রুব বলিলেন ;—

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"

ভক্তিসুধোদয়।

অর্থাৎ "রাজ্যের অভিলাষী হইয়া আমি সাধনা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যখন আমি সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে গিয়া মাণিক পাইলাম, তখন হে প্রভু, আমার আর অন্য বরে আবশ্যক নাই।" এই প্রকার হৈতুকী আর অহৈতুকী ভক্তি, এই দুই প্রকার ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বর দর্শন হইয়া থাকে।

আবার অপরদিক দেখিতে গেলে সাধনশীল ব্যক্তিই ধন, মান, ও যশ লাভ করিয়া থাকেন। সাধনহীন ব্যক্তি মনুষ্য-পদবাচ্য নহে। যে জাতি

আপনাদিগের ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিরত, সেই জাতির পতন অবশ্য-ম্ভাবী। অধুনা জাপানেব অধিবাসীরা আপনাদিগের সাধন-বলে এসিয়ার মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। কেহ মনেও ভাবে নাই যে, ক্ষুদ্র জাপান আজি এপ্রকার উন্নত হইতে পারিবে। যে জাপানের কথা পূর্ব্বে বড় শুনিতে পাওয়া যাইত না, সেই জাপান আজি সাধনার বলে বলীয়ান্! যে ক্ষুদ্র জাপান আমরা মানচিত্রে দেখিতে পাইতাম মাত্র, সেই জাপান-সাম্রাজ্যের কথা আজ প্রত্যেক লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ জাতির বিষয় ভাবিতে গেলেও জানিতে পারাযায়, যে ইংলণ্ড এক সময়ে অসভ্য জাতিতে পূর্ণছিল, সেই ইংলণ্ডবাসীরা আজ আপনাদিগের সাধনার দ্বারা আপনাদিগের ও স্বদেশের কতই শ্রীবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। আবার জানিতে পারাযায় যে, মহারাজ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রহ্মশক্তিই অধিক বলবান্ প্রত্যক্ষ করিয়া, নিজ সাধনার দ্বারা সেই ব্রহ্মশক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি সহিষ্ণুতার সহিত সাধনাব দ্বারা মহারাজার পরিবর্ত্তে ঋষি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। রাজা উত্তানপাদের পুত্র বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া কঠোর সাধনা দেখাইয়া ছিলেন। এই প্রকার যিনি কোন বিষয় লক্ষ্য করিয়া ধৈর্য্য-সহকারে সাধনায় যত্নবান হইয়া থাকেন, ইহ জন্মেই হউক, আর পর জন্মেই হউক, কখন না কখন তাঁহাব মনোরথ পূর্ণ হইবেই হইবে, ইহা শাস্ত্র-বাক্য। বিপদে অধীর হইলে চলিবে না, সহিষ্ণুতার সহিত তাহার প্রতীকারে যত্ন করিতে হইবে। ব্যস্ত হইয়া কেবল ছুটাছুটি করিলে প্রকৃত সাধনা হয় না, এবং তাহাতে তাদৃশ ফলও পাওয়া যায় না। আমরা যে দিকে উন্নতি করিবার চেষ্টা করি না কেন, সাধনার দ্বারা সেই দি.কই উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। সাধনার দ্বারা হইতে পারে না এ প্রকার কিছুই নাই। সাধনার দ্বারা যে, অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, তাহার একটী জলন্ত প্রমাণ আমরা পতিব্রতা সাবিত্রীর উপাখ্যানে দেখিতে পাই।

পূর্ব্বকালে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অপুত্রক বলিয়া পুত্র লাভেব নিমিত্ত সাবিত্রী দেবীর আরাধনায় রত হইলেন। দেবী সাবিত্রীর বরে তিনি পুত্রের পরিবর্ত্তে একটী কন্যারত্ন লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজা কন্যার

নামও সাবিত্রী রাখিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সাবিত্রীর বয়স বাড়িতে লাগিল। তিনি যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে অতিশয় সুন্দর-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার সেই অলৌকিক সুন্দর-মূর্ত্তি দেখিয়া, সকলেই মনে করিলেন যে, দেব-কন্যা মনুষ্যরূপে ভূতলে আসিয়াছেন। রাজা স্বীয় কন্যার যৌবন কাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইলেন। পূর্ব্বের স্বয়ম্বর প্রথা অনুসারে সাবিত্রী বনবাসী, রাজ্যভ্রষ্ট, দ্যুমৎসেন-পুত্র গুণবান সত্যবানকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিলেন। রাজা তাঁহার তনয়ার এই প্রকার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ঋষিবর নারদের নিকট সাবিত্রীর মনোভাব প্রকাশ করিলেন। মহর্ষি নারদ সত্যবানের ভাগ্যে ১৬ বৎসর পরমায়ু আছে জানিয়া, রাজাকে এ বিষয়ে নিষেধ করিলেন। পতিব্রতা সাবিত্রী এই ব্যাপার অবগত হইয়া বিনীত বচনে বলিলেন, "আমি যাঁহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন আর অল্পায়ুই হউন, গুণবান হউন, আর নির্গুণই হউন, তিনিই আমার পতি। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমি কখনও বরণ করিব না।" সত্য-পরায়ণা সাবিত্রীর এই প্রকার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া, দেবর্ষি নারদ রাজাকে কহি-লেন, "মহারাজ, সাবিত্রীর বুদ্ধি কোন প্রকারে বিচলিত হইবার নহে, কেহই ইহাকে ধর্ম্ম-পথ হইতে নিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইবেন না, অতএব আপনি সত্যবানের সহিত ধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রীর বিবাহ দিন।" মহর্ষির বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া রাজা, সত্যবানের সহিত নিজকন্যা সাবিত্রীর শুভ বিবাহ দিলেন। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া, বিবাহের পর হইতেই পতিব্রতা সাবিত্রী দৈবশক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা সত্যবান্ স্বীয় পত্নী সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ কাষ্ঠ সংগ্রহের পর তিনি দারুণ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, এবং ঐ শিরঃপীড়াতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। পতির দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়াছে দেখিয়া, পতিব্রতা সাবিত্রী অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই তিনি এক শ্যামবর্ণ উজ্জ্বলকায় পুরুষ তাঁহার পতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, দেখিতে পাইলেন। তখন সাবিত্রী-সতী সসম্ভ্রমে উঠিয়া, তাঁহার আকার দর্শনে তাঁহাকে কোন দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং বিবিধ মিষ্ট বাক্য দ্বারা

তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন কোন আদুরে শিশু এরূপ প্রকার বায়না করে যে, তাহারা যাহা চায়, তাহা না পাইলে, মাকে ছাড়ে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দেয়, কখন বা কাঁদিতে কাঁদিতে আঁচল ধরিয়া মায়েব সঙ্গে ফিরে, তাদের সাধের সামগ্রী না দিলেই নয়। শিশু কিছুতেই স্থির হইতেছে না দেখিয়া, মায়ের কোমল প্রাণ গলিয়া যায়, তিনি কত প্রকারে তাহাকে ভুলাইতে থাকেন, কিন্তু শিশু কোন প্রকারে ভুলিতে চাহে না। যখন কিছুতেই শিশু বুঝিতেছে না বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহাকে তাহার সাধের জিনিষ দিয়া থাকেন। পতিব্রতা সাবিত্রীও এই প্রকারে ধর্ম্মরাজের কাছে বায়না করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ পতিব্রতা সাবিত্রীকে কত বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই বুঝিবার নহে। পতিব্রতা সাবিত্রী ধর্ম্মরাজের সঙ্গ কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন না, তিনি যতদূর যান, সাবিত্রীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। সাবিত্রী কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন না, তিনি যাহা আব্দার করিয়াছেন, তাহা চাই। অবশেষে সাবিত্রীর মধু-মাখা বচনে ধর্ম্মরাজ ভুলিয়া গেলেন, এবং অগত্যা সাবিত্রীর সকল বাসনা পূর্ণ করিলেন। সাবিত্রী যে কেবল পতির জীবন চাহিয়াছিলেন, তাহা নহে, তৎসঙ্গে আরও অনেক বর চাহিয়াছিলেন। ভগবান্ ভক্তকে সকল প্রকার বর দিতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ভক্তের সকল আব্দার রক্ষা করেন। ভক্ত কান্দিলে ভগবান্ কি আর স্থির থাকিতে পারেন। যখন প্রহ্লাদ বিষ অন্ন লইয়া কঁাদিয়াছিলেন, তখন করুণাময় ভগবান্ আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। বিষ-অন্ন অমৃত হইল, ভগবান্ বালকবেশে সেই অন্ন খাইতে লাগিলেন এবং ভক্ত প্রহ্লাদের মুখেও দিতে লাগিলেন। শিশু কাঁদিলে মা কি আর থাকিতে পারেন? শিশুর ন্যায় হওয়া চাই, তবে মায়ের আব্দারে হওয়া যায়। পতিব্রতা সাবিত্রীও ধর্ম্মরাজের কাছে এই প্রকার সরল শিশুর ন্যায় আব্দার করিয়াছিলেন। সাবিত্রীর এই প্রকার সাধনার দ্বার রাজা অশ্বপতি পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। রাজ্য-ভ্রষ্ট দ্যুমৎসেনও রাজ্য এবং মৃত পুত্র সত্যবানকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি, এই জগৎ-সংসারে সাধনার ন্যায় আর কিছুই নাই। সাধনার দ্বারা সকলই লাভ করা যাইতে পারে। মা জগজ্জননী কল্পতরু,

তাঁহার কাছে যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। আধ্যাত্মিক বলই বল, আর যাহাই বলনা কেন, সাধনা ব্যতীত কিছুই লাভ হইতে পারে না। পরমহংস দেব বলিয়াছিলেন "আঁব খাও, পেট ভরিবে, কেবল পাতা গণিয়া হিসাব করিলে লাভ কি? সেই প্রকার সাধন কর, ফল পাইব, মিছাকাজে সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি?" "এই জগতে আমার কাজ কিছুই নাই, সকলই সেই আনন্দময়ীর কাজ" এই প্রকার মনে করিয়া কার্য্য করিলে আমরা সকল বিষয়ে উন্নতি করিতে পারিব। এই জগৎ-সংসারে যে যেমন সাধনা করে, আনন্দময়ী তাহাকে সেই প্রকার ফল দিয়া থাকেন। তিনি রাজরাজেশ্বরী, তাঁর ভাণ্ডারে অনেক আছে, তাঁর কিছুরই অপ্রতুল নাই। মায়ের সম্পত্তিতে ছেলের অধিকার, আমরা সকলই পাইব। সাধনা করিলে কিছুরই অভাব হইবে না। ধন, মান ইত্যাদি যাহাই চাহিব, তাহাই পাইব। আর দেবত্বই যদি চাই, তাহা হইতেও মা আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

একটি অদ্ভুত স্বপ্ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি মন্ত্রধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে, নির্ভীকচিত্তে ঐ ত্রিপদ গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছি ; এমন সময় অদূরে পুনশ্চ শুনিতেছি, বামাকণ্ঠে কে স্তোত্র-পাঠ-পূর্ব্বক গীতার ধ্যান অভ্যাস করিতেছেন :—

স্তব।

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে।

অদ্বৈতামৃত-বর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ ১
নমোহস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপদ্মনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ২
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দ্দনম।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশব ॥ ৬
পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসংবোধনাবোধিতম।
লোকে সজ্জন ষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসিনঃ শ্রেয়সে ॥ ৭
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮
যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯

ওঁ তৎসৎ। গীতা।

এই স্তোত্র পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে অল্প দূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে

দেখি উজ্জ্বল সবুজবর্ণে ভূষিতা মাতা গায়ত্রী দেবী ধ্যানে নিমগ্না। আমি অগ্রসর হইয়া দেবীকে প্রণাম করিলাম, চতুর্দ্দিক সদ্গন্ধে আমোদিত হইয়াছে, দেবী চক্ষু উন্মীলন করতঃ আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস! এসেছ, তোমার জন্য আমি এখানে বসে আছি, ভক্তি দেবী আমাকে খবর দিয়াছেন যে, তুমি এখানে আসিবে। আমি ব্রাহ্মণকে বড় ভাল বাসি; তুমি ব্রাহ্মণ। যে ব্রাহ্মণ সে আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। এংরূপ ভক্তিভাবে যে ব্রাহ্মণ আমার উপাসনা করিবে, সে আমার দর্শন করতঃ, এই জ্ঞানমার্গের প্রস্ফুটিত, সদ্গন্ধে আমোদিত পুষ্প চয়ন করতঃ আমার মাতার পূজা করিয়া থাকে। তোমাকে আমার মাতার নিকট প্রেরণ করিব, এই উদ্যানের পুষ্পগুলি তুমি যাহা পার, চয়ন কর। জ্ঞান-পুষ্প চয়ন করিলে, শান্তি লাভ হইবে, তিনিই মা আনন্দময়ী শান্তিদেবী।"

আমি জ্ঞান-পুষ্প চয়ন করিতে আরম্ভ করিলাম, বেদের কতক কতক চয়ন করিলাম। গায়ত্রীর অর্থ কিছু সংগ্রহ করিলাম। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপদ শাস্ত্রের ব্রাহ্মণ-কাগো হইতে দুই একটি নিক্ষেপ করিয়া বুঝিতেছি:—

ভগবান্ বুদ্ধদেব ধম্মপদ গ্রন্থে ব্রাহ্মণ কাগোতে বলিয়াছেন:—

ধ্যায়িং বিরজমাসীনং কতকিচ্চং অনাসবং।
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ॥৪

অনুবাদ—ধ্যানশীল, রজোমুক্ত (আসক্তিরহিত), একাকী অবস্থিত, কর্ত্তব্যানুষ্ঠায়ী (যিনি সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন), পাপবিমুক্ত এবং অর্হৎপদপ্রাপ্ত লোককে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

দ্বিতীয়— যস্স কায়েন বাচায় * মনসা নত্থি দুক্কতং।
সংবুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ॥৯

অনুবাদ—যাঁহার কায় মন ও বাক্য এই ত্রিস্থানে পাপ নাই, যিনি অতিশয় সংযমশীল, সেই লোককে ব্রাহ্মণ বলি।

ভগবান্ বুদ্ধদেব ধর্ম্মপদের ব্রাহ্মণ কাগোতে যে উপদেশগুলি দিয়াছেন, তাহাই আমার কতক কতক সংগ্রহ করা হইল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত গীতায় জানিলাম।

* মনস।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ২য় অ শ্লোঃ ৪৬॥

সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়া গেলে, উদপানে (ক্ষুদ্র জলাশয়) যতটুকু প্রয়োজন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদে ততটুকুর প্রয়োজন।

এই অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতেছি। আর গায়ত্রী ছন্দে মা মা বলিয়া নৃত্য করিতেছি, বড়ই তৃপ্তি হইল। দেবীর কথামত কার্য্য সমাধা হইল। সম্মুখস্থ একটি বৃক্ষ। দেবী স্থিরভাবে আমাকে সেই বৃক্ষতলে উপবেশনের আদেশ করিলেন। আমি সেই বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া ভাবিতেছি, এই শান্তি, এই বৃক্ষতলেই শান্তি। প্রকৃতই বৃক্ষটি শান্তিদেবী, সেই বৃক্ষটি উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণে ভূষিতা, ইনিই আনন্দময়ী, ইঁহার ক্রোড়ই শান্তিময় ক্রোড়। ইনি গায়ত্রী দেবীর মা, অশ্বত্থ বৃক্ষ ইঁহার নাম। এই বৃক্ষমধ্যস্থ এক দেবী উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণে প্রজ্বলিত হইয়া আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বসিলেন। আমি মাতৃক্রোড়ে শান্ত যথা হইয়া রহিলাম।

মা আমাকে অদূরে ইঙ্গিত করতঃ বলিলেন "বৎস। ঐ দেখ আমার জগৎ-পিতা প্রণবরূপী আনন্দে বিরাজ করিতেছেন।" আমি দেখিলাম, প্রণবরূপী ওঁকাররূপ ধারণ করতঃ সর্ব্বভূতে শব্দব্যাপী অনন্ত ওঁ ধ্বনিত হইয়া অনন্তে লয় হইয়া আনন্দে বিরাজে—যথা সেই শব্দ অনাদি ও অনন্ত একীভূত উজ্জ্বল শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রজ্বলিত ও দিগন্তধ্বনিতে বিরাজিত। ইনিই আনন্দ। ইনিই প্রণবানন্দ।

আমি তদ্দর্শনে করজোড়ে সেই বিশ্বপিতার উদ্দেশে স্তব আরম্ভ করিলাম।

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
ওঁ নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
ওঁ নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
ওঁ নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।

সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

এই প্রণবানন্দের ওঁকার ধ্বনি শ্রবণ ও মাতৃক্রোড়ে শান্ত যথা-রূপে আমি শান্তিনিমগ্ন; যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাবে গদ্‌গদ হইলাম, তাহা বলিবার সামর্থ্য নাই। ইনি এক অপূর্ব্ব পূর্ণজ্ঞানানন্দ। এই পূর্ণ + জ্ঞান + আনন্দ = পূর্ণজ্ঞানানন্দই...অনাদি অনন্তের মহাজ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য বিভোবা।

এমন সময়ে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। আমি চক্ষু উন্মীলন করিলাম, দেখিলাম যে, বহির্জ্জগতের দৃশ্যে সত্যই আমি, আমার গৃহে একখানি কম্বলে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শয়ন করিয়া আছি, পুত্রদ্বয় আমার নিকটে বসিয়া উভয়ে ক্রীড়া করিতেছে। তখন স্বপ্ন-বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, এক্ষণে স্থূল জগতে রহিয়াছি, পূর্ব্বে আমি সূক্ষ্ম ও কারণে ছিলাম। এই স্থূল জগৎ আমার বহির্মুখী মন ও এই কম্বলই আমার স্থূল দেহ। প্রকৃতির নিয়মানুসারে পক্ষিগণ কলরব করিতেছে, ও কোকিল কুহু কুহু স্বরে তখনও ডাকিতেছে তাহাও শুনিতেছি। প্রাতঃকাল ও বসন্তের প্রারম্ভ। তবে কি সমস্তই স্বপ্ন? এ একটি অদ্ভুত স্বপ্ন। তখন বুঝিলাম যে, এই বিশ্বটিই একটি স্বপ্নমাত্র। এইরূপ চিন্তা করিয়া মা দুর্গতিহারিণী দুর্গারূপিণীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম।

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

ওঁ।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তীর্থ।

স্থাবর-জঙ্গম ও জীবের আবাস ভূমি মৃন্ময়ী বসুন্ধরার সুখময় অঙ্কে, কত জীব-জন্তু বাস করিতেছে; সকলকেই ধরিত্রী জননী সমান আদর ও যত্নে প্রতি-পালন করিতেছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ-জীব মানব হইতে নিকৃষ্ট কীট, পতঙ্গ, এমন কি বোধ হয়, তৃণলতা গুলিও ধরিত্রী জননীর সুখময় অঙ্ক পরিত্যাগ করতঃ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অপবিজ্ঞাত স্বর্গের লালসায়, এই ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব দেহ নাশের ইচ্ছা করে না। অলঙ্ঘনীয় নিয়তি-চক্রের আবর্ত্তনে যখন পার্থিব দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে, তখনও জীব বাসনার সহস্র করে এই সংসারকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে চাহে, ধরণীর কোমল অঙ্ক ত্যাগ করিয়া কাহারও যাইতে সাধ হয় না। বসুন্ধরার কোমল বক্ষে এমন কি সুধা-নির্ঝরিণী, কোন গুপ্ত পথে নীরবে প্রবাহিতা রহিয়াছে যে, তাহার অপার্থিব স্বাদ জীব কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে চাহে না?

জীবশ্রেষ্ঠ মানব স্বীয় বুদ্ধিবলে সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। নিজের ও সমাজের সুখ ও শান্তি বিধান সঙ্কল্পে কত দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও শঠতার অবতারণ করিয়াছে। কত পাণ্ডিত্য, কত তর্ক, কত বাগাড়ম্বর দ্বারা কেহ বা আত্ম-প্রতিষ্ঠা, কেহ বা সমাজের সুখ ও শান্তির চরম ও পরম উপায়-নির্দ্ধারণ মন্ত্র ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু হায় কেহই সমাজের চিরন্তন দুঃখ ও অশান্তি দূর করিতে সক্ষম হইতেছে না। স্বজনবিরহের কাতর শোকোচ্ছ্বাস, দারিদ্র্যের কঠোর পেষণ, জরা ও ব্যাধির কঠিন কষাঘাত এবং মৃত্যুর লেলিহান জিহ্বা মানব-সমাজকে ভ্রূকুটি-কুটিল-বদনে যে শোণিতশোষিত-বিভীষিকা-প্রদর্শনে সদা সন্ত্রস্ত ও কাতর করিয়া তুলিয়াছে; এই বিভীষিকার অট্টহাস্য-নিনাদ-কম্পিত মানব-হৃদয়ে শান্তি-সুখের স্থান কোথায়? কেবল মাত্র স্নেহময়ী ধরিত্রী-জননীর অযাচিত করুণারাশি এত ভীতির মধ্যেও মানবকে আপনার দিকে সমাকৃষ্ট রাখিয়াছে। মনস্বী জীব জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখ তাপ ভোগ করিয়াও ধরণীর ধূলিরাশির ভিতর একবার মাত্র পদস্থাপন করিলে, পার্থিব-মলিনতা তাহাকে এতই বিভ্রান্ত করিয়া তুলে যে, তাহার নিকট পৃথিবীর এই মলিনতাই

পবিত্রতা ত্রিদশ-দুর্লভ হরিচন্দনের মাধুর্য্য ধারণ করে। ধরণীর স্নেহ এতই অগাধ যে, অনন্ত সুখ-সদন বৈকুণ্ঠনিবাসী মহাত্মারাও ধরণীর সুখ-সংস্পর্শে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য সেই বৈকুণ্ঠের সুখ বিস্মৃত হয়েন। ধরার সকলই অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী, তাই ক্ষণপ্রভার আলোকোচ্ছ্বাসের মত তাহার সুখও ক্ষণভঙ্গুর। বোধ হয় যাহাকিছু ক্ষণিক, তাহাই অধিকতর চিত্তাকর্ষক। কিন্তু হায়! এই রোমহর্ষণ বিভীষিকাময়ী ধরণীতে যে সুখের মোহে জীব সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই সুখ কি? আজও পর্য্যন্ত কেহ তাহার সন্ধান পাইয়াছে কি? ধরণীর কোনও পদার্থে সুখ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ধরাবক্ষে সুখ অন্বেষণ করিতে গেলে, শোক-তাপ, জরা-মৃত্যুর মধ্য দিয়াই সুখের অনুসন্ধান করিতে হয়, তাই অনেক সময়ে এই সমস্ত বিভীষিকাকেই সুখ বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক ইহাই কি সুখ? নিত্য-লব্ধ জরা-ব্যাধি যদি সুখকর হইত, তাহা হইলে জীব সুখানুসন্ধানে এত ব্যস্ত থাকিত না। পরন্তু এই ভয়-বিহ্বলতার মধ্যে অন্তরালে মানব একটু সুখ কল্পনা করিয়াও, সেই আশাতে বুক বাঁধিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা মূলক একটু সুখের স্বপ্ন দেখে। তাহাতেই বোধ হয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠার মত সুখ আর জগতে নাই। ফলতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা সুখই।

সৎ, চিৎ ও আনন্দময় মানব-আত্মার আনন্দই স্বাভাবিক অবস্থা। ভ্রমে পতিত হইয়া, মানব-আত্মা নিরানন্দ অনুভব করিয়া থাকে। তাই অতিমাত্র সামান্য অবসরেও সেই স্বভাবসিদ্ধ আনন্দোচ্ছ্বাসে মানব হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং সেই উদ্বেল আনন্দোচ্ছ্বাসের সংস্পর্শে স্পর্শমণি-স্পৃষ্ট লৌহখণ্ডের ন্যায় সংসারে দুঃখগুলিও সুখে পরিণত হইয়া যায়, মৃত্যুও অমৃতের প্রভায় বিভূষিত হইয়া উঠে।

কত সুদূরদর্শী মহামান্য কবিগণ এই ধরণীকে, ধরণীর ঐশ্বর্য্যকে কত তুচ্ছ, কত নগণ্য, কত হীন ও অলীক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন; ধরণীকে মায়াবিনী কুহকিনী বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। তাঁহারাই আবার এই ধরা-বক্ষে যে সকল বৈকুণ্ঠ-লাঞ্ছিত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র জনসাধারণ লোক-লোচনের সমক্ষে দেদীপ্যমান করিয়া রাখিয়াছেন বোধহয় তাঁহারা ও তাহার মত পবিত্র সেইরূপ সুখ-সদন মোক্ষধাম কল্পনা-চক্ষেও জগতে আর কুত্রাপি দেখিতে পান নাই।

ধরণীর ধূলি-ধূসর বক্ষে যে সকল স্থান ভগবান বিষ্ণুর পদাঙ্ক-পূত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই মহাতীর্থ সকল, ভগবান্ নারায়ণের ভৃগুপদ-চিহ্ন-ভূষিত বক্ষের কৌস্তুভ-মণির শোভা অপেক্ষাও মৃন্ময়ী বসুন্ধরার ধূসর বক্ষে অধিকতর শোভা ধারণ করিয়াছে। যদি ধরণীতে ক্ষণভঙ্গুরতার মধ্যে কোথাও সুখ থাকে, শান্তি থাকে, তাহা এই সকল তীর্থক্ষেত্রে বিরাজিত, কার্য্য দ্বারা যদি মানবের সুখ ও শান্তি অর্জ্জনীয় হয়, তবে তাহা একমাত্র তীর্থ-সেবা দ্বারা লভ্য।

যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নগণ্য মানব-সন্তান এই শোকতাপ জর্জ্জরিত ধরাধামে জন্ম গ্রহণ করতঃ জীবের মঙ্গল কামনায় পরমানন্দ চিত্তে আপনার দেহ, মন, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন ও অনন্যচিত্তে ধরণীর দুঃখ-তাপের পর্য্যালোচনা করতঃ ধরাবাসী জীবের শান্তিবিধান-কল্পে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন—সেই ধূলির মধ্যে একপ মহাত্মা শৈশবে আনন্দে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, যে ভূমিতে যৌবনে জীব-তারণ যজ্ঞের বহ্নিস্থাপন করিয়াছেন ও যেই মৃত্তিকাতে মরণের কোমল করযুগলে আত্মসমর্পণ করতঃ বিশ্বযজ্ঞের সহিত আত্মযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই পরম পবিত্র পুণ্য ভূমি ব্যতীত এই ধূলি-ধূসরিত ধরাবক্ষে ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের পদস্থাপন যোগ্য স্থান আর কোথায়।

যে স্থানে প্রেম-বিহ্বল প্রেমিক-প্রেমিকা পৃথিবীর যাবতীয় সুখ, দুঃখ, লজ্জা, ভয়, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনাদি সমস্ত উপেক্ষা করতঃ একমাত্র প্রাণের প্রাণ পরম দেবতার পদ-প্রান্তে আপনাকে ন্যস্ত করিয়া মহাপ্রলয়কেও তাচ্ছীল্য করতঃ সেই সাধনার ধন প্রেমময়ের চরণ যুগল হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক-সমাধি মগ্ন রহিয়াছেন, সেই পরম পবিত্র পূণ্য-ভূমি ব্যতীত এই মৃন্ময়ী ধরণীর ধূলি-ধূসরিত বক্ষে ভগবানের চরণ-স্থাপনের যোগ্য স্থান আর কোথায়।

যে পবিত্র ভূমিতে পতিগত-প্রাণা সতী সর্ব্বেন্দ্রিয়-সংযমন-পূর্ব্বক পতিদেবতার পদ-প্রান্তে আত্মাকে সংন্যস্ত করত, কায়া, মনঃ প্রাণ তাঁহারই সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, পতির সামান্য মাত্র স্তুতি-স্বরূপ অযথা নিন্দা শ্রবণেও, যিনি এই সুখ-দুঃখের ভোগায়তন দেহকে ভুজঙ্গিনীর জীর্ণ ত্বকের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে অনায়াসে বর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়েন; যিনি পতি-দেবতার

চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ-করতঃ জগতের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে সক্ষম হন, যিনি পতির আসন্ন-মৃত্যু-সময়ে পতির জীবনদাত্রী; যিনি জীবনে, মরণে, ভবনে, বনে সর্ব্বত্র স্বামীর সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া, সেই দেবতার চরণারবিন্দে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন, যেই ভূমি তাঁহার সেই পবিত্র নশ্বর দেহ ধূলির কণার কণামাত্র ধারণ করতঃ গৌরবান্বিত হইতে পারিয়াছেন, সেই পরম পবিত্র পুণ্যভূমি ব্যতীত ভগবান্ নারায়ণের পরম পবিত্র পদস্থাপনযোগ্য স্থান ধরণীর ধূলির মাঝে আর কোথায়।

পাংশুজাল-সমাচ্ছন্ন অনিত্য ধরা-বক্ষে ত্রিধা-নিহিত, বিষ্ণুপদ-বিভূষিত, পরম-পবিত্র, মহিমাময় তীর্থক্ষেত্রগুলি অত্যুজ্জ্বল রত্ন-হার স্বরূপ। এই রত্নমালা-বিভূষিত ধরিত্রী জননী স্বীয় মণিময় কণ্ঠহারের প্রাণারাম স্নিগ্ধজ্যোতি-প্রদর্শনে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত, ভ্রমান্ধ শিশুকে আপনার হৃদয়ের নিকটে আহ্বান করিতেছেন ও স্বীয় হৃদয়-নিহিত করুণা-সাগরে অভিস্নাত করিয়া, সেবা, প্রেম ও সাধনার মহামন্ত্রে উদ্বোধিত করতঃ, এই ক্ষণ-ভঙ্গুরতার মধ্য হইতে নিত্য, পরমানন্দ, জ্যোতির্ম্ময় শান্তি-সদনে লইয়া যাইতেছেন। ধরিত্রী জননীর যে সকল কৃতী সন্তান তাঁহারই ধূলি-মাটি অঙ্গে মাখিয়া, তাঁহারই অঙ্কাশ্রয়ে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠাবলে স্বীয় জননীর বক্ষে বৈকুণ্ঠ-দুর্লভ তীর্থ সকলের সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল অত্যুজ্জ্বল রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়াই, চিরকল্যাণময়ী ধরণী বসুন্ধরা নামের যোগ্য হইয়াছেন। নতুবা সামান্য ধাতু, প্রস্তর ও কীটাদির অস্থি, মল ইত্যাদি ধরণীর মালিন্য মাত্র; সম্পদ নহে। ধরণীর সম্পদ বলিবার যোগ্য যদি কিছু থাকে, মালিন্যময় ধরণীতে যদি কিছু পবিত্র ও মহৎ থাকে, তাহা তীর্থ ক্ষেত্র। মহাত্মাদিগের মহদন্তঃকরণই এই সকল তীর্থ ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা "নান্যৎ তীর্থং জগত্যস্তি তীর্থভূতাহি সাধবঃ।" জগতে সাধুরাই মহাতীর্থ, সাধুসেবা মহাপুণ্য ও সাধুসঙ্গ মহাফল-দায়ক।

অনন্ত আনন্দ-খনি নারায়ণের চরণ-সমীপে উপনীত হইতে হইলে, ধরণীর হৃদয়-ভূষণ তীর্থক্ষেত্রগুলির সেবা করা চাই। তীর্থকে হৃদয়ে ধ্যান করতঃ, তীর্থ-প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মাদিগের মহিমাময় ভাব-রাজ্যে আপনাকে অধিষ্ঠিত করিতে হইবে, এবং আপনাকেও তাঁহাদের ন্যায় জগন্মঙ্গল-যজ্ঞে দীক্ষিত করিতে হইবে। আমার বলিতে জগতে যাহা কিছু আছে; কায়া, মন,

প্রাণ সকলই সেই মহাযজ্ঞ-সাধনায় আহুতিপ্রদান করতঃ, শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ, তাঁহাদিগের গন্তব্যপথে গমন করিতে হইবে। ইহাই বসুন্ধরা জননীর ত্রিদিব-দুর্ল্লভ শান্তি-নির্ঝরের একমাত্র পন্থা। এই পন্থায় আনিবার জন্যই কল্যাণময়ী মাতা কত লোভে ভুলাইয়া, কত অভিমানে ফুলাইয়া, কত রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর শাসনে শাসাইয়া আপনার সন্তানদিগকে এই সুখময় পথের নিকটে আনয়ন করিতেছেন। তাই ধরণীর শোক-তাপ জরা-মৃত্যুময় ক্ষণভঙ্গুরতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সুখের ক্ষণিক জ্যোতি—এত মধুর ও এত সুখময়।

একটি গল্প।

(জন্মান্তর-কাহিনী।)

—:*:—

"ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ব্যতীত নিত্য-সুখ ও নির্ব্বাণ-সুখ পাওয়া যায় না।"

একটি রাজ-প্রাসাদস্থ একটি কক্ষে একটি দিব্যাঙ্গসুন্দরী সন্ন্যাসিনী একখানি মৃগচর্ম্মাসনোপরি উপবেশনপূর্ব্বক আপন মনে এইরূপে উচ্চারণ করিতেছে। তৎ-সম্মুখস্থ একখানি গালিচার আসনোপরি উপবিষ্ট একটি যুবরাজ হাঁ করিয়া অধৈর্য্য ভাবে সন্ন্যাসিনীর মুখপ্রতি দৃষ্টি করতঃ বলিল; "সেকি! তোমার এই কাঁচা বয়স, তুমি এখন ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া ক্ষেপিয়া বেড়াইলে চলবে কেন? আর আমি যুবরাজ এই সমস্ত রাজত্ব ত্যাগ করিয়া, তোমার সৌন্দর্য্য রাশিতে ডুবিয়া তিখির কাকের ন্যায় তোমার মুখ প্রতি চাহিয়া, হাঁ করিয়া বসিয়া রহিয়াছি—; তাহা কি তোমার গ্রাহ্যই হচ্ছে না? কেবল চক্ষু বুজিয়া উপাসনা করছো ব্যাপার কি?"

সন্ন্যাসিনী তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন

এবং যুবরাজ অসংলগ্ন প্রতি উত্তর দানে তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন তাহাই আমরা বর্ণনা করিতেছি :—

সন্ন্যাসিনী—দেব-দেবীর উপাসনায় কোন কোন শুভফল পাওয়া যায় ইহা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত নিত্য সুখ পাওয়া যায় না। সেই জন্য দেব-দেবীর উপাসনা ব্রহ্মোপাসনার কাছে অধম উপাসনা।

যুবরাজ—বলি, আমার কথা কি কিছুই তোমার কাণে লাগ্‌চে না? তোমার উত্তম ও অধম উপাসনা কত দিন করবে, তাই বলি, ওসব উপাসনাদি পরিত্যাগ কর ও সব অধম। আর আমি যে তোমার অধমেরও অধম তোমার রূপ-সাগরে ডুবিয়া পাগল হয়ে পড়েছি, তাকি তুমি জানছ না? আমি যে রাজা, তুমি যে আমার রক্ষিতা পরমা সুন্দরী বেশ্যা। আমি তোমাকে মাসহারা ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দিই, তাহা লইয়াও তুমি গ্রাহ্যই কর না। শুনিতে পাই, টাকাগুলো গরীব দুঃখীগণকে দান-বিতরণ করিতেছ; তাহা কর; যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই কর; তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু একটি কথা কি আমার সহিত কহিতে নাই। কেবল আপন মনে বক্ বক করিয়া বকিতেছ আর চক্ষু বুজিয়া কাহাকে চিন্তা করিতেছ?

সন্ন্যাসিনী—দেব-দেবীর-উপাসনা-কর্ম্ম, ঐহিক সুখ-প্রার্থনা বা পারত্রিক ফল-প্রদাতা—উপাসকের প্রার্থনা। বেদের সকাম কর্ম্মকাণ্ড দেব-দেবীর উপাসনা, কেন না বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা কামনাসিদ্ধি-প্রদাতা কর্ম্মাত্মক শক্তির সাহায্য লাভ হয়।

যুবরাজ—কি বাবা! এমন মেয়ে মানুষ ত দেখি নি। ঃ স্ত্রীলোক, একটি বেশ্যার কন্যা এত শিখলে কোথা? তুমি কি বেদ্ টেড্ পড়েছো না কি? ভাল তাই কর।

সন্ন্যাসিনী—না আমি কিছুই পড়ি নাই বটে, তবে আমার এ সমস্ত বিষয় জানা আছে। আপনি চুপ করিয়া বসিয়া শুনুন। ব্যস্ত হইবেন না। ঐ সকল কর্ম্মাত্মক শক্তিই দেব-দেবী। এই জন্যই বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডানুযায়ী দেব-দেবীর উপাসনা অধম উপাসনা। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন :—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যাবপশ্চিতঃ।
বেদবাদারতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ২য় গীতা।

দেবদেবীর উপাসনা দ্বারা ভোগৈশ্বর্য্য লাভ হয়, ভোগৈশ্বর্য্য লাভে ব্যবসায়িত্মিকা বুদ্ধি জন্মে না। তজ্জন্য সমাধি, শান্তি লাভ হয় না। পুনশ্চ মৃত্যুর পর জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কারণ যাহার সমাধি লাভ হয়, তাহার আর জন্ম মৃত্যু হয় না। ইহাই পূর্ণানন্দাবস্থা।

যে বাটীটিতে এইরূপে কথোপকথন হইতেছিল, সেই বাটীটি দ্বিতল। ইহা ঐ যুবতী সন্ন্যাসিনীর জন্য যুবরাজ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। বাটীটি রাজ-প্রাসাদ-সাদৃশ। প্রাসাদের একটি কক্ষে অধৈর্য্য-যুক্ত কামোন্মত্ত যুবরাজ; এবং শান্তিময়ী দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-শালিনী গৈরিকবসনধারিণী সেই যুবতী সন্ন্যাসিনী উপবেশনপূর্ব্বক বেদের কিয়দংশ আলোচনা করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইতেছেন। সন্ন্যাসিনী যখন ধ্যানস্থ হন, যুবরাজ তখন কথা কহেন, সন্ন্যাসিনী যখন বেদ উচ্চারণ করেন, যুবরাজ তখন তাঁহার রক্ষিতা বেশ্যার মুখ প্রতি হাঁ করিয়া দৃষ্টিস্থাপন-পূর্ব্বক শ্রবণ করেন। এইরূপে দিন চলিতে লাগিল, রাজা যে আশায় প্রত্যহ তাহার নিকট আসিতেছেন তাহার কিছুই ফলপ্রদ হয় না।

রাজা নিত্যই আসেন, এইরূপে নিত্যই কথোপকথন হইতে থাকে, বলা বাহুল্য, নিত্যই রাজা গতায়াত করিয়া ও তাঁহার সেই রক্ষিতা যুবতীর মুখ প্রতি নির্দ্দিষ্ট চাহনিতে অবস্থান করিয়া এবং তাহার মুখনিঃসৃত শাস্ত্র কথা শ্রবণ করিতে করিতে, রাজার মনের দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যুবরাজ ঐ সকল শাস্ত্রালাপ লইয়া তাহার সহিত দিবারাত্রি-যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমানুক্রমে কামোন্মত্ত-ভাব বিদূরিত হইয়া প্রেমোন্মত্ত-ভাব লাভ করিয়া প্রকৃতই সন্তুষ্ট-চিত্তে নিজে একটু একটু শান্তিলাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ভগবদ্ভক্তি করিতে শিখিলেন এবং তাঁহারই উপাসনায় অহোরাত্র যাপন করিতে সমর্থ হইতেছেন। এইরূপে সর্ব্বদাই সেইস্থানে অবস্থান করিয়া প্রকৃতই প্রীতি, ভক্তি লাভ করিতে শিখিতেছেন।

এইরূপে কতক দিবস কাটিয়া যায়। এমন সময় রাজা এক দিবস শুনিলেন যে, তাঁহারই একটি সহিসের এক পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সেই নবজাত শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইয়া হাস্য বা ক্রন্দন করিতেছে না, এমন কি মাতৃস্তন্য পর্য্যন্ত পান করিতে মুখ ফিরাইতেছে না তাহার মাতা যতই তাহাকে স্তন-পান করাইবার জন্য তাহার মুখ এবং আপন স্তন লইয়া সচেষ্ট হইতেছে, শিশু কিছুতেই মুখ দিতে চাহিতেছে না। ইহার কারণ কি ? তাহাই সন্ন্যাসিনীকে যুবরাজ অবগত করাইলেন। তৎশ্রবণে সন্ন্যাসিনী বলিলেন যে, "আমি শিশুটিকে একবার দেখিতে চাই। কেবল মাত্র শিশুর মাতা ও শিশু সেই স্থানে থাকিবে আর কেহই যেন না থাকে।" রাজারও সেইরূপ আদেশই রক্ষা হইল; অতএব সন্ন্যাসিনী সহিসের সেই সদ্যজাত পুত্র দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

এ দিকে সমগ্র রাজ্যময় এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; তাহাতে সকলেই বলিতেছে, যে 'হবে না, যে দেশের রাজা এরূপ এক বেশ্যা লইয়া অহর্নিশি যাপন করিতেছে, সে দেশে কি মঙ্গল আছে ? এ অমঙ্গল আর কোথায় হবে ? হবে না ত কি ?" প্রজাগণ এরূপে রাজাকে নির্দ্দেশ করতঃ তিরস্কার করিতে করিতে আপনাপনি নানারূপে কথোপকথন করিতে লাগিল। এমন সময় সকলে শুনিল যে, রাজার বেশ্যা আসিয়া পুত্রটিকে হাসাইয়াছে ও স্তন পান করাইয়াছে। সকলেই সামান্য এক বেশ্যার আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া হতবুদ্ধি হইল।

এই ঘটনার পর রাজা এক দিবস সন্ন্যাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ? আমাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বল, তুমি কে ? আমি জানি তুমি বেশ্যা-কন্যা; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তোমার পরিচয় জানিবার আরও কিছু আছে"এবং তাহা কি তুমি জান ? আমাকে বলিবে কি ?

রাজা বিনয়-পূর্ব্বক এ কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সন্ন্যাসিনী বলিল, 'রাজা মহাশয়, আপনি যাহা জানেন, তাহা সত্য, আমি এ জন্মে বেশ্যা-গৃহে জন্মিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্ব জন্মে অন্যরূপ ছিল, আমার পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত জানিবার জন্যই যখন আপনার আগ্রহ হইয়াছে, তখন আপনাকে বলিতেছি শুনুন :—

পূর্ব্বজন্মে একজন জ্যোতিষী পণ্ডিতের কন্যা হইয়া যখন আমি জন্মগ্রহণ করিলাম; আমার পিতৃদেব আমার অদৃষ্ট গণনায় জানিলেন যে, আমি বিবাহের

তিন দিবস পরই বিধবা হইব। পিতা একজন অদ্বিতীয় জ্যোতিষী ও প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজে যেরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ ছিলেন, আমাকেও সেইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষিতা করাইয়া প্রকতই জ্ঞানী করিয়া দিয়াছিলেন, সেই জ্ঞান বশতঃই আমি অগ্র পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ চৈতন্য-ভাবে আপনাকে বলিতে সমর্থ হইতেছি। আমি সৎশিক্ষা লাভ করিয়া প্রকৃত সতীত্ব জিনিষটি বেশ বুঝিতে শিখিলাম, আত্মসম্বন্ধে বিশেষরূপে বুঝিলাম, সাংসারিক যাবতীয় সুশিক্ষা লাভ একরূপ আমার হইল, গীতার আধ্যাত্মিক ভাব আমার মনে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল।

প্রকৃত বলিতে কি, আমার বিবাহ হইল, এবং তিন দিবস পরে অদৃষ্টানুযায়ী আমি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হই, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া, শাস্ত্রানুশীলন-সাহায্যে বুঝিলাম যে, দেহী অমর, অজর, নিত্য-বস্তু। দেহ চিরস্থায়ী নহে। এবং অলীক মাত্র। অতএব আমার স্বামী অমর। দেহটি আমার স্বামী ছিল না। দেহী-ই আমার স্বামী—যিনি চিরস্থায়ী। তজ্জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছেন—তাহাই মনে হইল।

দেহী নিত্য মবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০।২য় গীতা।

অতএব ইহাতে আমাদের শোকের কোনই কারণ নাই, তিনি সর্ব্বভূতেই রহিয়া, নিত্য ভাবে অবস্থান করিতেছেন। অতএব তাঁহাতেই একাগ্রভাবে মন সংযত করিয়া, সতীত্ব-রত্নটির আদরবৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহলেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি পিতার সাহায্যে একটি পৃথক বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া, নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিয়া, পূজা, যোগ, জপ-তপাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। এবং আরও বুঝিলাম যে, আমার এই নশ্বর দেহটিও আর একদিন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব—যেরূপ গীতায় কথিত আছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য-
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২। গীতা ২য়।

আমরা যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকি, সেইরূপ এই পরিজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করতঃ অন্য দেহ আশ্রয় লইব। এই-রূপ দেহ-মন লইয়াই আমি বেশ নির্ব্বিঘ্নে সতীত্ব জিনিসটা বুঝিতে অগ্রসর হইতেছিলাম। আমার বাটীতে কোন পুরুষ আসিবার আদেশ ছিল না। সে আমারই আদেশ। বাটীতে আমি এবং স্ত্রীজাতি-দাসীগণ মাত্র থাকিত। এইরূপে আমি বেশ শান্তি-সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলাম। মন চৈতন্যময় রাখিতে পারিলেই, সমস্ত বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান হয়, এই আমার বিশ্বাস ছিল।

দিন যাইল, মাস যাইল, বৎসর কাটিল, এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিল। অকস্মাৎ আমি এক কঠিন পীড়ায় আবদ্ধ হইলাম। তাহাতে আমার পিতৃদেব আমাকে আদেশ করেন যে, "কবিরাজ আনাইয়া একবার দেখাইব কি?" তাহাতে আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করাইবার জন্য তাঁহারই ইচ্ছামতই আমি আমার নিজ অভিপ্রায় জানাইলাম। তৎপরে কবি-রাজ আসিলেন, তিনি আমায় স্পর্শ করিলেন, কিন্তু আমি আমার হস্তে একটি সূতা বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। সেই সূতাটি স্পর্শ করিয়াই কবিরাজ আমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়াছিলেন, অনতিবিলম্বেই আমার দেহ হইতে আমার প্রাণ-বায়ু নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। যখন আমি চক্ষু বুজিলাম, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আমার মনে কবিরাজরূপ পর-পুরুষ-স্পর্শ-সুখানুভূতি উদয় হইয়াছিল, এবং সেই ফল হেতু আমি অদ্য বেশ্যা-কন্যা-রূপে পরিচিতা এবং বেশ্যা-গৃহে জন্মগ্রহণ করি-য়াছি। শাস্ত্রেই বলিয়াছে :—

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

যদিও আমি যাবজ্জীবন উচ্চ-শিক্ষিতা হইয়া সতীত্ব-রত্নটির আদর বুঝিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মাদিতে অতিবাহিত করিলাম, কিন্তু মৃত্যুকালীন পরপুরুষের স্পর্শ-সুখানুভাবনা মন মধ্যে যেমন উদিত হইল, মৃত্যুর পর-পারে অমনি বেশ্যা-গৃহে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিলাম। তাহাই আমি ঐ সহিষের পুত্রকে আনাইয়া তাহাকে দেখিয়া হাসিলাম, সেও আমার হাসির উত্তরে হাসিয়া ফেলিল; তখন আরও তাহাকে আমি বলিলাম যে, 'তোমার এখনও অভিমান, এখনও কি আত্মাভিমান যাইবে না, সহিষ-পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু

তাহার স্তনপান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ ?' তজ্জন্য তিনি আমার কথা শুনিয়া স্তন পান করিয়া, তাঁহার অভিমান দূরীভূত করিলেন। শুনিলেন, রাজামহাশয়, আপনি এদেশের রাজামহাশয় কিনা,—তজ্জন্যই আপনার নিকট সবিস্তারে বলিতেছি।"

যুবরাজ—আর আমাকে লজ্জিত করিও না, আমি রাজার যোগ্য নহ, আমি না বুঝিয়া, তোমাকে না চিনিয়া, সামান্য বেশ্যা-কন্যাকে বেশ্যাভাবেই দেখিয়াছিলাম, এবং তোমার অলীক রূপ-দর্শনে কামোন্মত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গি আমার মনে সর্ব্বদাই অদ্ভুতভাব দৃশ্য হইত। তাহা সত্বেও আমি তোমাকে বেশ্যা জ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত হই নাই ; তুমি বেশ্যা নহ, তুমি দেবী ! দেবী আমাকে ক্ষমা কর, আমার উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দাও। রাজা কাতরভাবে তাঁহাকে এরূপ মিনতি করিতেছেন দেখিয়া, সন্ন্যাসিনী বলিল, মহারাজ, আপনার দোষ কি ? আপনি আমার প্রতি কিছুই অন্যায় ব্যবহার করেন নাই, বরং আমার প্রতি যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন ও অনুগ্রহ করিয়াছেন। আপনি রাজা, আমি বেশ্যা-কন্যা, আপনি আমাকে রাজপ্রাসাদে স্থান না দিলে, আমাকে অনেক দুর্গতি ভোগ করিতে হইত। কেবলমাত্র আমি রাজার আশ্রিতা, এইজন্য আমাকে কোনই উৎপাত সহ্য করিতে হয় নাই ; আমি যদি আপনার রক্ষিতা না হইতাম, তাহা হইলে বেশ্যা-কন্যার যেরূপ দুর্গতি হইয়া থাকে, সেরূপ সমস্তই আমাকে ভোগ করিতে হইত। অতএব রাজা যেরূপ বারবনিতাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, আপনি আমাকে সেরূপ মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, সযতনে রাজ-অট্টালিকায় রাখিয়াছেন মাত্র ; তাহাতে ত আপনার কোনই দোষ হয় নাই। আর আমি বারবনিতার কন্যা, আমি স্বেচ্ছায় আপনার রক্ষিতাভাবে অবস্থান করিতে সম্মত হইয়াছি ; তাহাও আমার কর্ত্তব্য, ইহাও আমার না করিলে বিধির উপরে অভিমান করা হইত। আমি যেরূপ ভাব লইয়া আসিয়াছি, সেইরূপই কার্য্য করিতেছি। তবে আমার সতীত্ব বজায় রাখিতে আমি সতত সচেষ্ট রহিয়াছি। তজ্জন্য আমার মাতার অনুরোধে বিবাহ করিতেও অসম্মত হইয়াছিলাম। কারণ আমি পূর্ব্বজন্ম জানিতাম। আমার স্বামীর সহিত আমার বিবাহ হইবে না, তাহা জানিতাম। অতএব বিবাহ করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। যখন আমি বেশ্যা-

কন্যা, তখন আমার একটি বেশ্যা-পুত্রের সহিত বিবাহ হইত। তাহা হইলে আর আমার সতীত্ব রক্ষা হইত না।

তজ্জন্যই আমি বিবাহ করিলাম না। পরে আপনি রাজা মহাশয়, আমার মাতার নিকট আসিয়া আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া, আমায় রক্ষিতা-স্বরূপে রক্ষা করিতে চাহিলেন। তাহাতে আমি সম্মত হইয়া, আপনার রাজ-প্রাসাদে আশ্রয় লইয়াছি। নচেৎ আমার সতীত্ব রক্ষার জন্য আমার প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে হইত, এবং আপনার প্রতি আমি এই আবদার করিয়াছিলাম যে, আমার এই যৌবনোন্মুখী সময়, আমার বাটীতে কোন পুরুষ এমন কি, দাস পর্য্যন্ত আসিতে পারিবে না এবং আপনি আমার বিনানুমতিতে আমাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারিবেন না। আপনি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন, এবং আমিও নিশ্চিন্ত মনে আপনার সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া কালযাপন করিয়াছি, এবং নিজ জপ, তপ, যোগ, ধ্যানাদি ভিন্ন আর কিছুই ত করি নাই? এবং আপনার কোন কথাই ত শুনি নাই, রাজা মহাশয়?

যুবরাজ—না দেবী। তুমি নির্দ্দোষী, যথার্থ সাক্ষাৎ সতী-লক্ষ্মী। এরূপ স্ত্রীজাতিতে অতি বিরল; এরূপ অবিবাহিতা সচ্চরিত্রা নিষ্ঠাবতী স্ত্রীলোক ত আমি কখনও দেখি নাই। সতী! এইবার হইতে আমি তোমাকে পূজা করিব, তুমি মাতৃরূপিণী সাক্ষাৎ সতী-লক্ষ্মী।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

রাজা চণ্ডীর এই কথাটি বার বার উচ্চারণ করিয়া, নিজ কলুষিত মনকে পবিত্র করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রটি সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে অনেক দিন হইতে অভ্যস্ত করিতে শিখাইয়াছিলেন, তাই আজ সেই মন্ত্রটি যুবরাজ নিজ হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত করিয়া বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সন্ন্যাসিনী আপন মনে সহাস্য বদনে বলিলেন:—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" ১০। গীতা, ৫ম অঃ।

ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া এবং ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া, যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি

পুণ্য-পাপাত্মক কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না, (যেমন জলে থাকিলেও) পদ্মপত্র জল দ্বারা লিপ্ত হয় না।

এই হলো নির্লিপ্ত ভাব। এ ভাব বড় সুন্দর, বড়ই মধুর। এই ভাবই ব্রহ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ। এ ভাব লইয়া আন্দোলন করিয়াও যথার্থ স্থানলাভ হওয়াও সুকঠিন; তাই মহিষের পুত্র এ সমস্তভাবে চৈতন্যভাবে থাকিয়াও পুনর্জন্ম লইলেন। হাঁ, শুনুন রাজামহাশয়! মহিষের পুত্রের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত এইবারে শুনুন।

উনি পূর্ব্বজন্মে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন এবং উঁহার অনেক গুলি শিষ্য ছিল, হঠাৎ উনি একদিন শিষ্য-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া শ্মশানভূমে আসিয়া উপনীত হয়েন। শ্মশানে বসিয়া সাধনা করিতেছিলেন, শ্মশানে তখন দুই একটা চিতা ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। তদ্দর্শনে তাঁহার মনে কি এক ভাব উদয় হইল জানি না, তৎক্ষণাৎ শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন যে, "একটি চিতা সাজাও!" শিষ্যগণ তাঁহার কথার উপর প্রতি উত্তর করিতে বা প্রশ্ন করিতে সাহসী ছিল না। কারণ তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ব্রাহ্মণ; অতএব শিষ্যগণ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার আদেশ পালন করিল। চিতা সজ্জিত হইল। ক্ষণকাল পরে চিতার উপর উপবেশন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ শিষ্য-মণ্ডলীকে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।